"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

২০শ বর্ষ।

(১৩২৪ মাঘ হইতে ১৩২৫ পৌষ পর্য্যন্ত)

উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং মুখার্জি লেন, বাগবাজার,

কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা।

সূচীপত্র।

২০শ বর্ষ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান

(১)

(স্বামী সারদানন্দ)

ঔষধ, পথ্য ও দিবারাত্র সেবার পূর্ব্বোক্ত ভাবে বন্দোবস্ত হইবার পরে গৃহস্থ ভক্তগণ নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলেন একথা বলিতে পারা যায় না। কারণ, কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের মতামত গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহারা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, ঠাকুরের কণ্ঠরোগ এককালে চিকিৎসার অসাধ্য না হইলেও বিশেষ কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই এবং তাঁহার আরোগ্য হওয়া দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত সেবা চালাইবার ব্যয় কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে, ইহাই এখন তাঁহাদিগের চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। ঐরূপ হইবারই কথা—কারণ, বলরাম, সুরেন্দ্র, রামচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি যাঁহারা ঠাকুরকে কলিকাতায় আনিয়া চিকিৎসাদির ভার লইয়াছিলেন তাঁহারা কেহই ধনী ছিলেন না। নিজ পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহপূর্ব্বক সেবকগণের সহিত ঠাকুরের ভার একাকী বহন করেন এরূপ সামর্থ্য তাঁহাদিগের কাহারও ছিল না। ঠাকুরের অসাধারণ অলৌকিকত্ব তাঁহাদিগের প্রাণে যে দিব্য আশা, আলোক, আনন্দ ও শান্তির ধারা প্রবাহিত করিয়াছিল কেবল মাত্র তাহারই প্রেরণায় তাঁহারা ভবিষ্যতের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ পূতধারা যে সর্ব্বক্ষণ একটানে বহিতে থাকিবে

এবং ভবিষ্যতের ভাবনা উহার ভাটার সময়ে তাঁহাদিগকে বিকল করিবে না একথা বলিতে যাওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক। ফলে ঐরূপ হয়ও নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐরূপ সময় উপস্থিত হইলেই তাঁহারা ঠাকুরের ভিতরে এমন নবীন আধ্যাত্মিক প্রকাশসকলের দর্শন করিতেন যে, ঐ দুর্ভাবনা কোথায় বিলীন হইয়া যাইত এবং তাঁহাদিগের অন্তর পুনর্ব্বার নূতন উৎসাহ ও বলে পূর্ণ হইয়া উঠিত। তখন আনন্দের উদ্দাম উল্লাসে যেন বিচারবুদ্ধির অতীত ভূমিতে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহারা দিব্যালোকে দেখিতে পাইতেন যে, যাঁহাকে তাঁহারা জীবনপথের পরম অবলম্বন স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কেবল মাত্র অতিমানব নহেন কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের আশ্রয়, জীবকুলের পরমগতি—দেবমানব নারায়ণ! তাঁহার জন্ম, কর্ম্ম, তপস্যা, আহার, বিহার—এমন কি দেহের অসুস্থতানিবন্ধন যন্ত্রণাভোগ পর্য্যন্ত সকলই বিশ্বমানবের কল্যাণের নিমিত্ত। নতুবা জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষাদির অতীত সত্যসঙ্কল্প পুরুষোত্তমের দেহের অসুস্থতা কোথায়? সেবাধিকার প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ করিবেন বলিয়াই তিনি অধুনা ব্যাধিগ্রস্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন! দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত গমন করিয়া যাহাদিগের তাঁহাকে দর্শন করিবার অবসর ও সুযোগ নাই তাহাদিগের প্রাণে দিব্যালোকের উন্মেষ উপস্থিত করিবার জন্যই তিনি সম্প্রতি তাহাদিগের নিকটে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন! পাশ্চাত্য শিক্ষাসম্পন্ন জড়বাদী মানব, যে বিজ্ঞানের ছায়ায় দাঁড়াইয়া আপনাকে নিরাপদ ও সর্ব্বজ্ঞপ্রায় ভাবিয়া ভোগবাসনার তৃপ্তিসাধনকেই জীবনের লক্ষ্য করিতেছে, ঈশ্বর-সাক্ষাৎকাররূপ দিব্যবিজ্ঞানের উচ্চতর আলোকে উহার অকিঞ্চিৎ-করত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক তাহার জীবন ত্যাগের পথে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্যই তিনি এখন ঐরূপ হইয়া রহিয়াছেন! তবে কেন এই আশঙ্কা, অর্থাভাব হইবে বলিয়া কি জন্য দুর্ভাবনা? যিনি সেবাধিকার প্রদান করিয়াছেন, উহা সম্পূর্ণ করিবার সামর্থ্য তিনিই তাঁহাদিগকে প্রদান করিবেন।

ভাবুকতার উচ্ছ্বাসে অতিরঞ্জিত করিয়া আমরা উপরোক্ত কথাগুলি বলিতেছি, পাঠক যেন ইহা মনে না করেন। ঠাকুরের সঙ্গগুণে ভক্তগণকে ঐরূপ অনুভব ও আলোচনা করিতে নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়াই আমাদিগকে ঐ সকল কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে। দেখিয়াছি, অর্থাভাববশতঃ ঠাকুরের সেবার ক্রুটি হইবার আশঙ্কায় মন্ত্রণা করিতে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ভাবের প্রেরণায় আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। কেহ বা বলিযাছেন, 'ঠাকুর নিজের জোগাড় নিজেই করিয়া লইবেন, যদি না করেন তাহাতেই বা ক্ষতি কি? (নিজ বাটি দেখাইয়া) যতক্ষণ ইটের উপর ইট রহিয়াছে ততক্ষণ ভাবনা কি?—বাটি বন্ধক দিয়া তাঁহার সেবা চালাইব।' কেহ বা বলিয়াছেন, 'পুত্র কন্যার বিবাহ বা অসুস্থতা কালে যেরূপে চালাইয়া থাকি সেইরূপে চালাইব, স্ত্রীর গাত্রে দুই চারি খানা অলঙ্কার যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ভাবনা কি?' আবার কেহ বা মুখে ঐরূপ প্রকাশ না করিলেও আপন সংসারের ব্যয় কমাইয়া অকাতরে ঠাকুরের সেবার ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া ঐ বিষয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ঐরূপ ভাবের প্রেরণাতেই সুরেন্দ্রনাথ বাটিভাড়ার সমস্ত ব্যয় একাকী বহন করিয়াছিলেন এবং বলরাম, রাম, মহেন্দ্র, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি সকলে মিলিত হইয়া ঠাকুরের ও তাঁহার সেবকগণের নিমিত্ত এককালে যাহা কিছু প্রয়োজন হইয়াছিল সেই সমস্ত যোগাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ভক্তগণ ঐরূপে যে দিব্যোল্লাস প্রাণে অনুভব করিতেন তাহা এখন ঠাকুরকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট এবং সহানুভূতিসম্পন্ন করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তসঙ্ঘরূপ মহীরুহ দক্ষিণেশ্বরে অঙ্কুরিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও এখানে উহা নিজ আকার ধারণপূর্ব্বক এত দ্রুত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, ভক্তগণের কেহ কেহ তখন স্থির করিয়াছিলেন, ঐ বিষয়ের সাফল্য আনয়নই ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধির অন্যতম কারণ।

যতই দিন গিয়াছিল ততই ঠাকুরের অসুস্থ হইবার কারণ এবং কত দিনে তাঁহার আরোগ্য হওয়া সম্ভবপর ইত্যাদি বিষয় লইয়া নানা জল্পনা ও বিশ্বাস ভক্তগণের মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে যেন কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহার অতীত জীবনের অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনাবলীর আলোচনাই যে, উহাদিগের মূলে থাকিয়া ভক্তগণকে অদ্ভুত মীমাংসাসকলে আনয়ন করিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। একদল ভাবিতেন শুদ্ধ ভাবনা কেন অপরের নিকট প্রকাশও করিতেন যুগাবতার ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধিটা মিথ্যা ভান মাত্র; উদ্দেশ্যবিশেষ সংসাধনের জন্য তিনি উহা জানিয়া বুঝিয়া অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন; যখনই ইচ্ছা হইবে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইবেন। বিশাল কল্পনাশক্তি লইয়া শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রই এই দলের নেতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। অন্য এক দল বলিতেন, যাঁহার বিরাট ইচ্ছার সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া সর্ব্বস্থান ও সর্ব্বপ্রকারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে ঠাকুর অভ্যস্ত হইয়াছেন, সেই জগদম্বাই জনকল্যাণসাধনকারী নিজ গূঢ় সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাকে কিছুকালের জন্য ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছেন; উহার সম্যক্ রহস্যভেদ ঠাকুরও স্বয়ং করিতে পারিয়াছেন কি না বলা যায় না; তাঁহার ঐ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইলেই ঠাকুর পুনরায় সুস্থ হইবেন। অপর এক দল প্রকাশ করিতেন—জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, এ সকল শরীরের ধর্ম্ম, শরীর থাকিলেই এক দিন নিশ্চয়ই ঐ সকল উপস্থিত হইবে, ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধিও ঐরূপে উপস্থিত হইয়াছে, অতএব উহার একটা অলৌকিক গূঢ় কারণ আছে ভাবিয়া এত জল্পনার প্রয়োজন কি? যত দিন না আমরা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতেছি তত দিন পর্য্যন্ত ঠাকুর সম্বন্ধে কোন বিষয়ের মীমাংসা আমরা তর্কযুক্তির দ্বারা বিশেষরূপে বিশ্লেষণ না করিয়া নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত নহি, আমরা তাঁহাকে আরোগ্য করিবার জন্য প্রাণপণে সেবা করিব এবং তিনি মানবজীবনের যে উচ্চাদর্শ সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন সেই ছাঁচে নিজ নিজ জীবন গঠন করিতে

যথাসাধ্য চেষ্টা ও সাধনভজনে নিযুক্ত থাকিব। বলা বাহুল্য, শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথই ঠাকুরের যুবক শিষ্যবর্গের প্রতিনিধি স্বরূপে শেষোক্ত মত প্রচার করিতেন।

ঠাকুরের বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট শিষ্যবর্গ তাঁহার সম্বন্ধে ঐরূপ নানা ভাব ও মত পোষণ করিলেও তাঁহার মহদুদার শিক্ষানুসারে জীবন অতিবাহিত করিলে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলে তাঁহাদিগের পরম মঙ্গল হইবে একথায় পূর্ণ বিশ্বাসবান্ ছিলেন। ঐজন্যই একদল তাঁহাকে যুগাবতার বলিয়া, অন্যদল গুরু ও অতিমানব বলিয়া এবং অপরদল দেবমানব বলিয়া বিশ্বাস করিলেও তাঁহাদিগের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব কোনদিন উপস্থিত হয় নাই।

যাহা হউক, কিরূপ আধ্যাত্মিক প্রকাশসকল ঠাকুরকে অবলম্বন করিয়া এখন ভক্তগণের নিত্য প্রত্যক্ষগোচর হইতেছিল পাঠককে উহা বুঝাইবার জন্য আমরা যাহা দেখিয়াছি, এইরূপ কয়েকটী ঘটনার এখানে উল্লেখ করিব। ঘটনাগুলি ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ ভিন্ন অন্য যে সকল লোক তাঁহাকে ঐকালে প্রথম দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, ঠাকুরের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়া ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার পরম উৎসাহে তাঁহাকে আরোগ্য করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন। প্রাতে, বৈকালে, মধ্যাহ্নে ঠাকুরের শরীর কিরূপ থাকে তাহা উপর্য্যুপরি কয়েক দিবস আসিয়া দেখিয়া তিনি ঔষধাদির ব্যবস্থা স্থির করিয়াছিলেন এবং চিকিৎসকের কর্ত্তব্য শেষ করিবার পরে ঐসকল দিবসে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানা প্রকার প্রসঙ্গে কিছুকাল ঠাকুরের সহিত অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ফলে ঠাকুরের উদার আধ্যাত্মিকতায় তিনি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়া অবসর পাইলেই এখন হইতে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতে ও দুই চারি ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার মূল্যবান্ সময়ের এত অধিক ভাগ এখানে কাটাইবার জন্য ঠাকুর একদিন তাঁহাকে

কৃতজ্ঞতা জানাইবার উপক্রম করিলে তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ওহে, তুমি কি ভাব কেবল তোমারই জন্য আমি এখানে এতটা সময় কাটাইয়া যাই? ইহাতে আমারও স্বার্থ রহিয়াছে। তোমার সহিত আলাপে আমি বিশেষ আনন্দ পাইয়া থাকি। পূর্ব্বে তোমাকে দেখিলেও এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া তোমাকে জানিবার অবসর ত পাই নাই— তখন এটা করিব, ওটা করিব, ইহা লইয়াই ব্যস্ত থাকা গিয়াছিল। কি জান, তোমার সত্যানুরাগের জন্যই তোমায় এত ভাল লাগে; তুমি যেটা ভাল বলিয়া বুঝ তার একচুল এদিক ওদিক করিয়া চলিতে বলিতে পার না; অন্যস্থলে দেখি, তারা বলে এক, করে এক; ঐটে আমি আদৌ সহ্য করিতে পারি না। মনে করিও না, তোমার খোসামুদি করুচি, এমন চাষা আমি নই; বাপের কুপুত্র! —বাপ অন্যায় করুলে তাঁকেও স্পষ্ট কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না; ঐজন্য আমার দুর্ম্মুখ বলে নামটা খুব রটিয়া গিয়াছে।'

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'তা শুনিয়াছি বটে; কিন্তু এইত এতদিন এখানে আস্‌চ, আমি ত তার কিছুই পরিচয় পাইলাম না।'

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন 'সেটা আমাদের উভয়ের সৌভাগ্য! নতুবা অন্যায় বলিয়া কোন বিষয় ঠেকিলে দেখিতে, মহেন্দ্র সরকার চুপ করিয়া থাকিবার বান্দা নয়। যাহা হ'ক, সত্যের প্রতি অনুরাগ আমাদের নাই, একথা যেন ভাবিও না। সত্য বলে যেটা বুঝেছি, সেইটা প্রতিষ্ঠা করিতেই ত আজীবন ছুটাছুটি করেছি ঐ জন্যই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসারম্ভ, ঐ জন্যই বিজ্ঞানচর্চ্চার মন্দিরনির্ম্মাণ,— ঐরূপ আমার সকল কাজেই।'

যতদূর মনে হয়, আমাদিগের মধ্যে কেহ এই সময়ে ইঙ্গিৎ করিয়াছিল, সত্যানুরাগ থাকিলেও ডাক্তার বাবুর অপরা বিদ্যার শ্রেণীভুক্ত আপেক্ষিক (relative) সত্যাবিষ্কারের দিকেই অনুরাগ —ঠাকুরের কিন্তু পরাবিদ্যার প্রতিই চিরকাল ভালবাসা।

ডাক্তার উহাতে একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, 'ঐ তোমাদের

এক কথা; বিদ্যার আবার পরা, অপরা কি? যা হ'তে সত্যের প্রকাশ হয় তার আবার উঁচ নীচু কি? আর যদিই একটা ঐরূপ মনগড়া ভাগ কর, তাহা হইলে এটা ত স্বীকার করিতেই হইবে, অপরা বিদ্যার ভিতর দিয়াই পরা বিদ্যা লাভ করিতে হইবে— বিজ্ঞানের চর্চ্চা দ্বারা আমরা যে সকল সত্য প্রত্যক্ষ করি তাহা হইতেই জগতের আদি কারণের বা ঈশ্বরের কথা আরও বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারি। আমি নাস্তিক বৈজ্ঞানিক ব্যাটাদের ধরিতেছি না! তাদের কথা বুঝিতেই পারি না—চক্ষু থাকিতেও তারা অন্ধ। তবে একথাও যদি কেহ বলেন যে, অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের সবটা তিনি বুঝে ফেলেছেন, তা হ'লে তিনি হয় মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর—না হয় ত তাঁর জন্য পাগলাগারদের ব্যবস্থা করা উচিত।'

ঠাকুর ডাক্তারের দিকে প্রসন্নদৃষ্টিপাত পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'ঠিক বলেছ, ঈশ্বরের 'ইতি' যারা করে তাহা হীনবুদ্ধি, তাদের কথা সহ্য করতে পারি না।'

ঐ বলিয়া ঠাকুর আমাদিগের জনৈককে ভক্তাগ্রণী শ্রীরামপ্রসাদের —'কে জানে মন কালী কেমন, ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন'* গীতটি গাহিতে বলিলেন এবং উহা শুনিতে শুনিতে উহার ভাবার্থ মৃদুস্বরে ডাক্তারকে মধ্যে মধ্যে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। 'আমার

---

* কে জানে মন কালী কেমন।
ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন॥
কালী পদ্মবনে হংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন॥
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণোবের লক্ষ এমন।
তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম, অন্য কেবা জানে তেমন॥
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন।
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বোঝে না ধরে্বে শশী হয়ে বামন॥

প্রাণ বুঝেছে মন বোঝে না, ধর্‌বে শশী হয়ে বামন' গীতের এই অংশটি গাহিবার কালে ঠাকুর গায়ককে বাধা দিয়া বলিলেন, "উঁহুঁ, উল্টো পাল্টা হচ্ছে, 'আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না'—এইরূপ হইবে; মন তাঁকে (ঈশ্বরকে) জান্‌তে গিয়ে সহজেই বুঝে যে, অনাদি অনন্ত ঈশ্বরকে ধরা তার কর্ম্ম নয়, প্রাণ কিন্তু ঐকথা বুঝিতেই চাহে না, সে কেবলি বলে কি ক'রে আমি তাঁকে পাব।"

ডাক্তার ঐকথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, 'ঠিক বলেছ, মন ব্যাটা ছোটলোক একটুতেই পার্‌ব না, হবে না ব'লে বসে; কিন্তু প্রাণ ঐকথায় সায় দেয় না ব'লেই ত যত কিছু সত্যের আবিষ্কার হয়েছে ও হচ্ছে।'

গান শুনিতে শুনিতে দুই একজন যুবক ভক্তের ভাবাবেশে বাহ্যচৈতন্যের লোপ হইতে দেখিয়া ডাক্তার তাহাদের নিকটে যাইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'মুর্চ্ছিতের ন্যায় বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান নাই বলিয়া বোধ হইতেছে।' বুকে হাত বুলাইয়া মৃদুস্বরে নাম শুনাইবার পরে তাহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ হইতে দেখিয়া তিনি ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিলেন, 'এ সব তোমারই খেলা, বোধ হইতেছে।' ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আমার নয় গো, এসব তাঁরি (ঈশ্বরের) ইচ্ছায়। ইহাদের মন এখনও স্ত্রী পুত্র, টাকা কড়ি, মান যশাদিতে ছড়াইয়া পড়ে নাই বলিয়াই তাঁর নামগুণ শ্রবণে তন্ময় হইয়া ঐরূপ হইয়া থাকে।'

পূর্ব্ব প্রসঙ্গ পুনরায় উঠাইয়া এইবার ডাক্তারকে বলা হইল, তিনি ঈশ্বরকে মানিলেও এবং তাঁহার 'ইতি' না করিলেও যাঁহারা বিজ্ঞানচর্চ্চায় রত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একদল ঈশ্বরকে একেবারে উড়াইয়া দেন এবং অপর দল ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তিনি এইরূপ ভিন্ন অপর কোনরূপ হইতে বা করিতে পারেন না, এই কথা উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিয়া থাকেন। ডাক্তার

বলিলেন, 'হাঁ, ঐকথা অনেকটা সত্য বটে ; কিন্তু ওটা কি জান ? —ওটা হচ্চে বিদ্যার গরম বা বদহজম—ঈশ্বরের সৃষ্টির দুই চারিটা বিষয় বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়া তারা মনে করে, দুনিয়ার সব ভেদটাই তারা মেরে দিয়েছে। যারা অধিক পড়েছে দেখেছে, ও দোষটা তাদের হয় না ; আমি ত ঐ কথা কখনও মনে আনিতে পারি না।'

ঠাকুর তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন, 'ঠিক বলেছ, বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে আমি পণ্ডিত, আমি যা জেনেছি বুঝেছি তাহাই সত্য, অপরের কথা মিথ্যা—এইরূপ একটা অহঙ্কার আসে। মানুষ নানা পাশে আবদ্ধ রয়েছে, বিদ্যাভিমান তাহারই ভিতরের একটা, এত লেখাপড়া শিখেও তোমার ঐরূপ অহঙ্কার নাই, ইহাই তাঁর কৃপা।'

ডাক্তার ঐকথায় উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, 'অহঙ্কার হওয়া দূরে থাক্, মনে হয় যা জেনেছি বুঝেছি তা যৎসামান্য, কিছু নয় বলিলেই হয়—শিখিবার এত বিষয় পড়িয়া রহিয়াছে, মনে হয় শুধু মনে হয় কেন আমি দেখিতে পাই—প্রত্যেক মানুষের এমন অনেক বিচার জানে যাহা আমি জানি না ; সে জন্য কাহারও নিকট হইতে কিছু শিখিতে আমার অপমান বোধ হয় না। মনে হয়, ইহাদের নিকটেও (আমাদিগকে দেখাইয়া) আমার শিখিবার মত অনেক জিনিস থাকিতে পারে, ঐ হিসাবে আমি সকলের পায়ের ধুলা লইতেও প্রস্তুত।'

ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, 'আমিও ইহাদিগকে বলি. (আমাদিগকে দেখাইয়া) 'সখি যত দিন বাঁচি তত দিন শিখি!' পরে ডাক্তারকে দেখাইয়া আমাদিগকে বলিলেন, 'কেমন নিরভিমান দেখ্‌ছিস্. ভিতরে মাল (পদার্থ) আছে কি না তাই ঐরূপ বুদ্ধি।'

ঐরূপ নানা কথাবার্ত্তার পরে ডাক্তার সে দিন বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল ঐরূপে দিন দিন ঠাকুরের প্রতি যেমন শ্রদ্ধা

২

ও প্রীতিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিলেন ঠাকুরও তেমনি তাঁহাকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য যত্নপর হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন গুণী ব্যক্তির সহিত আলাপেই গুণীর সমধিক প্রীতি জানিয়া ঠাকুর তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ বাছা বাছা লোক সকলকে মধ্যে মধ্যে স্থবিদ্বান্ ডাক্তারের সহিত আলাপ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের সহিত পরিচিত হইবার পরে ডাক্তার একদিন বুদ্ধচরিতের অভিনয় দর্শন করিয়া উহার শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং তৎকৃত অন্য কয়েকখানি নাটকেরও অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। ঐরূপে নরেন্দ্রনাথের সহিত আলাপে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন এবং সঙ্গীতবিদ্যাতেও তাঁহার অধিকার আছে জানিয়া একদিন ভজন শুনাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। উহার কয়েক দিন পরে ডাক্তার এক দিবস অপরাহ্নে ঠাকুরকে দেখিতে আসিলে নরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষাপূর্ব্বক দুই তিন ঘণ্টা কাল তাঁহাকে ভজন শুনাইয়াছিলেন। ডাক্তার সেই দিন উহাতে এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, বিদায়গ্রহণের পূর্ব্বে নরেন্দ্রকে পুত্রের ন্যায় স্নেহে আশীর্ব্বাদ আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, 'এর মত ছেলে ধর্ম্মলাভ করিতে আসিয়াছে দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত, এ একটি রত্ন, যাতে হাত দেবে সেই বিষয়েরই উন্নতিসাধন করিবে।' ঠাকুর উহাতে নরেন্দ্রনাথের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, 'কথায় বলে অদ্বৈতের হুঙ্কারেই গৌর নদীয়ায় আসিয়াছিলেন, সেইরূপ ওঁর (নরেন্দ্রের) জন্যই তো সব গো।' এবং তদবধি ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়া নরেন্দ্রকে সেখানে উপস্থিত দেখিলেই ডাক্তার তাঁহার নিকট হইতে কয়েকটি ভজন না শুনিয়া ছাড়িতেন না।

ঐরূপে ভাদ্র আশ্বিনের কয়দিন অতীত হইয়া ক্রমে দুর্গাপূজার কাল উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুরের অসুস্থতা ঐ সময়ে কোন কোন দিন কিছু অধিক এবং অন্য সকল দিনে অল্প, এইভাবে চলিয়াছিল। ঔষধে সম্যক্ ফল পাওয়া যাইতেছিল না। ডাক্তার এক দিন

আসিয়া রোগ বাড়িয়াছে দেখিয়া বলিয়া বসিলেন, 'নিশ্চয় পথ্যের কোন অনিয়ম হইতেছে; আচ্ছা বল দেখি, আজ কি কি খাইয়াছ?'

প্রাতে ভাতের মণ্ড, ঝোল ও দুধ, এবং সন্ধ্যায় দুধ ও যবের মণ্ডাদি তরল খাদ্যই ঠাকুর খাইতেছিলেন, সুতরাং ঐ কথাই বলিলেন। ডাক্তার বলিলেন, 'তথাপি নিশ্চয় কোন নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল। আচ্ছা বল ত কোন্ কোন্ আনাজ দিয়া ঝোল রাঁধা হইয়াছিল?' ঠাকুর বলিলেন, 'আলু, কাঁচকলা, বেগুন, দুই এক টুকরা ফুলকপিও ছিল।'

ডাক্তার বলিলেন, 'এ্যা ফুলকপি খেয়েছ? এই ত খাবার অত্যাচার হয়েছে. ফুলকপি বিষম গরম ও দুষ্পাচ্য। কয় টুক্‌রা খেয়েছ?'

ঠাকুর বলিলেন, 'এক টুকরাও খাই নাই. তবে ঝোলে উহা ছিল দেখিয়াছি।'

ডাক্তার বলিলেন, 'খাও আর নাই খাও, ঝোলে উহার সত্ব ত ছিল. সে জন্যই তোমার হজমের ব্যাঘাত হইয়া আজ ব্যারামের বৃদ্ধি হইয়াছে।'

ঠাকুর বলিলেন. 'সে কি গো! কপি খাইলাম না, পেটের অসুখও হয় নাই, ঝোলে কপির একটু রস ছিল বলিয়া ব্যারাম বাড়িয়াছে, এ কথা যে আদৌ মনে নেয় না।'

ডাক্তার বলিলেন. 'ঐরূপ একটুতে যে কতটা অপকার করিতে পারে তাহা তোমাদের ধারণা নাই। আমার জীবনের একটা ঘটনা বলিতেছি. শুনিলে বুঝিতে পারিবে। আমার হজমশক্তিটা বরাবরই কম: মধ্যে মধ্যে অজীর্ণে খুব ভুগিতে হইত; সে জন্য খাদ্যের সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হইয়া নিয়ম রক্ষা করিয়া সর্ব্বদা চলি। দোকানের কোন জিনিস খাই না; ঘি, তেল পর্য্যন্ত বাড়ীতে করাইয়া লই। তথাচ এক সময়ে বিষম সর্দ্দি হইয়া ব্রন্‌কাইটিস্ হইল, কিছুতেই সারিতে চায় না। তখন মনে হইল, নিশ্চিত খাবারের কোন প্রকার দোষ হইতেছে। সন্ধান করিয়া উহাতেও কোন প্রকার দোষ ধরিতে পারিলাম না। উহার পরে সহসা এক দিন চোখে পড়িল, যে

গোরুটার দুধ খাইয়া থাকি তাহাকে চাকরটা কতকগুলো মাসকড়াই খাওয়াইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, কোনও স্থান হইতে কয়েক মন ঐ কড়াই পাওনা গিযাছিল, সর্দ্দির ভয়ে কেহ খাইতে চাহে না বলিয়া কিছু দিন হইতে উহা গোরুকে খাইতে দেওয়া হইতেছে। মিলাইযা পাইলাম, যখন হইতে ঐরূপ করা হইযাছে প্রায় সেই সময় হইতেই আমার সর্দ্দি হইয়াছে। তখন গোরুকে ঐ কড়াই খাওয়ান বন্ধ করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্দ্দিও অল্পে অল্পে কমিতে লাগিল। সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইতে সেই বার অনেক দিন লাগিয়াছিল এবং বায়ুপরিবর্ত্তনাদিতে আমার চারি পাঁচ হাজার টাকা খরচ হইয়া গিয়াছিল।'

ঠাকুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন 'ও বাবা, এ যে তেঁতুলতলা দিয়া গিয়াছিল বলিয়া সর্দ্দি হইল -সেইরূপ!'

সকলে হাসিতে লাগিল। ডাক্তারের ঐরূপ অনুমান করাটা একটু বাড়াবাড়ি বলিযা বোধ হইলেও উহাতে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া ঐ বিষয়ে আর কোন কথা কেহ উত্থাপন করিল না এবং তাঁহার নিষেধ মানিয়া লইয়া এখন হইতে ঠাকুরের ঝোলে কপি দেওয়া বন্ধ করা হইল।

ঠাকুরের ভালবাসা, সরল ব্যবহার এবং আধ্যাত্মিকতায় ডক্তারের মন তাঁহার প্রতি ক্রমে কতদূর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিল তাহা তাঁহার এক এক দিনের কথায় ও কার্য্যে বেশ বুঝা যাইত। শুদ্ধ ঠাকুরকে কেন, তদীয় ভক্তগণকেও তিনি এখন ভালবাসার চক্ষে দেখিতেছিলেন এবং ঠাকুরকে লইয়া তাহারা যে একটা মিথ্যা হুজুক করিতে বসে নাই এবিষয়ে বিশ্বাসবান্ হইয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুরকে তাহারা যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তি বিশ্বাস করিত তাহা তিনি কি ভাবে দেখিতেন তাহা বলা যায় না। বোধ হয় তাঁহার নিকটে উহা কিছু বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইত। অথচ তাহারা যে উহা কোন প্রকার স্বার্থের জন্য অথবা 'লোক দেখান'র মত করে না তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেন। সুতরাং তাঁহার নিকটে উহা

এক বিচিত্র রহস্যের ন্যায় প্রতিভাত হইত বলিয়া বোধ হয়। ভক্তদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিত হইয়া তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ঐ বিষয়ের সমাধানে নিত্য নিযুক্ত থাকিয়াও ঐ প্রহেলিকা-ভেদে সমর্থ হয় নাই। কারণ, ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইলেও মানবের ভিতর তাঁহার অসাধারণ শক্তিপ্রকাশ দেখিয়া তাঁহাকে গুরু ও অবতার বলিয়া শ্রদ্ধা পূজাদি করাটা তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বুঝিতে পারিতেন না, এবং বুঝিতে পারিতেন না বলিয়া উহার বিরোধী ছিলেন। বিরোধের কারণ, সংসারে যাঁহারা অবতার বলিয়া পূজা পাইতেছেন তাঁহাদের শিষ্যপরম্পরা তাঁহাদিগের চরিত্রের মহিমা প্রচার করিতে যাইয়া বুদ্ধির দোষে কোন কোন স্থলে শিব গড়িতে বাঁদর গড়িয়া বসিয়াছেন, এবং এই জন্য তাঁহারা স্বরূপতঃ কীদৃশ ছিলেন, লোকের তাহা ধরা বুঝা এখন এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ঐ প্রসঙ্গে ডাক্তার একদিন ঠাকুরের সম্মুখে স্পষ্ট বলিয়াও ছিলেন, 'ঈশ্বরকে ভক্তি পূজাদি যাহা বল তাহা বুঝিতে পারি, কিন্তু সেই অনন্ত ভগবান্ মানুষ হইয়া আসিয়াছেন এই কথা বলিলেই যত গোল বাধে। তিনি যশোদানন্দন, মেরীনন্দন, শচীনন্দন হইয়া আসিয়াছেন, এই কথা বুঝা কঠিন—এ নন্দনের দলই ত দেশটাকে উচ্ছন্ন দিয়াছে!' ঠাকুর ঐ কথায় হাসিয়া আমা-দিগকে বলিয়াছিলেন, 'এ বলে কি? তবে হীনবুদ্ধি গোঁড়ারা অনেক সময় তাঁহাকে বাড়াইতে যাইয়া ঐরূপ করিয়া ফেলে বটে।'

অবতার সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত মত প্রকাশের জন্য ডাক্তারের সঙ্গে গিরিশচন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথের সময়ে সময়ে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল। ফলে, উহার বিপরীতে অনেক যুক্তিগত কথা বলা যাইতে পারে, ইহা প্রতিপন্ন হওয়ায় ঐরূপ একান্ত বিরোধী মত সহসা প্রকাশ করিতে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু তর্কে যাহা হয় নাই, ঠাকুরের মনের অলৌকিক মাধুর্য্য ও প্রেম এবং তাঁহার ভিতর হইতে যে অদৃষ্টপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক প্রকাশ ডাক্তারের সময়ে সময়ে নয়নগোচর হইতেছিল তাহা দ্বারা সে বিষয় সংসিদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার ঐরূপ

মত ধীরে ধীরে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঐ বৎসর ৺দুর্গা-পূজার সন্ধিক্ষণে যে অলৌকিক বিভূতিপ্রকাশ ঠাকুরের ভিতরে সহসা উপস্থিত হইতে আমরা সকলে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম*, ডাক্তার সরকারও উহা দেখিবার ও পরীক্ষা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। তিনি সেই দিন অপর এক ডাক্তার বন্ধুর সহিত তথায় উপস্থিত থাকি[illegible] ভাবাবেশকালে ঠাকুরের হৃদয়ের স্পন্দনাদি যন্ত্রসাহায্যে পরীক্ষা ক[illegible]ছলেন এবং তাঁহার ডাক্তার বন্ধু ঠাকুরের উন্মীলিত নয়ন সঙ্কোচত হয় কি না দেখিবার জন্য তন্মধ্যে অঙ্গুলি প্রদান করিতেও ক্রটি করেন নাই! ফলে হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল, বাহিরে দেখিতে সম্পূর্ণ মৃতের ন্যায় প্রতীয়মান ঠাকুরের এই সমাধি অবস্থা সম্বন্ধে বিজ্ঞান কোনরূপ আলোক এখনও প্রদান করিতে পারে নাই; পাশ্চাত্য দার্শনিক উহাকে জড়ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ ও ঘৃণা প্রকাশপূর্ব্বক নিজ অজ্ঞতা ও ইহসর্ব্বস্বতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; ঈশ্বরের সংসারে এমন অনেক বিষয় বিদ্যমান, যাহাদের রহস্যভেদ দর্শন-বিজ্ঞান কিছুমাত্র করিতে সক্ষম হয় নাই—কোনও কালে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। বাহিরে মৃতের ন্যায় অবস্থিত হইয়া ঠাকুর সে দিন ঐকালে যাহা দর্শন বা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা কতদূর বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া ভক্তগণ মিলাইয়া পাইয়াছিল, সে সকল কথা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করায় উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

(ক্রমশঃ)

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, ৮ম অধ্যায়।

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি)

সমাধি।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

(সিষ্টার নিবেদিতা)

যে ব্যক্তি একখানি সরু তক্তার উপর দিয়া কোন গভীর গহ্বর পার হয়, তাহার প্রতি মুহূর্ত্তে হঠাৎ সমস্ত অভ্যস্ত সংস্কার ও অনুভূতির কথা মনে উদয় হইয়া সেই অত্যুচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার বাহিরে অবস্থিত মনোরাজ্যে মানবের মধ্যে মধ্যে প্রবেশলাভ সম্বন্ধে আমরা শাস্ত্রে যে সকল গল্প লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই, তাহারাও অনেকটা এই রকমের। সাগরের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে যাইতে যেমন পিটারের মনে পড়িল তিনি কোথায়, অমনি তিনি ডুবিতে আরম্ভ করিলেন। পর্ব্বতসানুতে নিদ্রিত কতিপয় ক্লান্ত নর জাগরিত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদের আচার্য্যদেব এক সম্পূর্ণ নূতন আকৃতিতে তাঁহাদের সম্মুখে বিদ্যমান। কিন্তু আবার তাঁহারা মর জগতে নামিয়া আসিলেন ; তখন সেই অপূর্ব্ব দর্শন কোথায় চলিয়া গিয়া স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। রাত্রিতে ক্ষেতের উপর বসিয়া মেষপালকে পাহারা দিতে দিতে এবং চুপে চুপে উচ্চ উচ্চ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতে করিতে মেষপালকগণ দেবদূতগণের আবির্ভাব দেখিতে পাইল। সেই মুহূর্ত্তকয়টী চলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থান এবং কালে তাহাদের মনের যে উচ্চাবস্থা আসিয়াছিল, তাহাও চলিয়া গেল। আর একি ! সে দেবদূতগণও যে সব আকাশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন ! তাঁহাদের শ্রোতৃগণ নিকটবর্ত্তী গ্রামে কি অসাধারণ ব্যাপার ঘটিয়াছে দেখিবার জন্য সাধারণ লোকদিগেরই ন্যায় পদব্রজে যাইতে বাধ্য হইল।

ভারতীয় আদর্শ এসকলের ঠিক বিপরীত। ভারতের আদর্শ পুরুষ তিনিই যিনি মনের প্রবৃত্তিসমূহকে এমন উত্তমরূপে জয় করিয়াছেন যে, তিনি যে কোন মুহূর্ত্তে চিন্তাসমুদ্রে ডুব দিতে পারেন এবং তথায় ইচ্ছামত থাকিতে পারেন; যিনি অমোঘ ভাব-স্রোতে হু হু করিয়া ভাসিয়া যাইতে পারেন, সহসা ঐ ভাব ভঙ্গ হইয়া অকস্মাৎ তিনি যে পুনর্বায় ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে নামিয়া আসিবেন, তাহার অনুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। অবশ্য শিক্ষার গভীরতা ও অনুভূতির প্রগাঢ়তা দ্বারা এই শক্তিলাভের সহায়তা হয়। কিন্তু উহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার একমাত্র সদুপায় কঠোর আত্মনিয়মন—এরূপ কঠোর যে, সাধক যেন ইচ্ছা মাত্র চিন্তারও বাহিরে যাইতে পারেন। যিনি এইরূপে নিজ মনকে একাগ্র করিতে পারেন যে, যখন ইচ্ছা উহাকে একেবারে নিরোধ পর্য্যন্ত করিতে পারেন, তাঁহার নিকট, মন আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের ন্যায় বা দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় হইয়া যায় এবং শরীরও মনের অনুগত প্রজা হইয়া দাঁড়ায়। এরূপ ক্ষমতা না পাওয়া পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ, অবিচলিত আত্মসংযম আসে না। এক পুরুষের মধ্যে কয়টা লোক জন্মগ্রহণ করে, যাহারা এরূপ উচ্চাধিকারী হইতে পারে! এরূপ মহাপুরুষগণের কার্য্যে ও কথায় এমন একটা জ্যোতি, এমন একটা দৃঢ় প্রত্যয় থাকে, যাহা বুঝিতে ভুল হয় না। বাইবেলের ভাষায়, "তাঁহারা এমন ভাবে কথা কন, যেন তাঁহাদের 'চাপরাস' আছে, যেন তাঁহারা পুঁথিপড়া পণ্ডিত মাত্র নহেন।"

একথা নিঃসন্দেহ যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বালক নরেন্দ্রকে প্রথম দর্শনেই 'আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞানী' বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার যেমন কোন প্রবাহের বেগ নিরূপণ করে, তিনিও তেমনি বালকের ইতিপূর্ব্বেই কতদূর মানসিক উচ্চাবস্থা লাভ হইয়াছে, তাহা ধরিতে পারিয়াছিলেন। তিনি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, তুমি কি নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে একটা জ্যোতি দেখিতে পাও?" বালক সবিস্ময়ে উত্তর দিলেন, "কেন, সকলেই কি দেখে না?" উত্তরকালে তিনি প্রায়ই এই প্রশ্নটীর উল্লেখ করিতেন এবং

প্রসঙ্গক্রমে তিনি কিরূপ জ্যোতি দেখিতেন, তাহাই বর্ণনা করিতেন। কখনও কখনও উহা একটী গোলকের মত হইত, এবং একটী বালক উহাকে পা দিয়া খেলিতে খেলিতে তাঁহার দিকে লইয়া আসিত। ক্রমে উহা নিকটবর্ত্তী হইত। তিনি উহার সহিত এক হইয়া যাইতেন, এবং সমস্ত জগৎ বিস্মৃত হইতেন। কখনও কখনও উহা এক অগ্নিপুঞ্জের মত হইত এবং তিনি উহাতে প্রবেশ করিতেন। আমরা অবাক হইয়া ভাবি যে নিদ্রার প্রারম্ভই এইরূপ, তাহা কি আমরা সচরাচর নিদ্রা বলিতে যাহা বুঝি তাহাই? সে যাহাই হউক যাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের সমবয়স্ক বালক ছিলেন, তাঁহারা বলেন যে, তিনি নিদ্রিত হইলে তাঁহাদের গুরুদেব তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাস লক্ষ্য করিয়া অপর সকলকে বলিতেন যে, স্বামিজী শুধু নিদ্রা যাইতেছেন বলিয়া মনে হইতেছে মাত্র, এবং তিনি এখন ধ্যানের কোন্ অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কাশীপুর উদ্যানে পীড়িত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, সেইসময় এক দিন স্বামিজী ঐরূপে যেন কয়েক ঘণ্টা কাল নিদ্রাই যাইতেছিলেন। নিকটে যিনি ছিলেন তাঁহার ঐরূপই মনে হইয়াছিল। প্রায় মধ্যরাত্রে তিনি সহসা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আমার দেহ কোথায় গেল?" তাঁহার সঙ্গী—পরে যিনি গোপাল দাদা নামে পরিচিত হইয়াছিলেন—নিকটে দৌড়িয়া গিয়া জোরে জোরে হাত বুলাইয়া দিয়া, মস্তকের নিম্ন হইতে সমস্ত শরীরের যে অনুভূতি লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা পুনরানয়ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যখন কিছুতেই কিছু হইল না, এবং বালক বিশেষ কষ্ট ও ভয় পাইতে লাগিলেন, তখন গোপাল দাদা শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটেই দৌড়িয়া গেলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার শিষ্যের অবস্থা জ্ঞাত করাইলেন। তিনি শুনিয়া একটু হাসিলেন এবং বলিলেন, "থাক্ ঐরূপ। কিছুক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকিলে তাহার কোন ক্ষতি হইবে না। ঐ অবস্থালাভের জন্য সে আমাকে বিস্তর জ্বালাতন করিয়াছে।" পরে তিনি গোপাল দাদা ও অপর সকলকে বলিলেন যে, নরেন্দ্রের নির্বিকল্প সমাধি লাভ

হইয়া গিয়াছে, এখন তাহাকে কার্য্য লইয়া থাকিতে হইবে। স্বামিজী নিজে পরে এই অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দের নিকট এইরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন, "মস্তিষ্কের ভিতরে যেন একটা আলো দেখিতে পাইতেছিলাম, উহা এত উজ্জ্বল যে, আমি ধরিয়াই লইয়াছিলাম যে, আমার মস্তকের পশ্চাতে কেহ একটী উজ্জ্বল আলো রাখিয়া গিয়া থাকিবে।" তৎপরে যে তাঁহার ইন্দ্রিয়ানুভূতি বন্ধনসম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায় কিনা 'যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' সে রাজ্যে উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন একথা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।

ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, মনকে একাগ্র করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে আমাদের দেহটাকে ভুলিতে পারা চাই। এই জন্যই লোকে তপস্যা ও কঠোরতা অভ্যাস করিয়া থাকে। কিছুকাল কঠোর তপস্যায় কাটাইতে হইবে, এই চিন্তা আজীবন স্বামিজীর আনন্দদায়ক ছিল। তিনি নির্ভীকভাবে বিজয়ীর ন্যায় সংসারের মধ্যে বিচরণ করিয়া বেড়াইলেও, প্রায়ই এই তপস্যার কথা উত্থাপন করিতেন। সুদক্ষ সওয়ার যেমন ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া দেখে, অথবা প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিশারদ যেমন বাদ্যযন্ত্রের পর্দ্দার উপর দিয়া অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া দেখে, তিনিও সেইরূপ শরীরটা ইচ্ছাশক্তির সম্পূর্ণ বশে চলে কিনা, পুনরায় দেখিতে ভালবাসিতেন—এখনও তাঁহার যন্ত্রের উপর পূর্ব্ববৎ দখল আছে কিনা নূতন করিয়া দেখিতে প্রীতি অনুভব করিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ দশায় তিনি কলিকাতার গরমের মধ্যেও ঐ কয় মাস জল পান করিব না এইরূপ স্বীকৃত হইয়াছিলেন; তবে মুখ ধুইবার কোন নিষেধ ছিল না। সেই সময়ে তিনি দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার গলদেশের পেশীসমূহ একবিন্দু জল প্রবেশ করিতে গেলেও আপনা হইতে বন্ধ হইয়া যাইত, সুতরাং তিনি ইচ্ছা করিলেও জলপান করিতে পারিতেন না। যেদিন তিনি কোন ব্রত উপলক্ষ্যে উপবাসী আছেন, সেই দিন তাঁহার নিকটে থাকিলে অপরেরও খাদ্যসামগ্রী অনাবশ্যক মনে হইত এবং চেষ্টা করিয়াও তদ্বিষয়ে

রুচি হইত না। আমি একটী ঘটনার কথা শুনিয়াছি—তিনি সেদিন বসিয়াছিলেন, এবং তাঁহার চারিপার্শ্বে কতকগুলি লোক তর্কবিবাদ করিতেছিল; সেই সকল তিনি শুনিতেছিলেন না বলিয়াই মনে হইতেছিল। হঠাৎ তাঁহার হস্তাগ্রে একটা শূন্য কাচের গেলাস ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া চূর্ণ হইয়া গেল ঐ তর্কে তাঁহার যে কষ্টবোধ হইতেছিল, তাহার ঐটুকুমাত্র নিদর্শন তিনি দিয়াছিলেন!

কত কঠোর সাধনা দ্বারা এইরূপ আত্মসংযমশক্তি পুষ্ট হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নহে। হয়ত কত ঘণ্টাই পূজাধ্যানাদিতে অতিবাহিত হইয়াছে, কতক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে হইয়াছে, এবং দীর্ঘকাল আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। শেষোক্ত বিষয়টী সম্বন্ধে এক সময়ে স্বামিজী পঁচিশ দিন প্রত্যহ অর্দ্ধ ঘণ্টা মাত্র নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। আবার এই অর্দ্ধঘণ্টার নিদ্রা হইতেও তিনি নিজেই জাগরিত হইতেন। সম্ভবতঃ অতঃপর আর কখনও নিদ্রা তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে বা বহুক্ষণ আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই। তাঁহার "যোগীর চক্ষু" ছিল, একথা বাল্যে যখন তিনি গঙ্গাবক্ষে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বজরায় উঠিয়া তাঁহাকে 'মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?" এই প্রশ্ন করেন, তখন তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। "যোগীর চক্ষু" সম্পূর্ণরূপে মুদ্রিত হয় না, এবং সূর্য্যোদয় হইবামাত্র একেবারে উন্মীলিত হইয়া যায়, ইহাই প্রবাদ। পাশ্চাত্যদেশে যাঁহারা তাঁহার সহিত এক গৃহে বাস করিতেন তাঁহারা শুনিতে পাইতেন যে, তিনি রাত্রিশেষে স্নান করিতে যাইবার সময় 'পরব্রহ্ম' কি ঐরূপ কোন নাম সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছেন। তাঁহাকে কঠোরতা অভ্যাস করিতে কখনও দেখা যাইত না, কিন্তু তাঁহার সমগ্র জীবন এমন প্রগাঢ় একাগ্রতাময় ছিল যে, অপর কাহারও পক্ষে উহা অতি ভীষণ তপস্যা হইত। আমেরিকার ন্যায় রেলরাস্তা, ট্রামওয়ে এবং জটিল নিমন্ত্রণতালিকার দেশে তাঁহাকে প্রথম প্রথম কি কষ্টে ধ্যানের বেগ সমলাইতে হইত, তাহা তাঁহার আমেরিকাবাসী বন্ধুগণ প্রত্যক্ষ

করিয়াছেন। জনৈক ভারতবাসী, যিনি তাঁহাকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, "তিনি ধ্যান করিতে বসিলে দশমিনিট যাইতে না যাইতেই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন, যদিও তাঁহার শরীর মশায় ছাইয়া যাইত!" এই অভ্যাসটী তাঁহাকে দমন করিতে হইয়াছিল। প্রথম প্রথম, লোকে হয়ত রাস্তার অপর সীমায় তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তিনি এদিকে গভীর চিন্তায় বাহ্যহারা হইয়া গিয়াছেন; —ইহাতে তিনি বড় লজ্জিত হইতেন। একবার নিউইয়র্কে তিনি একটী ক্লাসে ধ্যান শিক্ষা দিতেছেন, শেষে দেখা গেল যে, কিছুতে তাঁহার আর বাহ্য সংজ্ঞা আসে না; তখন তাঁহার ছাত্রগণ একে একে নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু যখন তিনি এই ব্যাপারটী শুনিলেন, তখন তিনি অতীব মর্ম্মাহত হইলেন এবং আর কখনও ক্লাসে ধ্যান শিখাইতে সাহস করেন নাই। নিজের ঘরে দুই একজনকে সঙ্গে লইয়া ধ্যান করিবার সময় তিনি কোন একটী কথা বলিয়া দিতেন, যাহা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিলে তাঁহার বাহ্যচৈতন্য ফিরিয়া আসিত।

কিন্তু ধ্যানকালের কথা একেবারে ছাড়িয়া দিলেও, তিনি সকল সময়ে প্রায়ই চিন্তায় তন্ময় হইয়া যাইতেন। দশজনে মিলিয়া গল্প গুজব হাসি পরিহাস চলিতেছে, এমন সময়ে দেখা গেল, তাঁহার নয়নদ্বয় স্থির হইয়া গিয়াছে, শ্বাস প্রশ্বাস ক্রমেই ধীরে ধীরে হইতেছে, ক্রমে একেবারে স্থির তৎপরে ধীরে ধীরে আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তি। তাঁহার বন্ধুগণ এ সকল জানিতেন এবং সেই মত ব্যবস্থা করিতেন। যদি তিনি দেখা শুনা করিবার জন্য কাহারও বাটীতে প্রবেশ করিয়া কথা কহিতে ভুলিয়া যাইতেন, অথবা যদি কেহ তাঁহাকে কোন ঘরে চুপ চাপ বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে কেহ তাঁহাকে বিরক্ত করিত না; যদিও তিনি কখনও কখনও উঠিয়া, মৌনভঙ্গ না করিয়াই আগন্তুককে সাহায্য করিতেন। এইরূপে তাঁহার মন ভিতরের দিকেই পড়িয়া থাকিত, বাহিরের বস্তু অন্বেষণ করিত না। তাঁহার চিন্তা কত উচ্চে আরোহণ করিয়াছে বা কতদূর

ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার কথাবার্ত্তাই আমাদের একমাত্র ইঙ্গিত ছিল তিনি সর্ব্বদা নির্গুণ তত্ত্ব সম্বন্ধেই প্রসঙ্গ করিতেন। লোকে যাহাকে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ বলে, উহা সকল সময়ে ঠিক সেরূপ হইত না তাঁহার গুরুদেবের সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। উহা অনেক সময়েই ঐহিক বিষয়ের কথা হইত কিন্তু উহার পরিধি সকল সময়েই অতি বিস্তৃত থাকিত। উহাতে কোন কিছু এতটুকু নীচ, বা সঙ্কীর্ণ, বা ক্ষুদ্র থাকিত না। উহার কোথাও সহানুভূতির সঙ্কোচ হইত না। তাঁহার বিরুদ্ধ সমালোচনা পর্য্যন্ত শুধু সংজ্ঞানির্দ্দেশ ও বিশ্লেষণ বলিয়াই লোকের মনে হইত। উহাতে বিদ্বেষ বা ক্রোধ থাকিত না। তিনি একদিন নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "আমি একজন অবতারের পর্য্যন্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে পারি, অথচ উহাতে আমার তাঁহার প্রতি ভালবাসার বিন্দুমাত্র হ্রাস হইবে না। কিন্তু আমি বেশ জানি যে, অধিকাংশ লোকেই এরূপ পারিবে না; তাহাদের পক্ষে নিজ নিজ ভক্তিটুকু বাঁচাইয়া রাখাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ!" তাঁহার বিশ্লেষণ শ্রবণে শ্রোতার মনেও আলোচ্য বিষয়ের প্রতি কোন বিরাগ বা ঘৃণার ভাব থাকিয়া যাইত না

জগতের প্রতি তাঁহার এই উদার ও মধুর দৃষ্টি তাঁহার গুরু-ভক্তির উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "আমার ভক্তি কুকুরের প্রভুভক্তির মত। আমি কারণ অন্বেষণ করি না, আমি শুধু পদানুসরণ করিয়াই সন্তুষ্ট।" আবার শ্রীরামকৃষ্ণেরও নিজগুরু তোতাপুরীর প্রতি ঐরূপ ভাব ছিল। এই আচার্য্যশ্রেষ্ঠ একদিন অম্বালার নিকটবর্ত্তী কৈথাল নামক স্থানে নিজ শিষ্যগণকে এই বলিয়া চলিয়া আসিলেন, "আমাকে বঙ্গদেশে যাইতে হইবে। আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি যে, তথায় একজন মুমুক্ষুর আমার সাহায্যের প্রয়োজন।" দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার কার্য্য শেষ হইলে তিনি আবার নিজ শিষ্যদিগের নিকট ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধিস্থান আজ পর্য্যন্ত লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু যাঁহাকে তিনি দীক্ষিত করিলেন তিনি তদবধি তাঁহার প্রতি

এত ভক্তিসম্পন্ন হইলেন যে, তাঁহার নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতেন না। 'ন্যাংটা আমাকে এই কথা বলিত'—এইরূপেই তিনি তৎসম্বন্ধে উল্লেখ করিতেন। জগতের প্রতি পূর্ণ প্রেম, এবং মানবের উপর পূর্ণবিশ্বাস কেবল সেই হৃদয়বান্ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভবপর, যিনি নিজ আদর্শ একবার কাহারও চরিত্রে সম্যক্‌রূপে প্রতিফলিত দেখিয়াছেন।

কিন্তু দেহবোধের পারে যাইবার শক্তিই আমাদের আচার্য্য দেবের ন্যায় চরিত্রবিকাশের একমাত্র কারণ নহে। হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন যে, চরম শক্তি বিকাশ করিতে হইলে প্রথমে প্রগাঢ় অনুভব শক্তি জাগাইয়া তুলিতে হইবে, এবং তৎপরে উহাকে সম্পূর্ণরূপে সংযম করিতে হইবে। এই ব্যাপারটী এমন এক অনুভূতির রাজ্যের ইঙ্গিত করে যাহা আমাদের অধিকাংশেরই কল্পনাতীত, তথাপি স্বামিজীর শিষ্যজীবনের একটা ঘটনা হইতে আমরা ইহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হই। তাঁহার বয়স তখনও খুব অল্প, এমন সময়ে সহসা একজনের মৃত্যুতে তাঁহার পরিবারের মধ্যে দারুণ অবস্থাবিপর্য্যয় আনয়ন করিল। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া দিন দিন তাঁহাদের জন্য চিন্তায় অধীর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। প্রিয়জনদিগের কষ্টে তাঁহার হৃদয়ের তন্ত্রীসকল যেন ছিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল, এবং স্বচ্ছন্দতা ও সম্পদের অবস্থা হইতে সহসা এক বিপরীত অবস্থায় আসিয়া পড়ায় তিনি কতকটা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের বিপদ কত গুরুতর তাহা দেখিয়া তিনি যেন বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না।

অবশেষে মর্ম্মবেদন আর সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি তাঁহার গুরুদেবের নিকট ছুটিয়া গেলেন, এবং তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ধীর ভাবে সমস্ত শ্রবণ করিয়া সস্নেহে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'যাও বাবা, ঐখানে যাও, গিয়া মা কালীর নিকট প্রার্থনা কর। তুমি যাহা চাহিবে, মা তোমাকে নিশ্চিত তাহাই দিবেন।"

অত্যন্ত সাধারণ ভাব দেখিলেও এই অস্বাভাবের মধ্যে কিছুই অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক ছিল না; কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক ধনী মাবোয়াড়ী ভক্ত ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার বাক্য রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারিতেন। বালক গুরুদেবের উপদেশের শান্ত ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভাবে কতকটা আশ্বস্ত হইয়া তথা হইতে মন্দিরে প্রার্থনা করিবার জন্য চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে তিনি প্রত্যাগত হইলেন, এবং তখন যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা বলেন যে, সে সময় তাঁহার আকৃতি বিস্ময়বিহ্বল ছিল এবং বাক্যনিঃসরণ করিতে যেন তাঁহার কষ্ট হইতেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রার্থনা করিয়াছিলে কি?" শিষ্য উত্তর দিলেন, "হাঁ, করিয়াছি।"

গুরুদেব আবার বলিলেন, "মার নিকট কি চাহিয়াছিলে?"

নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, "পরাভক্তি ও জ্ঞান!"

শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু না বলিয়া সংক্ষেপে শুধু বলিলেন, "আবার যাও।"

কিন্তু কোন পরিবর্ত্তন হইল না। তিন বার তিনি ইচ্ছামত বর প্রার্থনা করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন; তিন বারই তিনি ফিরিয়া আসিয়া ঐ একই কথা বলিলেন। মায়ের সামনে উপস্থিত হইয়াই তিনি আর সব ভুলিয়া গেলেন, এবং কি প্রয়োজনে তথায় আসিয়াছেন, তাহা পর্য্যন্ত তাঁহার মনে পড়িল না। আমাদের মধ্যে কেহ কখনও কি সেই উচ্চ অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন, যখন ভালবাসার পাত্রদিগের কল্যাণকল্পে তন্ময়ভাবে প্রার্থনা করিতে করিতে আমাদের আত্মবিস্মৃতি আসিয়া উপস্থিত হয়? তাহা হইলে, সাধারণ ভেদ-বৈচিত্র্যময় আপেক্ষিক জগৎ হইতে এই অনুভূতির কতগুণ অধিক পার্থক্য তাহা হয়ত আমরা কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি।

স্বামিজীর চিন্তা কথা কহিতে কহিতেই দেশকালের সীমা অতিক্রম করিত। চিন্তাটা কি অন্তরাত্মা বা আদি শক্তির বিকাশের নানারূপের অন্যতম রূপ মাত্র? উহাতে যে শক্তি ব্যয়িত হয় তাহা

কি যিনি চিন্তা করেন তাঁহার কল্যাণের দিক হইতে দেখিলে বৃথা নষ্ট হইল বলিয়া ধরিতে হইবে? প্রথমে কতকগুলি ঘটনার পরিধি, তৎপরে কতকগুলি চিন্তার পরিধি এবং সর্ব্বশেষে সেই পরব্রহ্ম! যদি তাহা হয়, তাহা হইলে মহাপুরুষগণের নিজ নিজ চিন্তারত্নরাশি অপরের সহিত একত্র সম্ভোগ করার ন্যায় নিঃস্বার্থ কার্য্য আর কিছুই নাই। তাঁহাদের কল্পনারাজ্যে প্রবেশলাভ করাই মোক্ষদ্বার উন্মুক্ত করা; কারণ তৎকালে শিষ্যের মনে প্রত্যক্ষভাবে একটী বীজ উপ্ত হয়, যাহা মনোজগতে আত্মসাক্ষাৎকারে পরিণত না হইয়া কিছুতেই বিনষ্ট হয় না।

আমাদের আচার্য্যদেবের চিন্তা কতকগুলি আদর্শেরই সমষ্টিস্বরূপ ছিল, কিন্তু ঐ সকল আদর্শকে তিনি এমন জীবন্ত জ্বলন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, কেহ তাহাদিগকে বস্তুতন্ত্রতাহীন বলিয়া মনে করিতে পারিত না। ব্যক্তি ও জাতি উভয়কেই তিনি তাহাদের আদর্শ-সমূহের দিক হইতে, তাহাদের নৈতিক উন্নতির দিক হইতে দেখিতেন। আমার অনেক সময় মনে হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে দুই বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে,—এক দলের স্বভাব সব জিনিসকে দুই ভাগে ভাগ করা। অপর দলের তিন ভাগে। স্বামিজী তিন ভাগে ভাগ করিতেই ভালবাসিতেন। কোন গুণের দুইটী বিপরীত সীমা (যেমন শীত উষ্ণ, ভাল মন্দ) ত তিনি স্বীকার করিতেনই, অধিকন্তু তিনি সর্ব্বদা উহাদের মধ্যে একটা সন্ধিস্থল দেখিতে পাইতেন, যেখানে উভয় দিকই সমান হওয়ায় কোন গুণই নাই, এরূপ বলা যাইতে পারে। ইহা কি প্রতিভারই একটী সার্ব্বজনীন লক্ষণ, না ইহা শুধু হিন্দুমনেরই একটী বিশেষত্ব?

কোন বস্তুতে তিনি কি দেখিতে পাইবেন, কোন্ জিনিস তাঁহার হৃদয়গ্রাহী হইবে, একথা কেহই বলিতে পারিত না। অনেক সময়ে কথা অপেক্ষা চিন্তার উত্তর তিনি সহজে ও উত্তমরূপে দিতে পারিতেন। তাঁহার কি অদ্ভুত ভাবতন্ময়তা লাগিয়াই থাকিত, তাহা এখানে

সেখানে এক আধটু আভাস ইঙ্গিত হইতে ধীরে ধীরে বুঝিতে পারা যাইত—সকল কথা ও চিন্তা তাহারই সহচরী মাত্র ছিল। কাশ্মীরে গ্রীষ্মের কয়মাস অতিবাহিত করিবার পর তবে তিনি আমাদিগকে বলিলেন যে, তিনি সর্ব্বদা জগন্মাতার মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছেন। মা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের মধ্যে চলিতেছেন, ফিরিতেছেন। আবার তাঁহার জীবনের শেষ শীতঋতুতে তিনি তাঁহার শিষ্য স্বামী স্বরূপানন্দকে বলিয়াছিলেন যে, কয়েক মাস ধরিয়া তিনি দেখিতেছেন, যেন দুইখানি হাত তাঁহার হস্তদ্বয়কে ধারণ করিয়া আছে। তীর্থ-যাত্রাকালে কেহ কেহ দেখিত তিনি একান্তে মালা জপ করিতেছেন। গাড়ীতে তাঁহার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে কেহ কেহ শুনিতে পাইতেন, তিনি কোন একটা মন্ত্র বা স্তোত্র বার বার আবৃত্তি করিতেছেন। তাঁহার প্রত্যূষে উঠিয়া স্তোত্রাদি আবৃত্তি করার কি অর্থ, তাহা আমরা একদিন জনৈক কর্ম্মীকে সংসার-সমরাঙ্গণে প্রেরণকালে তিনি যাহা বলিলেন তাহা হইতে বুঝিতে পারিলাম—"শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস প্রত্যহ প্রত্যূষে অন্য কোন কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে নিজের ঘরে দুই ঘণ্টা ধরিয়া 'সচ্চিদানন্দ', 'শিবোঽহম্' প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেন।" সকলের সমক্ষে কথিত এই ইঙ্গিতটুকু ব্যতীত আমরা আর কিছু শুনিতে পাই নাই।

সুতরাং অবিরাম ভক্তি দ্বারাই তিনি তাঁহার অবিচ্ছিন্ন একাগ্রতা বজায় রাখিতেন। তিনি সর্ব্বদাই মাঝে মাঝে যে সকল অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের আভাস দিতেন, ধ্যানই তাহাদের মূল কারণ। তিনি কথোপকথনে যোগদান করিতেন, যেন একজন লোক এক গভীর কূপে পাত্র ডুবাইয়া তথা হইতে স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ শীতল বারি আনিয়া দিল। তাঁহার চিন্তাসমূহের সৌন্দর্য্য বা প্রগাঢ়তাও যেমন, তাহাদের উৎকৃষ্টতাও তেমনি ইহাই প্রকাশ করিত যে, ঐ সকল চিন্তা আধ্যাত্মিক উপলব্ধিরূপ পর্ব্বতের চিরতুষারাবৃত শিখরদেশ হইতে আসিয়াছে।

তিনি তাঁহার বক্তৃতাকালীন অনুভূতিসমূহের যে সকল গল্প করিতেন, তাহা হইতে এই একাগ্রতার কতকটা আভাস পাওয়া যাইত। তিনি বলিতেন রাত্রে তাঁহার নিজের ঘরে কে যেন উচ্চৈঃ-স্বরে, পরদিন প্রাতঃকালে তিনি যে সকল কথা বলিবেন তাহাই তাঁহাকে বলিয়া দিতেছে, এবং পরদিন তিনি দেখিতেন যে, বক্তৃতা-মঞ্চে উঠিয়া তিনি সেই কথাগুলিই আবৃত্তি করিয়া যাইতেছেন। কখনও কখনও তিনি শুনিতেন, যেন দুইজন লোক পরস্পরের মধ্যে তর্কবিতর্ক করিতেছে। আবার কখনও ঐ কণ্ঠস্বর যেন বহুদূর হইতে আসিতেছে বলিয়া বোধ হইত—যেন একটা লম্বা রাস্তার অপর প্রান্ত হইতে কেহ তাঁহার সহিত কথা কহিতেছে। তৎপরে হয়ত ঐ আওয়াজ ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, অবশেষে উহা চীৎকারে পরিণত হইল। তিনি বলিতেন, "একথা ঠিক জানিও যে, অতীতকালে ঈশ্বরীয় বাণী (Inspiration) বলিতে লোকে যাহাই বুঝিয়া থাকুক না কেন, উহা নিশ্চয়ই এই প্রকারের একটা কিছু হইবে!"

কিন্তু এই সকল ব্যাপারের মধ্যে তিনি কিছুই অতিপ্রাকৃত দেখিতে পাইতেন না। উহা মনেরই স্বতঃপ্রবৃত্ত কার্য্য মাত্র; মন যখন কতকগুলি চিন্তাবিধিকে এত উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া লয় যে, উহাদিগের প্রয়োগ বিষয়ে আর কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা করে না, তখন উহা আপনা হইতেই ঐরূপ করিয়া থাকে। হিন্দুগণ যে অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া 'মনই গুরু হইয়া দাঁড়ায়' বলিয়া থাকেন, উহা হয়ত সেই অনুভূতিরই একটা চরম আকার। ইহা হইতে আরও আভাস পাওয়া যায় যে, তাঁহাতে চক্ষু কর্ণ এই দুটী শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের প্রায় সমান বিকাশ লক্ষিত হইলেও দর্শনেন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রবণেন্দ্রিয়েরই যেন ঈষৎ প্রাধান্য ছিল। তাঁহার জনৈক শিষ্য একবার তাঁহার সম্বন্ধে যেমন বলিয়াছিলেন, "তিনি তাঁহার নিজ মনের অবস্থা সমূহকে যথাযথভাবে বিবৃত করিতে পারিতেন।" কিন্তু এই সকল কণ্ঠস্বর স্বসংবেদ্য ব্যাপার ছাড়া আর কিছু, তাঁহার এরূপ অনুমান করিবার অণুমাত্র আশঙ্কা ছিল না।

আর একটী অনুভূতির কথা যাহা আমি তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, তাহাতে মনের ঐরূপ স্বতঃপ্রবৃত্ত ক্রিয়াই প্রকাশ পায়, তবে হয়ত ততটা পরিপুষ্ট আকারে নহে। তিনি বলিয়াছিলেন যে, যখনই কোন অপবিত্র চিন্তা বা আকৃতি তাঁহার সম্মুখে আসিয়াছে, তিনি তৎক্ষণাৎ অনুভব করিতেন, যেন ভিতর হইতে মনের উপর একটা ধাক্কা আসিয়া পড়িল—উহা তাহাকে যেন চূর্ণ বিচূর্ণ, অসাড় করিয়া দিল! উহার অর্থ—'না ওরূপ হইতে পারিবে না!'

তিনি অপরের মধ্যে সেই সকল কার্য্যকে অতি সহজে করিতে পারিতেন, যেগুলি প্রথমটা মনে হয় যেন আপনা আপনি হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিতে উচ্চতর জ্ঞানই যাহাদের নিয়ামক। যে জিনিসটী ঠিক, কেন তাহা কেহ বলিতে পারে না, অথচ যাহা সাধারণ বিধিনিষেধের চক্ষে দেখিলে ভুল বলিয়াই মনে হইবে, এরূপ স্থলে তিনি এক উচ্চতর শক্তির প্রেরণা দেখিতে পাইতেন। তাঁহার চক্ষে সকল অজ্ঞানতাই সমান অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হইত না।

তাঁহার গুরুদেব যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কার্য্য শেষ হইলে তিনি আবার তাঁহার নির্ব্বিকল্প সমাধিরূপ আমটী খাইতে পাইবেন, সেকথা তাঁহার বাল্যসঙ্গিগণ কদাপি বিস্মৃত হন নাই। কেহই জানিত না, কোন্ মুহূর্ত্তে ঐ কার্য্য সমাপ্ত হইবে, এবং তাঁহার চরম অনুভূতি যে আসন্ন, একথা কেহ কেহ সন্দেহও করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষবর্ষে তাঁহার কতিপয় বাল্যসঙ্গী একদিন সেই সকল অতীত দিবসের আলোচনা করিতেছিলেন, এবং ঐ প্রসঙ্গে "নরেন্দ্র যখনই জানিতে পারিবে সে কে এবং কি, তখন আর শরীর রাখিবে না"—এই ভবিষ্যদ্বাণীরও কথা উঠিল। তখন তাঁহাদের মধ্যে এক জন কতকটা হাস্যচ্ছলে তাঁহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন," "স্বামিজী, তুমি কে ছিলে এখন জানিতে পারিয়াছ কি?" তখনই এই অপ্রত্যাশিত উত্তর হইল, "হাঁ, এখন জানিয়াছি।" অমনি সকলে ত্রস্ত হইয়া গম্ভীরভাবধারণ করিলেন এবং চুপ করিয়া

গেলেন। কেহ তাঁহাকে ঐ বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইল না।

যতই শেষদিন নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, ততই ধ্যান ও তপস্যা তাঁহার অধিকাংশ সময় অধিকার করিয়াছিল। যে সকল বস্তু তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল তাহাও এখন আর তাঁহার চিত্তকে তেমন আকৃষ্ট করিতে পারিত না। অবশেষে শেষ মুহূর্ত্তে যখন তিনি মহাসমাধিতে মগ্ন হইযাছিলেন, তখন যেন ঐ বিরাট অতীন্দ্রিয় শক্তির কিছু কিছু, নিকটে ও দূরে যাঁহারা তাঁহাকে ভালবাসিতেন তাঁহাদিগকেও স্পর্শ করিযাছিল। একজন স্বপ্নে দেখিযাছিলেন, যেন শ্রীরামকৃষ্ণ সেই রজনীতে পুনরায় শরীর ত্যাগ করিযাছেন, এবং প্রত্যুষে জাগরিত হইয়া শুনিলেন, দ্বারে সংবাদবাহক তাঁহাকে ডাকিতেছে। আর এক জন (ইনি স্বামিজীর বাল্যের অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের মধ্যে একজন) দেখিয়াছিলেন, যেন তিনি উল্লাসভরে নিকটে আসিযা বলিতেছেন, "শশী, শশী, শরীরটাকে থু থু করিয়া ফেলিয়া দিযাছি!" আরও একজনকে সেই সন্ধ্যাকালে কে যেন জোর করিয়া ধ্যানের ঘরে লইযা গিযাছিল; তিনি তথায় দেখিযাছিলেন, তাঁহার আত্মা যেন একটা অসীম জ্যোতির সামনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; তিনি "শিব গুরু!" বলিয়া ঐ জ্যোতির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়াছিলেন!

মায়া ও বিজ্ঞানবাদ।

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম, এ)

অদ্বৈতবাদী বলেন জগৎ মিথ্যা,—এই যে সকল জিনিষ রহিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে তাহারা প্রকৃতপক্ষে নাই -মায়ার প্রভাবে আমাদের মনে হইতেছে যে তাহারা রহিয়াছে। বিজ্ঞানবাদ বা Subjective Idealism নামে পরিচিত যে মতবাদ Berkeley ইংলণ্ডে প্রথম প্রচার করেন তাহাতেও বলা হইয়াছে যে, বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব নাই। আমাদের মনে হইতেছে বটে আমরা এই সকল জিনিষ দেখিতেছি বা স্পর্শ করিতেছি, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহারা নাই। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে এই দুই মতের মিল আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে. এই দুইটী মত সম্পূর্ণ ভিন্ন। উহাদের মধ্যে যে প্রভেদ, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

Idealist এই ভাবে যুক্তি প্রয়োগ করেন আমার মনে হইতেছে এই একটী ফুল রহিয়াছে। এইরূপ মনে হইতেছে কেন? কারণ, আমার মনে হইতেছে যে একটা সুন্দর জিনিষ দেখিতেছি, মনে হইতেছে যে একটী কোমল পদার্থ স্পর্শ করিতেছি, মনে হইতেছে যে মনোরম গন্ধ ঘ্রাণ করিতেছি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আমার মনের মধ্যে কতকগুলি অনুভব হইতেছে, তাহারই ফলে আমি অনুমান করিতেছি যে বাহিরে একটী বিশিষ্ট বস্তু আছে। আমি যাহা কিছু অনুভব করিতেছি সকলি মনের মধ্যে, মনের বাহিরে কিছু অনুভব করিতেছি না, অথচ বলিতেছি যে মনের বাহিরে একটা বস্তু আছে; সুতরাং অনুভব না করিয়াই বলিতেছি—আছে। অনুভব হইল মনের মধ্যে, অথচ বলিতেছি জিনিষটা রহিয়াছে বাহিরে—ইহা ভ্রম। থাকিবার মধ্যে আছে মনের মধ্যে একটা বিশিষ্ট রকমের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধের ধারণা। মনের বাহিরে কোনও বস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ পাই নাই। সেরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইবেও না, কারণ, সকল অনুভব

মনের মধ্যে। মনের বাহিরে কোনও অস্তিত্বের আমরা কল্পনা করিতে পারি না। অতএব মনের বাহিরে কোনও অস্তিত্ব হইতে পারে না। ("The *esse* of things is their *percipii*"—Berkeley.) আমি বলিতেছি, এই বিশ্বজগৎ রহিয়াছে ; কিন্তু বাস্তবিক রহিয়াছে আমার মনের মধ্যে কতকগুলি বিচিত্র ধারণা। সেই ধারণাগুলিকে আমি বাহ্যজগৎ বলিয়া কল্পনা করিতেছি—ইহা ভ্রম। বাহিরে কিছুই নাই।

এই যুক্তি এবং এই সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদীর অনুমোদিত নহে। অদ্বৈতবাদীও বলেন জগৎ মিথ্যা কিন্তু সে অন্য অর্থে। তিনি ইহা বলেন না যে, আমাদের মনের মধ্যে কতকগুলি ধারণাই বাস্তবিকপক্ষে আছে, মনের বাহিরে কিছুই নাই। এখানে জগৎ এবং মিথ্যা এই দুইটী শব্দ তাঁহারা কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা জানা প্রয়োজন।

স্থুল ও সূক্ষ্ম এই দুই শ্রেণীর বস্তু লইয়া জগৎ। যাহাকে আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি তাহা, অর্থাৎ যাহাকে দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, আস্বাদন করা, বা আঘ্রাণ করা যায় তাহা স্থুল বস্তু, এবং যাহাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি না তাহা সূক্ষ্ম বস্তু। আমাদের বুদ্ধি, মন, জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল, কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল, পঞ্চবায়ু ইহারা সূক্ষ্ম বস্তু। ইহাদিগকে আমরা দেখিতে পাই না, শুনিতে পাই না, স্পর্শ করিতে পারি না, আস্বাদন করিতে পারি না, আঘ্রাণ করিতে পারি না। কিন্তু ধ্যানপ্রভাবে যাঁহাদের অলৌকিক অনুভবশক্তি হইয়া থাকে, সেই যোগিগণ এই সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। স্থুল বস্তুর ন্যায় সূক্ষ্ম বস্তুও অতি ক্ষুদ্র পরমাণু দ্বারা নির্ম্মিত। সূক্ষ্ম ভূতের পরমাণু দ্বারা সূক্ষ্ম বস্তু গঠিত হয়। সূক্ষ্ম ভূতের পরমাণুগুলি আবার বিভিন্ন প্রকারে সংযুক্ত হইয়া স্থুল ভূতের পরমাণু উৎপাদন করে এবং এই সকল স্থুল ভূতের পরমাণু হইতে স্থুল বস্তুসকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

আমাদের মনের বাহিরে একটী বস্তু এবং সেই বস্তু সম্বন্ধে

আমাদের মনের মধ্যে ধারণা,—এই দুইটী পদার্থ সম্বন্ধে Idealist বলেন, প্রথমটী কল্পিত পদার্থ, উহার বাস্তবিক কোনও অস্তিত্ব নাই দ্বিতীয়টী বাস্তবরূপে আছে। অদ্বৈতবাদী বলেন যে, যথার্থ কথা বলিতে গেলে উহাদের মধ্যে কাহারও প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, কারণ একমাত্র ব্রহ্মেরই প্রকৃত অস্তিত্ব আছে, আর কাহারও নাই। কিন্তু যে হিসাবে বলা যায় যে আমাদের মনের মধ্যবর্ত্তী ধারণার অস্তিত্ব আছে, সে হিসাবে ইহাও বলিতে হইবে যে, মনের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্ব আছে। ধারণাটী সূক্ষ্ম পদার্থ, বস্তুটী স্থূল পদার্থ, এবং ইহাদের যে সত্তা তাহা ব্যাবহারিক সত্তা। যতক্ষণ না ব্রহ্মজ্ঞান হয়, ততক্ষণ ইহাদিগকে অস্বীকার করা যায় না। তবে প্রকৃত যে অস্তিত্ব পারমার্থিক সত্তা—তাহা ইহাদের কাহারও নাই। ব্রহ্মসূত্র প্রথম অধ্যায়, প্রথম পাদ, দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্ব স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।—"নতু বস্তু এবং ন এবং অস্তি নাস্তি ইতি বা বিকল্প্যতে। বিকল্পনাস্তু পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষাঃ। ন বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানং পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষং কিং তর্হি? বস্তুতন্ত্রং এব হি তৎ। ন হি স্থাণাবেকস্মিন্ স্থাণুর্বা পুরুষোঽন্যো বা ইতি তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি। তত্র পুরুষোঽন্যো বেতি মিথ্যাজ্ঞানং। স্থাণুরেবেতি তত্ত্বজ্ঞানং বস্তুতন্ত্রত্বাৎ এবং ভূতবস্তুবিষয়াণাং প্রামাণ্যং বস্তুতন্ত্রং।"

অনুবাদ—"কোন একটী বস্তুকে এই রকম, এই রকম নহে, আছে, নাই এই ভাবে কল্পনা করা যায় না, কারণ; কল্পনা পুরুষের বুদ্ধিসাপেক্ষ। কিন্তু কোনও বস্তু সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান পুরুষের বুদ্ধির অপেক্ষা রাখে না। তবে এই যথার্থ জ্ঞান কি প্রকার? ইহা ঐ বস্তুর অধীন। একটী স্তম্ভকে দেখিয়া ইহা স্তম্ভ কিম্বা পুরুষ, এইরূপ জ্ঞান হইলে তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান বলে না। এ ক্ষেত্রে স্তম্ভকে পুরুষ বলিয়া জানা মিথ্যাজ্ঞান, স্তম্ভ বলিয়া জানা তত্ত্বজ্ঞান। কারণ, ইহা বস্তুতন্ত্র। কোনও বিষয়ের প্রামাণ্য সেই বিষয়েরই অধীন।"

এই স্থলে স্পষ্টভাবে বলা হইল যে, বস্তু একটী পদার্থ এবং বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান বা ধারণা ভিন্ন পদার্থ। ইহা বস্তুতন্ত্রবাদ।

বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদ Subjective Idealism এর অনুরূপ। ঐ মতে বিজ্ঞান (বস্তু সম্বন্ধে ধারণা) ব্যতীত বাহ্য কোনও বস্তু নাই। ব্রহ্মসূত্রে, দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ, ২৮শ সূত্রে এই বিজ্ঞানবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। সূত্রটী হইতেছে—"নাভাব উপলব্ধেঃ।" ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"ন খল্বভাবো বাহ্যস্য অর্থস্য অধ্যবসাতুং শক্যতে। কস্মাৎ। উপলব্ধেঃ। উপলভ্যতে হি প্রতিপ্রত্যয়ং বাহ্যঃ অর্থঃ—স্তম্ভঃ কুড্যং ঘটঃ পট ইতি। ন চ উপলভ্যমানস্য এব অভাবঃ ভবিতুমর্হতি।"

অনুবাদ—"বাহ্যবস্তু নাই এরূপ স্থির করিতে পারা যায় না—কেন? যেহেতু তাহার উপলব্ধি হয়। আমাদের প্রত্যেক প্রত্যয়ের সময় বাহ্য বস্তু উপলব্ধ হইয়া থাকে—স্তম্ভ, ভিত্তি, ঘট, পট এই প্রকার। যাহা উপলব্ধ হয়, তাহা নাই ইহা বলিতে পারা যায় না।" ইহার পরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—

"বিজ্ঞানবাদী হয়ত বলিবেন, উপলব্ধি হয় ইহা সত্য। কিন্তু যাহা উপলব্ধ হয় তাহা উপলব্ধি মাত্র। তাহা ব্যতিরেকে কিছুই উপলব্ধ হয় না'—ইহা কিন্তু ঠিক নহে। কেহ উপলব্ধিমাত্রকে স্তম্ভ বা ভিত্তি বলিয়া মনে করে না। সকলে স্তম্ভ, ভিত্তি প্রভৃতিকে উপলব্ধির বিষয় বলিয়া মনে করে।"

শঙ্করাচার্য্য এই ভাষ্যে বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিবার জন্য আরও অন্যান্য যুক্তি দিয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে Subjective Idealism এর মত অদ্বৈতবাদী গ্রহণ করেন নাই। বস্তু সম্বন্ধে আমাদের মনের মধ্যে যে ধারণা হয় তদ্ব্যতীত বস্তুর যে কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই—ইহা অদ্বৈতবাদী স্বীকার করিবেন না। অবশ্য এই সকল অস্তিত্ব ব্যাবহারিক ভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। যতক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, যতক্ষণ মায়া না নিরস্ত হয়, ততক্ষণ এই সকল বস্তু নাই বলিলে চলিবে না। কিন্তু 'জগৎ মিথ্যা' এই যে অনুভূতি, ইহা ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পর হয়। তখন নিখিল বিশ্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়, মাত্র এক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সত্যরূপে বিরাজিত থাকেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, কি প্রকারে জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হইবে? যদি Subjective Idealism এর মত গ্রহণ কর, যদি বল মনের বাহিরে কোনও বস্তু নাই সকলই মনের কল্পনা মাত্র, তাহা হইলে বলিতে পার, জগৎ মিথ্যা। তাহা যদি না স্বীকার কর, যদি বল যে বাহ্য জগৎ মনের কল্পনা মাত্র নহে, তাহা হইলে আবার কেমন করিয়া বলিবে যে জগৎ মিথ্যা? অদ্বৈতবাদীর উদ্দেশ্য কি?

এই প্রশ্নের কি উত্তর হইতে পারে দেখা যাউক। এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া যায়। ব্রহ্ম কারণ বা প্রকৃতি, জগৎ কার্য্য। কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে। একই পদার্থ বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কারণ ও কার্য্যরূপে পরিচিত হয়। উহাদের যে ঐক্য তাহাই যথার্থ। উহাদের যে প্রভেদ তাহা নাম ও রূপ লইয়া, তাহা যথার্থ নহে। এইজন্য জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে। জগতের যে সত্তা তাহা ব্রহ্মেরই সত্তা। তদতিরিক্ত সত্তা জগতের নাই। জগৎ মিথ্যা বলিলে এই বুঝিতে হইবে যে, আমাদের যে মনে হয় ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত নানাবিধ পদার্থ রহিয়াছে তাহা ভ্রম। ব্রহ্মের যে সত্তা তদতিরিক্ত কোনও সত্তা নাই।

এই মত সমর্থন করিবার জন্য নিম্নলিখিত শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে:—

যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং, মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্।

—ছান্দোগ্য ৬, ৪ ১।

"হে সৌম্য, মৃত্তিকার একটী খণ্ড জানিলে যেমন সকল মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পদার্থ জানা হয়, কেবলমাত্র বাক্যে মৃত্তিকার বিকারকে (স্বতন্ত্রভাবে) আছে বলিয়া বলা হয়, ইহা নামমাত্র, 'মৃত্তিকা' ইহাই সত্য।"

সেইরূপ ব্রহ্মকে জানিলে নিখিল বিশ্বকে জানা যায়, কারণ ব্রহ্ম হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি, এই বিশ্ব ব্রহ্মেরই বিকার ব্রহ্মই

সত্য। নানাবিধ দ্রব্য বলিয়া পরিচিত ব্রহ্মের যাহা বিকার তাহারা নামে মাত্র আছে।

এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটী শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়া থাকে— ব্রহ্মসূত্র, ২য় অধ্যায়, ১ম পাদ, ১৪শ সূত্রের ভাষ্য।)

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি"

"ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা"

"আত্মা এব ইদং সর্ব্বম্"

"ব্রহ্ম এব ইদং সর্ব্বম্"

"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"

"যত্র তু অস্য সর্ব্বমাত্মা এব অভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি।

অতএব দেখা যাইতেছে, শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মেই বিলীন হয়। সুতরাং ব্রহ্মের সত্তা ভিন্ন জগতের কোনও স্বতন্ত্র সত্তা নাই। জগতের বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে যে ভেদপ্রতীতি হয় তাহা মিথ্যা। বাস্তবিক পক্ষে উহারা এক, কারণ, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে।

যুক্তির সাহায্যে এই কথা বুঝিবার চেষ্টা করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

একটী নির্দ্দিষ্ট বস্তু যে পরিমাণ স্থান অধিকার করিয়া থাকে অনন্ত আকাশের তুলনায় তাহা নগণ্য (infinitesimal); যতটুকু সময় ধরিয়া তাহার অস্তিত্ব, অসীম কালের তুলনায় তাহাও নগণ্য। যাহা নগণ্য তাহাই শূন্য। Infinitesimal is another name for Zero. সুতরাং অনন্ত আকাশ ও অসীম কালের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলা যায় যে, নির্দ্দিষ্ট বস্তুটী যে স্থান ও সময় ব্যাপিয়া আছে তাহা শূন্য, অর্থাৎ বস্তুটী নাই।

কিন্তু আমাদের পরিমিত শক্তিতে অনন্ত আকাশ ও অসীম কাল উপলব্ধি করিতে পারি না বলিয়া আমরা ঐ বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারি না—ইহা ব্যাবহারিক সত্তা। কিন্তু যদি মায়া কাটিয়া যায়, যদি আমরা উপলব্ধি করিতে পারি যে, সময় ও স্থান (Time

and Space) আমাদের অনন্ত স্বভাবকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, জগতের অসংখ্য পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সকল অনন্তের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। অসীমের দিক হইতে দেখিলে জগতের বস্তুসকল মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

এই ভাবে প্রতিপন্ন হইবে যে, যাহা দেশ ও কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন তাহা পরমার্থ হিসাবে মিথ্যা। একমাত্র ব্রহ্মই দেশ ও কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। অতএব একমাত্র ব্রহ্মই সত্য।

স্বপ্নতত্ত্ব।

(ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার, এম, এ, এল, এম, এস)

অনেক প্রকার মানসিক বিকার, উন্মাদ অবস্থা, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতিকে ঠিক পীড়া বলা যায় না; কিন্তু এ সকলকে সুস্থাবস্থাও বলা যায় না। এ সকল অবস্থায়, অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায়, হিপ্‌নটাইজড্‌ অবস্থায় (Hypnotized state) আমাদিগের মনের ভাব কিরূপ হয় তাহা আলোচনা করিলে এমন সকল নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, যাহা কেবলমাত্র জাগ্রৎ সময়ের মনস্তত্ত্ব আলোচনার দ্বারা জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নহে। ঐ সমস্ত অসুস্থাবস্থায় মনের যে সমস্ত নূতন ক্রিয়া এবং শক্তির বিকাশ লক্ষিত হয়, তাহা জাগ্রৎ অবস্থায় মনের এবং জ্ঞানের অগোচর থাকিয়া যায়।

আমাদের মনে সাধারণ জ্ঞানের প্রকাশকে সূর্য্যরশ্মির প্রকাশের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সূর্য্যরশ্মিতে যে কেবল দৃশ্যমান আলোকরশ্মি আছে তাহা নহে, ইহাতে অদৃশ্য রশ্মি বা Invisible light, আছে। এই অদৃশ্য রশ্মির অস্তিত্ব যদিও আমাদের দৃষ্টিশক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় না বটে, তথাপি ফটোগ্রাফিক প্লেটে ইহাদের

ছাপ পড়ে বলিয়া, ইহাদের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। এই গুলিকে অন্যভাবে অর্থাৎ উত্তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি শক্তিতে পরিণত করিয়াও জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা হইয়াছে। সেইরূপ আমাদের জাগ্রৎ অবস্থার জ্ঞানই যে মনের শক্তি এবং ক্রিয়ার একমাত্র প্রকাশক তাহা নহে এই সাধারণ জ্ঞানে প্রকাশিত হইতেছে না, এরূপ মনের কার্য্য ও শক্তি প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে অহরহঃ চলিতেছে। বোধ হয় জ্ঞান-গোচর মানসিক ক্রিয়া অপেক্ষা এই সকল অজ্ঞাত ক্রিয়াই মানবের প্রকৃত স্বরূপ বিকাশের পক্ষে অধিকতর শক্তিশালী।

প্রসিদ্ধ অষ্ট্রীয়ান ডাক্তার ফ্রুড (Freud) অল্পদিন হইল মনোরাজ্যের এই অজ্ঞাত ক্রিয়া সকলের আলোচনা দ্বারা মনস্তত্ত্বের এক নূতন দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছেন—মনের এই অজ্ঞাত ক্রিয়া বুঝিবার নিয়মাবলী আবিষ্কার করিয়া মনস্তত্ত্বের সম্পূর্ণ এক নূতন দিকের সন্ধান পাইবার উপায় করিয়া গিয়াছেন। আমাদের অনুমান হয় যে ডাক্তার ফ্রুড এবং তাঁহার ছাত্রগণের গবেষণার ফলে পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের অনেক পরিবর্ত্তন হইবে, এবং হিন্দু দর্শনেরও কতকগুলি মত আবার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট সাদরে গৃহীত হইবে। এই সমস্ত বিষয় বর্ত্তমান সন্দর্ভে ক্রমশঃ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রাচীন মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের আলোচনার সার-সংগ্রহ ইংরাজি বিশ্বকোষের (Encyclopædia Britannic) স্বপ্ন (Dream) বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে এই প্রবন্ধের মধ্যে বিভিন্ন পণ্ডিতগণের যে সকল মত আছে তাহার কোনটীতেই স্বপ্নতত্ত্বের প্রকৃত রহস্য ভেদ হয় নাই। কিন্তু ডাক্তার ফ্রুড এবং তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাদের আবিষ্কৃত উপায়গুলি দ্বারা মনের অজ্ঞাত ভাবসকলের বিশ্লেষণ করিয়া কিরূপে ঐ বিষয়ের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন তাহা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিবৃত করিতেছি। ডাক্তার এইচ, এ, ব্রিল (Dr. H. A. Brill) আমেরিকার

একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার এবং ডাক্তার ফ্রুডের শিষ্য তাঁহার এক পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত স্বপ্নবিবরণ প্রায় তাঁহার কথাতেই লিপিবদ্ধ করিলাম ঃ—

কুমারী জি—আমেরিকাবাসিনী। বয়স ২৮ বৎসর। তিন মাস স্নায়ুদৌর্ব্বল্য রোগে কষ্ট পাইয়া ১৯০৫ সালের জানুয়ারী মাসে আমার নিকট চিকিৎসার্থ উপস্থিত হন। এই কুমারী তিন মাস পূর্ব্বে বেশ ভাল ছিলেন ; তাহার পর অনিদ্রা, ক্ষুধামান্দ্য কোষ্ঠকাঠিন্য মাথাধরা, অকারণ ক্লান্তিবোধ, অকারণ ক্রন্দনেচ্ছা, উদ্বিগ্নতা প্রভৃতি মানসিক অশান্তিতে কষ্ট পাইতে থাকেন কুমারীর মাতা সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তিনি জানাইলেন, তাঁহার কন্যার স্বভাব একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সে বিমর্ষভাবে কালযাপন করে—এমন কি, প্রায়ই মৃত্যুর ইচ্ছাও প্রকাশ করে। কুমারী দেখিতে বড় সুন্দরী ছিলেন তাঁহার মানসিক অশান্তির এবং দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, মনের মধ্যে দারুণ বিষাদ নিরন্তর অনুভব করিলেও তিনি তাহার কারণ কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন না। তিনি জানেন যে, "তাহার দুঃখ করিবার কিছুই নাই। সুখে জীবন কাটাইবার যাহা প্রয়োজন সবই তাঁহার আছে। তথাপি তিনি উক্ত বিষাদের ভাব কিছুতেই কাটাইয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহার মাতার অদৃষ্টে কখন কি ঘটে এই দুঃশ্চিন্তা তাঁহার মনে মাঝে মাঝে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিষম যাতনা প্রদান করে।" এই প্রকার ভাবার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে শিখিয়াছিলাম বলিয়া আমি বুঝিলাম যে, তাঁহার মাতার মৃত্যু হউক কুমারীর মনে এইরূপ গূঢ় ইচ্ছা তাঁহার অজ্ঞাতসারে কখন কখন উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ কথা পাঠকগণ পরে বুঝিতে পারিবেন।

কুমারী আমার চিকিৎসাধীনে কিছু দিন থাকিবার পরেও তাঁহার শারীরিক ব্যাধির এবং মানসিক অশান্তির বিশেষ কোনও উপকার হইতেছে না দেখিয়া আমি তাঁহাকে ডাক্তার ফ্রুডের Psycho-analysis মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ উপায়ে চিকিৎসা করিবার ইচ্ছা করিয়া

তিনি যাহা স্বপ্ন দেখেন তাহা লিখিয়া আনিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি ঐ বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইয়া চলিয়া গেলেন এবং কয়েক দিন পরে নিম্নলিখিত স্বপ্নটি লিখিয়া আনিলেনঃ—

স্বপ্নে দেখিলাম, যেন আমি কোন নির্জ্জন পাড়াগাঁয়ে রহিয়াছি এবং বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি। আমার বাড়ী যেন লিকনর বে (Likonor Bay), কিন্তু সেখানে কিছুতেই যাইতে পারিতেছি না। যতবার একটু অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছি, ততবারই রাস্তার উপর একটি করিয়া দেওয়াল অন্তরাল হইয়া দাঁড়াইতেছে। মনে হইল, রাস্তাটি দেওয়ালে পরিপূর্ণ। আমার পা সীসার মত ভারী হইতেছিল, সুতরাং খুব আস্তে আস্তে হাটিতে লাগিলাম। মনে হইতেছিল যেন আমি অতি দুর্ব্বল কিম্বা অতি বৃদ্ধ হইয়াছি। কিছুক্ষণ ঐরূপে চলিবার পরে দেখিলাম, একদল মুরগীর ছানা আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন যেন আমি সহরের একটি রাস্তায় রহিয়াছি—তাহাতে ভয়ানক লোকের ভীড়। এই ছানাগুলি আমার পিছনে পিছনে দৌড়িয়া চলিল; তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড়টি যেন আমাকে বলিল, 'এস, আমার সঙ্গে অন্ধকারে এস'।"

এই স্বপ্নটি আমার নিকট প্রায় অর্থশূন্য বোধ হইয়াছিল। বিশেষতঃ স্বপ্নদর্শনকারী নিজেই এই সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এই হাস্যজনক স্বপ্নবৃত্তান্তটি বলিতে তাঁহার লজ্জাবোধ হইতেছে। কারণ, মুরগীর ছানা কথা বলিতেছে, ইহা কবে কে শুনিয়াছে!

যাহা হউক, আমি এই স্বপ্নটিকে বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহাতে দীর্ঘ আট পৃষ্ঠা ফুল্‌স্‌ক্যাপ কাগজ খরচ হইয়াছিল। সমস্ত বিশ্লেষণটি এখানে দিবার প্রয়োজন নাই। স্বপ্নের মধ্যে যে পরস্পরসংশ্লিষ্ট ভাবের সংযোগ (Association) ছিল তাহা এবং তাহার গূঢ়ার্থ (Symbolic expression) মাত্র এখানে দেওয়া যাইতেছে।

স্বপ্নদর্শনকারীকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, স্বপ্নের কোন্ অংশটি তিনি বেশ স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মনে হয়। উত্তরে

তিনি বলিলেন, "আমি সর্ব্বাপেক্ষা বড় মুরগীর ছানাটিকেই বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলাম, অন্যগুলি অস্পষ্ট বোধ হইয়াছিল। এইটিই অসাধারণরূপে বড় ও ইহার গলাটি বিশেষ লম্বা ছিল এবং ইহা আমার সঙ্গে কথা বলিয়াছিল। যে রাস্তায় ছানাটি আমার সঙ্গে কথা বলিয়াছিল তাহা দেখিয়া আমি যে রাস্তায় স্কুলে যাইতাম সেই রাস্তার কথা মনে পড়ে। ১৩ বৎসর বয়সের সময় আমি ঐ স্কুল হইতে পাশ করি। ঐ পাড়াটি প্রায় সব সময়ে স্কুলের ছেলেতে পরিপূর্ণ থাকিত—" এই কথা বলিয়া কুমারী লজ্জায় আরক্তিম হইয়া হাসিতে লাগিলেন।

হঠাৎ তাঁহার ঐরূপ ভাবান্তর কেন উপস্থিত হইল, জিজ্ঞাসা করায় কুমারী বলিতে লাগিলেন, "এই সব কথা বলিতে বলিতে আমার স্কুলের সুখের দিনগুলি মনে পড়িতেছে। তখন আমার কোনও দুঃখ বা কষ্ট ছিল না। আমাদের স্কুলে দুইটি বিভাগ ছিল—এক বিভাগে ছেলেরা পড়িত, অপর বিভাগে মেয়েরা পড়িত। ছাত্রবিভাগের এক জনের সঙ্গে আমার ভাব ছিল। স্কুলের ছুটীর পর তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইত এবং দুই জনে এক সঙ্গে বাড়ী যাইতাম। বন্ধুটির নাম ছিল ফ—। তাহার চেহারা কিছু লম্বা এবং রোগা ছিল। অন্যান্য ছাত্রীরা তাহার বিষয় লইয়া আমাকে বিরক্ত করিত। তাহাকে আসিতে দেখিলে তাহারা আমাকে বলিত, 'সুন্দরি, তোমার মুরগীর ছানাটি এইবার আসিতেছেন।' ছেলেদের মধ্যেও তাহার ডাক নাম ছিল 'মুরগীর ছানা'।"

তখন সেই কুমারীকে জিজ্ঞাসা করা হইল, স্বপ্নে তিনি যে বড় মুরগীর ছানা দেখিয়াছিলেন, তাহার অর্থ কি এখন তিনি বুঝিতে পারিতেছেন? তাহাতে কুমারী হাসিয়া বলিলেন যে, লম্বা গলাওয়ালা যে মুরগীর ছানা স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম সেটি ফ—, এই কথা কি আপনি বলিতে চান? তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইল, এখনও তাঁহার ফ—এর সঙ্গে জানাশুনা আছে কি না। তাহাতে তিনি বলিলেন যে, গত কয় মাস তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই ইহার পূর্ব্বে প্রায়ই দেখা হইত।

এইরূপে আরও কিছু বিশ্লেষণ করিয়া বুঝা গেল যে, তাঁহাদের ছাত্রজীবনের ভালবাসা এখনও তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ফ— এই কুমারীর নিকট তিনবার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিন্তু কুমারী তাঁহার স্থির মতামত কিছু জানান নাই। সত্য কথা বলিতে কি, তিনি ফ—কে পছন্দ করিতেন কিন্তু ফ—এর অবস্থা ভাল না থাকায় তাঁহার আত্মীয়েরা এই বিবাহে আপত্তি করেন।

সৈন্যদের নৃত্যউৎসবে (Military ball) ফ—এর সহিত কুমারীর শেষ দেখা হইয়াছিল। তখন ফ— সৈন্যবিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সৈন্যের পোষাকে তাহাকে বেশ মানাইয়াছিল, এবং বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল।

তিনি এই কুমারীর সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতি অতি সদয় ব্যবহার করিলেও বিবাহের প্রস্তাব আর করেন নাই। কুমারীটি কিন্তু চতুর্থবার বিবাহের প্রস্তাবের আশা করিয়াছিলেন এবং এইবার প্রস্তাব করিলেই তিনি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কুমারী শুনিয়াছিলেন যে, ফ—সম্প্রতি অন্য একটি যুবতীকে ইঙ্গিতে বিবাহের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার মনে যে খুব আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা তাঁহার এই কথা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়—"আমি এই সকলের জন্য নিজেকেই মাত্র দোষ দিতে পারি, এবং আমাকে ঐ সব চেষ্টা করিয়া ভুলিতে হইবে।"

আমরা এক্ষণে এই স্বপ্নের হাস্যজনক এবং অসম্ভব অংশের, অর্থাৎ মুরগীর ছানার কথা বলার অর্থ স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি 'মুরগীর ছানা' ফ—এর চলিত নাম। তিনিই এই স্বপ্নের প্রধান নায়ক। স্বপ্নে অন্যান্য মুরগীর ছানার চেহারা অস্পষ্ট ইহার অর্থ এইরূপ হইতে পারে যে, এই কুমারীর অন্যান্য প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ছিল, কিন্তু কুমারী তাহাদিগকে মন হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন।

মুরগীর ছানা বলিয়াছিল "আমার সঙ্গে অন্ধকারে এস।"

মনের অজ্ঞাত প্রদেশে (Sub-conscious region) অনুসন্ধান করিবার জন্য ডাক্তার ফ্রুড বাক্যজনিত ভাবসকলের (Word-asso-

ciations) বিশ্লেষণ নিমিত্ত একরূপ নিয়ম ব্যাহৃত করিয়াছেন; পরে সে বিষয় আরও বিশদ্‌ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইবে। মোটামুটি ইহা এইরূপ

বিশ্লেষণকারী একটি কথা বলেন, সেই কথা শুনিয়া পরীক্ষিত ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ কি কথা মনে পড়ে তাহা বলিতে হয়। পুনরায় এই কথাটি বলিলে আবার তাঁহার কি কথা মনে পড়ে, তাহাও বলিতে হয়। এইরূপে পরীক্ষার্থীর মনের অজ্ঞাত প্রদেশের চিন্তাস্রোতের গতি নিরূপণ করা হয় এই প্রকারে 'অন্ধকার' কথাটি হইতে তৎসংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত ভাবপ্রকাশক কথাগুলি কুমারীর নিকট পাওয়া গেল। অন্ধকার – অস্পষ্ট, অননুভবনীয়, রহস্য, বিবাহ।

এই সব কথায় কুমারীর মনে পড়িল যে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর, ক—র সহিত বিবাহের কথায় তাঁহার মাতা বলিয়াছিলেন যে, "টাকাই সব নহে। কে কেমন মানুষ তাহাও চেনা দায়। কোন মানুষের সঙ্গে থাকিয়া যত দিন পর্য্যন্ত না তাহার নুন খাইতেছ, তত দিন তাহাকে চিনিতে পারিবে না। বিবাহ একটি রহস্য"

এই কথাটি তাঁহার মনে গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল এবং বাইবেল হইতে তাঁহার মাতা যে তাঁহাকে নুন খাওয়ার কথা বলিয়াছিলেন, তাহা কুমারী মোটেই ভুলেন নাই। ইহাতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে তাঁহার মনে 'অন্ধকার' এই কথাটি গূঢ়ার্থবাচক এবং তাহার অর্থ বিবাহ। ইহা হইতেই আমরা মুরগীর ছানার উক্তির প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারি। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এইটি ক-এর বিবাহের চতুর্থ প্রস্তাব।

স্বপ্নের প্রথম অংশের বিবরণ এইরূপ:—'আমি একটি জনশূন্য পাড়াগাঁয়ে রহিয়াছি—ইত্যাদি।'

সেই কুমারীর এই সুন্দর দেশটির দৃশ্য কতক পরিমাণে স্মরণ হইল। তিনি গত গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের উপকূলে গিয়াছিলেন। স্বপ্নে এই উপকূলের নাম পাইয়াছিলেন লিকনর বে (Likonor Bay) কিন্তু এই নামের অর্থ তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। লিকনর-

যে কথাটি লইয়া তাঁহার নিকট হইতে নিম্নলিখিত ভাবসংহতি (word-association) পাওয়া গেল। 'লিকনর' শব্দের পর তাঁহার 'লুকারনো' ও 'লুগানো' এই দুই স্থানের কথা মনে পড়িল ; এই স্থান দুইটি তিনি দুই বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন এবং এই দুই স্থানেই তিনি বিবাহের পরবর্ত্তী "মধু মাস" (honey moon) যাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

তাহার পর লিকনর যে এই কথাটির মধ্যে তিনটি কথা বুঝিতে পারিলেন। Like পছন্দ করি, honor সম্মান করি, (obey) বশ্যতা স্বীকার করি। যদি Like কথাটী স্থলে Love অর্থাৎ ভালবাসি এই কথাটি বসাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহা বিবাহের মন্ত্র হয় ; এ মন্ত্র প্রত্যেক কুমারীরই জানা আছে। স্বপ্নে এইরূপ দুই তিনটি কথা মিশিয়া গিয়া সংক্ষিপ্ত হইয়া যাওয়ার দৃষ্টান্ত অনেক স্থলে পাওয়া যায়।

স্বপ্নের প্রথম ভাগের অর্থ এইরূপ হইতে পারে। আমি একটি নির্জ্জন পল্লীগ্রামে ছিলাম এবং ভালবাসা, সম্মান এবং বশ্যতা লইয়া বাড়ী যাইতে ব্যস্ত হইয়াছিলাম, অর্থাৎ আমি নিজেকে একেলা অনুভব করিয়া বিবাহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলাম।

স্বপ্নের পরের বিবরণ এই যে, কুমারী তাহার পদদ্বয় সীসার মত ভারী বোধ করিয়াছিলেন এবং তাহার একটা কিছু ঘটিবে বলিয়া ভীত হইতেছিলেন। তথাপি মোটেই অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না। অগ্রসর হইবার বিশেষ চেষ্টা সত্বেও অগ্রসর হইতে পারা যাইতেছে না—স্বপ্নে যখন এইরূপ প্রতিবন্ধকের ভাব অনুভব করা যায়, তখন মনে দুইটি বিরোধী ভাবের দ্বন্দ্ব হইতেছে বুঝিতে হইবে।

এখানেও তাহাই হইয়াছিল। কুমারী বিবাহ করিতে বিশেষ উৎসুক এবং ফ—কে পছন্দ করেন। তাহা ছাড়া তাহার বয়স হইয়া গিয়াছে। যেন তিনি অতি বৃদ্ধ কিম্বা দুর্ব্বল ; সেই জন্য চলিতে পারিতেছেন না ; স্বপ্নে এইরূপ ভাবের উপলব্ধি হইয়াছিল। অর্থাৎ যেন তিনি দুর্ব্বল এবং বৃদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার বিবাহের রাস্তা দিয়া

চলা কঠিন হইতেছে। বয়োবৃদ্ধ এবং দুর্ব্বল হইয়াছিলেন বলিয়া জাগ্রৎ অবস্থায়ও আপনাকে পরিহাসচ্ছলে বুড়ী বলিতেছিলেন। এই সব বিবেচনায় তাঁহার পক্ষে ফ—কে গ্রহণ করাই উচিত। কিন্তু তাঁহার আত্মীয় স্বজন এই বিবাহে আপত্তি করিয়াছিল। কারণ, ফ—অল্প-বয়স্ক সুন্দর যুবক হইলেও তাঁহার আর্থিক অবস্থা এমন ছিল না যে, তিনি বিবাহ করিয়া তাঁহার স্ত্রীর সামাজিক অবস্থানুসারে তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে পারেন।

তাহার পর স্বপ্ন এইরূপ চলিয়াছে—"যখনই আমি একটু অগ্রসর হই, তখনই আমার পথের মাঝখানে দেয়াল উঠে। মনে হইল, এই রাস্তাটি যেন দেয়ালে পরিপূর্ণ।"

একটি রাস্তা দেয়ালে পরিপূর্ণ, ইহা দ্বারা Wall Street বুঝাই-তেছে। ইহা আমেরিকা দেশস্থ একটী রাস্তার নাম। এই রাস্তার পার্শ্বে বড় বড় ব্যাঙ্ক আছে, তাহাতে লোকেরা টাকা জমা রাখিয়া থাকে। অতএব টাকাই এই বিষয়ে প্রতিবন্ধক তাহা বুঝা যাইতেছে।

যখন এই ব্যাখ্যা কুমারীকে বলা হইল তখন তিনি কিছু হাসিয়া বলিলেন, আমিও এই বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া Wall Street ব্যাঙ্কে আমাদের যে টাকা জমা আছে তাহা হইতে ফ—কে সাহায্য করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার মাতা ও আমার মধ্যে এই সর্ত্ত আছে যে আমার মাতার মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত আমি এই টাকায় হাত দিতে পারিব না।

এক্ষণে সমগ্র স্বপ্নটি এইরূপ দাঁড়াইতেছে ;—আমার এক্ষণে ২৮বৎসর বয়স এবং আমি একরূপ বৃদ্ধা এবং আমি ফ—কে বিবাহ করিতে ব্যস্ত কিন্তু তাঁহার এমন টাকা নাই যাহাতে আমাদের উভয়ের উপযুক্ত ভাবে ভরণপোষণ হইতে পারে। তবে যদি সে আবার বিবাহের প্রস্তাব করে, আমি হয়ত তাহাকে অর্থ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারি। স্বপ্নের দ্বিতীয় অংশে আপনার মনেই যেন তাহার এই গূঢ় ইচ্ছা সফলতা লাভ করিতেছে।

গত কয়েক মাস ধরিয়া এই সব চিন্তায় কুমারীর মন পরিপূর্ণ

ছিল— এ কথা তিনি স্বীকার করিলেন ; এবং তিনি এই সব ভুলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, তাহাও বলিলেন।

স্পষ্ট বুঝা যায় যে, স্বপ্নে যে সব চিন্তা প্রকাশ হইয়াছিল সে সব চিন্তার বিষয় এই কুমারী জ্ঞানতঃ কাহাকেও বলিতেন না ; এ সব কথা বলিতে তাহার যে লজ্জা হইত, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু না বলার আর একটি কারণ এই যে, এই সব বিষয় লইয়া তিনি অজ্ঞাতভাবে অনেক চিন্তা করিলেও নিজের ভিতরের সব কথা তিনি নিজেই স্পষ্ট বুঝিতে পারেন নাই।

সাধারণতঃ সামান্য বিষয়সম্বন্ধে স্বপ্ন দৃষ্ট হয় না। অনেক স্বপ্ন অনেক স্থলে অতি সামান্য এবং সরল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই সকল স্বপ্ন যদি রীতিমতভাবে বিশ্লেষণ করা যায় তাহা হইলে বুঝা যায় যে, স্বপ্ন দর্শন-কারীর গভীরতম গূঢ় ভাব ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। সেই জন্য স্বপ্নের মধ্যে এই ভাব বুঝিবার সময় এত বাধা অতিক্রম করিতে হয়।

ইহা ব্যতীত স্বার্থ কামনা, অহংজ্ঞান ইত্যাদি দ্বারা প্রণোদিত কার্য্যের ফলে আমাদের মনের অজ্ঞাত স্তরের ভিতর একটি সেন্‌সর (censor) সৃষ্টি হয়। যুদ্ধের সময় একজন রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। তিনি যে সকল সংবাদ বাছিয়া মনোনীত করিয়া দেন তাহাই সাধারণে প্রকাশিত হয়। গূঢ় সংবাদ সাধারণে প্রকা-শিত হয় না। এই রাজকর্ম্মচারীকে সেন্‌সর বলে। আমাদের মনের মধ্যে যে সেন্‌সর সৃষ্টি হয়, তাহা আমাদের লজ্জা ও পাপজনক কার্য্যের স্মৃতি এবং অপ্রিয় দুঃখদায়ক অনুভূতি সকল আমাদের সাধারণ জ্ঞানের নিকট অপ্রকাশিত রাখিতে চেষ্টা করে। তাহার ফলে কিন্তু অনেক সময় বাতুলতা, শারীরিক ও মানসিক অশান্তি প্রভৃতি উপস্থিত হয়। স্বপ্ন সকলের ঐন্দ্রজালিকতা অনেক পরিমাণে আমাদের এই মানসিক সেন্‌সরের কীর্ত্তি. তাহারই ফলে স্বপ্ন অধিকাংশ স্থলে দর্শনকারীর অবোধ্য হয়, এবং নিদ্রা ভঙ্গ হইলে অনতিবিলম্বে স্বপ্ন ভুলিয়া যাইতে হয়। (ক্রমশঃ)

— —

সাধুসঙ্গ।

(শ্রীকুমুদবন্ধু সেন)

সংসার মহামায়ার লীলাভূমি। এই লীলা দেখিয়া সাধক কবি গাহিয়াছেন, —

"এম্‌নি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক ক'রে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি করিতে পারে॥"

বাস্তবিকই এই ভবরোগগ্রস্ত ত্রিতাপদগ্ধ সংসারী জীবের শান্তি নাই। বাসনার উত্তাল তরঙ্গে, অভিমান অহঙ্কারের তাড়নে এবং দুর্দ্দম প্রবল রিপুর পীড়নে জীব সর্ব্বদা অশান্তিপারাবারে ভাসিতেছে। চারিদিকে কামকাঞ্চনের কথা, চারিদিকে রোগ শোক দুঃখের ছবি চারিদিকে ভোগ বিলাসের তাণ্ডব নর্ত্তন। উপায় কি? ভোগ বাসনার পরিতৃপ্তির জন্য জীবনের আয়োজন, স্ত্রী পুত্র পরিবার প্রতিপালনের জন্য চিন্তাস্রোত অহরহঃ প্রবাহিত হইতেছে, বিষয়-গরল পানে জর্জ্জরিত চিত্ত বিকল ও বিক্ষিপ্ত এবং আত্মাভিমানের মহিমায় আমরা এত অভিভূত যে আমাদের পূজার্চ্চনা, সাধু-সেবা এবং যাহা কিছু ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান তাহার মূলে আকাঙ্ক্ষার আবেদন পরিলক্ষিত হয়। ঈশ্বর বলিয়া যদি কেহ থাকেন—তিনি যেন আমাদের ভোগ-যজ্ঞের ইন্ধন জোগাইবার ব্যক্তি মাত্র—তাই তাঁহাকে নমস্কার করি, পূজা করি এবং তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠা করি। ধন-জন-যশ-তৃষ্ণা অহর্নিশি মনে বিরাজ করিতেছে, সংসারে কাম-কাঞ্চনের আলাপ এবং লোকনিন্দার প্রলাপ ব্যতীত আমাদের অধি-কাংশ লোকেই আর কিছু জানে না—ইহা ব্যতীত আমাদের ভাষার উপযুক্ত প্রয়োগ জানি না। ভগবানের মধুর নাম উচ্চারণ করাই আমাদের পক্ষে যেন কঠোর সাধন হইয়া দাঁড়াইয়াছে! বাস্তবিকই এই শোচনীয় অবস্থায় আমাদের উপায় কি? শাস্ত্র বলেন, সাধুসঙ্গ।

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥"

ক্ষণকাল যদি সাধুসঙ্গে যাপন করা যায় তবে এই ভীষণ ভবসমুদ্র হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, ইহা মহাজনগণের বাক্য।

সাধুসঙ্গ ত করিব, কিন্তু সাধুকে চিনিব কিরূপে? এই সংসারে পড়িয়া কোন ধর্ম্মানুরাগী ব্যাকুলাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিকট এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলেন—প্রকৃত বৈষ্ণব কে? তদুত্তরে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলেন,

"যাঁহারে দেখিলে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
তাঁহারে বৈষ্ণব বলি জানিহ নিশ্চয়॥"

সাধুর—প্রকৃত ভগবৎপ্রেমিকের ইহাই লক্ষণ। বাস্তবিকই যাঁহাকে দেখিলে আমরা সংসারের আবিলতা ভুলিয়া যাই—যাঁহাকে দেখিলে আমাদের ভগবৎভাব স্ফুরিত হয়—যাঁহাকে দেখিলে হৃদয়ে শ্রীভগবানের আসন পাতিতে ইচ্ছা হয়—তিনিই সাধু। যিনি প্রকৃত বিবেকবৈরাগ্যবান্, যিনি কামকাঞ্চনের লেলিহান্ বাসনাগ্নিতে হবিঃ প্রদান করেন না, যিনি এই অনিত্য সতত‌চঞ্চল গতানুগতিক জগতের অসারত্ব দেখাইয়া প্রকৃত সত্যের পথ প্রদর্শন করেন, যাঁহার জীবন সত্যের পবিত্রতার এবং সংযমের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ তিনিই যথার্থ সাধু। এইরূপ সাধুর সঙ্গ লাভ করিলে জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়, বিষয়বিষ ত্যাগ করিয়া ভক্তির পীযূষধারা পান করিয়া জীবন কৃতার্থ হয় এবং ভগবদারাধনাই যে মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য লোকে তাহা ধারণা করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং সাধু চিনিতে পার আর নাই পার, এইরূপ মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিলেই—তাঁহার পবিত্র অমৃতসঙ্গলাভ করিলেই তোমার অবিদ্যাচ্ছন্ন চিত্ত স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হইবে—সাধুর সরল অমায়িক ব্যবহারে এবং অসীম ভালবাসায় তোমার হৃদয় আর্দ্র হইবে এবং এই স্বার্থপঙ্কিলময় জগতে নিঃস্বার্থতার অপূর্ব্ব আদর্শ দর্শন করিয়া তোমার মোহের আবরণ ধীরে ধীরে অপসৃত হইবে। সাধুসঙ্গের এমনই গুণ যে, ঘোর পাষণ্ড

নাস্তিকও ঐশী শক্তির অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিয়া ক্ষণিকের জন্যও সেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আস্বাদ লাভে ধন্য হইবে।

সুতরাং সাধুসঙ্গ করিবার চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। লোকে বলে, জহুরী না হইলে জহর চিনিতে পারে না। যদি সেই চিন্তামণিকে চিনিতে চাও, যাদ সেই "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" এর ধারণা করিতে চাও, তবে সাধু হও—সাধুর আদর্শে জীবন গঠিত কর। সাধু না হইলে সেই চিন্তামণিকে চিনিতে পারিবে না। সাধু হইতে গেলে সাধুসঙ্গ ব্যতীত উপায় নাই। সাধু মহাপুরুষদিগের জীবন ও তাঁহাদের কার্য্যাবলী চিন্তা করিলেও আমরা সাধুসঙ্গের কতকটা মাধুর্য্য ও আনন্দ অপরোক্ষভাবে হৃদয়ে অনুভব করিয়া থাকি। অবতার ও আচার্য্যপুরুষগণই যথার্থ সাধু। জগতের হিতের জন্য, জীবের মঙ্গলের জন্য এবং জনসমাজে ধর্ম্মের পুণ্যাদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহারা জগতে আবির্ভূত হন। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ এই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই যৌবনে সংসার ত্যাগ করিয়া কৌপীনধারী হইয়াছিলেন। স্নেহময় জনকজননী, প্রণয়িনী স্ত্রী এবং স্নেহের পুত্তলী একমাত্র পুত্রকে ত্যাগ করিয়া যুবক রাজকুমার জরা মরণ-ব্যাধি-পীড়িত জীবগণের কল্যাণের জন্য কি কঠোর তপস্যাই না করিয়াছিলেন! নিরঞ্জনা তীরে উরুবিল্বের বোধিদ্রুমতলে কি কঠোর সাধনার সহিত তিনি সত্যের সন্ধান করিয়াছিলেন তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। সেই মেঘগম্ভীর প্রতিজ্ঞাবাণী স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্ল্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়ম্ সমুচ্চলিষ্যতে॥

আবার দেখ সেই কিশোর সন্ন্যাসী শঙ্কর, যিনি জগতের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিবার জন্য বালকবয়সে স্নেহময়ী মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া নির্ভীক কেশরীর ন্যায় কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃত বেদান্তভাষ্য চিরোজ্জ্বল সূর্য্যের ন্যায় ধর্ম্মজগতে

বিরাজিত থাকিয়া শত শত জীবের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিতেছে এবং তৎকৃত বিবেকচূড়ামণি, মোহমুদ্গর, মণিরত্নমালা, প্রভৃতি স্তোত্ররাজি পাঠ করিলে বৈরাগ্য ও ভক্তিরসে হৃদয় অভিসিঞ্চিত হয়।

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের দিকে চাহিয়া দেখ—যিনি অশ্রুসিক্তনয়নে গদগদ কণ্ঠে বলিতেছেন—

"ন চ প্রার্থ্যং রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্যবিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধূং।
সদা কামং কামং প্রমথপতিনোদ্গীতচরিতো
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥
হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে।
অহো দীনেঽনাথে নিহিতচরণো নিশ্চিতমিদম্
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

—যিনি কখনও মহাভাবে গর গর হইয়া যমুনাভ্রমে সাগরবক্ষে ঝম্প প্রদান করিতেছেন - কখনও অর্দ্ধবাহ্যদশায় "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন করিতেছেন, আবার কখনও জীবের দুঃখে কাতর হইয়া দ্বারে দ্বারে মধুর হরিনাম বিলাইতেছেন—যিনি কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া প্রেমের প্রবল বন্যায় আপনাকে ও সমগ্র বাংলা-দেশকে ভাসাইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার কথা ক্ষণিক চিন্তা করিলেও কাহার না হৃদয় ভক্তিরসে প্লাবিত হয়?

আবার সেদিন পঞ্চবটীমূলে যে মাতৃগতপ্রাণ সরল ব্রাহ্মণ বালক "মা" "মা" বলিয়া রোদন করিয়া গিয়াছেন—যাঁহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, কঠোর সাধনা এবং অভূতপূর্ব্ব প্রেম ভাষার অতীত—যাঁহার জীবন ধর্ম্মজগতের ইতিহাস ও বেদস্বরূপ—সেই জ্ঞান ভক্তির সমন্বয়মূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে এবং আচার্য্যকেশরী স্বামী বিবেকানন্দের পবিত্র পাদস্পর্শে জগতে ধর্ম্মের এক মহাতরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে—জগতে এক মহা সাম্যনীতি ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব জাগরিত হইয়াছে।

বাস্তবিকই ঈদৃশ আচার্য্য-পুরুষদিগকে চিন্তা করিলে, একাগ্রমনে ধ্যান করিলে এবং সর্ব্বদা স্মরণ মনন করিলে কলুষিত মোহান্ধ-চিত্ত নির্ম্মল হয় এবং ঘোর অশান্তিসাগরে শান্তিলাভ করিয়া জীব ধন্য হয়।

আমাদের দৃষ্টি কামকাঞ্চনের তামস অঞ্জনে অনুরঞ্জিত তাই হিসাব করিয়া ধর্ম্মাচরণ করি। এই অঞ্জনে অনুরঞ্জিত হইয়াই অভিমানিনী দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন,

"ধর্ম্মহেতু সব ত্যজি আইলা বনেতে।
চারি ভাই আমাকেও পারহ ত্যজিতে॥
তথাপিহ ধর্ম্ম নাহি ত্যজিবে রাজন্।
কায়ার সহিত যেন ছায়ার গমন॥"
"ধিক্ বিধাতারে এই করে হেন কর্ম্ম।
দুষ্টাচার দুর্যোধন করিল আজন্ম॥
তাহারে নিযুক্ত কেন পৃথিবীর ভোগ।
তোমারে করিল বিধি এমন সংযোগ॥"

দ্রৌপদীর এই প্রশ্নে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন,

"ধর্ম্ম করি যেই জন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়
বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয়॥
ফললোভে ধর্ম্ম করে লুব্ধ বলি তারে।
লোভে পুনঃ বাড়ে যেন নরক ভিতরে॥"

বাস্তবিক এই বণিক্‌বৃত্তির, এই বিনিময় লাভের আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে এত উগ্রভাবে উদ্দীপ্ত যে আমরা নিঃস্বার্থভাবে ধর্ম্মাচরণ কল্পনা করিতে পারি না। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

আমরা কিন্তু কার্য্য করিলেই কর্ম্মফলের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকি। কিন্তু সাধু সে জন্য ধীর স্থির ও উদাসীন। ভগবান্ ঈশার সেই উপদেশ ও তাঁহার একান্ত নির্ভরশীল জীবন স্মরণ করিলে জানিতে পারি সাধুর জীবন কত মহৎ ও মধুর।

"পাখীরও থাকিবার বাসা আছে, পশুরও থাকিবার আবাস আছে, কিন্তু ভগবানের সন্তানের তাহাও নাই।" "আগামী কল্যের জন্য চিন্তা করিও না" ইহা কেবল ঈশ্বরবিশ্বাসী সাধুই বলিতে পারেন।

এখন প্রশ্ন এই, আমরা কেমন করিয়া সাধুসঙ্গ লাভ করিব? কোথায় সেই সাধু যাঁহার দর্শনে আমাদের অজ্ঞান-আবরণ উন্মোচিত হয়?

ভারত ধর্ম্ম প্রধান দেশ। ভারতে ধর্ম্মবীরের অন্ত নাই। যদি আমাদের প্রাণে যথার্থ ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়—যদি সত্যলাভের জন্য আমাদের একান্ত আকাঙ্ক্ষা জন্মে, যদি সত্যপথপ্রদর্শক সাধুর জন্য আমরা ব্যাকুল হই, তবে আমরা নিশ্চয়ই সাধুর দর্শনও পাইব। ভগবানের সৃষ্টিতে জল, বাতাস, যাহা আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় তাহা প্রভূত পরিমাণে দেখিতে পাই। সেইরূপ যখন আমারা সাধুসঙ্গ লাভের প্রয়াসী হইব, সরলভাবে তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইব—তখন আমার জন্য সাধু—গুরু আবির্ভূত হইবেন!—সাধুর আদর্শ দেখাইতেই পরম সাধু জগদ্‌গুরু অবতারপুরুষাদির আবির্ভাব। তাঁহাদের চিন্তাই সাধুসঙ্গ—তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলীর জীবনলীলা প্রকৃত ভগবদ্‌ভক্তের প্রিয় বস্তু। শুক, সনক, নারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, শঙ্কর, বুদ্ধ, চৈতন্য রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি ভারতে একের পর আর আবির্ভূত হইয়া "ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি" ইহাই প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের লীলাগ্রন্থ, বেদ, পুরাণ প্রভৃতি পাঠ করিলেও সাধু সঙ্গ করা হয়। কারণ মহাপুরুষেরা বলিয়া থাকেন—"ভক্ত, ভাগবত এবং ভগবান্ এক"। নিরঞ্জন গুরুর কৃপায় এবং সাধু সঙ্গের পুণ্য প্রভাবে আমরা অহৈতুকী ভক্তির আদর্শ ধারণা করিতে পারি।

চিত্তশুদ্ধি ধর্ম্মলাভের জন্য একান্ত প্রয়োজন। চিত্তের মালিন্য সর্ব্বতোভাবে দূর না হইলে, সংকল্প বিকল্পের তরঙ্গ রোধ না করিলে আমাদের চিত্তের যথার্থ একাগ্রতা আসে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

এই চিত্তশুদ্ধি সাধুসঙ্গ না ক'রলে সহজে হয় না। ঈশ্বরীয় কথা, ঈশ্বর চিন্তায় তন্ময়তা বালকবৎ সরলতা, নিঃস্বার্থ প্রেম এবং আকাশ-বৎ উদারতা আমরা সাধুর মধ্যে দেখিতে পাই। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া আমরা বুঝিতে পারি প্রকৃত ঐশ্বর্য্য—বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম এবং প্রকৃত আনন্দ ভগবচ্চিন্তায়। ঝুড়ি ঝুড়ি উপদেশ অপেক্ষা একটা উপদেশ কার্য্যে পরিণত করা অধিকতর কার্য্যকরী। যথার্থ সাধুর সংস্পর্শে আসিলে আমরা জীবন্ত আদর্শ দেখিতে পাই এবং সেই জীবন দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি ধর্ম্ম একটা কথার কথা নহে—ইহা জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ সত্য। সাধুসেবা ও সাধুসঙ্গে জীবের ভববন্ধন মোচন হয়; আমরা সাধুসঙ্গে বুঝিতে পারি যে, মন মুখ এক না হইলে ধর্ম্ম সাধন হয় না, কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি থাকিলে সত্যের দর্শন হয় না চালাকীর দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য সাধিত হয় না এবং ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে কখনও ধর্ম্মলাভ হয় না। সাধুর কৃপায় বুঝিতে পারি,

> "কিং দানেন ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং,
> কিম্বা পুত্রকলত্রমিত্র পশুভির্দেহেন গেহেন কিম্।
> জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং সপদি রে ত্যাজ্যং মনো দূরতঃ,
> স্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীপার্ব্বতীবল্লভম্॥
> "আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনম্,
> প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ কালো জগদ্ভক্ষকঃ।
> লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা বিদ্যুচ্চলং জীবিতং,
> তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা॥"

যদি সংসারের অসারতা ঐশ্বর্য্যের নশ্বরতা এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে চাও—যদি কামকাঞ্চনের প্রবল মোহ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে চাও—যদি বাসনার বীচিবিক্ষুব্ধ উদ্দাম স্রোত হইতে রক্ষা পাইতে চাও—যদি অশান্তির অকুল পাথার হইতে শান্তির কল্পবৃক্ষমূলে আশ্রয় লাভ করিতে চাও—তবে সাধুর শরণাগত হও। তাঁহার নির্ম্মল সঙ্গে, উন্নতাদর্শে এবং পবিত্র ভাবে অনুপ্রাণিত

হইলে তোমার হৃদয় নির্ম্মল হইবে—এবং সেই নির্ম্মল চিত্তদর্পণে ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হইবেন।

অসতো মা সদ্গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়॥
মৃত্যোর্মাঽমৃতঙ্গময়।
আবিরাবির্ম এধি॥
রুদ্র যত্তে দক্ষিণম্ মুখম্
তেন মাং পাহি নিত্যম্॥

বেদান্ত-পরিভাষা।*

(স্বামী অমৃতানন্দ

অনাদি অনন্ত জ্ঞানই বেদ ঋষিগণ যে সকল আধ্যাত্মিক সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ববেদ নামে অভিহিত হয়। প্রত্যেক বেদকেই সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। বেদের অন্তভাগ বা বেদান্ত জ্ঞানকাণ্ড, সম্যক্ প্রকারে অবিদ্যা বা অজ্ঞান নাশ করে বলিয়া উহাকে উপনিষদ্ বলে।

অনুবন্ধ-চতুষ্টয়—কিছু উপদেশ দিতে হইলে অধিকারী নির্ব্বাচন আবশ্যক। কারণ, অনধিকারীকে উপদেশ দিলে তাহা নিষ্ফলই হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "যার পেটে যা সয়"। গ্রন্থবিশেষের পক্ষেও ইহা প্রয়োজন, সেখানে অধিকারীও নির্ব্বাচন

---

* "বেদান্তসার" নামক পুস্তকের সুবোধিনী টীকা অবলম্বনে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধটী তাহারই অন্যতম। —লেখক।

আবশ্যক। সকল গ্রন্থের একটি বিষয়ও আছে। বিষয় ব্যতিরেকে গ্রন্থ হইতে পারে না। কোনও গ্রন্থ যে বিষয়টি বুঝাইতে চাহিতেছে তাহার সহিত গ্রন্থের একটা সম্বন্ধ থাকা দরকার, তাহা না থাকিলে গ্রন্থ বোধগম্য হইবে না, এবং শেষ কথা এই যে, বিনা প্রয়োজনে কোন কার্য্য করা উচিত নহে। সুতরাং গ্রন্থের প্রযোজনীয়তা থাকা আবশ্যক। অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন এই চারিটিকে বেদান্তের অনুবন্ধ কহে।

অধিকারী - বেদান্তের অধিকারী হইতে হইলে স্বাধ্যায় আবশ্যক। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করাকেই স্বাধ্যায় কহে। স্বাধ্যায় দ্বারা বেদের তাৎপর্য্য বোঝা যায় এবং বেদের প্রকৃত অর্থ না বুঝিতে পারিলে জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অধ্যয়ন না করিয়াও জ্ঞান হইয়াছে, এরূপ দেখা যায়—সুতরাং অধ্যয়ন ব্যতিরেকে জ্ঞান হইবে না, ইহা কি প্রকার? ঐরূপ স্থলে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা নিজে অধ্যয়ন না করিলেও অপরের নিকট হইতে শাস্ত্রার্থ শ্রবণ করিয়াছিলেন বলিয়া উহার আবশ্যক হইল না।

তৎপরে নির্ম্মল চিত্ত হইতে হইবে। কাম্য ও নিষিদ্ধকর্ম্ম বর্জ্জন-পূর্ব্বক নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা এই সকল কার্য্য দ্বারা ইহজন্মে বা পরজন্মে চিত্তের নির্ম্মলতা লাভ হয়।

স্বর্গাদি সুখ লাভের জন্য অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞকে কাম্যকর্ম্ম বলে। নরকাদি দুঃখভোগের কারণ ব্রাহ্মণহত্যাদিকে নিষিদ্ধকর্ম্ম বলে। যে সকল কর্ম্ম না করিলে পাপ সঞ্চয় হয় তাহাদিগকে নিত্যকর্ম্ম বলে। পুত্রজননাদি উদ্দেশ্য করিয়া জাতেষ্টি প্রভৃতি কর্ম্মকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলে। এবং যে সকল কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানকৃত পাপ নাশ হয় অর্থাৎ চান্দ্রায়নাদি কর্ম্ম, তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত কহে।

সগুণ ব্রহ্ম বিষয়ক মানসিক ব্যাপাররূপ শাণ্ডিল্যবিদ্যাদিকে উপাসনা কহে; এই উপাসনা দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা হয়।

নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা নির্ম্মল চিত্ত হওয়ার সহিত

পিতৃলোক ও সত্যলোকপ্রাপ্তিরূপ ফল লাভও হইয়া থাকে—শ্রুতিতে আছে, "কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকঃ" ইত্যাদি। এই সকল কার্য্য দ্বারা নির্ম্মলচিত্ত হইয়া সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইতে হইবে।

বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব এই চারিটিকে সাধন-চতুষ্টয় কহে।

কোনটি নিত্য ও কোনটি অনিত্য বস্তু, উহার বিচারের নাম বিবেক

অত্যন্ত ক্ষুধা পাইলে যেরূপ ভোজন ছাড়া অন্য বিষয় ভাল লাগে না এবং ভোজনে বিলম্বও সহ্য হয় না, সেইরূপ ইহলোকের ও পরলোকের সকল প্রকার ভোগবিলাসে অরুচি ও তত্ত্বজ্ঞানের উপায় শ্রবণ মননাদিতে অত্যন্ত অভিরুচিকে বৈরাগ্য বলে।

শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা—এই ছয়টিকে ষট্‌-সম্পত্তি বলে।

পূর্ব্ববাসনার বলে শ্রবণাদি সাধন ছাড়িয়া ভোগবিলাসিতার দিকে ধাবমান মন অন্তঃকরণের যে বৃত্তির দ্বারা নিগৃহীত হয় সেই বৃত্তি-বিশেষকে শম বলে।

জ্ঞানের সাধন শ্রবণাদি হইতে পৃথক্ অন্য শব্দাদি বিষয়ে প্রবর্ত্তমান শ্রোত্রাদি বাহ্যেন্দ্রিয় অন্তঃকরণের যে বৃত্তি দ্বারা নিবর্ত্তিত হয় সেই বৃত্তি-বিশেষকে দম বলে।

বিধিপূর্ব্বক চতুর্থ আশ্রম স্বীকাররূপ কর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ সন্ন্যাস দ্বারা নিত্যাদি বিহিত কর্ম্মের পরিত্যাগ, ও 'আমি কর্ত্তা নহি' এই কর্ত্তৃত্ববুদ্ধিহীন অবস্থায় অবস্থানকে উপরতি বলে। মনের ও বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বিক্ষেপের অভাবকেও উপরতি কহে। শীতোষ্ণাদির জন্য সুখ ও দুঃখ শরীরের ধর্ম্ম। শরীর থাকিতে উহা ত্যাগ করা যাইবে না। সুতরাং স্বপ্রকাশ, চিদ্রূপ নিজ আত্মাতে শীতোষ্ণাদির অত্যন্ত অভাব, এইরূপ বিচার দ্বারা শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বের সহনকে তিতিক্ষা কহে।

অমানিত্বাদি সাধন বিষয়ে মনের স্থিরতাকে অর্থাৎ নিরন্তর সেই বিষয়েরই চিন্তাকে সমাধান কহে।

গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা বলে।

মোক্ষের ইচ্ছাকে মুমুক্ষুত্ব বলে।

ছয় বেদাঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়নশীল, নির্ম্মলচিত্ত, সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তিই বেদান্তের অধিকারী।

বিষয়—জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য স্থাপনই বেদান্তের বিষয়।

সম্বন্ধ—যে বস্তুটি বুঝাইবার চেষ্টা হইতেছে ও যাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে অর্থাৎ বোধ্য বিষয় ও বোধকশাস্ত্র এই উভয়ের যে সম্বন্ধ তাহাকে সম্বন্ধ বলে।

প্রয়োজন—বেদান্তের প্রয়োজন মুক্তি অর্থাৎ অজ্ঞানের নাশ ও নিরতিশয় স্বরূপানন্দ প্রাপ্তি কিন্তু অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও তাহাতে আনন্দ সম্ভবপর কিন্তু নিত্য প্রাপ্ত বস্তু যে আত্মস্বরূপ তাহার পুনঃ-প্রাপ্তি ও তাহাতে আনন্দ কি প্রকারে সম্ভব?

গলদেশস্থিত সুবর্ণ হার ভ্রমবশতঃ হারাইয়া গিয়াছে ভাবিয়া লোক শোকে ও দুঃখে অভিভূত হয় এইরূপ ঘটনা আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই; এবং কিছুকাল অনুসন্ধানের পর অপরের উপদেশ মত নিজ কণ্ঠদেশে হাত দিয়া "এই যে আমার হার' এই কথা বলিয়া আনন্দিত হয়। সেই প্রকার নিত্যপ্রাপ্ত আত্মস্বরূপ স্বপ্রকাশ, নিত্য, মুক্ত, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইলেও, লোকে ভ্রমবশতঃ আমি বদ্ধ, আমি অজ্ঞান, আমি দুঃখী এই প্রকার মনে করে; কিন্তু গুরু ও শ্রুতিবাক্য শ্রবণ দ্বারা ভ্রম দূর হইলে সে স্বস্বরূপ জানিতে পারে ও নিরতিশয় আনন্দ লাভ করে এবং এই প্রকারেই নিত্যপ্রাপ্ত বস্তুর পুনঃ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই স্বস্বরূপ জ্ঞান হইলে সমস্ত শোক চলিয়া যায় ও জীব ব্রহ্ম হইয়া যায়। শ্রুতি বলিতেছেন, "তরতি শোকমাত্মবিৎ", "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।"

শিষ্যের কর্ত্তব্য অতি সামান্য সামান্য জাগতিক কার্য্যে গুরুর আবশ্যক হইয়া থাকে; সুতরাং আধ্যাত্মিক জগতের পারমার্থিক সত্য লাভের জন্য যে গুরুর আবশ্যকতা আছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। শ্রুতিও বলিয়াছেন—'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎ পাণিঃ

শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং" গুরু ব্যতিরেকে আমাদের জ্ঞান লাভের উপায় নাই। যেমন নদীস্রোতে ভাসমান কীট আবর্ত্তের পর আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিতে থাকে এবং কোনও প্রকারে নিজ চেষ্টায় সেই আবর্ত্তের মধ্য হইতে বাহির হইতে পারে না; কিন্তু কোনও সদাশয় ব্যক্তি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে আবর্ত্তের মধ্য হইতে উঠাইয়া নদীতীরে কোনও বৃক্ষ ছায়ায় রাখিয়া দিলে তবে সে আবর্ত্ত হইতে মুক্ত হয় ও শান্তিলাভ করে। সেইরূপ সংসারক্ষেত্রে ঘূর্ণ্যমান জন্ম, জরা ও ব্যাধি এই ত্রিতাপতাপিত ব্যক্তি অর্দ্ধপ্রজ্জ্বলিতমস্তক পুরুষের তাড়াতাড়ি সেই দাহ নিবৃত্তির জন্য শীতল জলাশয়ে গমনের ন্যায় স্বস্বরূপজিজ্ঞাসু হইয়া সংসাররূপ দুঃখের নিবর্ত্তক, বেদান্তপারদর্শী, ব্রহ্মজ্ঞ, করতল-গত আমলকির ন্যায় স্বপ্রকাশ আত্মস্বরূপ জ্ঞানের সমর্পক গুরুর নিকট যাইবে রিক্তহস্তে যাইবে না, অন্ততঃ এক টুক্‌রা যজ্ঞকাষ্ঠ-খণ্ডও হাতে করিয়া লইয়া যাইবে। শ্রুতিতেও আছে "সমিৎপাণিঃ" ইত্যাদি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—"সাধু দর্শন করিতে গেলে শুধু হাতে যেতে নেই, একটু কিছু হাতে করে নিয়ে যেতে হয়। কিছু না পেলে অন্ততঃ দুটো ফুলও নিয়ে যাবি"। বেদান্তের অধিকারী হইয়া উপরোক্ত প্রকারে গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিবে।

গুরুর কর্ত্তব্য—ব্রহ্মজ্ঞ গুরু কেবলমাত্র কৃপা করিয়া প্রকৃত অধিকারী ও জিজ্ঞাসু শিষ্যকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করিবেন। এ স্থলে প্রশ্ন হইতেছে, বাক্যমনের অগোচর অখণ্ড, অব্যক্ত ব্রহ্মের উপদেশ গুরু কি প্রকারে দিবেন?

অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপের বিধিমুখে উপদেশ দেওয়া যায় না বটে, কিন্তু "নেহ নানাস্তিকিঞ্চন", "নেতি নেতি" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যের দ্বারা প্রথমে নিষেধ-মুখে বলিয়া পুনরায় "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বিধিমুখে উপদেশ দিয়া থাকেন।

অধ্যারোপ—বস্তুতে অবস্তুর আরোপকে অধ্যারোপ বলে। যেমন

রজ্জুই প্রকৃতবস্তু কিন্তু অবস্তুরূপ সর্প তাহাতে ভ্রমবশতঃ অধ্যারোপিত হইয়াছে মাত্র।

অপবাদ—বিচার দ্বারা ভ্রান্ত আরোপের নিরাকরণকে অপবাদ বলে। যে প্রকার অধ্যারোপ ও অপবাদ-ন্যায় অনুসারে প্রকৃত বস্তু রজ্জু প্রকাশ হইয়া পড়ে বা রজ্জুর স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়, সেইরূপ অধ্যারোপ ও অপবাদ ন্যায় অনুসারে গুরু ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ জানাইয়া দেন। বস্তুরূপ ব্রহ্মে অজ্ঞানাদি জগৎপ্রপঞ্চ অধ্যারোপিত হইয়াছে মাত্র, বিচার দ্বারা তাহার অপবাদ করিলেই প্রকৃত বস্তু ব্রহ্ম জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

ব্রহ্মে জগৎ নাই বলিলেই ত হইত? অধিষ্ঠান ব্রহ্মে অজ্ঞানাদি জগৎ প্রপঞ্চ অধ্যারোপ করিয়া পুনরায় তাহার অপবাদের আবশ্যক কি?

আবশ্যক আছে। বায়ুর রূপ নাই বটে কিন্তু অগ্নিতে রূপ আছে সেইরূপ ব্রহ্মে জগৎপ্রপঞ্চ নাই বলিলে অন্য অধিষ্ঠানে আছে বলিয়া সংশয় হইতে পারে, এবং ঐরূপ সংশয় হইলে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সিদ্ধ হয় না। কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানে কোনওপ্রকার সংশয় থাকিতে পারে না। সুতরাং, একমাত্র অধিষ্ঠান ব্রহ্মে জগৎ অধ্যারোপ এবং তাহার অপবাদ করিলেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সিদ্ধ হইবে ও নিঃসংশয় জ্ঞান লাভ হইবে।

মায়া ও ব্রহ্মের স্বরূপ—জগৎ প্রপঞ্চ মায়ার কার্য্য। অসত্য, জড়ত্ব ও দুঃখই মায়ার স্বরূপ, সত্য, জ্ঞান ও আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ।

কোনও বস্তুর অসাধারণ গুণকে লক্ষণ কহে। এই লক্ষণ দুই প্রকার, তটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপ লক্ষণ।

তটস্থ লক্ষণ—কোনও বস্তুর অপেক্ষা করিয়া যে লক্ষণ বলা যায় এবং যে লক্ষণ সর্ব্বকাল না থাকিয়া কোন কোন সময়ে থাকিয়া লক্ষিত বস্তুর লক্ষ্যের কারণ হইয়া থাকে তাহাকে তটস্থ লক্ষণ বলে। যেমন, একটি গৃহের সম্মুখে একটি গরু বাঁধা আছে, এ স্থলে ঐ গরুটী সেই গৃহের তটস্থ লক্ষণ।

স্বরূপ লক্ষণ—অন্য কোনও বস্তুর অপেক্ষা না করিয়া যে লক্ষণ বলা যায় এবং যে লক্ষণ লক্ষিত বস্তুর সহিত সর্ব্বকাল বর্ত্তমান থাকে উহাকে স্বরূপ লক্ষণ বলে। যেমন স্বর্ণচূড়াসক্ত মন্দির, এ স্থলে সেই স্বর্ণচূড়া ঐ মন্দিরের স্বরূপ লক্ষণ।

তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা গুরু ব্রহ্মের উপদেশ করেন। শ্রুতিতে ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি বলা হইয়াছে; উহা তাঁহার তটস্থ লক্ষণ। কারণ, সর্ব্বজ্ঞ কথাটির প্রকৃত অর্থ ভাবিলে ইহাই দেখা যাইতেছে যে "যিনি সমস্তই জানেন"। এখন তিনি যখন এক তখন এই "সমস্তের" অস্তিত্ব কোথায়? সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই ক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ অনিত্য জগৎকে অপেক্ষা করিয়াই ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ বলা হইয়াছে। সুতরাং উহা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ

"সচ্চিদানন্দই ব্রহ্ম", "সত্য, জ্ঞান ও অনন্তই ব্রহ্ম", এই সমস্ত লক্ষণকে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বলা যায়।

শ্রুতিতে ব্রহ্মকে বাক্য ও মনের অগোচর ও নির্গুণ বলা হইয়াছে; এবং ইহাও সকলেই অবগত আছেন যে, যাহা বাক্য ও মনের গোচর এবং যাহার গুণ আছে, তাহারই লক্ষণ হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহাকেই লক্ষণা দ্বারা বলা যায় সুতরাং, বাক্যমনের অগোচর নির্গুণ ব্রহ্মের তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণাদি কি প্রকারে বলা হইল?

সত্য বটে ব্রহ্ম বাক্যমনের অগোচর এবং নির্গুণ, কিন্তু গুরু জিজ্ঞাসু শিষ্যের অজ্ঞান দূর করিবার জন্য ব্রহ্মোপদেশচ্ছলে তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণাদি ব্রহ্মে আরোপ করেন মাত্র।

ব্যবহারিক সত্য—জাগ্রৎ অবস্থায় আমাদের জগতের সকল বস্তুর সহিত ব্যবহার সম্ভবপর এবং এই অবস্থায় আমাদের জগতের সহিত ব্যবহার হয় বলিয়াই, আমরা জগৎকে সত্য বলিয়া মনে করি। কারণ, জাগ্রৎ অবস্থায় যাহার সহিত আমাদের ব্যবহার সম্ভবপর হয় না তাহাকে আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করি না, ইহা আমাদের স্বভাব। জাগ্রৎ অবস্থায় ব্যবহার চলে বলিয়াই এই যে সত্য বলিয়া বোধ হয়, ইহাকে ব্যবহারিক সত্য বলে।

প্রাতিভাসিক সত্য --যখন আমরা নিদ্রিত হই, তখন বাহ্য জগতের সহিত আমাদের ব্যবহার থাকে না। কিন্তু সেই নিদ্রিত অবস্থায় যখন আমরা স্বপ্ন দেখি তখন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সে স্থলে উপস্থিত না থাকিলেও স্বপ্নাবস্থায় আমরা উহা সত্য বলিয়া জ্ঞান করি। যথা, আমি কোন নগরীতে একটি বৃহৎ অট্টালিকার কোনও সুন্দর কক্ষের মধ্যে অতি কোমল শয্যাপরে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইলাম। কিছুক্ষণ পরে স্বপ্নে দেখিতেছি যে, আমি এক নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে একটি ব্যাঘ্র দেখিতে পাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু সে ব্যাঘ্র আমাকে ধরিবার জন্য আমার দিকে অগ্রসর হইল আমি প্রাণভয়ে সবেগে দৌড়াইতে লাগিলাম, কত কণ্টক আমার দেহে বিদ্ধ হইল, আমিও তাহার যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম। সেই ব্যাঘ্রও আমাকে ধরিবার জন্য আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ লম্ফ প্রদান করিতে করিতে আসিতে থাকিল। কিছু দূর যাইয়া আমি এক স্থানে পড়িয়া যাইয়া যেমন ব্যাঘ্রের ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছি, অমনি আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইল এবং আমি দেখিলাম যে আমি কক্ষের মধ্যে সুকোমল শয্যায় শুইয়া আছি কিন্তু আমার দেহ ঘর্ম্মাক্ত ও হৃৎকম্প হইতেছে। সুন্দর কক্ষের মধ্যে সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়াও আমি স্বপ্নাবস্থায় বন, কণ্টক ও ব্যাঘ্র সত্য বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলাম এবং সেই মিথ্যা স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাঘ্রের ভয়ে এতদূর পর্য্যন্ত ভীত হইয়াছিলাম যে, জাগিয়াও আমার হৃৎকম্প দূর হয় নাই এবং আমার শরীরও ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে! যদি স্বপ্নাবস্থায় উহা মিথ্যা আমার এরূপ জ্ঞান হইত, তাহা হইলে আমার ভীত হইবার কোনও কারণ থাকিত না। ইহদ্বারা দেখা যাইতেছে যে, উহা সত্য বলিয়াই ঠিক বোধ হইয়াছিল। এই যে স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুতে সত্য বলিয়া বোধ—ইহাকে প্রাতিভাসিক সত্য বলে।

পারমার্থিক সত্য—যাহার কোন কালে অভাব হয় না, যাহা সকল অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, তাহাই নিত্য এবং যাহা নিত্য তাহাই প্রকৃত

সত্য স্বপ্নাবস্থায়, জাগ্রদবস্থার অভাব হয় ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক সত্যের অভাব ঘটে এবং সুষুপ্তি অবস্থায় স্বপ্নাবস্থার অভাব ঘটিলে প্রাতিভাসিক সত্যেরও অভাব ঘটে। এতদ্বারা যখন দেখা যাইতেছে যে, অবস্থাভেদে ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্যের অভাব হয়, তখন উহা নিত্য নহে। সুতরাং উহা ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক সত্য হইলেও পারমার্থিক সত্য নহে। যাহা যথার্থ সত্য তাহাই নিত্য এবং তাহাই পারমার্থিক সত্য। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে, জন্ম জন্মান্তরে, এবং সমাধিতে যে সচ্চিদানন্দ বর্ত্তমান থাকে, কোনও রূপ অবস্থাভেদে যাহার পরিবর্ত্তন হয় না সেই সচ্চিদানন্দই পারমার্থিক সত্য। সচ্চিদানন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সত্য। সংগুরু এই পারমার্থিক সত্যের উপদেশ করিবেন।

জগতের সকল বস্তুতে আমরা তিন প্রকার ভেদ দেখিতে পাই—স্বগত ভেদ স্বজাতীয় ভেদ ও বিজাতীয় ভেদ। যাহা কিছু অদ্বিতীয় বা অখণ্ড নহে তাহারই এই তিন প্রকার ভেদ থাকিবে এবং যাহা এক, অদ্বিতীয় ও অখণ্ড তাহাতে স্বগত স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ থাকিবে না।

স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ—একটি বৃক্ষে ও তাহার ফল এবং ফুলেতে যে পার্থক্য দেখা যায় তাহাকে স্বগত ভেদ বলে। যেমন, আম্রবৃক্ষ ও তাহার ফল আম্র। একটি বৃক্ষের সহিত অপর একটি বৃক্ষের যে প্রভেদ তাহাকে স্বজাতীয় ভেদ বলে। যেমন আম্রবৃক্ষে ও বটবৃক্ষে। একটি বৃক্ষের সহিত একটি প্রস্তর খণ্ডের যে ভেদ তাহাকে বিজাতীয় ভেদ বলে।

শ্রুতিতে আছে ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয় এবং অখণ্ড। সুতরাং ব্রহ্ম স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ রহিত।

অজ্ঞান নাশ করিবার জন্য ব্রহ্মজ্ঞ গুরু কেবল মাত্র কৃপা করিয়া প্রকৃত অধিকারী জিজ্ঞাসুকে সেই বাক্যমনের অগোচর, সর্ব্বজ্ঞ সচ্চিদানন্দময়, পারমার্থিক সত্য, অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপদেশ করিবেন।

সৎকথা।

১। পবিত্র থাকলে ধর্ম্ম একদিন না একদিন বুঝ্‌তে পার্‌বে। সত্তের কাছে ভগবান্‌ প্রকাশিত হন, যেমন অর্জ্জুনের কাছে শ্রীকৃষ্ণ হয়েছিলেন।

২। সৎসঙ্গ ছাড়্‌তে নেই। সৎসঙ্গ ছাড়্‌লেই দুর্ব্বুদ্ধি হয় ও শয়তান এসে ঘাড়ে চাপ্‌তে পারে।

৩। সদ্‌গুরু লাভ মহাভাগ্যের কথা ও ভগবানের কৃপা চাই। সদ্‌গুরুর কৃপা পেলে সদ্গতি হয়। ত্যাগীর নিকট দীক্ষা লইতে হয়।

৪। যারা ধর্ম্ম মান্‌বে, ভগবান্‌কে চাইবে তাদের মেজাজই আলাদা। এক রকমের লোক আছে, ভাল কথা বল্‌লেও মান্‌বে না নিজের গোঁতে চল্‌বে নিজেও কষ্ট পাবে অপরকেও কষ্ট দেবে।

৫। বরাবর গুরুর উপর, সাধুর, উপর, ঠাকুরের উপর ভক্তি শ্রদ্ধা বিশ্বাস থাকা কঠিন। যার থাকে সে ভাগ্যবান্‌ পুরুষ—তার উপর ভগবানের খুব দয়া বল্‌তে হবে।

৬। যারা একটা সত্যকথা বল্‌তে পারে না, তারা আবার ধ্যান জপ করবে কি? যারা ধ্যান কর্‌তে পার্‌বে না, তারা গরীব দুঃখীকে যতটুকু পারে সাহায্য করুক—সেবা করুক। তাতে ভগবান্‌ খুসী হন।

৭। নিজের মায়া নিয়েই মানুষ অস্থির, আবার পরের মায়া নিতে চায়!

৮। যে ভগবানকে ডাক্‌বে, ভক্তি কর্‌বে, তাঁর শরণাগত হয়ে থাক্‌বে সে বুদ্ধিমান্‌। তাঁকে অন্তরে অন্তরে নিজের অবস্থা জানাও, তিনিই সব ঠিক করে দেবেন। তাঁকে জান্‌তে চাইলে তিনিই কৃপা করে জানিয়ে দেবেন।

৯। অর্থের দ্বারা ভগবান্‌ লাভ হয় না—ঘর বাড়ী হয়, যাগযজ্ঞ হয়। ভগবান্‌ হলেন প্রাণের জিনিষ।

১০। রূপেয়া, জরু, জমিন্ এই তিনটী হল বন্ধনের কারণ। এ তিনটী না ছাড়্‌লে ভগবানকে পাওয়া যাবে না।

১১। লোককে দুঃখ দেওয়া মহাপাপ—যতটুকু পার তাঁর কৃপায় দুঃখ দূর কর।

১২। সময়ে সব হয়, অসময়ে কিছু হয় না। ব্যস্ত হলে চল্‌বে না, ধৈর্য্য ধরে থাক্‌তে হয়। কোন প্রতিকূল অবস্থায় পড়্‌লে ধৈর্য্য ধরে থাকতে হয়। ঐ অবস্থায় ভগবানের উপর বিশ্বাস রেখে স্থির থাক্‌তে পার্‌লে পরে কল্যাণ হবেই হবে।

১৩। পরের দোষ দেখা মহাপাপ—কর্ম্মহীন হলে পরের দোষ সহজেই নজরে আসে।

১৪। মানুষ আপনার কর্ম্মে আপনিই ভোগে। মনে করে লোককে ভোগাব কিন্তু নিজেই ভোগে। অপরকে ঠকিয়ে মনে করে আমি জিতেছি কিন্তু সে নিজেই ঠকেছে। যে তা মনে না করে সেই বুদ্ধিমান্ ঠকানো বুদ্ধি ভাল নয়।

১৫। কত সংযম কর্‌তে কর্‌তে ভগবানের দয়া হয়। সংযম না কর্‌লে কি হয়?

১৬। ভিক্ষা করে খাওয়ার উদ্দেশ্য কি?—মান অপমান, লোকলজ্জা সব কাকবিষ্ঠার মত ত্যাগ কর্‌তে হবে। ভিক্ষা করে খেয়ে ভগবানের নাম কর, তাহলে তাঁর দয়া হবে।

১৭। মানুষ উপকার পেয়ে উপকার ভুলে যায় তাই ত দুর্দ্দশা! যে উপকার পেয়ে উপকার মনে রাখে সেই মানুষ। যার দ্বারা যে বিষয় উন্নতি হয় তাকে কখনও ভোলা উচিত নয়।

মথুরা অঞ্চলে জলপ্লাবন।

গত মাসের সংখ্যায় আমরা মথুরা অঞ্চলে যে ভয়ানক জলপ্লাবন হইয়াছে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। পরে তথাকার অবস্থা সম্বন্ধে গত ২৬শে ও ২৮শে ডিসেম্বর আমরা বৃন্দাবন হইতে যে পত্র পাইয়াছি তাহা নিম্নে প্রকাশিত করিলাম।

"...আপনার প্রেরিত ৫০৲ টাকা পাইয়াছি। বৃন্দাবন হইতে আর ৭৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছি। মথুরার ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবিনাশ বাবু এবং বৃন্দাবনের ডাক্তার শ্রীপ্রমথ নাথ গোস্বামী অনেক গুলি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিয়াছেন। কলিকাতা হইতে ৮ খানি ছোট কাপড় ও কিছু ঔষধও পাইয়াছি। গুজরাটের ষ্টেসন মাষ্টার ২০৲ টাকা পাঠাইয়াছেন। বর্ষাণা অঞ্চলে জল কমিয়া যাওয়ায় ব্যাধির প্রকোপ অনেক কমিয়াছে। সেই জন্য বর্ষাণার কেন্দ্রটী গোবর্দ্ধনে লইয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছি। এই অঞ্চলটীই এখন বিশেষ আক্রান্ত দেখিতেছি। গোবর্দ্ধন হইতে আশ পাশের ১০।১২টা গ্রামকে সাহায্য করিতে পারা যাইবে।

আপনি কুইনাইনাদি বাবদে কিছু টাকা পাঠাইয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। প্রেমমহাবিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট হইতে ১৫৸৴৫ এবং কয়েক জায়গায় পত্রাদি লিখিয়া ১৯৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছি। বন্যার জল প্রায় দুই ফুট কমিয়াছে তাহাতে অনেক ক্ষেত জাগিয়াছে; চাষারা প্রাণপণে চাষবাস আরম্ভ করিয়াছে—এবং গম বুনিতেছে। কেবল যাহাদের বলদ মরিয়া গিয়াছে বা যাহারা বীজের গম খাইয়া ফেলিয়াছে অথচ হাতে টাকা নাই, তাহারাই কাঁদিতেছে। জল কমিতে আরম্ভ করায় অনেক গ্রামের সুবিধা হইয়াছে। বর্ষাণা অঞ্চলের জল প্রায় কমিয়া আসিল, নন্দগ্রামের জল শুকাইয়া গিয়াছে, বর্ষাণা কেন্দ্রের সেবকেরা গ্রামে গ্রামে গিয়া ৭ দিনের ঔষধাদি দিয়া কেন্দ্রে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এ অঞ্চলের

লোকেরা কেহ সেবা করিতে আসিলে ভয় পায়! কারণ, তাহাদের কেহ কখন ভালবাসে নাই, নিঃস্বার্থভাবে যে কেহ কথা কহে এরূপ তাহারা কল্পনায় আনিতে পারে না। কষ্ট স্বীকার করিয়া জল কাদা ভাঙ্গিয়া ঘরে ঘরে ঔষধ দিয়া বেড়াইতেছে অথচ তাহাদের কোন মতলব নাই, এ কথা তাহারা বিশ্বাস করিতেই পারে না! তাই অনেক করিয়া বুঝাইয়া তবে ঔষধ দিয়া আসিতে হইতেছে। যাহাদের বলদ মরিয়াছে তাহাদের বলদ এবং যাহাদের গমের বীজ নাই তাহাদের গম দিয়া এই সময়ে সাহায্য করিতে পারিলে, অনেক জমি পতিত থাকিয়া যাইত না। গত কল্য গোবর্দ্ধনের দিকের অবস্থা দেখিতে গিয়াছিলাম, এ দিকে জল অতি সামান্যই কমিয়াছে, কিন্তু তাহাতেই অনেক ক্ষেত্র জাগিয়াছে। মথুরার সেবাসমিতির লোকেরা তাঁহাদের গোবর্দ্ধনস্থ কেন্দ্র বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন—শুনিলাম তাঁহাদের সেবকেরা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিন চার দিন পরে অন্য লোক আসিবে। তাঁহাদের সেবক কেন্দ্র হইতে আগত একটী লোকের সহিত দেখা হইল, তাঁহার মুখে শোক এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের খবর জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম যে, সকলেরই সর্দ্দি কাশ লাগিয়া আছে। অনেকের গাল গলা ফুলিয়াছে। জ্বর খুব বেশী না হইলেও এখনও আছে, নিউমোনিয়া সংযুক্ত জ্বরও অনেক! দারুণ শীত পড়িয়াছে, চারিদিকে জল থাকায় শীত আরও বেশী হইয়াছে। বেলা ১০।টার পূর্ব্বে কেহই আগুন ছাড়িয়া চলিতে পারে না। চাষীরা এই সময় আহারাদি করিয়া ক্ষেতে যায়, আর সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসে। গোবর্দ্ধনের Damper Hospitalএর চারিদিকে এখনও এক মানুষভোর জল।

বন্যাপীড়িত লোকদের সাহার্য্যকল্পে যিনি যাহা দান করিতে চান, তাহা ম্যানেজার, 'উদ্বোধন, ১নং মুখার্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা —এই ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে।

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি)

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বামিজীর মহাসমাধি।

(সিষ্টার নিবেদিতা)

১৯০০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে স্বামিজী যে সকল বন্ধুর সহিত মিসরে ভ্রমণ করিতেছিলেন তাঁহাদের নিকট হইতে সহসা বিদায় লইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যাঁহারা এই সময়ে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন বলেন, "তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইত যেন তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যখন তিনি কাইরোর নিকটবর্ত্তী পিরামিডসমূহ, নারীমুখবিশিষ্ট সিংহমূর্ত্তিটী (the Sphinx) এবং অন্যান্য বিখ্যাত দৃশ্যগুলি দেখিতেছিলেন তখন বাস্তবিকই তিনি যেন জানিতে পারিয়াছিলেন যে তিনি অভিজ্ঞতারূপ গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠাগুলি উল্টাইতেছেন। ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নসমূহ আর তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীসকলকে স্পর্শ করিতে পারিত না।

অন্যদিকে আবার তিনি তদ্দেশবাসিগণকে সর্ব্বদা 'নেটিভ' নামে অভিহিত হইতে শুনিয়া এবং নিজেকে ঐ সময়ে তাহাদিগের পরিবর্ত্তে বরং বিদেশীয়দিগের সহিত একশ্রেণীভুক্ত হইতে দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। বরং এই হিসাবে তিনি যেন মিসর অপেক্ষা কনষ্ট্যান্টিনোপল দর্শন করিয়া অধিক প্রীত হইয়াছিলেন. কারণ তাঁহার জীবনের শেষভাগে তিনি বার বার একজন বৃদ্ধ তুর্কীর কথা

বলিতেন, সে ব্যক্তির তথায় একটী হোটেল ছিল, এবং সে এই বিদেশী যাত্রীদলকে—যাহাদের মধ্যে একজন ভারত হইতে আগত—পয়সা না লইয়া খাওয়াইবার জন্য বিশেষ জেদ করিয়াছিল। সত্য সত্যই আধুনিক বিষয়বুদ্ধিবর্জ্জিত প্রাচ্যদেশীয়দিগের নিকট সকল ভ্রমণকারীই তীর্থযাত্রী, এবং সকল তীর্থযাত্রীই অতিথি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

পরবর্ত্তী শীতকালে তিনি ঢাকায় গমন করিলেন এবং অনেক দলবল লইয়া ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়া আসামের একটী তীর্থে স্নান করিতে গেলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য এই সময়ে কত দ্রুত ভগ্ন হইতেছিল, তাহা যাঁহারা তাঁহার খুব নিকটে থাকিতেন তাঁহারাই জানিতেন। আমরা দূরে ছিলাম বলিয়া কেহই সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করি নাই। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল তিনি বেলুড়ে যাপন করিলেন—এবং 'বাল্যকালে বৃষ্টি পড়ার যেরূপ শব্দ শুনিতেন সেই শব্দ পুনরায় শুনিবার জন্য আশা করিতে লাগিলেন!' আবার যখন শীত আসিল তখন তিনি এত পীড়িত হইলেন যে, তাঁহাকে শয্যাগত হইতে হইল।

তথাপি ১৯০২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী, এই দুইমাস তিনি আরও একটী তীর্থযাত্রা করিয়া আসিলেন। এবার তিনি প্রথমে বুদ্ধগয়া এবং তৎপরে বারাণসী দর্শন করেন। তাঁহার সকল ভ্রমণের উহাই উপযুক্ত অবসান হইয়াছিল। তাঁহার শেষ জন্মদিনের প্রাতঃকালে তিনি বুদ্ধগয়ায় পৌঁছিলেন; তথাকার মোহন্তজীর আদরযত্নের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। এখানে, এবং পরে কাশীতেও তিনি এত পরিমাণে এবং স্বাভাবিকভাবে নিষ্ঠাবান হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রীতি ও বিশ্বাস-ভাজন হইলেন যে, তিনি নিজেই লোকদের হৃদয় কতটা অধিকার করিয়া লইয়াছেন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এখন যেমন বুদ্ধগয়া তাঁহার শেষ তীর্থদর্শন হইল, তেমনি উহাই তিনি সর্ব্বপ্রথমে দর্শন করিয়াছিলেন। আর উহার কয়েক বৎসর পরে তিনি কাশী-

ধামেই একজনের নিকট বিদায় লইবার কালে বলিয়াছিলেন, "যতদিন না আমি সমাজের উপর বজ্রের ন্যায় পড়িতেছি ততদিন আর এই স্থান দর্শন করিব না।"

স্বামিজীর কলিকাতা প্রত্যাগমনের পর তাঁহার দূরদেশস্থিত বহু শিষ্য তাঁহার নিকট আসিয়া সমবেত হইলেন। যদিও তাঁহাকে পীড়িত দেখাইতেছিল, তথাপি ইঁহাদের মধ্যে কেহই সম্ভবতঃ বুঝিতে পারেন নাই যে, অন্তিম সময়ের আর অধিক বিলম্ব নাই। এখনও সাগরবক্ষে অর্দ্ধ-পৃথিবী অতিক্রম করিয়া লোকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে লাগিল, এবং পরস্পরের মধ্যে বিদায় গ্রহণাদি চলিতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, কাশীধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই তাঁহার প্রথম কথোপকথন এই সম্বন্ধে হইল যে, যাঁহারা তাঁহার কাছে থাকেন তাঁহাদিগকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে দিবার জন্য, তাঁহার নিজের কিয়ৎকালের জন্য সরিয়া থাকা আবশ্যক।

তিনি বলিলেন, "কত দেখা যায় যে, মানুষ দিবারাত্র তাহার শিষ্যগণের নিকটে থাকিয়া তাহাদিগকে মাটী করিয়া ফেলে! একবার লোকগুলি তৈয়ার হইয়া যাইবার পর ইহা বিশেষ প্রয়োজন যে, তাহাদের নেতা তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিবেন, কারণ তাঁহার অনুপস্থিতি ব্যতীত তাহারা নিজেদের বিকাশ সাধন করিতে পারিবে না!"

বিদেশীয়গণের সহিত যে সংস্পর্শ তাঁহার প্রৌঢ়দশায় অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিয়াছিল, তাহারই সর্ব্ব শেষেরটীর ফলে তিনি সহসা ধর্ম্মে গার্হস্থ্য-জীবনে নিষ্ঠার উচ্চাদর্শসমূহের কি প্রয়োজন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বোপরি শুধু কথা ও কার্য্যে নহে, আন্তরিক ভাবে ও প্রাণপণে চিন্তাতেও, নিজেদের ব্রতগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করেন বলিয়া, সামাজিক জীবনের আদর্শসমূহ তাঁহাদের নিকট সচরাচর নিতান্ত অসার পদার্থের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। স্বামিজী সহসা দেখিলেন যে, যে জাতি বিবাহিত

জীবনের সম্বন্ধকে পবিত্র জ্ঞান করে না, সে জাতির মধ্যে কখনও নিষ্ঠাবান যাজককুল বা উচ্চদরের সন্ন্যাসিসম্প্রদায় জন্মিবার আশা নাই।

যেখানে বিবাহবন্ধন সম্পূর্ণ অবিচ্ছেদ্য বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে, কেবল সেইখানেই দাম্পত্যজীবনেতর পথগুলিতেও লোকে নিষ্ঠার সহিত চলিতে পারে। সামাজিক আদর্শকে পবিত্র জ্ঞান করিলেই, যাহা সমাজবন্ধনের উর্দ্ধে অবস্থিত সেই সন্ন্যাসজীবনকে পবিত্র জ্ঞান করা সম্ভবপর হয়।

এই অনুভূতিই তৎপ্রচারিত দর্শনের শীর্ষবিন্দুস্বরূপ। ইহা হইতেই মহামায়ার খেলার শেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ন্যাস-জীবনকে সম্ভবপর করিবার জন্য সমগ্র সমাজ, তাহার উন্নতি-চেষ্টা ও তদ্বিষয়ে সিদ্ধি—এ সকলের প্রয়োজন। সনাতনধর্ম্মে নিষ্ঠাবান সাধুরও যেমন প্রয়োজন, নিষ্ঠাবান গৃহস্থেরও তেমনি প্রয়োজন। বিবাহবন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখা এবং সন্ন্যাসব্রত অক্ষুণ্ণ রাখা—এ দুইটাই একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। সমাজে উন্নতচরিত্র লোক না থাকিলে শক্তিশালী সন্ন্যাসিবৃন্দের উদ্ভব হইতে পারে না। গার্হস্থ ব্যতীত সন্ন্যাসজীবন হয় না, ঐহিক ব্যতীত পারমার্থিক জীবন হয় না; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সবই এক, তথাপি ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহারও এতটুকু অঙ্গ-হানি হইতে দিলে চলিবে না, কারণ প্রত্যেক পরমাণুর মধ্য দিয়া সেই ভূমাই প্রকাশ পাইতেছেন। ইহা তাঁহারই পুরাতন বাণী, একটী নূতন আকারে মাত্র। তিনি এবং তৎপূর্ব্বে তাঁহার আচার্য্যদেব যেমন পুনঃ পুনঃ বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, ভাবাবেশ অপেক্ষা চরিত্র খাঁটী হওয়াই ভগবৎ সেবার পক্ষে অধিক উপযোগী। যে জিনিসটাকে রাখিবার ক্ষমতা নাই, তাহার ত্যাগে কি বাহাদুরী?

তাঁহার সম্মুখে নানা কার্য্য সর্ব্বদাই আসিয়া পড়িত; সেই সকল কার্য্যের খাতিরে স্বামিজী ১৯০২ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে একবার তাঁহার স্বাস্থ্য শোধরাইয়া লইবার বিশেষ চেষ্টা করিলেন, এমন কি, তিনি

কবিরাজী চিকিৎসা সুরু করাইলেন, যাহাতে এপ্রেল, মে ও জুন মাস ভোর তিনি এক বিন্দু ঠাণ্ডা জল পান করিতে পাইতেন না। ইহাতে তাঁহার শরীরের কতদূর উপকার হইয়াছিল, বলা যায় না কিন্তু ঐ কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়া যাইবার সময় তিনি তাঁহার ইচ্ছাশক্তির বল অক্ষুণ্ণ আছে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছিলেন।

জুন মাস শেষ হইলে কিন্তু তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। দেহত্যাগের পূর্ব্ব বুধবারে তিনি সমীপস্থ একজনকে বলিয়াছিলেন, "আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছি। একটা মহাতপস্যা ও ধ্যানের ভাব আমার মধ্যে জাগিয়াছে, এবং আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছি।"

আর আমরা যদিও স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, তিনি অন্ততঃ তিন চারি বৎসরের পূর্ব্বে আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, তথাপি জানিলাম যে তাঁহার কথাগুলি সত্য। এই সময়ে জগতের খবরা-খবর শুনিয়া তিনি নামমাত্র উত্তর প্রদান করিতেন। সাময়িক কোন সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করা এখন অনর্থক হইয়া পড়িল। তিনি শান্ত ভাবে বলিতেন "তোমার কথা ঠিক হইতে পারে কিন্তু আমি আর এ সকল ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিতে পারি না। আমি মৃত্যুর দিকে চলিযাছি!"

একবার কাশ্মীরে একটী অসুখের পর আমি তাঁহাকে দুই খণ্ড পাথর উঠাইয়া লইয়া বলিতে শুনিয়াছিলাম, "যখনই মৃত্যু আমার সন্নিকট হয়, আমার সকল দুর্ব্বলতা চলিয়া যায়। তখন আমার ভয় বা সন্দেহ বা বাহ্যজগতের চিন্তা এসব কিছুই থাকে না। আমি শুধু নিজেকে মৃত্যুর জন্য তৈয়ার করিতে থাকি। তখন আমি এই রকম শক্ত হইয়া যাই—" তিনি দুই হাতে পাথর দুই-খানিকে পরস্পর ঠুকিলেন—"কারণ আমি শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়াছি।"

নিজের জীবনের ঘটনাসমূহ তিনি এত কম উল্লেখ করিতেন যে,

কথাগুলি আমরা কদাপি বিস্মৃত হই নাই। আবার সেই ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্ম কালেই তিনি অমরনাথ গুহা হইতে ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন যে. তিনি তথায় অমরনাথের নিকট ইচ্ছামৃত্যু বর লাভ করিয়াছেন। ইহাতে যেন এই কথাই নিশ্চয় বলিয়া জানা গিয়াছিল যে তাঁহাকে সহসা মৃত্যু আক্রমণ করিবে না এবং ইহার সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের "ও নিজেকে জান্‌তে পার্‌লে আর এক মুহূর্ত্তও দেহ রাখবে না" এই ভবিষ্যদ্বাণীর এত চমৎকার ঐক্য ছিল যে আমরা এ সম্বন্ধে সকল চিন্তা এককালে দূর করিয়া দিয়াছিলাম। এমন কি, তাঁহার এই সময়ের নিজ মুখের গম্ভীর বহ্বর্থ বাক্যগুলিও ঐ কথা মনে পড়াইয়া দিতে পারিল না।

এতদ্ভিন্ন, তাঁহার যৌবনের সেই অদ্ভুত নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভের কথাও আমাদের মনে ছিল; আমরা ইহাও জানিতাম যে উক্ত সমাধি অন্তে তাঁহার আচার্য্যদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "এই তোমার আম, আমি উহা বাক্সে চাবি দিয়া রাখিলাম। তোমার কার্য্য শেষ হইলে আবার তুমি উহা খাইতে পাইবে!"

যে সাধু আমাকে এই গল্পটী বলিয়াছিলেন তিনি ঐসঙ্গে আরও বলিয়াছিলেন, "আমরা এখন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি। ঐ সময় নিকটবর্ত্তী হইলে আমরা নিশ্চিত জানিতে পারিব। কারণ তিনি আমাদিগকে বলিবেন যে, তিনি আবার তাঁহার আম খাইতে পাইয়াছেন।"

ঐ সময়ের কথা স্মরণ করিলে এখন এই ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই যে, কত রকমের ঐ প্রত্যাশিত ইঙ্গিত আমরা পাইয়াছিলাম। কিন্তু তখন আমরা উহা শুনিয়াও শুনি নাই, বুঝিয়াও বুঝিতে পারি নাই।

তিনি সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতা ও আসক্তিকে দূরে পরিহার করিলেও যেন একটী বিষয়ে আমরা তাঁহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিয়াছিলাম। যাহা চিরকাল তাঁহার নিকট প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর ছিল, সেই জিনিসটী এখনও তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীসকল স্পর্শ করিতে পারিত।

দেহান্তের অব্যবহিত পূর্ব্ব রবিবারে তিনি জনৈক শিষ্যকে বলিলেন, "দেখ, এই সকল কার্য্যই চিরকাল আমার দুর্ব্বলতার স্থল! যখন আমি ভাবি যে, ঐগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে, তখন আমি একেবারে হতাশ হইয়া পড়ি!"

ঐ সপ্তাহেরই বুধবারে—সে দিন একাদশী—তিনি নিরম্বু উপবাস করিলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত শিষ্যকে নিজ হাতে প্রাতঃকালীন আহারীয় দ্রব্যসকল পরিবেশন করিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক জিনিষটী—কাঁটালের বিচিসিদ্ধ, আলুসিদ্ধ, সাদা ভাত, এবং বরফ দিয়া ঠাণ্ডা করা দুধ—দিবার সময় তৎসম্বন্ধে কৌতুকসহকারে গল্প করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে ভোজন সমাপ্ত হইলে তিনি নিজে হাতে জল ঢালিয়া দিলেন এবং তোয়ালে দিয়া হাত মুছাইয়া দিলেন।

স্বভাবতঃই শিষ্য প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছিলেন, "স্বামিজী এ সকল আমারই আপনার জন্য করা উচিত, আপনার আমার জন্য নহে!" কিন্তু তাঁহার উত্তর অতি বিস্ময়জনক গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হইল—"ঈশা তাঁহার শিষ্যগণের পা ধুইয়া দিয়াছিলেন!"

তদুত্তরে শিষ্যের মুখে আসিতেছিল, 'কিন্তু সে ত শেষ সময়ে!' কিসে যেন কথাগুলিকে আটকাইয়া দিল—তাহা আর বলা হইল না। ভালই হইয়াছিল। কারণ এখানেও শেষ সময় সমাগত হইয়াছিল।

এই কয়দিন স্বামিজীর কথাবার্ত্তা ও চালচলনে কোন বিষাদ-গম্ভীর ভাব ছিল না। পাছে তিনি অতিরিক্ত ক্লান্তি বোধ করেন তজ্জন্য আমরা বিশেষ চিন্তান্বিত থাকিতাম, এবং কথাবার্ত্তা ইচ্ছাপূর্ব্বক অতি লঘু বিষয়সকলেই নিবদ্ধ রাখা হইত। তাঁহার পালিত পশুগণ, তাঁহার বাগান, নানাবিধ পরীক্ষা (experiments), পুস্তক, এবং দূরস্থিত বন্ধুবর্গ—এই সকলেরই প্রসঙ্গ হইত। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও আমরা ঐ সময়ে একটী জ্যোতির্ম্ময় সত্তা অনুভব করিতাম—তাঁহার স্থূল দেহ যেন উহারই ছায়া বা প্রতীক মাত্র বলিয়া বোধ হইত। তথাপি

কেহই অতশীঘ্র সব শেষ হইয়া যাইবে, এ কথা বুঝিতে পারেন নাই—বিশেষতঃ সেই ৪ঠা জুলাই শুক্রবারে—কারণ সে দিন তাঁহাকে বহু বৎসর যাবৎ তিনি যেমন ছিলেন তদপেক্ষা অধিক সুস্থ ও সবল দেখা গিয়াছিল এবং তজ্জন্য ঐ দিনটীকে বড় শুভ দিন বলিয়াই মনে হইয়াছিল।

ঐ দিন তিনি অনেক ঘণ্টাকাল রীতিমত ধ্যান করিয়াছিলেন। তৎপরে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটী সংস্কৃত ক্লাস করিয়াছিলেন। শেষে মঠের ফটক হইতে দূরবর্ত্তী বড় রাস্তা পর্য্যন্ত বেড়াইয়াও আসিয়াছিলেন।

যখন তিনি বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তখন সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে। তিনি নিজের ঘরে গিয়া গঙ্গার দিকে মুখ ফিরিয়া ধ্যান করিতে বসিলেন। ইহাই শেষ ধ্যান। তাঁহার আচার্য্যদেব প্রথম হইতেই যে মুহূর্ত্তের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন সেই মুহূর্ত্ত এখন উপস্থিত হইয়াছিল। আধঘণ্টা কাটিয়া গেল; তৎপরে সেই ধ্যানরূপ পক্ষে ভর করিয়া তাঁহার আত্মা দেশকালের সীমা ছাড়াইয়া, যথা হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, সেই পরম ধ্যানে চলিয়া গেল; শরীরটা ভাঁজ করা পোষাকের মত পৃথিবীতেই পড়িয়া রহিল।

বেদান্ত-প্রচার।

(ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্বেতকেতু উপাখ্যান।)

(স্বামী শুদ্ধানন্দ)

১। স্বামীজি ও বেদান্তপ্রচার।

স্বামী বিবেকানন্দ যে নর-নারায়ণের সেবাধর্ম্মের একজন বিশিষ্ট প্রচারক ও উৎসাহদাতা ছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রমগুলির কল্যাণে, রামকৃষ্ণ মিশন অনুষ্ঠিত দুর্ভিক্ষ-জলপ্লাবনাদি কালে বিস্তৃত সেবাধর্ম্মের আয়োজনে সর্ব্বসাধারণে তাহা বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে তিনি যে একজন বিশিষ্ট স্বদেশহিতৈষী ছিলেন এবং জাতীয় ভাবের প্রবল উদ্বোধক ছিলেন, তাহাও কতিপয় বর্ষ হইতে সাধারণে জানিয়াছে।

স্বামীজির প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। তিনি মুখ্যতঃ দক্ষিণেশ্বর-নিবাসী ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন বিশিষ্ট ত্যাগী শিষ্য ছিলেন এবং তদীয় গুরুর উপদেশরাজি নিজ জীবনে সাধনা দ্বারা সাধ্যমত উপলব্ধি করিয়া প্রাচীন শাস্ত্র ও আধুনিক বিজ্ঞান সাহায্যে এবং নানাদেশে দীর্ঘ ভ্রমণজনিত অভিজ্ঞতা সহায়ে উহাদের ভিতর নিজের ছাঁচ দিয়া সমগ্র জগতে প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার উপদিষ্ট সেবাধর্ম্ম ও স্বদেশহিতৈষিতার ভাব সর্ব্বসাধারণে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছে —একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বুঝিতে হইবে, তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য সর্ব্বসাধারণের ভিতর যথার্থ ধর্ম্মতত্ত্ব সাধনা দ্বারা উপলব্ধি করিবার উপদেশের ঐ দুইটী গৌণ উপায় মাত্র। আজকাল নানাস্থানে সমাজসেবা, দেশের কল্যাণ প্রভৃতি যে সকল বিষয় বহুল পরিমাণে আলোচিত হইতেছে এবং যাহাদের সমর্থনে স্বামীজির উপদেশসমূহ উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাদের সকল স্থলে স্বামীজির উদ্দিষ্ট মূল লক্ষ্য যে আধ্যাত্মিক উন্নতি

তাহার দিকে সবিশেষ দৃষ্টি আছে কি না বলিতে পারি না। স্বামীজির ভাব ছিল—পতিত, দুঃস্থ, দুর্ভিক্ষপীড়িত, রুগ্ন নরনারীকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করিতে করিতে সর্ব্বভূতে নারায়ণ উপলব্ধি করিতে হইবে। বাহিরে শুধু একটা প্রকাণ্ড হাঁসপাতাল খাড়া করিলে স্বামীজির উদ্দিষ্ট সেবাধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইবে না—দেখিতে হইবে, সেবকগণের চরিত্র সেবাদ্বারা উন্নত হইতেছে কি না, তাঁহাদের ক্রমশঃ অহংবোধ নাশ হইতেছে কি না, সেবার জন্য যে নিষ্ঠা, যে স্বার্থত্যাগ, যে আত্যন্তিকতা প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের মধ্যে বিকশিত হইয়া ক্রমে তাঁহাদিগকে মুক্তির উন্মুখ করিতেছে কি না। কর্ম্মযোগের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া ক্রমে নৈষ্কর্ম্ম্যের পথে তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন কি না। ক্রমে সেবকেরা ধ্যানধারণা-পরায়ণ ব্রহ্মচর্য্যব্রত সাধকে পরিণত হইতেছেন কি না। নতুবা সেবা-ধর্ম্ম ব্যভিচারে ও হুজুগে এবং আন্তরিকতাশূন্য বাহ্য অনুষ্ঠান মাত্রে পর্য্যবসিত হইবার বিলক্ষণ আশঙ্কা রহিয়াছে।

স্বদেশহিতৈষিতা সম্বন্ধেও এ কথা প্রযুজ্য—উহাও এক প্রকারের সেবা। স্বদেশসেবকগণের চরম আদর্শ বিশ্বপ্রেমের দিকে যেন বিশেষ লক্ষ্য থাকে। স্বামীজি ঐ বিশ্বপ্রেমে প্রেমিক ছিলেন, নতুবা তিনি পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম্মপ্রচারে যাত্রা কখনও করিতেন না। এই আদর্শের দিকে লক্ষ্য না রাখিলে স্বদেশহিতৈষিতা পরবিদ্বেষে পরিণত হইবার বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে।

যাহা হউক, অদ্য আমরা এই প্রবন্ধে স্বামীজির অভিপ্রেত আর একটী কার্য্যের দিকে সাধারণের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিতে চাই। উহাও তৎকথিত মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের একটী গৌণ উপায় মাত্র। এবং এইগুলি ব্যতীতও তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা হইতে উদ্ভাবিত মুখ্য উদ্দেশ্যসাধনের বহু গৌণ উপায় তাঁহার বক্তৃতাসমূহে উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আজ আমরা এইটীর দিকেই সাধারণের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিতে চাই। তাহা এই—সর্ব্বসাধারণমধ্যে বেদান্তবিদ্যার বিস্তার।

বেদান্ত বলিতে উপনিষৎসমূহ বুঝাইয়া থাকে এবং স্বামীজিও ঐ অর্থেই বেদান্ত শব্দ ব্যবহার করিতেন। এই উপনিষদ্‌ই আমাদের সমুদয় দর্শনের, পুরাণ তন্ত্রাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের এবং আমাদের সমাজপ্রচলিত বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মূলভিত্তি। বেদান্ত বলিতে আমাদের বাঙ্গালা দেশে সচবাচর শাঙ্কর দর্শন বুঝাইয়া থাকে - ব্যাসসূত্র অধ্যয়ন করিতে গিয়াও সাধারণতঃ শাঙ্কর ভাষ্য অবলম্বন করা হয়। কিন্তু ব্যাসসূত্রের মূল ভিত্তি যে উপনিষদ্, তাহার দিকে কয়জনের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়? উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিতে যাইয়াও মুখ্যতঃ শাঙ্কর ভাষ্য অবলম্বিত হয়, মূল উপনিষদের দিকে বড় দৃষ্টি থাকে না।

আমরা শাঙ্কর ভাষ্যেব নিন্দা করিতেছি না, কিন্তু ভাষ্যের সহিত মূলকে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত করিয়া রাখিবারই প্রতিবাদ করিতেছি। ইহাতে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়। বেদান্তকে ভক্তিবিরোধী শুষ্কজ্ঞান-প্রধানরূপে মাত্র উপস্থাপিত করা হয়। সেই জন্যই স্বামীজি বলিতেন, ভাষ্যকারবিশেষের অনুসরণ না করিয়া মূল গ্রন্থের অক্ষরার্থ বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত।

আমাদের দেশে শাস্ত্রগ্রন্থাদির ব্যাখ্যা॰ পণ্ডিতবর্গের ভাবার্থ দিবার প্রবৃত্তি বড় প্রবল। ভাবার্থের আবরণে নিজ নিজ রুচিসঙ্গত অথচ মূলবিরুদ্ধ কত বিষয় চলিয়া যায়, তাহার দিকে ভাবার্থকারগণের খেয়াল বড় থাকেনা। সেই জন্য স্বামীজি ভাবার্থের পরিবর্ত্তে অক্ষরার্থের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বলিতেন। আমার বেশ স্মরণ আছে, দেহত্যাগের দিনে আমায় শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা আনিয়া 'সুষুম্নঃ সূর্য্য-রশ্মিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র ও উহার মহীধরকৃত ব্যাখ্যা পাঠ করিতে বলেন। আমি পাঠ শেষ করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "এখানে মহীধরের ব্যাখ্যা আমার সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। তোরা পংক্তির অর্থ লাগাবার বিশেষ চেষ্টা করবি।"

অনেকের ধারণা, উপনিষদ্ অতি কঠিন গ্রন্থ, উহার অর্থ ভাষ্য-সাহায্য ব্যতীত বুঝা অসম্ভব। ইহা আংশিক ভাবে সত্য হইলেও

সম্পূর্ণ সত্য নহে। অনেক উপনিষদের অনেক স্থলের আক্ষরিক অনুবাদেই অর্থ বেশ বোধগম্য হয়। যে সকল স্থলে হয় না, সে সকল স্থলে ভাষ্যের দ্বারা কখনও কখনও বেশ সাহায্য হয়, কখনও কখনও চৈতন্যদেবের ভাষায় ভাষ্যমেঘে মূলার্থরূপ সূর্য্যকে আরও প্রচ্ছন্ন করে। যাহা হউক, আমরা এক্ষণে স্বামীজি এই উপনিষৎ প্রচারার্থে কিরূপ আগ্রহান্বিত ছিলেন, তাঁহার বক্তৃতা হইতে কতক কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইব, পরে কি উপায়ে ঐ গুলি প্রচারিত হইতে পারে. তৎসম্বন্ধে আমাদের মনে যে উপায়গুলি সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, তাহাদের নির্দ্দেশ করিব এবং পরে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে শ্বেতকেতুর উপাখ্যানের যথাসম্ভব আক্ষরিক অনুবাদ সমুদয়টী নমুনাস্বরূপ দিয়া পাঠকবর্গকে মূল উপনিষদের সহিত কতকটা পরিচিত করিতে চেষ্টা করিব। অতঃপর উহার মধ্যে অস্পষ্ট অংশগুলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়া উক্ত উপাখ্যান হইতে কি কি বিষয় শিক্ষা করা যাইতে পারে, তাহার উল্লেখ করিব। অবশেষে সংক্ষেপে আধুনিক জীবনে উক্ত উপদেশাবলির প্রয়োজনীয়তা দেখাইব।

২। বেদান্ত বিস্তার সম্বন্ধে স্বামীজির কয়েকটী কথা।

শাস্ত্রীয় তত্ত্বসমূহ সর্ব্বসাধারণের ভিতর বিস্তার সম্বন্ধে স্বামীজি একস্থলে বলিতেছেন,—

"যে ধর্ম্মতত্ত্বগুলি আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে নিবদ্ধ রহিয়াছে, যাহা এখন অতি অল্প লোকের অধিকারে রহিয়াছে। ভারতের মঠ ও অরণ্যসমূহে গুপ্তভাবে রহিয়াছে, সেইগুলিকে যে সকল লোকের হস্তে গুপ্তভাবে রহিয়াছে, তাহাদের হস্ত হইতে, শুধু তাহাই নহে, সংস্কৃত ভাষারূপ গুপ্ত পেটিকা হইতে বাহির করিয়া সর্ব্বসাধারণে প্রচার করিতে হইবে। এক কথায় আমি ঐ তত্ত্বগুলিকে সর্ব্বসাধারণের বোধ্য করিতে চাই—আমি চাই ঐ ভাবগুলি সর্ব্বসাধারণের, প্রত্যেক ভারতবাসীর,

সে সংস্কৃত ভাষা জানুক বা নাই জানুক, সকলের সম্পত্তি হউক।"

তিনি কলিকাতা-বক্তৃতায় বামাচারসমর্থক তন্ত্রসমূহের নিন্দা করিয়া বলিতেছেন—

"তাহাদিগকে প্রকৃত শাস্ত্র বেদ, উপনিষদ্, গীতা পড়িতে দাও।"

মান্দ্রাজের এক বক্তৃতায় পুরাণের গল্প ছাড়িয়া উপনিষদুক্ত তেজস্বিতা অবলম্বন করিতে বলিতেছেন,—

"আমাদিগকে দুর্ব্বল করিবার সহস্র সহস্র বিষয় আছে, গল্প আমরা যথেষ্ট শিখিয়াছি। আমাদের প্রত্যেক পুরাণে এত গল্প আছে, যাহাতে জগতে যত পুস্তকালয় আছে, তাহার অর্দ্ধেকেরও উপর পূর্ণ হইতে পারে। * *আর উপনিষৎসমূহ শক্তির বৃহৎ আকরস্বরূপ। উপনিষদ্ যে শক্তি সঞ্চারে সমর্থ, তাহাতে উহা সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করিতে পারে।"

অন্যত্র,—

"এখন বীর্য্যবান্ হইবার চেষ্টা কর। তোমাদের উপনিষদ্, সেই বলপ্রদ, আলোকপ্রদ, দিব্য দর্শন শাস্ত্র আবার অবলম্বন কর, আর এই সকল রহস্যময় দুর্ব্বলতাজনক বিষয়সমূহ পরিত্যাগ কর। উপনিষদ্রূপ এই মহত্তম দর্শন অবলম্বন কর। জগতের মহত্তম সত্য-সকল অতি সহজবোধ্য। যেমন তোমার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে আর কিছুর প্রয়োজন হয় না, ইহা তদ্রূপ সহজবোধ্য। তোমাদের সম্মুখে উপনিষদের এই সত্যসমূহ রহিয়াছে, ঐ সত্যসকল অবলম্বন কর, ঐগুলি উপলব্ধি করিয়া কার্য্যে পরিণত কর।"

উপনিষদ্ যে ভারতীয় সর্ব্বপ্রকার মতবাদ ও ভাবের ভিত্তিস্বরূপ তদ্বিষয়ে বলিতেছেন,—

"বিশিষ্ট বিশ্লেষণ করিলে তোমরা দেখিবে যে, বৌদ্ধধর্ম্মের সারভাগ ঐ সকল উপনিষদ্ হইতেই গৃহীত, এমন কি, বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি, তথাকথিত অদ্ভুত ও মহান্ নীতিতত্ত্ব কোন না কোন উপনিষদে অবিকল বর্ত্তমান। এইরূপ জৈনদেরও ভাল ভাল মতগুলি

সব উপনিষদে রহিয়াছে। * প্রত্যেক উপনিষদে অনুসন্ধান করিলে যথেষ্ট ভক্তির কথা পাওয়া যায়, এমন কোন সুপরিণত ভারতীয় আদর্শ নাই, যাহার বীজ সেই সর্ব্বভাবের খনিস্বরূপ উপনিষদে না পাওয়া যায়। * উপনিষদে ভয়ের ধর্ম্ম নাই। উপনিষদের ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, উপনিষদের ধর্ম্ম—জ্ঞানের ধর্ম্ম। এই উপনিষৎসমূহই আমাদের শাস্ত্র। * আমি এই সকল উপনিষদেই বিশেষ ভাবে একটী বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি যে, প্রথমে দ্বৈতভাবের কথা, উপাসনা প্রভৃতি আরম্ভ হইয়াছে, শেষে অপূর্ব্ব অদ্বৈতভাবের উচ্ছ্বাসে উহা সমাপ্ত হইয়াছে।”

উপনিষদের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন ভাষ্যকারগণের নিজ নিজ মতানুযায়ী ভাব প্রবেশ করাইবার চেষ্টাকে নিন্দা করিয়া নিরপেক্ষভাবে উহার শব্দার্থের অনুসন্ধান বিষয়ে বলিতেছেন,—

“আর উপনিষদের শব্দার্থের বিপর্য্যয় করিবার চেষ্টা আমার নিকট অতিশয় হাস্যাস্পদ বলিয়া বোধ হয়, কারণ আমি দেখিতে পাই, ইহার ভাষাই অপূর্ব্ব। শ্রেষ্ঠতম দর্শনরূপে ইহার গৌরব ছাড়িয়া দিলেও, মানবজাতির মুক্তিপথপ্রদর্শক ধর্ম্মবিজ্ঞানরূপে উহার অদ্ভুত গৌরব ছাড়িয়া দিলেও, ঔপনিষদিক্ সাহিত্যে যেমন মহান্ ভাবের অতি অপূর্ব্ব চিত্র আছে, জগতে আর কুত্রাপি তদ্রূপ নাই। * উপনিষদে ভাষা নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল, উহার ভাষা একরূপ নাস্তিভাবদ্যোতক, স্থানে স্থানে অস্ফুট, যেন উহা তোমাকে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু অর্দ্ধপথে গিয়াই ক্ষান্ত হইল, কেবল তোমাকে এক অগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় বস্তু উদ্দেশে দেখাইয়া দিল, তথাপি তোমার সেই বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রহিল না। * জগতের আর কোথায় সমগ্রজগতের সমগ্র দার্শনিক ভাবের সম্পূর্ণতর চিত্র পাইবে? হিন্দু জাতির সমগ্র চিন্তার, মানবজাতির মোক্ষাকাঙ্ক্ষার সমগ্র কল্পনার সারাংশ যেরূপ অদ্ভুত ভাষায় চিত্রিত হইয়াছে, এরূপ আর কোথায় পাইবে? * উপনিষদের ভাষা, ভাব সকলেরই ভিতর কোন কুটিল ভাব নাই। উহার প্রত্যেক

কথাই তরবারিফলকের ন্যায়, হাতুড়ির ঘায়ের মত সাক্ষাৎ ভাবে হৃদয়ে আঘাত করিয়া থাকে। উহাদের অর্থ বুঝিতে কিছুমাত্র ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই—সেই সঙ্গীতের প্রত্যেক সুরটীরই একটা জোর আছে, প্রত্যেকটীই তাহার সম্পূর্ণ ভাব হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিয়া যায়। কোন ঘোরফের নাই, একটীও অসম্বদ্ধ প্রলাপ নাই একটীও জটিল বাক্য নাই, যাহাতে মাথা গুলাইয়া যায়। উহাতে অবনতির চিহ্নমাত্র নাই, বেশী রূপক বর্ণনার চেষ্টা নাই। বিশেষণের পর ক্রমাগত বিশেষণ দিয়া ভাবটীকে জটিলতর করা হইল, প্রকৃত বিষয়টী একেবারে চাপা পড়িল, মাথা গুলাইয়া গেল—তখন সেই শাস্ত্ররূপ গোলকধাঁধার বাহিরে যাইবার আর উপায় রহিল না। উপনিষদে এরূপ চেষ্টা আরম্ভ হয় নাই। যদি ইহা মানবপ্রণীত হয়, তবে ইহা এমন এক জাতির সাহিত্য, যাহারা তখনও তাহাদের জাতীয় তেজবীর্য্য একবিন্দুও হারায় নাই। ইহার প্রতি পৃষ্ঠা আমাকে তেজবীর্য্যের কথা বলিয়া থাকে।”

বাহুল্য ভয়ে আর অধিক উদ্ধৃত হইল না।

৩। বেদান্ত প্রচারের উপায় সমূহ।

বাঙ্গালা দেশে উপনিষদের প্রচার সম্ভবতঃ রাজা রামমোহন রায় হইতেই প্রথম সূত্রপাত হয়। তাহার পর দুই চারি জন ব্যক্তি কয়েকখানি করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিষদ্ প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল দুই জন মাত্র সাহসী প্রকাশক বিস্তারিতভাবে সভাষ্য উপনিষদ্ প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। দুই এক জন ব্যক্তি কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিষদের পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ দুই জন লেখক মাত্র উপনিষদের তত্ত্বগুলি সরল বাঙ্গালা গদ্যে নিজ ভাষায় লিখিয়াছেন। কোন কোন সাময়িক পত্রেও উপনিষদের তত্ত্ব কিছু কিছু আলোচিত হইয়াছে, দুই একটী সভাসমিতিও এ বিষয়ে অল্প স্বল্প উদ্যোগ করিয়াছেন। কিন্তু যতদূর চেষ্টা হওয়া উচিত, এখনও পর্য্যন্ত তাহা হয় নাই।

আমরা বলি, এই বিষয়ে আর একটু প্রণালীবদ্ধভাবে, আর একটু

দৃঢ়তার সহিত চেষ্টা করিবার সময় হইয়াছে। সহৃদয় ব্যক্তিগণ যেমন গীতার মূল বা সরল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ বা স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করিয়া প্রচার করিয়াছেন, উপনিষদ্ সম্বন্ধেও সেই নীতি অবলম্বন করুন। কলকাতায় যেমন গীতা-সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তদ্রূপ উপনিষদ্-সোসাইটিও প্রতিষ্ঠিত হউক। সুপণ্ডিত সুবক্তাগণ মূলের অনুসরণ ত্যাগ না করিয়া অর্থাৎ নিজেদের কল্পনা বেশী না মিশাইয়া সর্ব্বসাধারণের সহজবোধ্য ভাষায় উপনিষদের ধারাবাহিক বক্তৃতা বিভিন্ন স্থানে দিতে থাকুন। আরও বেশী আশিক্ষিতদের জন্য সুকথকগণ উপনিষদের বিভিন্ন আখ্যায়িকাবলম্বনে কথকতার সৃষ্টি করুন এবং রামায়ণ মহাভারত বা ভাগবতের কথকতার ন্যায় সর্ব্বত্র এই সকল কথা দেওয়া হইতে থাকুক। কথার ভিতর দোষ এই আছে যে লোকের মনোরঞ্জন করিতে যাইয়া অতিরিক্ত ভাবে মূল হইতে সরিয়া যাওয়া হয়—পুরাণাদির কথকতায়ও সেই দোষ প্রবেশ করিয়াছে। লোকরঞ্জন করিতে যাইয়া যাহাতে সেই দোষ বেশী প্রবেশ না করে, তদ্বিষয়ে কথকগণকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। জটিল দার্শনিক বিচার ছাড়িয়া দিয়া উপনিষদের স্থূল স্থূল উপদেশগুলি লইয়া বিভিন্নবয়স্ক বালকবালিকার উপযোগী বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থ রচিত হউক এবং সাধারণ বিদ্যালয়সমূহে ঐগুলি নিয়মিত পাঠ্য গ্রন্থরূপে গৃহীত ও অধ্যাপিত হউক। মাসিকপত্রের স্তম্ভ ভাবুকতা-প্রধান, নীতি ও ধর্ম্ম বিগর্হিত উচ্চ আদর্শশূন্য অসার উপন্যাস গল্পে পূর্ণ না হইয়া উপনিষৎতত্ত্ব প্রচারে নিয়োজিত হউক। এমন কি, রঙ্গালয়ে পর্য্যন্ত উপনিষদের আখ্যায়িকাবলম্বনে নাটক রচিত হইয়া সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে অভিনীত হউক। চিত্রকলাকেও এই উপনিষৎ-প্রচারের সহায়ক করা যাইতে পারে। বৃহদারণ্যকের জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ অবলম্বনে একখানি উৎকৃষ্ট চিত্র জনৈক বন্ধুর গৃহে দেখিয়াছি। উৎকৃষ্ট চিত্রকরগণকে ভাবটা বুঝাইয়া বলিয়া দিলে তাঁহারা এতৎসম্বন্ধে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট চিত্র প্রস্তুত করিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা উপনিষদ্জ্ঞান বিস্তারের অনেক সহায়তা হইতে পারে।

এই প্রচারকার্য্যের জন্য প্রথমতঃ পণ্ডিতগণকে প্রস্তুত হইতে হইবে এবং ভাষ্যের সুবিস্তৃত দার্শনিক বিচার দ্বারা বিক্ষিপ্ত মনকে মূলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার উপর ক্ষণেকের জন্য সমাহিত করিতে হইবে। মোট কথা, উপনিষদুক্ত সত্যগুলি প্রচারযোগ্য বলিয়া একবার দৃঢ় ধারণা হইলে তাহার জন্য যত প্রকার উপায় কল্পনা করা যাইতে পারে, সমুদয়ই অবলম্বিত হইতে পারে।

ইহা সত্য যে, উপনিষদুক্ত সত্যসকল নিজ জীবনে প্রত্য উপলব্ধি করিতে না পারিলে শুধু পঠনপাঠনে অনেক সময় বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমান আসিয়া হৃদয়কে কলুষিত করিয়া আদর্শ হইতে বহু দূরে লইয়া যায়। তজ্জন্য ঐ সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার চেষ্টাই মুখ্য। একথা খুব সত্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ সকল উপনিষৎ পঠনপাঠনও যথা ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে উহা যে সেই উপলব্ধির একটী বিশিষ্ট সাধন তদ্বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। অনেকে সাধনভজনের অতি সীমাবদ্ধ অর্থ করিয়া পূজা মন্ত্রজপ প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াকেই একমাত্র সাধন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তৈত্তিরীয় উপনিষদের এক স্থলে দেখা যায়, প্রত্যেক বিভিন্ন সাধনের সঙ্গে স্বাধ্যায়, প্রবচন অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন অধ্যাপনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়া পরিশেষে বিভিন্ন ঋষির মতে বিভিন্ন প্রকার সাধনপ্রণালীর শ্রেষ্ঠতা কথিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে নাকমৌদ্গল্য ঋষির মতে একমাত্র স্বাধ্যায় প্রবচনরূপ সাধনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, উহাই একমাত্র তপস্যা। এবিষয়ে আমরা জনৈক উন্নত সাধকের নিকট শুনিয়াছি, উপনিষৎপাঠকালে তিনি শুধু উহার অর্থ বুঝিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, কিন্তু এক একটী বাক্য ও উহার তাৎপর্য্য লইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া ধ্যান করিতেন। তাহাতেই উহার গূঢ় রহস্যসমূহ তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইত। শ্রুতিও বলিয়াছেন, উপনিষদ্বাক্য প্রথমে শ্রবণ, পরে বিচারপূর্ব্বক উহার চিন্তা বা মনন ও অবশেষে নিদিধ্যাসন বা ধ্যান করিলে তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। অবশ্য শ্রুতি বলিয়াছেন, সদ্‌গুরুর নিকট এই সকল তত্ত্ব

শ্রবণ করিতে হইবে—তবেই উত্তমরূপে জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তত্ত্বসাক্ষাৎকারী মহাপুরুষ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ সাক্ষাৎ বেদবাণী, ভগবদ্বাণী, ঋষিবাণী বা সিদ্ধবাক্য বলিয়া উপনিষৎসমূহের আলোচনা করিলেও তত্ত্বসাক্ষাৎকারের কতকটা সাহায্য করে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এইবার আমরা পাঠককে ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত শ্বেতকেতু উপাখ্যানের সাধ্যমত আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ যাহা করিয়াছি, তাহাই উপহার দিব। কেবল তৎপূর্ব্বে স্বামীজি ছান্দোগ্যাদি প্রাচীন উপনিষদ্গুলির সম্বন্ধে এক স্থানে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশমাত্র উদ্ধৃত করিব।

"ছান্দোগ্যাদি প্রাচীনতর উপনিষদ্গুলির ভাষা আর একরূপ, অতি প্রাচীন, অনেকটা বেদের সংহিতাভাগের ভাষার মত। আবার উহার মধ্যে অনেক সময় অনেক অনাবশ্যক বিষয়ের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া তবে উহার ভিতরের সার মতগুলিতে আসিতে হয়। এই প্রাচীন উপনিষদ্টীতে (ছান্দোগ্য) কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদাংশের যথেষ্ট প্রভাব আছে—এই কারণে ইহার অর্দ্ধাংশের উপর এখনও কর্ম্মকাণ্ডাত্মক। কিন্তু অতি প্রাচীন উপনিষদ্গুলি পাঠে একটা মহান্ লাভ হইয়া থাকে। সেই লাভ এই যে, ঐগুলি অধ্যয়ন করিলে আধ্যাত্মিক ভাবগুলির ঐতিহাসিক বিকাশ বুঝিতে পারা যায়।

"এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ক্রমবিকাশ বুঝিবার সুবিধাই অনেকে বেদপাঠের একটী বিশেষ উপকারিতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"উহা এমন এক ভাষায় লিখিত, যাহা খুব সংক্ষিপ্ত এবং খুব সহজে মনে রাখা যাইতে পারে।

"এই গ্রন্থের লেখকগণ কতকগুলি ঘটনা স্মরণ রাখিবার উপায়স্বরূপ যেন লিখিতেছেন—তাঁহাদের যেন ধারণা—এ সকল কথা সকলেই জানে; ইহাতে মুস্কিল হয় এইটুকু যে, আমরা উপনিষদে উল্লিখিত গল্পগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিতে পারি না। ইহার

কারণ এই, ঐগুলি যাঁহাদিগের সময়ে লেখা, তাঁহারা অবশ্য ঘটনাগুলি জানিতেন, কিন্তু এক্ষণে তাহাদের কিম্বদন্তী পর্য্যন্ত নাই—আর যা একটু আধটু আছে. তাহা আবার অতিরঞ্জিত হইয়াছে। তাহাদের এত নূতন ব্যাখ্যা হইয়াছে যে, যখন আমরা পুরাণে তাহাদের বিবরণ পাঠ করি তখন দেখিতে পাই, তাহারা উচ্ছ্বাসাত্মক কাব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

৪। ছান্দোগ্যে শ্বেতকেতু উপাখ্যানের আক্ষরিক অনুবাদ।

শ্বেতকেতু অরুণের পৌত্র ছিলেন। তাঁহাকে পিতা বলিলেন, "শ্বেতকেতো, গুরুগৃহে গিয়া ব্রহ্মচর্য্য কর। হে সৌম্য, আমাদের বংশে বেদপাঠ না করিয়া কেহ এ পর্য্যন্ত পতিত ব্রাহ্মণ তুল্য হয় নাই।"

তিনি দ্বাদশবর্ষ বয়সের সময় গুরুগৃহে গিয়া চতুর্ব্বিংশতিবর্ষবয়স্ক হইলে সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করিয়া গর্ব্বিত, পণ্ডিতম্মন্য ও অবিনীত-স্বভাব হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। পিতা তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি যে গর্ব্বিত, পণ্ডিতম্মন্য ও অবিনীতস্বভাব হইয়াছ, তুমি কি সেই উপদেশ, সেই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?

"যাহা দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অচিন্তিত চিন্তিত হয়, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়?"—"ভগবন্, এইরূপ উপদেশ কিরূপে হইতে পারে?"

"হে সৌম্য, যেমন একটী মৃৎপিণ্ডকে জানিলে সমুদয় মৃণ্ময় বস্তু বিজ্ঞাত হয়—বিকার বাগিন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নামমাত্র, মৃত্তিকা—ইহাই সত্য।

"হে সৌম্য, যেমন একটী সুবর্ণপিণ্ডকে জানিলে সুবর্ণনির্ম্মিত সকল বস্তুকে জানা হয়—বিকার বাগিন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নামমাত্র, সুবর্ণ—ইহাই সত্য।

"হে সৌম্য, যেমন একটী নরুণের জ্ঞান হইলেই ইস্পাতনির্ম্মিত সকল পদার্থকে জানা হয়, বিকার বাগিন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নাম-মাত্র, ইস্পাত—ইহাই সত্য। হে সৌম্য, সেই উপদেশও এইরূপ।"

"নিশ্চিতই আমার সেই পূজনীয় গুরুগণ ইহা জানিতেন না।

যদি ইহা জানিতেন, তবে আমাকে কেন বলিলেন না? পূজনীয় আপনিই আমাকে তাহা বলুন।”

পিতা বলিলেন,

“হে সৌম্য, আচ্ছা, তাহাই হউক।”

“হে সৌম্য, ইহা অগ্রে এক দ্বিতীয়রহিত অস্তিস্বরূপ মাত্রই ছিল। এই বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, ইহা অগ্রে এক দ্বিতীয়রহিত নাস্তিস্বরূপমাত্রই ছিল। সেই নাস্তিস্বরূপ হইতে অস্তিস্বরূপ জন্মিয়াছে।

“কিন্তু হে সৌম্য, এরূপ কিরূপে হইতে পারে? নাস্তি হইতে অস্তিস্বরূপ জন্মাইবে কিরূপে? হে সৌম্য, ইহা পূর্ব্বে এক দ্বিতীয়রহিত অস্তিস্বরূপই ছিল।

“তাহা আলোচনা করিল, বহু হই, ভাল করিয়া জন্মাই। তাহা তেজ সৃষ্টি করিল। সেই তেজ আলোচনা করিল, বহু হই, ভাল করিয়া জন্মাই—তাহা জল সৃজন করিল। সেইজন্য যেখানে কেহ শোক করে বা ঘর্ম্মাক্ত হয়, তেজ হইতেই সেই জল জন্মিয়া থাকে।

“সেই জল আলোচনা করিল, বহু হই, ভাল করিয়া জন্মাই। তাহা অন্ন (পৃথিবী) সৃষ্টি করিল। সেই জন্যই যে কোন স্থানে বৃষ্টি হয়, সেখানেই প্রচুর অন্ন হয়—জল হইতে সেই আহার্য্য অন্ন জন্মিয়া থাকে।”

“সেই এই প্রাণিগণের তিন প্রকার বীজ আছে—অণ্ডজ, জীবজ (জরায়ুজ) ও উদ্ভিজ্জ।

“সেই এই দেবতা আলোচনা করিলেন, আচ্ছা, আমি এই তিন দেবতার ভিতর জীবাত্মারূপে প্রবেশ করিয়া নামরূপ প্রকাশ করি।

“তাহাদের এক একটীকে ত্রিতয়াত্মক করি। (এই সংকল্প করিয়া) সেই এই দেবতা ঐ তিন দেবতার ভিতর এই জীবাত্মারূপে প্রবেশ করিয়া নামরূপ প্রকাশ করিলেন।

“তাহাদের এক একটীকে ত্রিতয়াত্মক করিয়াছিলেন। হে সৌম্য,

এই তিন দেবতা ত্রিতয়াত্মক ত্রিতয়াত্মক হইয়া যেরূপে এক একটা হইয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট অবগত হও।"

"অগ্নির যে লোহিত রূপ, তাহা তেজের রূপ; যাহা শুক্ল রূপ, তাহা জলের; যাহা কৃষ্ণরূপ, তাহা অন্নের (পৃথিবীর)। অগ্নির অগ্নিত্ব চলিয়া গেল—বিকার বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা আরব্ধ নামমাত্র, তিনটী রূপ ইহাই সত্য।

"সূর্য্যের যে লোহিত রূপ, তাহা তেজের রূপ; যাহা শুক্ল রূপ তাহা জলের; যাহা কৃষ্ণ রূপ, তাহা অন্নের (পৃথিবীর)। সূর্য্যের সূর্য্যত্ব চলিয়া গেল, বিকার বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা আরব্ধ নামমাত্র, তিনটী রূপ—ইহাই সত্য।

"চন্দ্রের যে লোহিত রূপ, তাহা তেজের রূপ; যাহা শুক্ল রূপ, তাহা জলের; যাহা কৃষ্ণরূপ, তাহা অন্নের (পৃথিবীর)। চন্দ্রের চন্দ্রত্ব চলিয়া গেল। বিকার বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা আরব্ধ নামমাত্র, তিনটী রূপ—ইহাই সত্য।

"বিদ্যুতের যে লোহিত রূপ, তাহা তেজের রূপ; যাহা শুক্লরূপ, তাহা জলের; যাহা কৃষ্ণ রূপ, তাহা অন্নের (পৃথিবীর)। বিদ্যুতের বিদ্যুত্ত্ব চলিয়া গেল। বিকার বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা আরব্ধ নামমাত্র, তিনটী রূপ—ইহাই সত্য।

"এই বিষয়টী জানিয়াই পূর্ব্বকালীন মহাবৈদিক মহাগৃহস্থগণ বলিয়াছিলেন, কেহ এখন পর্য্যন্ত আমাদের নিকট অশ্রুত, অচিন্তিত ও অবিজ্ঞাত বিষয় কিছু বলিতে পারিবে না। এইগুলি (এই তিনটি—লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণরূপ) হইতেই তাঁহারা সমুদয় তত্ত্ব জানিয়াছিলেন।

"যেটী লোহিত বর্ণ, তাহা তেজের রূপ বলিয়া তাঁহারা জানিয়াছিলেন। যাহা শুক্লবর্ণ, তাহা জলের রূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন। যাহা কৃষ্ণবর্ণ তাহা অন্নের (পৃথিবীর) রূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন।

"যাহা অবিজ্ঞাত বলিয়া বোধ হয়, তাহা এই দেবতাগুলির। তেজ,

জল ও পৃথিবীর) সমষ্টি বলিয়া জানিয়াছিলেন। হে সৌম্য, এই তিন দেবতা পুরুষের শরীরে যাইয়া এক একটী যেরূপে তিন তিন রূপ হয়, তাহা আমার নিকট বিশেষ রূপে জান।"

"অন্ন ভক্ষিত হইলে তিন প্রকার হইয়া থাকে—তাহার যে স্থূলতম অংশ, তাহা বিষ্ঠা হয়; যাহা মধ্যম অংশ, তাহা মাংস হয়; যাহা সূক্ষ্মতম অংশ তাহা মন হয়।

"জল পীত হইলে তিন প্রকার হইয়া থাকে,—তাহার যে স্থূলতম অংশ, তাহা মূত্র হয়; যাহা মধ্যম অংশ, তাহা রক্ত হয়; যাহা সূক্ষ্মতম অংশ, তাহা প্রাণ হয়।

"তেজ (তৈল ঘৃতাদি) ভক্ষিত হইলে তিন প্রকার হইয়া থাকে তাহার যে স্থূলতম অংশ, তাহা অস্থি হয়; যাহা মধ্যম অংশ, তাহা মজ্জা হয়; যাহা সূক্ষ্মতম অংশ, তাহা বাক্য হয়।

"হে সৌম্য মন অন্নবিকার প্রাণ জলবিকার ও বাক্য তেজোবিকার।"

"হে ভগবন্, পুনরায় আমাকে এই বিষয় বুঝাইয়া দিন।"

"আচ্ছা সোম্য", পিতা বলিলেন।

"দধি মথিত হইলে তাহার যে সূক্ষ্মতম অংশ, তাহা উর্দ্ধে উঠে, তাহা ঘৃত হয়।

"এইরূপই হে সৌম্য, অন্ন ভক্ষিত হইলে তাহার যে সূক্ষ্ম অংশ তাহা উর্দ্ধে উঠে, তাহা মন হয়।

"জল পীত হইলে, তাহার যে সূক্ষ্ম অংশ, তাহা উপরে উঠে, তাহা প্রাণ হয়।

"তেজ (অর্থাৎ তৈল ঘৃতাদি) ভক্ষিত হইলে, তাহার যে সূক্ষ্ম অংশ, তাহা উপরে উঠে, তাহা বাক্য হয়।

"হে সৌম্য, মন নিশ্চিতই অন্নবিকার, প্রাণ নিশ্চিতই জলবিকার ও বাক্য নিশ্চিতই তেজোবিকার।"

"হে ভগবন্, আমাকে পুনরায় এই বিষয়ে উপদেশ করুন।"
"আচ্ছা, সৌম্য"—তিনি বলিলেন।

"হে সৌম্য, পুরুষ ষোড়শ অংশযুক্ত—পনর দিন খাইও না, যত ইচ্ছা জল পান কর, জলপান করিলে প্রাণ ত্যাগ হইবে না।"

তিনি পনর দিন খাইলেন না—তার পর পিতাব নিকট উপস্থিত হইলেন - "হে পিতঃ, কি বলিতে বলেন?" "হে সৌম্য, ঋক্, সাম, যজুর্মন্ত্র সকল বল।" তিনি বলিলেন, "পিতঃ, আমার কিছুই মনে পড়িতেছে না।"

তাঁহাকে বলিলেন, "হে সৌম্য, যেমন কাষ্ঠসমূহেব দ্বারা উপচিত প্রবল অগ্নির খদ্যোতপ্রমাণ (জোনাকি পোকার মত ক্ষুদ্র) একখানা অঙ্গার পড়িয়া থাকিলে তদ্দ্বারা বহু বস্তু দগ্ধ করা যায় না, সেইরূপই হে সৌম্য, তোমার ষোড়শকলার এক কলা বাকি আছে, সুতরাং ইদানীং সেই একটী মাত্র কলার দ্বারা তোমার বেদের মন্ত্রগুলি মনে পড়িতেছে না। খাও—তবে আমার উপদেশ সব বিশেষরূপে জানিতে পারিবে"।

তিনি খাইলেন পরে পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে পিতা যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি তাহাই বলিতে পারিলেন।

তাঁহাকে পিতা বলিলেন, "হে সৌম্য, যেমন বহু কাষ্ঠ দ্বারা উপচিত প্রবল অগ্নির খদ্যোতপ্রমাণ অঙ্গার পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার উপর তৃণ দিলে অনেক অগ্নি হইয়া জ্বলিয়া উঠে তখন উহা দ্বারা অনেক বস্তুকে দগ্ধ করা যায়—

"হে সৌম্য, এইরূপ তোমার ষোড়শ কলাব মধ্যে একটী কলা মাত্র অবশিষ্ট ছিল—তাহাতে অন্ন দেওয়াতে তাহা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাহা দ্বারাই এখন বেদের মন্ত্র সকল স্মরন করিতে পারিতেছ। হে সৌম্য, মন অন্নবিকার, প্রাণ জলবিকার ও বাক্য তেজোবিকার।"

এইরূপে শ্বেতকেতু পিতাব উপদিষ্ট বিষয় বুঝিতে পারিলেন, বুঝিতে পারিলেন।

অরুণের পুত্র উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বলিলেন, "হে সৌম্য, আমার নিকট সুষুপ্তির তত্ত্ব অবগত হও। পুরুষ যে সময়ে (গাঢ়ভাবে সুষুপ্ত হইয়া) 'স্বপিতি' (গাঢ়ভাবে নিদ্রিত হইয়াছে)—এই নাম প্রাপ্ত হয়, তখন সে সতের সহিত মিলিত হয়,—'স্ব'তে (নিজেতে) 'অপীত' (গত) হয়—সেই তাঁহাকে 'স্বপিতি' বলা হয়, যেহেতু তিনি তখন 'স্ব'তে 'অপীত' হন। (স্ব+অপীত=স্বপিতি।)

"যেমন কোন সূত্রের দ্বারা উত্তমরূপে বদ্ধ কোন পক্ষী চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অন্যত্র আশ্রয়প্রাপ্ত না হইয়া সেই বন্ধন স্থানেই ফিরিয়া আসে, হে সৌম্য, এইরূপেই সেই মন নানাদিকে ঘুরিয়া অন্যত্র আশ্রয় লাভ না করিয়া প্রাণকেই (পরমাত্মাকেই) আশ্রয় করে (হে সৌম্য মনের বন্ধন-স্থান, প্রাণ পরমাত্মা)।

"হে সৌম্য, অশনা পিপাসার তত্ত্ব (অশনা খাইবার ইচ্ছা—ক্ষুধা, পিপাসা—পানের ইচ্ছা—তৃষ্ণা) আমার নিকট অবগত হও। যখন পুরুষের 'আশিশিষতি' (খাইবার ইচ্ছা করিতেছে) এই নাম হয় জলই অশিত বস্তুকে লইয়া যায়। যেমন গোপালকে গো-নায় বলে, অশ্বসমূহের নেতাকে অশ্ব নায় বলে, পুরুষদিগের নেতাকে পুরুষ নায় বলে, সেই জলকে (খাদ্যদ্রব্যের নেতা বলিয়া) অশ-নায় বলে। হে সৌম্য, সেই স্থলে এই (দেহরূপ) অঙ্কুর বা কার্য্য রহিয়াছে—ইহার মূল বা বীজ কিছু নাই—এমত হইতে পারে না।

"অন্ন ব্যতীত তাহার মূল কি হইতে পারে? এইরূপ হে সৌম্য, অন্নরূপ অঙ্কুর বা কার্য্যের দ্বারা তাহার মূল বা বীজ জলের অন্বেষণ কর। হে সৌম্য, জলরূপ কার্য্য বা অঙ্কুর দ্বারা তাহার মূল বা বীজ তেজের অনুসন্ধান কর। তেজোরূপ কার্য্য বা অঙ্কুর দ্বারা, হে সৌম্য, তাহার মূল বা বীজ সতের অনুসন্ধান কর। হে সৌম্য, এই সমুদয় প্রাণীর মূল কারণ সৎ; সৎ উহাদের আশ্রয়, এবং সৎই উহাদের লয় স্থান।

"আর যখন পুরুষের 'পিপাসতি' (জলপান করিতে ইচ্ছা করিতেছে) এই নাম হয়, তখন তেজই সেই পানীয় জলকে লইয়া যায়

(শুষ্ক করিয়া ফেলে)। যেমন গো নেতা, অশ্ব-নেতা, ও পুরুষ নেতাকে যথাক্রমে গো-নায়, অশ্ব-নায় ও পুরুষ-নায় বলে, এইরূপই সেই তেজকে উদন্যা (উদ অর্থাৎ জলকে লইয়া যায় বা শুষ্ক করে) বলে। হে সৌম্য, এস্থলে এই যে অঙ্কুরস্বরূপ কার্য্য (শরীর) উৎপন্ন হইয়াছে, জানিও—ইহার মূল বা বীজ নাই, তাহা কখন হইতে পারে না।

"তাহার আর জল ব্যতীত কি মূল হইতে পারে? হে সৌম্য, জলরূপ অঙ্কুর বা কার্য্য দ্বারা তাহার মূল বা বীজ তেজের অনুসন্ধান কর হে সৌম্য, তেজোরূপ অঙ্কুর বা কার্য্য দ্বারা তাহার মূল সতের অনুসন্ধান কর। হে সৌম্য, এই সমুদয় প্রাণীর মূল সৎ, সৎই উহাদের আশ্রয়, উহাদের পরিণামে অবস্থিতি সতে। হে সৌম্য, এই তিন দেবতা পুরুষকে আশ্রয় করিয়া যেরূপে এক একটী ত্রিতয়াত্মক হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। হে সৌম্য, এই পুরুষের যখন মৃত্যু হয়, তখন তাহার বাক্য মনে লয় হয়, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরম দেবতায় লয় প্রাপ্ত হয়।

"সেই যে এই সূক্ষ্ম বস্তু, এই সমুদয় তদাত্মক, তাহা সত্য, তিনি আত্মা। হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই।"

"হে ভগবন্, আমায় এবিষয় পুনরায় উপদেশ করুন।"

"আচ্ছা, সৌম্য", - তিনি বলিলেন।

"হে সৌম্য, মধুকরগণ যেমন মধু প্রস্তুত করে, নানাপ্রকার বৃক্ষের রস সংগ্রহ করিয়া সমুদয় রসকে একটী রসে পরিণত করে

"সেই বিভিন্ন রসসমূহ যেমন সেই একত্বপ্রাপ্তাবস্থায় আমি অমুক বৃক্ষের রস, আমি অমুক বৃক্ষের রস—এরূপ পৃথক্ করিয়া বুঝিতে পারে না, হে সৌম্য, এইরূপেই এই সমুদয় প্রাণী সতে মিলিত হইয়াও আমরা সতে মিলিত হইয়াছি, এইরূপ জানিতে পারে না।

"তাহারা ইহলোকে ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ বা মশক, যে যাহা ছিল, সুষুপ্তি আদির অবসানেও তাহাই হয়।

"সেই যে এই সূক্ষ্ম বস্তু, এই সমুদয়ই এতদাত্মক, তাহা সত্য, তিনি আত্মা, হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই।"

"ভগবন্, পুনরায় আপনি আমাকে এই তত্ত্ব বুঝাইয়া দিন।"

"আচ্ছা, সৌম্য", তিনি বলিলেন।

"হে সৌম্য, এই পূর্ব্বদিকস্থ নদীসমূহ পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইতেছে, পশ্চিমদিকস্থ নদীসমূহ পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইতেছে। তাহারা সমুদ্র হইতে সমুদ্রেই যায়, সমুদ্রই হয়, তাহারা যেমন তথায় আমি অমুক, আমি অমুক, তাহা বুঝিতে পারে না।

"এইরূপই হে সৌম্য, এই সকল প্রাণী সৎ হইতে আসিয়া, সৎ হইতে আসিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারে না। তাহারা ইহলোকে ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ বা মশক, যাহা যাহা ছিল, তাহা হইতে আসিয়াও তাহাই থাকে।

"সেই যে এই সূক্ষ্ম বস্তু, এই সমুদয়ত এতদাত্মক, তাহা সত্য, তিনি আত্মা, হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই।"

"হে ভগবন্, পুনরায় আমায় শিক্ষা দিন"

"আচ্ছা", সৌম্য, তিনি বলিলেন।

"হে সৌম্য, এই প্রকাণ্ড বৃক্ষটীর মূলে যদি কেহ আঘাত করে, তবে সজীব অবস্থায়ই তাহা হইতে রস নিঃসৃত হয়; যদি উহার মধ্যদেশে কেহ আঘাত করে, তবে সজীব অবস্থায়ই তাহা হইতে রস নিঃসৃত হয়; আর যদি কেহ উহার অগ্রদেশে (ডগায়) আঘাত করে, তবে সজীব অবস্থায়ই উহা হইতে রস নিঃসৃত হয়। উহা জীবাত্মা দ্বারা পূর্ণ বলিয়া পুনঃ পুনঃ রস পান করিয়া আনন্দে অবস্থান করে।

"যদি জীব উহার একটী শাখাকে ত্যাগ করে, তবে সে শুষ্ক হয়, দ্বিতীয় শাখাকে জীব ত্যাগ করিলে পর তাহা শুষ্ক হয়, তৃতীয় শাখাকে ত্যাগ করিলে পর তাহা শুষ্ক হয়, সমুদয় শাখাকে যদি ত্যাগ করে, তবে সমুদয় শুষ্ক হয়।"

তিনি বলিলেন, "হে সৌম্য, এই সেই জানিও—জীবশূন্য হইলেই এই দেহ মৃত হয়, জীব কখন মরে না।

"সেই যে এই সূক্ষ্ম বস্তু, এই সমুদয় এতদাত্মক, তাহা সত্য, তিনি আত্মা, হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই।"

"হে ভগবন্, পুনরায় আমায় এই বিষয় শিক্ষা দিন।"

"আচ্ছা, সৌম্য", তিনি বলিলেন।

"ঐ বটবৃক্ষ হইতে তাহার ফল লইয়া আইস।"

"ভগবন্, এই আনিয়াছি।"

"উহা ভাঙ্গ।"

"ভাঙ্গিয়াছি, ভগবন্!"

"কি দেখিতেছ?"

"এই সব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীজ, ভগবন্!"

"উহাদের মধ্যে একটী ভাঙ্গ দেখি, বৎস!"

"ভাঙ্গিয়াছি, ভগবন্!"

"কি দেখিতেছ?"

"কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, ভগবন্!"

তাহাকে বলিলেন,—

"হে সৌম্য, এই যে সেই অতিশয় সূক্ষ্ম বস্তুকে দেখিতে পাইতেছ না, হে সৌম্য, এই সূক্ষ্ম বস্তুর মধ্যেই মহান্ বটবৃক্ষ রহিয়াছে—হে সৌম্য, আমার বাক্যে শ্রদ্ধা স্থাপন কর।

"সেই যে এই সূক্ষ্ম বস্তু, এই সমুদয় এতদাত্মক, তাহা সত্য, তিনি আত্মা, হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই।"

"হে ভগবন্, পুনরায় এই তত্ত্ব আমায় বুঝাইয়া দিন।"

"আচ্ছা, সৌম্য"—তিনি বলিলেন।

"এই লবণখণ্ড জলে নিক্ষেপ করিয়া প্রাতঃকালে আমার নিকট আসিও।"

সে তাহাই করিল। তাহাকে তিনি বলিলেন,—

"রাত্রে যে লবণখণ্ড জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তাহা লইয়া আইস।"

সে উহা খুঁজিয়া পাইল না।

"হে বৎস, উহা জলে বিলীন হইয়া আছে—এক পাশ হইতে একটু লইয়া খাইয়া দেখ—কিরূপ?

"লবণাক্ত।"

"মাঝখান হইতে খাইয়া দেখ—কিরূপ?"

"লবণাক্ত।"

"নীচের দিক্ হইতে একটু খাইয়া দেখ—কেমন?"

"লবণাক্ত।"

"ইহা ফেলিয়া দিয়া আমার কাছে এস।"

সে তাহাই করিল—ঐ লবণ বরাবরই ছিল। তাহাকে বলিলেন, "হে সৌম্য, সংকে এখানে দেখিতে পাইতেছ না—এইখানেই রহিয়াছে। সেই যে এই সূক্ষ্মবস্তু, এই সমুদয় এতদাত্মক, তাহা সত্য, তিনি আত্মা, হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই।"

"হে ভগবন্, পুনরায় আমায় এই বিষয় উপদেশ দিন।"

"আচ্ছা, সৌম্য" -তিনি বলিলেন

"হে সৌম্য, যেমন কোন লোককে গন্ধার দেশ হইতে বদ্ধচক্ষু অবস্থায় আনয়ন করিয়া নির্জ্জন অরণ্যে ছাড়িয়া দিলে সে যেমন সেখানে পূর্ব্বমুখ, উত্তরমুখ, দক্ষিণমুখ বা পশ্চিমমুখ হইয়া চীৎকার করিতে থাকে—আমাকে চোক বাঁধিয়া এখানে আনিয়াছে চোক বাঁধিয়া এখানে ছাড়িয়া দিয়াছে।

" তাহার যেমন বন্ধন খুলিয়া দিয়া বলে, গন্ধার এই দিকে—এই দিকে যাও। সে এই উপদেশ পাইয়া এবং উক্ত উপদেশের তাৎপর্য্য অবধারণে সমর্থ হইয়া এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রামে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গন্ধারেই গিয়া উপস্থিত হয়, এইরূপ আচ-

জ্ঞান বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যাঁহার আচার্য্য আছে, সেই ব্যক্তিই তত্ত্ব জানিতে পারেন। তাঁহার ততদিনই বিলম্ব, যত দিন না দেহ-পাত হয়, তার পরই ব্রহ্মে মিলিত হন।

"সেই যে এই সূক্ষ্ম বস্তু, এই সমুদয় এতদাত্মক—তাহা সত্য, তিনি আত্মা, হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই।"

"হে ভগবন্, আমাকে পুনরায় শিক্ষা দিন।"

"আচ্ছা, সৌম্য"—তিনি বলিলেন।

"হে সৌম্য, রোগগ্রস্ত মুমূর্ষু ব্যক্তিকে তাহার জ্ঞাতিরা চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া বলে, আমাকে চিনিতে পারিতেছ?—আমাকে চিনিতে পারিতেছ? যতক্ষণ না তাহার বাক্য মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরম দেবতায় লয় হইতেছে, ততক্ষণ চিনিতে পারে।

"আর যখন তাহার বাক্য মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরম দেবতায লয় হয় তখন আর চিনিতে পারে না।

"সেই যে এই সূক্ষ্ম বস্তু, এই সমুদয় এতদাত্মক,—তাহা সত্য, তিনি আত্মা, হে শ্বেতকেতো, তুমি সেই।"

"হে ভগবন্, পুনরায় আমায় শিক্ষা দিন।"

"আচ্ছা সৌম্য"—তিনি বলিলেন।

"হে সৌম্য, লোকের হাত বাঁধিয়া লইয়া আসে—বলে—এ অপহরণ করিয়াছে, চুরি করিয়াছে ইহার জন্য কুঠার তপ্ত (গরম) কর। স যদি সেই চৌর্য্যের কর্ত্তা হয়, তবে মিথ্যা কথা বলিয়া মিথ্যা দ্বারা আত্মাকে আবরণ করিয়া তপ্ত পরশু গ্রহণ করে—সে পুড়িয়া যায়, তাহাকে মারিয়া ফেলে।

"আর সে যদি তাহা না করিয়া থাকে, তবে সে চুরি করে নাই বলিলে নিজে সত্যের আশ্রয়েই থাকে। সত্য দ্বারা নিজেকে আবৃত করিয়া তপ্ত পরশু গ্রহণ করে—সে দগ্ধ হয় না—তাহাকে ছাড়িয়া দেয়।

"যেমন সে সেই অবস্থায় দগ্ধ হয় না সেইরূপ জ্ঞানীরও বন্ধন হয় না।)। এই সমুদয়ই এতদাত্মক,—তাহা সত্য, তিনি আত্মা হে শ্বেতকেতো তুমি সেই।"

তাঁহার এই উপদেশ বাক্যে বিশেষ ভাবে বুঝিয়াছিলেন, বিশেষ ভাবে বুঝিয়াছিলেন।

৫। ইহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য।

এক্ষণে আমরা ইহার সংক্ষিপ্ত তৎপর্য্য দিতে চেষ্টা করিব, কারণ, পাঠকবর্গ দেখিবেন, এইটী শুধু পাঠ করিলে মোটামুটি একটা ভাব পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সকল স্থলে ভাব স্পষ্ট নহে। অনেক স্থলে দৃষ্টান্তগুলি কি উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ভাল বুঝা যায় না, অর্থাৎ শ্বেতকেতুর মনে কি ভাবের উদয় হওয়ায় পিতা পরবর্ত্তী দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছেন, তাহা পারস্কার বুঝা যায় না। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ঐ সকল স্থলে শ্বেতকেতুর মনোভাব অনুমান করিয়া তাঁহার মনের সন্দেহের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এই তাৎপর্য্য প্রকাশে অনেক স্থলে ভাষ্যকারের অনুসরণ করিব এবং স্থানে স্থানে নিজের সহজ বুদ্ধি দ্বারাও পরিচালিত হইব।

প্রথমে যেরূপ ভাবে পিতা শ্বেতকেতুকে প্রশ্ন করিতেছেন, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সমুদয় উপনিষদের এক লক্ষ্য—এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করা।

যদি বাস্তবিক এই জগতের উপাদান কারণ এক সৎস্বরূপ হয়, তবে সেই সতের জ্ঞান হইলেই সমুদয় জগতের জ্ঞান হইবে না কেন?

এই সৎ বস্তু যে সাংখ্যকল্পিত প্রকৃতি বা প্রধানের ন্যায় অচেতন বা জড় নহে,তাহা তিনি বহু হইবার আলোচনা করিলেন—এই আলোচনা হইতেই ভাষ্যকার অনুমান করিয়াছেন এবং ব্যাসসূত্রেও 'ঈক্ষতের্না-শব্দং', সূত্রে ইহা সূচিত হইয়াছে। তার পর যথাক্রমে তেজ, জল ও পৃথিবীতত্ত্বের সৃষ্টির কথা। সাধারণতঃ শাস্ত্রে আকাশ ও বায়ুকে লইয়া পঞ্চভূতের উল্লেখ দেখা যায়। এখানে তিন ভূতের উল্লেখ কেন?

ইহার প্রধান উত্তর এই য, সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝান কোন শ্রুতিরই অভিপ্রেত নহে—সৃষ্টিতত্ত্বের অবতারণার মূল লক্ষ্য এই—সৃষ্টি হইতে মানবমনকে আকৃষ্ট করিয় স্রষ্টার অভিমুখীন করা দেখান যে, নামরূপে বহু হইলেও মূলতঃ সব এক পদার্থমাত্র অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া উহারা যে তেজ, জল ও পৃথ্বীর বই কিছুই নয়, ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা। সুতরাং সমুদয়ই ঐ তিন তত্ত্বের পরিণাম জানিলেই আমরা যে সকল বস্তুর সহিত কোন কালে পরিচিত নহি, তাহাদেরও জ্ঞান স্বতঃই হইয়া গেল আর স্বতন্ত্র জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা রহিল না। সেই তিনটী তত্ত্ব হইতে কিরূপে বাহ্য ও অধ্যাত্ম সমুদ বিষয়ের উৎপত্তি, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। আবার প্রতিলোমপ্রণালীক্রমে দেহের কারণ অন্ন (পৃথিবী), পৃথিবীর কারণ জল, জলের কারণ তেজ ও তেজের কারণ সৎ—ইহা প্রমা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এখানে এইটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র আধুনিক বিজ্ঞানের উৎপত্তির বহু পূর্ব্বে মনকে জড়—জড়ের এক প্রকার সূক্ষ্ম পরিণাম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে কিরূপ যত্ন করিতেছেন। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলিয়া রাখি যে, স্বামীজি যেমন বলিয়াছেন,—

"বস্তুতঃ উপনিষদের মধ্যে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত আধুনিক বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত বিশেষ প্রতিপত্তি সকল অনেক সময়ে ভ্রমাত্মক হইলেও উহাদের মূল তত্ত্বগুলির সহিত বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বের কোন প্রভেদ নাই।"

বিস্তারিত বর্ণনার ভিতর হয়ত আধুনিক বিজ্ঞানবিরুদ্ধ অনেক কথা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে মূল তত্ত্বের হানি কিছুতেই হইতে পারে না। কিরূপে সৎ হইতে ক্রমে তেজ জল ও পৃথ্বীতত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তগুলি হয়ত অবৈজ্ঞানিক বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহার স্থূল কথা এই যে, সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে স্থূলের উৎপত্তি এবং স্থূল হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতরে যাইয়া সূক্ষ্মতমে লয়। আর এক কথা, এই তিন বা পাঁচ ভূতের কথাও আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের

বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু এই বিভাগের কারণ আলোচনা যদি করা যায়, তবে এই বিভাগকে একবারে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। আমাদের বিষয়জ্ঞান লাভের দ্বার পাঁচটী মাত্র—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ। এই পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, তেজ, রস ও গন্ধ উপলব্ধ হইয়া থাকে এবং আলোচনা করিলে ইহাও কতকটা বোধ হয় যে, এই প্রত্যেকটীতে যেন ক্রমান্বয়ে এক একটী করিয়া গুণ বাড়িতেছে। এই আভাস হইতে সুধী পাঠক ত্রিবৃৎকরণ বা পঞ্চীকরণ রহস্য কতকটা ধারণা করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয়।

আর একটী কথা উপদেশের প্রথমেই আছে—মূল কারণ সৎ অর্থাৎ অস্তিস্বরূপ অথবা অসৎ অর্থাৎ নাস্তিস্বরূপ—ইহার বিচার। ভাষ্যকার এই বিচারকে শূন্যবাদ খণ্ডন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আমরা তৈত্তিরীয় উপনিষদের এক স্থলে দেখিতে পাই, অসৎই পূর্ব্বে ছিল, ইহা কথিত হইয়াছে। অবশ্য ভাষ্যকার সে স্থলে অসৎ অর্থে নামরূপে অনভিব্যক্ত এক সৎ বস্তুকেই বুঝাইয়াছেন। এবং সে স্থল দেখিলে তাহাই উক্ত শ্রুতির অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। আমাদের মনে হয়, জগৎকারণের তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া কেহ কেহ তাহা যে 'একটা কিছু' এই দিকেই ঝোঁক দিতে ভাল-বাসিতেন, যেমন আমাদের আলোচ্য উপনিষদ্‌টীতে, আবার কেহ কেহ এই নামরূপে বিভক্ত জগৎটীকে সাধারণ দৃষ্টিতে 'সৎ' বা 'আছে' এই বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া কারণাবস্থায় যে তাহার নামরূপ নাই,—এই তত্ত্বটীই 'অসৎ' বা 'নাই' এই শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে ভালবাসিতেন—যেমন তৈত্তিরীয়ে। পরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় তাঁহাদের প্রয়োজন বা খেয়াল অনুসারে এই সকল শ্রুতি-বাক্যকে নিজ নিজ মতের পোষকরূপে প্রতিপন্ন করিতে গিয়া সৎকারণ-বাদ, শূন্যবাদ প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন ও উহা লইয়া নানা বৃথা শব্দবিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দর্শনশাস্ত্র উহার মূল আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইতে বিযুক্ত হইলে এই সকল অনর্থপরম্পরার উৎপত্তি হয়।

দৃষ্টান্তগুলির আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, শিষ্য যে বিষয়-গুলির সহিত বিশেষ পরিচিত, সেইগুলি হইতে আচার্য্য অজ্ঞাত তত্ত্বসমূহের আভাস দিবার চেষ্টা করিতেছেন। স্বপ্নরহিত নিদ্রা বা সুষুপ্তি অবস্থার সহিত সকলেই পরিচিত ঐ সুষুপ্তি অবস্থার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বুঝাইতেছেন, যেমন উক্ত অবস্থায় বিশেষ বিশেষ নামরূপ কিছু থাকে না, সতের সহিত মিলন হয়, সৃষ্টির প্রাক্কালে অথবা প্রলয়াবস্থায়ও সতের সহিত মিলন হওয়ায় তদ্রূপ নাম রূপ কিছু থাকে না। উক্ত মিলিতাবস্থা এবং মিলিতাবস্থা হইলেও জীব কেন তাহা বুঝিতে পারে না তাহা বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন রস মিলিয়া মধু হওয়া অথবা নদীসমূহের সাগরে মিলিত হওয়ার দৃষ্টান্ত অবতারিত হইয়াছে। কিন্তু একটী আশঙ্কা এই, সুষুপ্তি বা প্রলয় হইলেই যদি সকলেই সেই সতের সঙ্গে মিলিত হয়,তবে এত চেষ্টা করিয়া জ্ঞান লাভের সার্থকতা কি ?—এইটী বুঝাইবার জন্য তপ্ত পরশু গ্রহণ দ্বারা কেহ বাস্তবিক চুরি করিয়াছে কি না—এই trial by ordeal পরী-ক্ষার দৃষ্টান্ত অবতারিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে অনেক দেশে এই পরীক্ষা প্রচলিত ছিল। ইহা কুসংস্কারই হউক আর ইহার মধ্যে কিছু সত্যই থাক্,তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ইহার দ্বারা দৃষ্টান্তপ্রতি পাদ্য বিষয়টী বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। একটী কথা এই প্রসঙ্গে বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ মনে করেন, দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য কোন বিষয় প্রমাণ করা -তজ্জন্য তাহারা দৃষ্টান্তে কোন দোষ দেখাইতে পারিলে দৃষ্টান্তপ্রতিপাদ্য বিষয়টীও ভুল প্রমাণিত হইল, মনে করেন। কিন্তু দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য তাহা নহে। অন্য প্রমাণ—যথা যুক্তি বা অনুভূতি দ্বারা কোন বিষয় প্রমাণসিদ্ধ বোধ হইলে অপরের মনে উহাকে কত-কটা সম্ভব (Plausible) বলিয়া ধারণা করাইয়া দিবার জন্যই দৃষ্টান্তের অবতারণা।

বটবীজের ও লবণের দৃষ্টান্তগুলির উদ্দেশ্য স্পষ্ট। ইন্দ্রিয়গোচর না হইলেও কোন বস্তুর (এখানে জগৎকারণ সূক্ষ্মতম সৎবস্তুর) অস্তিত্ব যে অসম্ভাবিত নহে, তাহাই দেখান ঐ দৃষ্টান্তগুলির উদ্দেশ্য।

৫

গন্ধারদেশ হইতে চক্ষুবদ্ধ অবস্থায় আনীত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত তত্ত্বজ্ঞান-লাভে আচার্য্যোপদেশের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপনার্থ। যখন বাক্য মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে ও তেজ পরম দেবতায় লীন হয়, তখনই মৃত্যু হয় বলা হইতেছে। মৃত্যুরূপ ঘটনার এইরূপ বর্ণনা যাহা মৃত্যুকালীন মৃতব্যক্তির সম্বন্ধে দেখা যায় তাহারই উল্লেখ মাত্র। দেখা যায়, মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রথমে কথা বন্ধ হয়, তখনও তাহার চিন্তা চলিতে থাকে, চিন্তাগতি রুদ্ধ হইলেও শ্বাসপ্রশ্বাস চলে, শেষে শ্বাসপ্রশ্বাসগতি রুদ্ধ-প্রায় হইলেও দেহে উষ্মা থাকে। ক্রমে সমুদয় শরীর ঠাণ্ডা হইয়া আসিতে থাকে—হৃদয়ের নিকট একটু গরম থাকে। শেষে তাহাও চলিয়া গেলে মৃত্যু হয়, তখন জীব কোন অজ্ঞাত রাজ্যে চলিয়া যায়, কোন পরম দেবতায় মিলিত হয়। বস্তুতঃ প্রাত্যাহিক পরিদৃষ্ট ঘটনা সুষুপ্তি, সাময়িক-পরিদৃষ্ট ঘটনা মৃত্যু এবং অনুমিত জাগতিক প্রলয়—এ সকলগুলিই মানবের চরমাবস্থা তত্ত্বজ্ঞানে যে ব্যক্ত হইতে অব্যক্তাবস্থা হইয়া নামরূপের একেবারে অভাব হয়, এই ভাবটির আভাস দিবার জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। জীব ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত থাকিতে জীবের মৃত্যু হয় না, ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যতক্ষণ জ্ঞান না হইতেছে, ততক্ষণ সুষুপ্তি, মরণ বা প্রলয়ে জীবভাব বিলুপ্ত হয় না।

আর একটী বিষয় পাঠক এই উপনিষদ্‌টীর আক্ষরিক অনুবাদের ভিতর লক্ষ্য করিবেন যে—ইহাতে এক একটী বাক্যের পুনরুক্তি আছে। পুনরুক্তি সাধারণতঃ দোষ বলিয়া কথিত হইলেও এবং আধুনিক ব্যস্ততার যুগে ইহা লোকের বিরক্তিকর হইলেও প্রাচীন সর্ব্বদেশীয় ধর্ম্মগ্রন্থেই পুনরুক্তি অনেক পাওয়া যায়। আমরা পূর্ব্বেই একস্থলে বলিয়াছি, উপনিষদ্ শুধু পাঠের জিনিষ নহে, ধ্যানের বস্তু। বার বার এক বিষয় বলিলে ধ্যানেরই সাহায্য হয় এবং শিক্ষার ইহাই প্রাচীন প্রথা। ধ্যান অর্থে এক বিষয়ে বার বার মনকে ধারণ করা—ইহাতে ভাসা ভাসা জ্ঞানের পরিবর্ত্তে জ্ঞানের গভীরতাই হয়। বেদান্তের 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ' সূত্রে এই তত্ত্বেরই একটু ইঙ্গিত আছে।

সমুদয় গল্পটী হইতে মূল শিক্ষা যাহা পাওয়া যায় তাহার কতক কতক উল্লিখিত হইতেছে:—

জগতের মূল কারণ সৎ—অসৎ নহে এবং উহা চেতন। ঐ মূল কারণকে জানিতে পারিলে সমুদয় জগৎকে জানা হইল। কারণ, ঐ মূল কারণই নামরূপে প্রবিভক্ত হইয়া তেজ জল পৃথিবী আদি রূপ ধারণ করিয়াছে এবং তাহা হইতেই আবার সমুদয় প্রাণীর বাহ্য দেহ, ইন্দ্রিয়াদি ও মনেরও উৎপত্তি হইয়াছে

সেই সৎ জীবাত্মারূপে সকল প্রাণীতে অনুপ্রবিষ্ট—এই কারণে জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরমার্থতঃ অভিন্ন। জগৎকে পরমার্থদৃষ্টিতে৷ কারণের সহিত অভিন্ন ভাবে দেখিলে উহা সত্য, নতুবা সৎকে ছাড়িয়া জগতের অস্তিত্ব নামমাত্র—মিথ্যা।

গুরূপদেশে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়।

জগৎকারণ সৎবস্তু অতি সূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়াদির অগোচর হইলেও উহার অস্তিত্বের অপলাপ করা যায় না।

সুষুপ্তি মরণাদির আলোচনা করিয়া নামরূপের অতীত সৎবস্তুর আভাসের জ্ঞান লাভ করিতে হয়।

সুষুপ্তি আদির সহিত তত্ত্বজ্ঞানাবস্থার পার্থক্য—অজ্ঞান ও জ্ঞান—ইত্যাদি ইত্যাদি।

৬। ইহার বর্ত্তমান উপযোগিতা।

এক্ষণে এই উপাখ্যানে উপদিষ্ট উপদেশের আধুনিক জীবনে উপযোগিতার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রথমেই বুঝা উচিত, প্রাচীন ও আধুনিক জীবনের মূল প্রয়োজনের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। তখনও লোকে নানা বিভিন্ন লৌকিক বিজ্ঞান আলোচনান্তে শেষে এমন এক বিজ্ঞানের অনুসন্ধান করিত, যাহা দ্বারা জগতের মূল উপাদানভূত পদার্থের জ্ঞান হইয়া জ্ঞানপিপাসা সম্পূর্ণ হইত। এখনও শুধু লৌকিক বিদ্যার প্রবল আলোচনা হইয়া লোকের মন তৃপ্ত হইতেছে না, লোকে সকল জ্ঞানের সার জ্ঞানের অনুসন্ধান করিতেছে। কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যে চিন্তাশীল

মনীষিগণ এখনও সেই কি জানিলে সব জানা যাইবে, এই মূল সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত। কারণ, প্রাচীন কালের মত মানুষ সেই মানুষই আছে। মানুষের মনের উপাদান তখনকারই মত এখনও জ্ঞানশক্তি, ভাবশক্তি ও কর্ম্মশক্তি লইয়া গঠিত। তখনকার মত এখনও মানুষ কামক্রোধাদি স্বাভাবিক কুপ্রবৃত্তির সঙ্গে সংযম, শ্রদ্ধা, বিবেক-বৈরাগ্যাদি স্বাভাবিক সুপ্রবৃত্তিরদ্বন্দ্বে অহর্নিশ ব্যস্ত ও কবে উহার অবসান হইয়া নির্ম্মল শান্তিসুখের অধিকারী হইবে, তজ্জন্য চিন্তিত। দেশকালপাত্রভেদে সামান্য বাহ্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র, কিন্তু ভিতরের ব্যাপারটা ঠিক সেই একইরূপ রহিয়াছে। এই কারণে শুধু প্রাচীন—এই অজুহাতে কোন তত্ত্বালোচনা, কোন গভীর বিষয়ই উপেক্ষিত হইবার নহে। বিদ্যা শিখিয়া শ্বেতকেতুর ন্যায় পণ্ডিতম্মন্য হইবার দৃষ্টান্ত আমরা এখন ঘরে ঘরে দেখিতেছি—উদ্দালকের ন্যায় জ্ঞানী সাধু পিতার বিরলতা হইলেও এখনও অত্যন্তাভাব হয় নাই।

একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হয়, শ্বেতকেতু এতবার তত্ত্বমসি মহাবাক্যের উপদেশ পাইয়া শেষে কি অবস্থাপন্ন হইলেন? উপনিষদে অতি সংক্ষেপে কেবল এইটুকু আছে যে, তিনি জানিতে পারিলেন। তিনি কি শুধু বুদ্ধিগম্য পরোক্ষ জ্ঞানমাত্র লাভ করিলেন, না, উপলব্ধির দ্বারা তাঁহার অপরোক্ষানুভূতিও হইল? বাস্তবিক কি তাঁহার জগৎকারণের সহিত সম্পূর্ণ অভেদজ্ঞান হইয়াছিল? তিনি কি এই উপদেশ লাভের পর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন বা সন্ন্যাসী হইয়া গেলেন?

এসকল প্রশ্নের সুনিশ্চিত উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। তবে উপনিষদের অন্যান্য উপাখ্যান ও উপদেশাদির আলোচনা করিয়া প্রতীত হয় যে, শ্বেতকেতু পিতার উপদেশে যে জ্ঞানলাভ তখন করিলেন, তাহা অনেকটা পরোক্ষজ্ঞানই বলিতে হইবে এবং সম্ভবতঃ তিনি গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞান সাধনায় জীবন কাটাইয়া খুব বার্দ্ধক্যাবস্থায় হয়ত সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন। উপনিষদে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনের

কথা যাজ্ঞবল্ক্যাদি দুই একটী দৃষ্টান্ত ব্যতীত ও স্থানে স্থানে উহার উপদেশ ব্যতীত বড় অধিক পাওয়া যায় না। তখন-কার কালে বোধ হয় জীবনসংগ্রাম তত প্রবল ছিল না অথবা জ্ঞানচর্চ্চার দিকে আগ্রহ সাধারণতঃ এত অধিক ছিল যে, জনকাদির ন্যায় একচ্ছত্র রাজার কার্য্য করিয়াও অনেকেই তত্ত্বজ্ঞান চর্চ্চার সময় করিয়া লইতেন—এককথায় তখন বোধ হয় plain living and high thinking এর দিকে সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি ছিল। যাঁহারা খুব বেশী অধ্যাত্ম চর্চ্চা করিতেন, তাঁহাদেরই মধ্যে কেহ কেহ অধিক বয়সে যাজ্ঞবল্ক্যের মত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেন। জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চিত ভাবে আজীবন সাধন করা তখনও অসম্ভব হয় নাই।

যাহা হউক, শ্বেতকেতু সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলি সবই আনুমানিক। আমরা যদি এই উপাখ্যানে যে সকল বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছি, তাহাদের ধারণার চেষ্টা করি, আমরা কিরূপ লাভবান্ হইব? সমগ্র জগতে একত্ব ও অখণ্ডত্ব, কার্য্য কারণের অভিন্নতা, জগৎকারণের সহিত আমার ব্যক্তিগত আমিত্ব একত্ব প্রভৃতি তত্ত্বচিন্তা ও প্রণিধান এবং উপলব্ধির চেষ্টা করিতে করিতে আমাদের ভিতর ক্রমে ঘৃণাবিদ্বেষের ভাব একেবারে দূর হইয়া ক্রমে বিশ্বজনীন প্রেমের সঞ্চার হইবে—সমুদয় জগৎকে আমরা প্রেমের চক্ষে দেখিব—সবই আমাদের দৃষ্টিতে প্রেমপূর্ণ হইয়া যাইবে। ভেদজ্ঞানই অপ্রেমের মূল—অভেদজ্ঞান প্রেমের প্রস্রবণ। আর নিজের ব্রহ্মাভিন্নত্ব জ্ঞানে ও উপলব্ধিতে আমাদের ভিতর মহাশক্তি মহাতেজোবীর্য্যের সঞ্চার হইবে। আধ্যাত্মিক রাজ্যে ইহার প্রয়োগে মানুষকে দেবতা করিয়া তুলিবে, মানসিক রাজ্যে মহামনীষী ও ভৌতিক রাজ্যে এক-জন মহাশক্তিধর পুরুষ করিয়া তুলিবে। যাঁহারা এই তত্ত্বজ্ঞানের সহিত ভক্তির বিরোধের আশঙ্কা করেন, তাঁহাদিগকে সংক্ষেপে বলি—যদি সেই আশঙ্কাই হয়, তবে দ্বৈতবাদমতে ব্যাখ্যা করিয়া তৎ ও ত্বম্ পদটীর ৫মী, ৬ষ্ঠী, ৭মী প্রভৃতি যে কোন বিভক্তি দিয়া সমাস করিয়া (যথা, তৎ ত্বম্ অসি—৬ষ্ঠী তুমি তাহার) ব্যাখ্যা করিয়া সেই ভাবই

গ্রহণ করিয়া প্রাণপণে সেই ভাবের উৎকর্ষ সাধন কর—শেষে দেখিও, প্রেমের পরাকাষ্ঠায় আর কোন ভেদ রাখিতে পার কি না।

জ্ঞানী বিচারমার্গ দ্বারা তন্ন তন্ন করিয়া যে শুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্বে উপনীত হন, ভক্ত ভক্তিপথে প্রেমের পরাকাষ্ঠায় সেই অদ্বৈততত্ত্বে না পঁহুছিয়া থাকিতে পারেন্ না। আধুনিক যুগে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ ভক্তি এক।"

চিন্তা করিলে এই এক উপাখ্যান হইতেই এমন মনোহর তত্ত্বাদির অবতারণা করা যাইতে পারে যে, তাহার শেষ হয় না কিন্তু স্থান সংক্ষিপ্ত। অতএব কষ্টস্বীকার করিয়া যাঁহারা এই প্রবন্ধপাঠ করিবেন, তাঁহাদের একজনও অন্ততঃ তৎকালে মূল উপনিষদ্ গ্রন্থ অধ্যয়নে আগ্রহ ও উৎসাহান্বিত হইবেন, এই বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিয়া এই স্থানেই বিরত হইলাম।

রূপ-কথা।

(শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।)

"তার পর?—ঝিম্ ঝিম্ ঝিম—ও কি ডাক্‌ছে, মা?"

"রাত ডাক্‌ছে।"

"কাকে ডাক্‌ছে?—কেন ডাক্‌ছে, মা?"

"অন্ধকার গভীর নিশুতি রাতে রাত এমনি ডাকে।"

"কাকে ডাকে?"

"কাউকে না—আপন মনে। এখন ঘুমো।"

"ঘুম যে আস্‌ছে না।—ওকি। অমন করে উঠ্‌লি কেন? না—আমি আর ঘুমুবো না। তুই গল্প বল—ঐ যে—সেই চারদিক অন্ধকার!—সেই গল্প!—উঃ ভয় করছে!—হাঁ, ভয় করলেই এমনি

তুই আমার গায় হাত বুলিয়ে দিবি।—তারপর—সেই অন্ধকার!—ঘুম পাচ্ছে, মা।"

"ঘুমোও বাপ।"

"তুই গল্প বল্‌তে থাক—আমি ঘুমোতে ঘুমোতে শুনি।"

"ওই নীহারিকামণ্ডল—"

"'তারপর'—বল।"

"তারপর—ওই নীহারিকামণ্ডল—"

"'নীহারিকামণ্ডল' কি?—অমন শক্ত শক্ত বলিস্ কেন? আমার কাণের কাছে তোর মুখ রেখে 'পুট্ পুট্' ক'রে বল্, আর আমি চোখ বুজে 'হুঁ হুঁ' ক'রে শুনি—বল্।"

"চারিদিক অন্ধকার—কেবল অন্ধকার—যে দিকে চাই, অন্ধকার—অন্ধকার—আর কোন কথা নেই—আর কোনো কিছু নেই।"

"তুই?"

"আমিও নেই।"

"কোথায় নেই?—লুকিয়েছিস্ বুঝি? অন্ধকারের মধ্যে?—এযে অন্ধকার। কিছুই যে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে—কোথায় তুই?"

"এই যে, এই যে আমি।—তার পর—"

"হুঁ—তার পর? আলো কই? দেখ্‌তে পাচ্ছিনে তোকে—আলো?"

"আলো!—সেই অন্ধকার আকাশের মাঝখানে হঠাৎ আলো হয়ে উঠ্‌ল।"

"সত্যি সত্যি!—তাই তো! আলো!—চাঁদ উঠেছে!"

"চাঁদ নেই, শুধুই আলো—শুধু মাঝখানে আলো! চারিদিক তেমনি আঁধার—যেন কাল মিশমিশে চুল।"

"মুখের চারধারে?—দেখি মা!"

"দূর পাগলা ছেলে!"

"কি সুন্দর তোর মুখ, মা!—আঃ—তার পর?"

"তারপর—সেই আলোর মাঝখানে ধীরে ধীরে ছায়ার

মতো হলো। ক্রমে সেই ছায়া এক জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী হয়ে উঠ্‌লো।"

"'জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী' কি? তার নাম? ওঃ—তোর নাম বুঝি!"

"হা—হা—হা!—দূর পাগলা ছেলে!—সেই হচ্ছেন মা।"

"মা! কার মা? তুই তো মা! আচ্ছা তার ছেলে কই?"

"এই যে, এই যে—"

"আঃ—তারপর?"

"তারপর—সেই মা আপনার ছেলেকে কোলে করে আকাশের মাঝখানে উদিত হলেন।"

"তার পর?"

"তার পর—সে কি আদর! সে কি হাসি। সে কি আনন্দ!"

"উঃ—আমায় ছেড়ে দে।—তার পর?"

"তার পর—সেই মা তাঁর কোলের ছেলেকে ছেড়ে দিলে।"

"তুইও যে আমায় ছেড়ে দিচ্ছিস্—তারপর?"

"তার পর—ছেলে মায়ের আঁচল ধরে ধীরে ধীরে নীচে এসে নাবলো।"

"কোথায়?"

"আমরা যেখানে আছি—এই মাটীতে।"

"কি করতে? খেলা করতে? হা-হা—হা—কি মজা! কি খেলা?"

"এই ছাই ভস্ম—"

"ঘুম পাচ্ছে মা—আমিও খেলবো—কি খেলা?"

"এই দৌড়াদৌড়ি, হুটোপুটি, কখনও হাসি, কখনও কান্না, কখনও অভিমান—মায়ের সঙ্গে।"

"কি খেলা?—বল্ না?"

"কি দুষ্টু ছেলে!"

"বল না? আমি খেলব।—তার পর?"

"তার পর—ছেলে বায়না ধরলে—খেলবে। মা তখন কি করে।

লাল, নীল, সবুজ, কাল, হলদে, শাদা—কয়েকটি লাড্ডু ছেলেকে দিলেন। ছেলে তাই পেয়ে মহাখুসী—লাড্ডু পেয়ে মার কথা ভুলেই গেল। মা আর কি করে! ছেলেকে ফেলে তো আর যেতে পারে না। হঠাৎ এক বুড়ী সেজে বস্‌ল "

"ডাইনী বুড়ী?"

"না—না—ডাইনী না।"

"কাঠকুড়ুনী?—কাঠকুড়ুনী। 'কাঠকুড়ুনী—কি মা'?—'গাছ-তলাতে গুড়ি গুড়ি—মাথায় ঝাপটা সোনের নুড়ি—সন্ধ্যাবেলা হাতে চুপড়ি—ওগো, তুমি কাদের বুড়ী?' মা,মা, ঐ—ঐ—বুড়ী আস্‌ছে—"

"কোথায় আসছে রে?"

"তুই যে বল্‌লি? বুড়ী—বুড়ী কি কচ্ছিল?"

"বুড়ী দাঁড়িয়ে ছেলেটি লাড্ডু খেল্‌ছিল—তাই দেখ্‌ছিল। দেখে হেসে বল্‌লে—ও ছেলে! কোথায় এসেছ? কোথায় যাবে? এ অজানা অচেনা দেশ! ওমা, তুকি এখানে কেমন ক'রে এলে!—তুমি কাদের ছেলে গা? আহা! যেন রাজপুত্তুরটি"—

"বুড়ী ত খুব ভাল মা?—তার পর?"

"তার পর—বুড়ী বল্লে, 'ওগো, কথা কও। আ—হা—হা, সন্ধ্যা হয়ে এল—এখন সব রাক্ষস, ভূত পেত্নীরা চড়া বেড়াতে আস্‌বে'।—"

"ভয় কচ্ছে—ভয় কচ্ছে, মা!"

"ভয় কিসের?—বুড়ী বল্‌লে, এস বাছা, এ রাজ্যে আর কেউ নেই—কেবল আমি আছি, আর আমার অন্ধের নড়ী—ছয়টি ছেলে আছে। তোমার এই লাড্ডু কয়টি তাদের দিও, দিলে তারা তোমায় পেয়ে ভারী খুসী হবে। তুমি বাড়ী এস, তোমারই বাড়ী—এস যাদু।"

"তারা বুঝি রাক্ষস!—কি হবে?"

"বুড়ী ছেলেটিকে সঙ্গে ক'রে চল্‌ল কত কথা বল্‌তে বল্‌তে—রাস্তা ধরে। সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে, চারিদিক অন্ধকার হ'য়ে এল।

বুড়ী ছেলেটির হাত ধরে নিয়ে চল্‌ল। চল্‌তে চল্‌তে কিছু দূর গিয়ে একটা প্রকাণ্ড বাড়া—ভূতের মতো, চারদিকে খাড়া উঁচু দেয়াল। বাড়ীতে ঢুকে বুড়ী বল্লে, 'এই আমাদের বাড়ী।' কত অন্ধকার কোটা পার হয়ে তারা চল্‌ল—চ'লে একটা প্রকাণ্ড ঘরে গিয়ে ঢুকলো। অন্ধকার সেই ঘরে বুড়ী ছেলেটিকে ছেড়ে দিয়ে স'রে পড়লো।"

"কোথায়?"

"বেরিয়ে গেল—কিন্তু দরজা জান্‌লা বন্ধ। ছেলেটি সেই অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ হ'য়ে একেবারে ভ্যাবা চ্যাবা খেয়ে গেল। ভয়ে একরকম হয়ে গিয়ে লাড্ডু ছুড়ে ফেল্‌লে যাই ফেলা, অমনি শুনলে, সেই ঘরের বাইরে হো হো ক'রে একসঙ্গে কারা বিকট হাসি হাস্‌ছে। সেই শুনে ছেলেটি ভয়ে একটা চীৎকার ক'রে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ল।"

"আমায় ধরে থাক্ মা!—তার পর, তার পর?"

"এমন সময় সেই অন্ধকার ঘর আলো হয়ে উঠ্‌লো। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ছেলেটিকে বুকের ভেতর তুলে নিয়ে চুমো খেলেন। মায়ের যত্নে ছেলের মূর্চ্ছা ক্রমে ভেঙ্গে গেল। যাই ভেঙ্গে যাওয়া অমনি দেখ্‌লে—সেই বুড়ী—অন্ধকার ঘর আবার তেমনি অন্ধকার! দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘরের সব দরজাগুলো একসঙ্গে ঝন্ ঝন্ ক'রে খুলে গেল, আর বিকট হো হো হো হো হো হো শব্দে কতকগুলি ছায়ার মতো মূর্ত্তি ঝড়ের মতো ঘরের ভেতর এসে পড়ল!—"

"ভূত?"

"না—বুড়ীর ছেলেগুলো।—ঢুকেই ছেলেটির চারদিকে ঘিরে ঘিরে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে আবার একবার হো হো ক'রে ভয়ানক একটা হাসি হেসে একসঙ্গে ছেলেটিকে তুলে নিয়ে লোফালুফি খেল্‌তে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে নাচ্‌তে লাগল, আর হো হো কর্‌তে লাগল। এমনি কিছুক্ষণ ক'রে ছেলেটিকে পাষাণের উপর ধুপ্ ক'রে ফেলে দিয়ে আবার হো হো করে হেসে নাচ্‌তে নাচ্‌তে ঘর থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে গেল। ছেলেটি সেই আছাড়ে মা মা ব'লে কেঁদে উঠ্‌লো।"

"মা—মা! না—না—অন্য গল্প বল, এ গল্প নয়।"

"কেন? ভয় কিসের বাপ? এই যে তুই আমার বুকে আছিস্।"

"কই - কই—কই তোর বুকে আছি?"

"এই যে—এই যে।"

"হাঁ—এই তো তুই মা, এই তো তোর বুক। কই তোর মুখ কই? দেখ্তে পাচ্ছিনে—হাঁ। তার পর?"

"তার পর—ভোর হ'ল, সূর্য্য উঠ্লো, ঘরের ভেতর আলো এসে পড়ল। ছেলেটি চোখ চেয়ে মিট্ মিট্ ক'রে আলো দেখ্তে লাগল—"

"আর কচি কচি হাস্তে লাগল।—কি সুন্দর মা, আলোক!—এখন তো রাত!—কখন সূর্য্যি উঠবে মা? কখন ভোর হবে?—উঃ রাত দুপুর!—তার পর?"

"তার পর—বুড়ী এসে তার প্রকাণ্ড চুপড়ীটায় ছেলেটিকে তুলে—সোনের সুড়ী বুড়ী গুটি গুটি মেরে ভূতের মতো বাড়ীটার বাইরে এল। এসে ছেলেটিকে ছেড়ে দিলে।"

"তার পর?"

"তার পর—কিছু দিন পরে ছেলেটি বুড়ীকে বল্লে, 'বুড়ী তুই কে?' বুড়ী বল্লে, 'আমি বুড়ী।' ছেলেটি বল্লে, 'তুই বুড়ী, আর আমি?' বুড়ী বল্লে, 'তুই রাজপুত্তুর'। ছেলেটি চম্কে উঠে বল্লে 'রাজপুত্তুর! তবে আমার মা বাবা কোথায়?' বুড়ী বল্লে, 'সে অনেক দূর।'"

"তবু শুনি।"

"অনেক দূর! এই যে রাস্তা গিয়েছে, যেতে যেতে একটা প্রকাণ্ড বন, সে বন—উঃ কি ভয়ঙ্কর! -বনের পর একটা ধূধূ মাঠ, সেই মাঠের পর একটা নদী—উঃ তাতে কি তোব!—খড়গাছ পড়লে ছিঁড়ে দু খানা হয়ে যায়! সেই নদী পার হয়ে তবে তোমার মার কাছে যাওয়া যায়।"

'বুড়ী, আমি মার কাছে যাব। আমায় তুই সেখানে দিয়ে আয়।"

"আর একটু বড় হও, তার পর যাবে।"

"না বুড়ী, আমায় এখনই দিয়ে আয়।"

"বুড়ী তখন ভয় দেখিয়ে বল্লে, 'ওমা, সে কি কথা! ও সব কি কথা।' বলেই বুড়ী কটমটিয়ে ছেলেটির দিকে চাইলে, ছেলেটি ভয়ে একেবারে এতটুকুখানি হয়ে গেল। বুড়ীকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হ'ল না। মনে মনে 'মার কাছে যাব—মার কাছে যাব' ব'লে কাঁদতে লাগল। এমনি ক'রে সেই ভূতের মতো বাড়ীতে ডাইনীর মতো বুড়ীর কাছে ছেলেটি কিছু দিন রইল। রাজপুত্তুর আরও একটু বড় হইল। একদিন বুড়ী বল্‌লে, 'রাজপুত্তুর, তুমি রাজা হবে।' রাজপুত্তুর বল্‌লে, 'কোথাকার?' বুড়ী বল্‌লে, 'এ দেশের। আমার ছেলেরা তোমার পাত্তোর, মিত্তির, উজীর, নাজীর সেনাপতি হবে। তুমি তখন যা ইচ্ছে কর্‌বে, তাই হবে। বড় বড় নগর তৈরী কর্‌তে পারবে। দেশ বিদেশের ধন-দৌলত মণি মাণিক্যে তোমার রাজপুরী ভ'রে যাবে। তখন এক পরম সুন্দরী রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে দেব। রাজকন্যার হাজার হাজার পরীর মতো দাসী থাক্‌বে। নাচ, গান, আমোদ আহ্লাদে মহাসুখে রাজত্ব কর্‌বে।' রাজপুত্তুর বুড়ীর কথা শুনে বল্‌লে, 'না—না—আমার রাজা হয়ে কাজ নেই, ধন-দৌলত মণি-মাণিক্যে কাজ নেই, রাজকন্যায় কাজ নেই, পরীর মতো দাসীতে কাজ নেই—আমি মার কাছে যেতে চাই।'

রাজপুত্তুরের 'না—না' শুনে বুড়ী প্রথমে কটমটিয়ে উঠ্‌লো, তার পর একগাল হেসে বল্‌লে, 'পাগল! মা কেরে? একদিন ব'লেছিলুম বুঝি? আরে সে যে মিথ্যে মিথ্যি বলেছি—তুমি ছোট ছিলে কিনা। ছোট ছেলেরা রূপ-কথা শুন্‌তে ভালবাসে কিনা—তাই রূপ-কথা বলেছি। এখন বড় সড় হয়েছ, বুদ্ধি সুদ্ধি হয়েছে এখনো কি রূপ কথা শুন্‌তে ভাল লাগে! পোড়া কপাল! সেই আষাঢ়ে গল্প সত্যি ভেবে বসে আছ। মিথ্যা-মিথ্যা ছেলেভুলনে মিথ্যা কথা—রূপ-কথা।'

'না বুড়ী, আমার যেন মনে হচ্ছে, মিথ্যে কথা নয়। আমার মন কেমন কচ্ছে, মার কাছে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে!'

'মা কে রে!—তাকে কি তুই দেখেছিস্?'

'দেখেছি, বুড়ী, দেখেছি—একদিন স্বপ্নে—ঐ যে দিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম।'

'স্ব-প্নে!—হা—হা—হা—স্বপ্নে কত কি দেখা যায়, কখনো আকাশে উড়েছি, কখনো রাজা হয়েছি, কখনো বাঘে তাড়া কচ্ছে, কখনো ম'রে গেছি—কেমন, এ সব দেখ না?'

'দেখি।'

'তবে আর কি!'

'না—না—আমার মাকে দেখেছি। সে যদি স্বপ্ন হয়, তবে এই যে তোর বাড়ীতে আছি, এই যে সব দেখ্‌ছি, তোকে দেখ্‌ছি—আর এই যে তুই সব রাজ্য করবি না কি কর্‌বি, বলছিস্—এও স্বপ্ন।—এতো—স্বপ্ন!—এই স্বপ্ন, আর সেই স্বপ্নই সত্য।'

বুড়ী তখন চোখ পাকিয়ে রাজপুত্তুরের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল। তার পর মুখ হাসি হাসি ক'রে বল্‌লে, 'আহা, কি হবে। বাছার আমার অসুখ করেছে—স্বপ্নের পেত্নীতে পেয়েছে! একটা অষুধ—আজ রাত্রে শোবার আগে খেয়ো এখন আর কোনো উৎপাৎ থাক্‌বে না—বেশ ঘুম হবে। যদি বা কোন স্বপ্ন দেখ, যা সত্যি ঠিক্ ঠিক্ মিলে যাবে, এমন স্বপ্ন দেখ্‌বে।'

রাত হ'ল। বুড়ী কাঠের মতো শক্ত একটা পাত্তোরে খানিকটা অষুধ রাজপুত্তুরকে খাইয়ে দিলে। খেয়ে রাজপুত্তুর বললে, 'বুড়ী, আমার মাথা ঝিম্ ঝিম্ কর্‌ছে।'

বুড়ী হেসে বল্‌লে, 'ঐ তো অষুধের গুণ! খেলেই ঘুম পায়! সবটা খাও, যাদু।'

বুড়ীর কথায় রাজপুত্তুর সবটা চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেল্‌ল। খেয়েই ঢুল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। ঢুলে ঢুলে ঢলে পড়ল। বুড়ী তখন পাত্তোরটা পাষাণের মত মেঝেতে তিনবার হা—হা—হা—ক'রে ঠুকে হো—হো—

ক'রে হেসে উঠ্‌লো। সমস্ত ঘরটা হাসিতে যেন ভয়ে আঁৎকে উঠ্‌লো। হাসি শুনে বুড়ীর ছেলেগুলো ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌তে নাচ্‌তে ঘরে ঢুক্‌লো। ঢুকে রাজপুত্তুরের চারধারে হাত ধরাধরি ক'রে নাচ্‌তে লাগ্‌ল। খানিকক্ষণ নেচে চলে গেল। বুড়ী তখন ঘুমন্ত রাজপুত্তুরের শিয়রে বসে একদৃষ্টে রাজপুত্তুরের মুখের দিকে চেয়ে রইল। আর বিড় বিড় করে কি বক্‌তে লাগ্‌ল। কিছুক্ষণ বিড় বিড় ক'রে তার পর গম্ভীরস্বরে বল্‌লে

'রাজপুত্তুর।'

রাজপুত্তুর ঘুমের মধ্যেই উত্তর দিলে,

'হুঁ'

বুড়ী আবার জিজ্ঞেস করলে,

'বল দেখি, আমি কে?'

'তুই ডাইনী বুড়ী।'

'আমায় মা বল্, নইলে তোর নিষ্কৃতি নেই।'

'না—আমার মা এক মা, অন্য মা নেই।'

'ঠিক্—কিন্তু আমাকেও 'মা' না বল্লে, আমাকে তুষ্ট না কর্‌লে আমার হাত হ'তে কেউ এড়াতে পারে না।'

'না—তুই ডাইনী। ডাইনী ডাইনী, ডাইনী কি মা হয়?'

'না-ই বা হ'ল, হেলা ক'রে একবার মা বল্ না।'

'না—তুই আমায় কত কষ্ট দিচ্ছিস্—মার কাছে যেতে দিচ্ছিস্ নে।—এই তোর কাজ, তুই ডাইনী। তোর ইচ্ছে আমায় এমনি করে রাখিস্।'

'না—ইচ্ছে নয়? তবে এই আমার কাজ।'

'ইচ্ছে নয়; তবে করিস্ কেন?'

'মজা করবার জন্যে।'

'তুই রাক্ষসী!'

'আমি রাক্ষসী মা।'

'রাক্ষসী মা! সে কেমন মা?'

'যেমনই হোক, এক বার বল না?—বল, আমি আর তোর দুঃখ দেখ্‌তে পাচ্ছিনে—মা বল!'

'বল্‌লুম।'

'বল্‌লি—খুসী হ'য়েছি—হা হা হা এখন আমার কাজ—শুধু দেখ্‌বি—আমি খুসী হয়েছি—দেখেই ছুটি—কিন্তু তখনও আমি তোকে বাঁধতে পিছু পিছু ছুটব—'

'তুই যা পারিস্, করিস্—তোকে আমার ভয় নেই—তুই যতই ভয় দেখাস্ না কেন।'

'হা—হা—হা—কি আনন্দ! ডাইনীকে সবাই ভয় করে—ভয় করে আর আমার বুকে বাজে।—রাজপুত্তুর!'

'কি?'

'আমার সঙ্গে এস'—না—না—ঐ দেখ—ঐ দেখ—কি দেখ্‌ছ?'

'আগুন—দাউ দাউ জ্বল্‌ছে। আগুনের শিখায় শিখায় কালো কালো ছায়ামূর্ত্তি—অসংখ্য—নাচ্‌ছে—উঃ কি ভয়ঙ্কর! ঐ আমায় ডাক্‌ছে—ভয় করছে। ডাইনী, ভয় কর্‌ছে!'

'আবার দেখ।'

'এ কি! কোথায় আগুন? এ যে পরীর রাজ্য!—কি সুন্দর! মণি মুক্তা পাথরের পুরী—কি সুন্দর! কি জ্যোতিঃ।—কি সুন্দর থরে থরে ফুলের মালা—ফুলের তোড়া ঝিকি মিকি পাথরের উপরে ছড়ানো—থরে থরে সাজানো। পরীর মন্দির—কি সুন্দর।—ফুলে ফুলে নাচ্‌ছে—পরীরা হাত ধরাধরি করে। নাচ্‌ছে—ঘুর্ ঘুর্ ঘুর্। সোনার আঁচল যেন হাজার পদ্মের পাপ্‌ড়ী উড়্‌ছে—ফুর্ ফুর্ ফুর্। সবুজ—নীল—লাল—সোনালি—আলো—থেকে থেকে জ্বলে উঠ্‌ছে—উজ্জ্বল, আরো উজ্জ্বল হল। ঐ যে নাচ্‌তে নাচ্‌তে থম্‌কে দাঁড়াল—এক সঙ্গে সবাই মাথা নীচু কর্‌লে। ঐ যে আ লার পুরীর দরজা খুলে গেল—কে এ? সুন্দর! কে এ?—পরীর রাণী!—এত সুন্দর! ধীরে ধীরে ধীরে ঐ যে এসে দাঁড়াল। ও কি! আমার মুখে এক-দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। হাতে ফুলের মালা—আমার দিকে তুলে ধরেছে।'

'রাজপুত্র, এই রাজ্য—অনন্ত ঐশ্বর্য্য অনন্ত সৌন্দর্য্য—অনন্ত সুখ—রাজা হবে? বল—'না', বল '

'কেন ডাইনী?'

'আমায় 'না' বলেছ যে!'

'যদি না বল্‌তুম?'

'তবে এ সব তোমার হ'ত।'

"তুই ডাইনী!—ঐ দেখ, সে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে ও কি!—কি বল্‌ছে?—'পান কর'—মৃদু মৃদু হাসি—আবার সেই কথা,—'পান কর—আমায় ডাক্‌ছে দুহাত বাড়িয়ে—'এস রাজপুত্তুর'—উঃ কি জ্বালা, কি সুখ! আমার বুকের ভেতর সুখের শেল বিঁধছে—উঃ—এই তো স্বর্গ—পূর্ণ জ্বালা, পূর্ণ সুখ—স্বর্গ, স্বর্গ, স্বর্গ—স্বর্গের রাজা আমি হব—আর আমার রাণী—"

'আমি হব। এস, এস রাজপুত্তুর!'

'তুমি কে?'

'এখনো জিজ্ঞেস্ করছ?'

'হাঁ।'

'শোনবার কি দরকার?—সময় যায়—কে দেখ্‌বে—কার বিষ-দৃষ্টি পড়্‌বে—সব ভেঙ্গে যাবে! এস রাজপুত্তুর! পান কর!'

'ভেঙ্গে যাবে? তার পর?—ঐ যে ডাইনী মৃদু মৃদু হাস্‌ছে—ডাইনী কি বল্‌ছিস্?'—কি?—'তার পর সেই আগুন—আগুনের অনন্ত শিখা—সে শিখায় ছায়া মূর্ত্তি কুৎসিৎ কালো—নাচ্‌বে—হাত-তালি দেবে—কিন্তু শব্দ হবে না। আর তুমি রাপুত্তুর, সে আগুনের মাঝখানে শবের মত শুয়ে'—'ডাইনী, সে কোথায় গেল? স্বর্গের রাণী—'

'তার মনের কথা ধরা পড়েছে। তাই গেল?'

'কোথায় গেল?'

'যেখান হ'তে আস্‌তে দেখেছিলে।'

'সে তো আগুন! ঐ—ঐ—উঃ কি আগুন!—ছুটে আস্‌ছে—

আমার দিকে সহস্র ফণা তুলে আস্‌ছে।—কোথা যাব?—কোথা যাব?—মা—মা!—'

মুখের কথা মুখে থাকৃতেই রাজপুত্তুরের ঘুম ভেঙ্গে গেল। রাত্রি কখন প্রভাত হয়েছে—সূর্য্য উঠেছে। রাজপুত্তুর ধড়মড়িয়ে লাফিয়ে উঠে পড়্‌ল—তখনো বুক কাঁপছে। দেখ্‌লে রাতের সেই ডাইনীর অষুধের পাত্র খালি পড়ে আছে। ভয়ে তার প্রাণ শিউরে উঠ্‌লো। রাজপুত্তুর এক নিঃশ্বাসে সে ঘর হতে বাহির হল। বাহির হয়ে কোঠার পর কোঠা পার হ'য়ে দেয়ালের বাইরে এসে পড়্‌ল। মনে হ'ল সেই নদীর তীর। তার ওপারে মা আছে। রাজপুত্তুর ছুট্‌লো সেই রাস্তা ধ'রে। কিছু দূর দৌড়ে হাঁপিয়ে পড়্‌ল। তবু ছুটতে লাগ্‌ল। ভোর হ'তে আরম্ভ ক'রে দুপুর হ'ল। তখন দেখ্‌লে সাম্‌নে একটা প্রকাণ্ড বন। বনের ভেতর ঘোর কুট্টি অন্ধকার। বাঘ ভালুকের ডাক।

"ঐ ঐ মা, কি যেন ডাক্‌ছে।—ভয় কচ্ছে"

"ভয় কি বাপ!—তার পর সেই বনের মধ্যে ঢুকে তো রাজপুত্তুর একেবারে কেমন হ'য়ে গেল। একবার ভাবলে—ফিরে যাই—এ বনের চেয়ে ডাইনী ভাল। এমন সময় শুন্‌লে বনের বাইরে—হা রে রে রে শব্দ। ধর্‌ ধর্‌—পালাল—পালাল—গাছের আড়াল হ'তে উঁকি মেরে রাজপুত্তুর দেখ্‌ল, ডাইনী বুড়ী তার ছেলেগুলো নিয়ে আসছে। ভাব্‌লে ফিরে যাই—এ বনের চেয়ে ডাইনী ভাল। এমন সময় আবার শুন্‌লে বনের বাইরে হা রে রে রে শব্দ। ধর্‌ ধর্‌—পালাল—পালাল। গাছের আড়াল হ'তে উঁকি মেরে রাজপুত্তুর দেখ্‌ল, ডাইনী বুড়ী তার ছেলেগুলো নিয়ে তেড়ে আস্‌ছে। বুড়ী বল্‌লে, 'ঐ—ঐ—ঐ বনে ছোঁড়া ঢুকেছে—শীগ্‌গীর—শীগ্‌গীর এগিয়ে যা।' এই না শুনে রাজপুত্তুর বনের আরো ভেতরে গিয়ে ঢুক্‌লো। কাঁটায় সমস্ত শরীর ছিঁড়ে গেল গাছের গুঁড়ি মাথায় লেগে মাথা কেটে দর্‌ দর্‌ ক'রে রক্ত পড়্‌তে লাগ্‌ল, কতবার হোঁচোট্‌ খেয়ে প'ড়ে গেল। একবার একটা অজাগর সাপের গায় পা পড়্‌ল, 'ওমা!' বলে লাফ

দিয়ে সাপটা ডিঙ্গিয়ে গেল।"

"তুই আমায় ধরে থাক, মা। ভয় করছে।"

"ভয় কি।—এমনি দৌড়ুতে দৌড়ুতে রাজপুত্তুর বনের বাইরে এসে পড়ল। একটা ধূ ধূ মাঠ। রাজপুত্তুর মাঠের উপুর দিয়ে আরো জোরে ছুটলো। ছুটতে ছুটতে মাঠের মাঝখানে এসে একেবারে ব'সে পড়ল। তেষ্টায় ছাতি ফাটে ফাটে—'জল, জল' ব'লে চীৎকার করে উঠলো।"

"মা, মা, আমার গলা শুকিয়ে গেছে। তেষ্টা পেয়েছে—জল খাব।"

"এই সময় শুনলে—কিছু দূরে পেছনে সেই তারা ছুটে আসছে—হৈ হৈ—ধর্ ধর্ শব্দে। রাজপুত্তুর জল টল ভুলে গেল, পিপাসা কোথায় পালাল। কিছুদূর যাচ্ছে আর পেছন ফিরে দেখছে—কদ্দূর এল। ডাকাতেরা কাছে এসে পড়েছে। এমন সময় দেখলে দূরে আয়নার মতো চক চকে একটি নদী। দেখেই রাজপুত্তুর 'ঐ ঐ ব'লে আরো ছুটে চল্‌ল ডাকাতেরা যেন একেবারে কাছে এসে পড়েছে, রাজপুত্তুর আরো ছুটে চল্‌ল। ছুটতে ছুটতে নদীর একেবারে কাছে এসে পড়ল আর একটু আর একটু—কিন্তু ডাকাতেরা তাকে ধরে ধরে আর এক পা হলেই নদী—রাজপুত্তুর 'মা মা' বলে জ'লে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডাকাতদের লাঠির আঘাত লাগতে না লাগতে রাজপুত্তুর ঝাঁপ দিল। তখন রাজপুত্তুরের আর জ্ঞান নাই। যখন জ্ঞান হ'ল তখন দেখলে—"কি দেখলে?"

"দেখলে?—সেই মাকে—জ্যোতিস্ময়ী দেবীকে।"

"হাঁ—যেন ঘুম ভেঙ্গে চোখ চেয়ে দেখলে—দেখলে, মা যেন ঠিক তেমনি করে তাকে কোলে করে বসে আছে।"

"এই যেমন তুই আমায় কোলে করে বসে আছিস্, আর রূপ-কথা বল্‌ছিস—না?"

"হুঁঃ"

স্বপ্ন-তত্ত্ব।

ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার এম. এ. এল, এম, এস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যে সকল স্বপ্ন সফল হইয়াছে সেই সকল স্বপ্ন সম্বন্ধে সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটি (Psychical Research Society) বা মনস্তত্ত্ব গবেষণা সভা বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়াছেন। ক্যামব্রিজের প্রফেসর সিজউইক, আমেরিকার হাভার্ডের প্রফেসর উইলিয়ম জেমস এবং ফ্রান্সে মুসে রবত ও মার্বিটেন এইরূপ স্বপ্ন লইয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন। ইঁহারাও উক্ত সোসাইটির পক্ষ হইতে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। আমাদের ও দেশের সাহিত্যিক, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম. এ, বি, এল মহাশয় স্বপ্রণোদিত হইয়া ঐরূপ স্বপ্ন সকল সংগ্রহ করিয়া বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সংগৃহীত বিবরণ হইতে কতক-গুলি দৃষ্টান্ত এই প্রবন্ধ মধ্যে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইবে।*

স্বপ্নাবস্থায় আমাদের স্মৃতিশক্তি অধিকতর প্রখর হয় এবং অতী-তের স্মৃতি অধিকতর উজ্জ্বলভাবে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। জাগ্রৎ অবস্থায় অনেক বিষয়ই আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, কিন্তু এই সকল বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে কোন মনোযোগ দিই না বলিয়া তাহারা স্মৃতিপটে কোন চিহ্নই রাখিয়া যায় না বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ ঘটনার অনেকগুলি আমাদের স্মৃতিপটে চিহ্ন রাখিয়া যায়। যদিও এই সব ঘটনার জ্ঞান সাধারণতঃ আমাদের জাগ্রৎ মনের বাহিরে থাকে, তথাপি স্বপ্নে কখন কখন স্মৃতিশক্তি

---

* সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটির কার্য্য বিবরণীর ২৫ সংখ্যায় সফল স্বপ্নের কথা অনেক আছে।

অসাধারণরূপে প্রখরতা লাভ করিয়া, এই সব ঘটনা আমাদের মন-মধ্যে জাগাইয়া দেয়। কোন কোন পণ্ডিত সফল স্বপ্ন সম্বন্ধে উপরোক্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অনেক সফল স্বপ্ন সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যাই যথার্থ বলিয়া আমাদেরও মনে হয়। স্বপ্নে স্মৃতিশক্তি কিরূপ প্রখরতা লাভ করে তাহার দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে

এবারক্রম্বি Abercrombie) ৭ বৎসর বয়সের সময় বাইবেলের একটি পদ শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেইটি স্মরণ করিবার জন্য কয়েকদিন উপর্য্যুপরি ক্রমাগতঃ চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই সফল হইতে পারেন নাই। বহুদিন পরে প্রৌঢবয়সে একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন, জেরিমিয়া (Jeremiah) পুস্তকের যে অধ্যায়ে সেই পদটি আছে, তাহা তাঁহার চক্ষের সম্মুখে খোলা রহিয়াছে; স্বপ্নে সেই পদটি পাঠ করিতে সক্ষম হইলেন।

স্বপ্নে স্মৃতিশক্তির এইরূপ অসাধারণ প্রখরতা লাভের সূত্র ধরিয়া কিরূপে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ সফল স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন তাহাও দ্রষ্টব্য

উক্ত মনস্তত্ত্ব গবেষণা সভার—প্রকাশিত একটি স্বপ্ন বিবরণী এবং তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ—

একজন জার্ম্মাণ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মিশর দেশ (Egypt) হইতে কতকগুলি শিলালিপি উদ্ধার করেন। যে সব শিলালিপি প্রায় সম্পূর্ণ ছিল, তাহাদের তিনি পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু যেগুলি ভগ্ন অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অনেক চেষ্টা করিয়াও সেগুলির মর্ম্মোদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন না। এমন সময় একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে, এক অপরিচিত বৃদ্ধ আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন যে, পুরাকালে ঐখানে মিশরের এক দেবমন্দির ছিল; তিনি (বৃদ্ধ লোকটি) ঐ মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ যে ভগ্ন শিলালিপি পাইয়াছেন সেগুলি ঐ মন্দিরের দরজার উপরস্থিত

* Enquiries concerning the Intellactual powers.

প্রস্তরের ভগ্নাংশ। এই প্রস্তরের বিভিন্ন অংশে বর্ণের তারতম্য আছে বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ ভগ্ন শিলালিপিগুলি এক প্রস্তরের অংশ নহে বলিয়া ভ্রম করিতেছেন। কিন্তু তিনি যদি প্রস্তরখণ্ডগুলি ভাল করিয়া দেখেন, তাহা হইলে প্রস্তরখণ্ডগুলির মধ্য দিয়া একটি ভিন্ন বর্ণের শিরার মতন সূক্ষ্ম দাগ দেখিতে পাইবেন, যাহাতে বুঝা যায় যে প্রস্তরখণ্ডগুলি একই প্রস্তরের বিভিন্ন অংশ মাত্র। তিনি যদি এই শিলালিপির খণ্ডগুলি একই প্রস্তরের অংশ বিবেচনা করিয়া ভগ্ন খণ্ড-গুলিকে একত্র সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে অচিরেই তাহার পাঠোদ্ধার হইয়া যাইবে। বাস্তবিকই স্বপ্নদৃষ্ট বৃদ্ধের এই উপদেশ গ্রহণ করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মনস্তত্ত্ব গবেষণাসভার পত্রিকায় Journel of the Phychical Research Society) যে লেখক এই স্বপ্নবৃত্তান্তটি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তিনি ইহা এইরূপভাবে আলোচনা করিয়াছেন—প্রত্নতত্ত্ববিৎ যদিও তাঁহার সাধারণ জ্ঞানদ্বারা স্পষ্টভাবে ঐ রেখাটির অস্তিত্ব অনুভব করেন নাই, তথাপি ঐ প্রস্তরখণ্ডের ভিতর যে সূক্ষ্ম শিরার মতন দাগ আছে, তাঁহার দৃষ্টিশক্তি তাহা অনুভব করিয়াছিল। এই তত্ত্বটি তাঁহার সাধারণ জ্ঞানের অজ্ঞাত থাকিলেও তাঁহার অজ্ঞাত মন তাহা সংগ্রহ করিয়াছিল এবং এই তত্ত্বটি ধরিয়া অজ্ঞান মন স্থির করিতে পারিয়াছিল যে বিভিন্ন ভগ্ন শিলাখণ্ডগুলি একই প্রস্তরের অংশ। একাগ্র চিন্তার ফলে অজ্ঞাত মন স্বপ্নের ভিতর দিয়া সাধারণ মনকে এই কথা বলিয়া দিয়া তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিল।

এবারক্রম্বি (Abercrombie) একটি স্বপ্নের উল্লেখ করিয়াছেন। একটি ব্যাঙ্কের কেরাণী ব্যাঙ্কের হিসাব মিলাইতে গিয়া হিসাবের সঙ্গে ছয় পাউণ্ডের অমিল দেখিয়া বিশেষ মুস্কিলে পড়িল। সমস্ত দিন সে হিসাবে ভুলের কারণ স্মরণ করিবার বৃথা চেষ্টা করিল। রাত্রে সে স্বপ্নে দেখিল যে, এক "তোৎলা" লোক

আসিয়া তাহাকে তাহার প্রাপ্য টাকা দিবার জন্য বিশেষ জিদ করিতেছে। সেই লোকটিকে বিদায় করিয়া দিবার জন্যই যেন ব্যাঙ্কের কেরাণী তাহাকে সেই ছয় পাউণ্ড তৎক্ষণাৎ দিয়া ফেলিল।

টাকার জন্য কড়া তাগাদায় সে সময় সে অত্যন্ত রাগিয়া গিয়াছিল, এই জন্য হিসাবের খাতায় খরচের কথা লিখিতে পারে নাই—টাকা দেওয়ার কথাও ভুলিয়া গিযাছিল। স্বপ্ন দর্শনে তাহার সে ভুল ভাঙ্গিল।

মরি (Maury) একটি স্বপ্নের ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন—এক ভদ্রলোক বাল্যকালে মণ্টব্রাইসন (Montbrison) সহরে শিক্ষা-লাভ করিয়াছিলেন, ২০ বৎসর পরে ঐ সহর পুনঃ দর্শন করিবার ইচ্ছা করেন। যে দিন ঐ সহর দর্শন করিতে যাত্রা করিবেন, সেই দিন রাত্রে স্বপ্নে দেখেন যেন মণ্টব্রাইসন সহরে উপস্থিত হইযাছেন এবং তথায় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এই ভদ্রলোকটি আগন্তুকের পিতার পুরাতন বন্ধু বলিয়া নিজের পরিচয় দিলেন এবং নিজের নামোল্লেখ করিলেন।

তৎপরদিন সহরে উপস্থিত হইয়া স্বপ্নে যেরূপ সহরের দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, সেইরূপ দৃশ্য দেখিলেন। একজন ভদ্রলোক তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া আপনাকে তাঁহার পিতার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিলেন। গ্রন্থকার এই স্বপ্নটি যাত্রার উত্তেজনায় পূর্ব্বস্মৃতির জাগরণে নিষ্পন্ন এইরূপভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।* ইহার একটি প্রধান কারণ এই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে স্বপ্নে পিতার বন্ধুকে যেরূপ যুবক দেখা গিয়াছিল, বস্তুতঃ তাঁহাকে তিনি অনেক বৃদ্ধ দেখিয়াছিলেন।

মাকারিও নিম্নলিখিত স্বপ্নবিবরণটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এক জনের পুত্র তাহার পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে একখণ্ড

* Maury—Annales Medico-psychologiques 1861.

জমী প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই জমীখণ্ডটি তাহার পিতা মূল্য দিয়া কিনিয়া ছিলেন, এ কথা সে তাহার পিতার নিকট শুনিয়াছিল কিন্তু এই জমীর দলিল তাহার পিতা কোথায় রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা সে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই। পরে এই জমী লইয়া একটি মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়, যাহাতে এই দলিলখানি আদালতে উপস্থিত করিতে না পারিলে, জমার উপর তাহার অধিকার বিলোপের সম্ভাবনা। মোকদ্দমার শেষ দিন, অর্থাৎ যে দিন সেই দলিল আদালতে উপস্থিত করিতে না পারিলে তাহাকে মোকর্দ্দমায় হারিতে হইবে, তাহারই পূর্ব্বরাত্রে সে স্বপ্নে দেখিল যে ঐ দলিল খানি একজন বৃদ্ধ উকিল, যিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারই নিকট রহিয়াছে। ভূম্যধিকারীর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে বাস্তবিকই ঐ উকিলের নিকট হইতে সেই দলিলখানি প্রাপ্ত হইলেন এবং মোকর্দ্দমায় জয় লাভ করিলেন। গ্রন্থকার এই স্বপ্নটি বাল্যকালের পূর্ব্বস্মৃতির উদ্ধারভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।*

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয়ের সংগৃহীত সত্য স্বপ্নের বিবরণগুলির দুই একটি বোধ হয় ঐ ভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। তাঁহার লিখিত বিবরণী এই—"একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা† লিখিতেছেন যে—প্রায় দুইবৎসর পূর্ব্বে আমাদের একটি ওয়াচ্ ঘড়ীছিল। সেটি অল্প দিনের মধ্যে দুই তিনবার ভাঙ্গিয়া যায়। তজ্জন্য সেটিকে খুব সাবধানে দম দওয়া ও ব্যবহার করা হইত। একদা আমি স্বপ্নে দেখিলাম, ঘড়ীটিতে দম দিতেছি আর এক প্রকার শব্দ করিয়া ঘড়ীটি ভাঙ্গিয়া গেল। পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে দম দিতে গিয়া আমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ায় খুব সাবধানে দম দিতে ছিলাম; কিন্তু হঠাৎ ঠিক সেই রকম শব্দ করিয়া সত্য সত্যই ঘড়িটী ভাঙ্গিয়া গেল।"

যখন ঘড়ীর স্প্রিং (spring) পূর্ব্বাপেক্ষা খারপ হওয়ার দরুণ

---

* Macario—*Gazette Medicale de Paris* 18·7.

† শ্রীমতী অমৃতা ঘোষযায়া, ভুকানগাঁও।

উহা পরিবর্ত্তন করা হয়, তখন যে ঘড়ীতে দম দেয় তাহার অনুভূতির কিন্তু পরিবর্ত্ত হওয়া সম্ভব, কিন্তু এই অনুভূত এত সামান্য এবং অস্পষ্ট যে তাহা আমাদের জাগ্রৎ মনের গোচর হওয়া সম্ভব নহে। তথাপি এই অনুভূতি যে কখন কখন অজ্ঞাত মনের গোচরে না আসিতে পারে এমন নহে। হয়ত ঘড়ীর স্প্রিং ভাঙ্গিবার পূর্ব্বের অবস্থার মত অবস্থা হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বদিনের দম দিবার সময়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি দ্বারা মহিলাটির অজ্ঞাত মনের গোচরে আসিয়াছিল। অজ্ঞাত মনের এই জ্ঞানটিই স্বপ্নের সৃজন করিয়া দিয়াছিল, এবং বাস্তবিক ঘটনাতেও তাহাই ঘটিয়াছিল।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীশশধর বাবু কর্ত্তৃক সংগৃহীত আর একটি মহিলার স্বপ্ন বিবরণী এইরূপ—"তাঁহার গৃহপালিত হাঁসগুলির ডিম হইত না। তিনি সে জন্য অনেক সময় আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। এক রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহার হাঁস ডিম পাড়িয়াছে। যথার্থই পর দিবস হইতে হাঁসগুলি ডিম পাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল।"

অন্যান্য পক্ষীদের মতন ডিম পাড়িবার পূর্ব্বে হাঁসেরও স্বরের এবং অন্যান্য ব্যবহারের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয়। মহিলাটি যদিও জাগ্রৎ মনের দ্বারা এই পরিবর্ত্তন গুলি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, তথাপি সম্ভবতঃ অজ্ঞাত মনদ্বারা এই পরিবর্ত্তনগুলির কিছু কিছু উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এই উপলব্ধিই তাঁহার স্বপ্নের সৃজন করিয়াছিল। এবং বাস্তব উপলব্ধি বলিয়া বাস্তব জগতেও সেইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল।

শশধর বাবু শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একটি স্বপ্ন এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"যখন আমি শোণবর্ষায় মহারাজ ৺হরবল্লভ নারায়ণ সিংহ মহোদয়ের অধীনে কার্য্য করিতাম, তখন মান্‌সী ষ্টেসন হইতে শোণবর্ষা যাইবার পথে একটি স্থান দেখিয়া তাহা আমার পূর্ব্বাপরিচিত বোধ হইল, অথচ আমি তৎপূর্ব্বে ঐ অঞ্চলে কোন দিনই যাই নাই। সেই স্থানটিতে আমার যান নামাইয়া বাহকেরা বিশ্রাম করিতেছিল; আমি

যান হইতে অবতরণপূর্ব্বক স্থানটি বেশ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। যতই দেখিতে লাগিলাম, ততই আমার নিকট উহা পরিচিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তারপর ভাবিতে ভাবিতে আমার বেশ মনে পড়িল যে ঠিক এক বৎসর কি দশমাস পূর্ব্বে একদিন রাত্রিতে আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যে, আমি এই পথে যাইতেছি। স্বপ্নের অন্যান্য ঘটনার সহিত বর্ত্তমান গমনের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না ; কিন্তু এই স্থানটি দিয়া যাইতেছিলাম এবং এখানে বিশ্রাম করিয়াছিলাম ; তাহা আমার নিকট সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইল এবং ইহাও মনে পড়িল যে আমার স্বপ্নে সেখানে একটি দেবীমন্দির দেখিয়াছিলাম। এই কথা মনে হইবামাত্র আমার বাহকগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহার নিকটে কোন দেবী মন্দির আছে কি না। তদুত্তরে তাহারা অদূরবস্থিত একটি আম্রকুঞ্জ দেখাইয়া বলিল যে সেখানে "মাই কাত্যান কি স্থান" অর্থাৎ কাত্যায়নী দেবীর মন্দির আছে। ইহা জানিয়া আমি এক বৎসর পূর্ব্বের স্বপ্নের সহিত ইহার সামঞ্জস্য দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। বলা বাহুল্য ইতিপূর্ব্বে আমি এই দেবী স্থানের বিষয় কিছুই অবগত ছিলাম না।"

কোন কোন নূতন দৃশ্য কিম্বা নূতন লোক দেখিয়া মনে হয় যে এই নূতন দৃশ্য কিম্বা লোক একবারে প্রথম দেখা হইতেছে এরূপ নহে পূর্ব্ব হইতেই যেন তাহাদিগকে কোথাও না কোথাও দেখা আছে. ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অনেক সময় এইরূপ নূতন দৃশ্য পূর্ব্বে স্বপ্নে দেখা গিয়াছে মনে হইয়া যেন পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। সাধারণতঃ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের ধারণা এই যে এইরূপ বিশ্বাস মনের ভ্রম।

কিন্তু যথার্থই যে অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য এবং মনুষ্য পূর্ব্বে স্বপ্নে দেখা গিয়া থাকে তাহারও প্রমাণ আছে।

লিবাল্ট (Liebault) এইরূপ একটি স্বপ্নের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণটি এই। একটি স্ত্রীলোক স্বপ্নে

দেখেন যে তিনি যেন পা পিছলাইয়া জলে পড়িয়া যাইতেছেন, তখন একটি অপরিচিত লোক তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিল। সেই পুরুষটির নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তাঁহার নাম অলরি (Olory)। স্বপ্নে স্ত্রীলোকটি পুরুষটির চেহারা এরূপ স্পষ্ট ভাবে দেখিয়াছিল যে সেই চেহারাটি তাহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে একটি পুরুষ ঐ স্ত্রীলোকটির গৃহে প্রবেশ করে, তাহাকে দেখিয়া স্ত্রীলোকটি স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ বলিয়া চিনিতে পারেন। তখন স্ত্রীলোকটি পুরুষকে প্রশ্ন করেন যে আপনার নাম কি অলরি (Olory), তাহাতে পুরুষটি নিজের ঐ নাম বলিয়া স্বীকার করেন। স্ত্রীলোকটি যদি পুরুষটিকে ঐরূপ ভাবে নাম না জিজ্ঞাসা করিয়া পুরুষটিকে স্বরূপ বলিতে দিতেন এবং নিজের ধারণার সহিত মিলাইয়া তাহার সত্যাসত্য যাচাই করিতেন তাহা হইলে এই ব্যাপারটি নাম শ্রবণ করিবার পরে তাহার ভ্রম বিশ্বাস হইয়াছে পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়া উড়াইয়া দিতেন। কিন্তু স্ত্রীলোকটি প্রথমেই পুরুষটির নাম বলিতে পারিয়াছিল বলিয়া লিবাল্ট (Liebault) এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে ঐ পুরুষটি স্ত্রীলোকের বাড়ীর কয়েক মাইল দূরে বাস করিত। তাহাতে লিবাল্ট সিদ্ধান্ত করেন যে হয়ত ঐ স্ত্রীলোকটি পুরুষটিকে রাস্তায় কিম্বা অন্য কোনখানে মনোযোগ না দিয়া শুধু চক্ষুর দৃষ্টিতে দেখিয়াছে; সম্ভবতঃ তাহাকে কেহ নাম ধরিয়া ডাকিয়াছে, সেই শব্দটি তাহার মনোযোগ আকর্ষণ না করিয়া কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই সবগুলি হয়ত তাহার জাগ্রৎ মনে কোনও স্মৃতিচিহ্ন রাখে নাই, কিন্তু তবুও তাহার অজ্ঞাত মনে অস্পষ্ট দাগ রাখিয়াছিল যাহা হইতে ঐ স্বপ্নের সৃষ্টি হইয়াছে।*

লিবল্টের এরূপ সিদ্ধান্ত একেবারে অযৌক্তিক নহে। তবে অনেক স্বপ্ন বিচার করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে স্বপ্নে কথন কথন

* Liebault—Dee Sommeel et des etats analogues 1866.

যথার্থই প্রাগ্‌দর্শন হইয়া থাকে। শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্বপ্নে যে দেবী মন্দিরের কথা আছে তাহা মনের ভ্রম বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিতেরা বলিবেন যে দেবী মন্দিরের কথা হয়ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় কাহারও নিকট শুনিয়া ভুলিয়া গিয়াছেন। সেই জন্য এই স্বপ্নটি লুপ্ত স্মৃতির পুনরুদ্ধার। কিন্তু আমাদের বোধ হয় এইটি একটি প্রাগ্‌দর্শনের স্বপ্ন।

অনেক সময় নূতন দৃশ্য পুরাতন বলিয়া বোধ হয় তাহার কতকগুলি পুনর্জন্মবাদ সিদ্ধান্ত দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় কিনা তাহাও একটি অনুসন্ধানের বিষয়।

এবারক্রম্বি একটি আশ্চর্য্য সত্য স্বপ্ন লুপ্তস্মৃতির পুনরুদ্ধার সিদ্ধান্ত দ্বারা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আমাদের মনে হয় এই স্বপ্ন ঘটনাটি অদ্ভুত মনের দূরদৃষ্টিমূলক স্বপ্ন—ঘটনাটি এইরূপ।

একজন ভদ্র লোককে কার্য্য গতিকে নিজের বাড়ী হইতে কতক দূরে অন্য একটি বাড়ীতে নিশা যাপন করিতে হইয়াছিল। সেই বাড়ীতে গিয়া তিনি রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহার বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে। তাহার স্ত্রী সেই প্রজ্জ্বলিত গৃহ হইতে তাঁহার সন্তানগুলিকে বাহির করিয়াছেন। কিন্তু গোলমালে তাঁহার ছোট ছেলেটিকে বাটি হইতে বাহির করিবার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। এই অবস্থা দেখিয়া স্বপ্ন দর্শনকারী যেন নিজে প্রজ্জ্বলিত গৃহে প্রবেশ করিয়া শিশু সন্তানটিকে উদ্ধার করিলেন।

স্বপ্নদর্শনকারী এই স্বপ্ন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া নিজের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নিজের গৃহের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। দেখিলেন যে যথার্থই তাঁহার গৃহে আগুন লাগিয়াছে এবং গোলমালে তাঁহার স্ত্রী তাঁহার শিশু সন্তানটিকে বাহির করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া

তাঁহার শিশু সন্তানটিকে প্রজ্জ্বলিত গৃহ হইতে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন।

গ্রন্থকার এই ঘটনা এইরূপভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন— হয়ত স্বপ্নদর্শনকারী পূর্ব্বে অনেকবার দেখিয়াছেন যে, তাঁহার ভৃত্য অগ্নি সম্বন্ধে ভয়ানক অসাবধান। তিনি আরও লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে তাঁহার স্ত্রী অল্প বিপদেও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যান। হয়ত অজ্ঞাতসারে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে আপদ বিপদ উপস্থিত হইলে তাঁহার স্ত্রী সকল সন্তানগুলিকে সাবধান করিতে পারিবেন না। এই সব ধারণা হয়ত তাঁহার মনে ক্রমশঃ অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করিয়াছিল; সেই সকল ভাব তাঁহার মনে উপরোক্ত স্বপ্নটি সৃজন করিয়াছিল। আবার তাঁহার ধারণাগুলি সত্য ছিল বলিয়া সেই সময়ে বাস্তব জগতেও সেই ঘটনাগুলি ঘটিয়াছিল। এইরূপে স্বপ্ন দর্শনকারীর দৃষ্টস্বপ্ন সত্য হইয়াছিল।

একজন পণ্ডিত এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা একেবারে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না, তবে এই ব্যাখ্যার মধ্যে কতকগুলি কষ্ট কল্পনা আছে বলিয়া বোধ হয়, পাঠকগণকে তাহা বেশী বুঝাইতে হইবে না। স্বপ্নদর্শনকারীর অজ্ঞাত মন প্রাগ্‌দর্শন বা দূরদৃষ্টির শক্তি দ্বারা যথার্থই প্রজ্জ্বলিত গৃহের ব্যাপার অবগত হইয়াছিল এবং শিশু সন্তানকে উদ্ধার করিবার জন্য সন্নিকট ভবিষ্যৎটীকে স্বপ্নের দ্বারা স্বপ্নদর্শনকারীর জ্ঞান গোচর করিয়া দিয়াছিল, ইহাই সহজ ব্যাখ্যা বলিয়া আমাদের বোধ হয়।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ ও মন্তব্য।

বিগত ২১শে মাঘ, ১৩২৪, ইং ২০শে ফেব্রুয়ারী বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের ষষ্ঠপঞ্চাষৎ জন্মতিথি পূজা ও তদোউপলক্ষে উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। জন্মতিথি রবিবারে পড়ায়, উক্ত তিথিপূজা ও উৎসব ভিন্ন ভিন্ন দিবসে অনুষ্ঠিত না হইয়া একই দিবসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

উৎসব-দিবসে স্বামীজির শয়নগৃহ এবং সমাধিমন্দির অতি সুন্দর-ভাবে সজ্জিত হইয়াছিল। স্বামীজির সন্ন্যাসীবেশী তৈলচিত্রখানি লতাগুল্ম ও পুষ্পাদির দ্বারা সুশোভিত হইয়া মঠ প্রাঙ্গণে স্থাপিত হইয়াছিল। আলেখ্যটীকে দেখিলেই মনে হইতেছিল স্বামীজি যেন স্বশরীরে আগমন করিয়া ভক্তগণের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করিতেছেন। ঐ স্থানেই বৈষ্ণবচরণবাবাজি কর্ত্তৃক পদাবলী ও ব্যাঁটরা কালীকীর্ত্তন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক মাতৃনামামৃত গীত হওয়ায় স্থানটীকে আরও প্রাণময় করিয়া তুলিয়াছিল।

এ বৎসর প্রায় ছয় সাত হাজার ভক্তের সমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে যুবাভক্তের সংখ্যাই অধিক। অল্লাধিক চার হাজার ভক্ত জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে পংক্তিতে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ বৎসর দরিদ্র নারায়ণের সংখ্যা কিছু কম হইয়াছিল।

মান্দ্রাজ, বাঙ্গালোর, বৃন্দাবন, কনখল, এলাহাবাদ, কাশী প্রভৃতি অন্যান্য কেন্দ্রেও স্বামীজির জন্মোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানেও ভক্তগণ কর্ত্তৃক জন্মোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে।

আগামী ৩রা চৈত্র, সন ১৩২৪ সাল, ইং ১৭ই মার্চ্চ, ১৯১৮, ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ত্র্যশীতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে মহোৎসব হইবে। ভক্তগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

সিষ্টার নিবেদিতা বালিকাবিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মাণার্থ সাহায্য-কল্পে আমরা পুনঃ পুনঃ সাধারণের নিকট আবেদন করিতেছি। কিন্তু এপর্য্যন্ত আমরা আশানুরূপ সাহায্য পাই নাই। যাঁহারা ভারত-বর্ষের মঙ্গলকামী, যাঁহারা আমাদের সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতিকল্পে চিন্তান্বিত তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত—স্ত্রীজাতির উপযুক্ত শিক্ষা বিধান করিতে না পারিলে তাঁহাদের বর্ত্তমান আশা কখনও বাস্তবতায় পরিণত হইবে না। সেই জন্য আমরা উন্নতমনা ও উদারচেতা দেশসেবিগণের নিকট উক্ত অনুষ্ঠানের সুসিদ্ধির জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। ইহাতে তাঁহারা শুধু স্ত্রীজাতিরই কল্যাণ কেন পরোক্ষে সমগ্র দেশের ও সমাজের কল্যাণ সাধনই করিবেন।

বিবেকানন্দপুরস্ত্রীশিক্ষালয় ও নিবেদিতা বালিকাবিদ্যালয়ের বাটি নির্ম্মাণার্থ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত দান স্বীকার।

ডাঃ বি, এম, বসু বর্ম্মা ৫৲
শ্রীমতী নীহারিকা দেবী, শিমলা ২৲
শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী ১৲
শ্রীযুত রাজেন্দ্রকুমার দত্ত, ঢাকা ১৲
নরেশচন্দ্র ঘোষ ২৲
কান্তি চন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা ৫০৲
কামাখ্যানাথ মিত্র দৌলতপুর ১৲
শ্রীমতী ধুম বাই, এফ বানজী
১ম দফে ২৫৲, ২য় দফে ৩৫৲, বোম্বাই ৬০৲
শ্রীযুত হরিচরণ বসু ও শ্রীশচন্দ্র মিত্র,
বোম্বাই ৫০১৲
ধরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও ভ্রাতৃগণ,
কলিকাতা ৫০১৲
শ্রীমতী মৃণালিনী দাস, ৭৲
শ্রীযুত সত্যচরণ কুমার, এলাহাবাদ ১০৲
মহেন্দ্রনাথ মিত্র, কসবি ২৲
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়,
ভবানীপুর ২০৲
,, চুনিলাল ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা ১৲
,, যতীন্দ্রনাথ সোম, ,, ১৲
,, জগন্নাথ দাস, ,, ১৲
ডাঃ জগৎপতি রায়, ,, ১৲
শ্রীযুত সিদ্ধেশ্বর দাস, ,, ৪৲
,, বিশ্বনাথ ঘোষাল ১৲
,, এস, কে, বসু, বসরা ৫৲
,, কামিনীকুমার দাস, চট্টগ্রাম ৪৲
মিঃ, ই, জে, নিউটন, ডানেডিন,
নিউজিলেণ্ড ১৫৲
মিঃ এম নরসিমান্, মান্দ্রাজ ২॥০
,, এম রামস্বামী, বাঙ্গালোর ২॥০
,, এস, এন, দয়াপতি শর্ম্মা ১॥০
জনৈক বন্ধু ১৲
শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বসু, বাসরা, ১৲

শ্রীমতী কাদম্বিনী দত্ত, কলিকাতা
ঐ আত্মীয় ১৲
শ্রীযুত চারুচন্দ্র দে ১৲
শ্রীমান লালুর মা ২৲
শ্রীমতী কাদম্বিনী ঘোষ পাটিংভোল ১৲
শ্রীযুত নিত্যানন্দ সুর রেঙ্গুন ৫৲
,, হরিমোহন বসু উকিল আরামবাগ
মিঃ কে কেশবরাম মূর্ত্তি কোকনদ ২৲
শ্রীযুত তারকনাথ নন্দী, কলিকাতা ১৲
মেসার্স পাল ফেগুস এণ্ডকোং, কলিকাতা ৫০০৲
লেফটেনেণ্ট শৌরেন্দ্র মোহন পাঠকের মাতার স্মৃত্যর্থে, সাঙ্গোর ৫৲
শ্রীযুত নিত্যানন্দ বসু কলিকাতা ৫৲
শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ, প্রথম দফা ৩০০
শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী, কলিকাতা ১০৲
কুমার অরুণ চন্দ্র সিংহ ৫৲
শ্রীযুত ভোলানাথ দাস ১
,, বসন্তলাল সাউ, শিবলাল সাউ ৩০
ডাঃ সরসীলাল সরকার ৫০৲
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মোকামা ২৲
,, সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত সিলেট ২৲
,, বসন্তলাল ঘোষ কলিকাতা ১০৲
জনৈক বন্ধু ১০৲
ঐ মাঃ স্বামী পূর্ণানন্দ ১০৲
শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র পাঠক, কাঁথী ২৲
,, সি, এল, শীল, সাবরেজিষ্টার কাঁথী ৫৲
কুঞ্জবিহারী দে, ঐ ॥০
গুচ্ছান সহ মা প্রবোধকৃষ্ণ বসু ৮॥০
শ্রীযুত বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়, কাঁথী ৪
ত্রৈলোক্য নাথ পাইন, আসাম ৪
,, বলদেও সিং দেরাদুন ৫৲
শরৎ চন্দ্র ঘোষ, মানভূম ২৲
ডাঃ জে. এন, বিশ্বাস, মন্দালয় ৫
শ্রীযুত ভগবান দাস ঘোষ, কলিকাতা ৫৲
,, রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তি, ময়মনসিংহ ১৫৲
,, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ২য় দফা ১০৲
,, রাইমোহন মজুমদার, কাগমারী ২৲
টি, এম, রায় খড়্গপুর ৫৲
রাম লালজী ঠকুরী, ইন্দোর ৩৲

শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ডিসেম্বর মাসের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী আমরা পাইয়াছি, তাহা হইতে জানা যায় যে, গত নভেম্বর মাসের ১৬ জন ব্যতীত আলোচ্য মাসে আরও ২৫ জনকে আশ্রমে রাখিয়া সেবা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩২ জন আরোগ্য লাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছে; ৩ জন দেহত্যাগ করিয়াছে, এবং ৬ জন এখনও চিকিৎসাধীন আছে।

২৬৪৫ জনকে দাতব্য ঔষধালয় হইতে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল তন্মধ্যে ৪৩৫ নূতন এবং ২২১০ জন উহাদেরই পুনরাবর্ত্তক।

উক্ত মাসে ৫ জন রোগিকে তাহাদের বাটীতে যাইয়া ঔষধ এবং ডাক্তার দ্বারা এবং কাহাকে কাহাকেও পথ্য দিয়া সাহায্য করা হইয়াছিল।

উক্ত মাসে আয়—চাঁদা হিসাবে ৯১৲; এক কালিন দান ৪৩৶০; খুচরা সংগ্রহ ৩৲ এবং সুদ হিসাবে ৯৸; মোট ১৪৬৸৶ টাকা। বিল্ডিং ফণ্ডএর আয় সুদ হিসাবে ৩২॥০। ব্যয় হিসাবে সেবাশ্রমের ব্যয় ১৩৮৸৵০ এবং বিল্ডিং ফণ্ডএর ব্যয় ২৪২॥৶৩।

আলেয়ারের বাঁধ ভাঙ্গিয়া জল প্লাবনে মথুরা জেলার বহু গ্রাম ভাসাইয়া দিয়াছে, ঐ সকল গ্রামবাসিদের সাহায্যের জন্য দুটী কেন্দ্র খোলা হইয়াছে, একটী রাধাকুণ্ডে এবং অপরটী বর্ষাণায়। এই দুটী কেন্দ্রে ডিসেম্বর ১৯১৭ পর্য্যন্ত ১৪১৪ জনকে ঔষধ, এবং উহাদের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও পথ্য এবং বস্ত্রাদি দিয়া সাহার্য্য করা হইয়াছে, ৭৫ জনকে তাহাদের বাড়ীতে গিয়া চিকিৎসা করা হইয়াছিল। অর্থাভাবে আমরা বর্ষাণার কেন্দ্র উঠাইয়া দিয়াছি, রাধাকুণ্ডের আস পাসের গ্রামসমূহে রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হওয়ায় উক্ত কেন্দ্র হইতেই সকল গ্রামে গিয়া ঔষধাদি দিয়া আসা হইতেছে। সকলের অতি সামান্য সামান্য সাহায্যে যদি আর একটী মাস উক্ত সেবা-কেন্দ্রটী রাখিতে পারা যায় তাহা হইলে উক্ত মাসের মধ্যেই জল কমিয়া যাইবে, এবং সকলে সুস্থ হইলে গম প্রভৃতির চাষ করিয়া লইতে পারিবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান

(স্বামী সারদানন্দ)

(৩)

আশ্বিন অতীত হইয়া কার্ত্তিক এবং শ্রীশ্রীকালীপূজার দিন ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইল কিন্তু ঠাকুরের শারীরিক অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি দেখা গেল না। চিকিৎসার প্রথমে যে ফল পাওয়া গিয়াছিল তাহা দিন দিন নষ্ট হওয়ায় ব্যাধি প্রবলভাব ধারণ করিবে বলিয়া আশঙ্কা হইতে লাগিল। ঠাকুরের মনের আনন্দ ও প্রসন্নতা কিন্তু কিছুমাত্র হ্রাস না হইয়া বরং অধিকতর বলিয়া ভক্তগণের নিকটে প্রতিভাত হইল। ডাক্তার সরকার পূর্ব্বের ন্যায় ঘন ঘন যাতায়াত ও পুনঃ পুনঃ ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়াও আশানুরূপ ফল না পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন ঋতু পরিবর্ত্তনের জন্য ঐরূপ হইতেছে, শীতটা একটু চাপিয়া পড়িলেই বোধ হয় ঐ ভাবটা কাটিয়া যাইবে।

দুর্গাপূজার ন্যায় কালীপূজার সময়েও ঠাকুরের ভিতরে অদ্ভুত আধ্যাত্মিক প্রকাশ ভক্তগণের নয়নগোচর হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ কোন সময়ে প্রতিমা আনয়নপূর্ব্বক কালীপূজা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তগণের সম্মুখে ঐ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে পরম আনন্দ হইবে ভাবিয়া তিনি শ্যাম-পুকুরের বাটিতে উক্ত পূজা করিবার কথা পাড়িলেন। কিন্তু পূজার উৎসাহ, উত্তেজনা ও গোলমালে ঠাকুরের শরীর অধিকতর অবসন্ন

হইবে ভাবিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে ঐরূপ কার্য্য হইতে বিরত হইবার পরামর্শ প্রদান করিল। দেবেন্দ্র ভক্তগণের কথা যুক্তিযুক্ত ভাবিয়া ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। ঠাকুর কিন্তু পূজার পূর্ব্ব দিবসে কয়েক-জন ভক্তকে সহসা বলিয়া বসিলেন, 'পূজার উপকরণ সকল সঙ্ক্ষেপে সংগ্রহ করিয়া রাখিস্—কাল কালীপূজা করিতে হইবে।' তাহারা তাঁহার ঐ কথায় আনন্দিত হইয়া অন্য সকলের সহিত ঐ বিষয়ে পরামর্শ করিতে বসিল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি ভিন্ন পূজার আয়োজন সম্বন্ধে অন্য কোন কথা ঠাকুরের নিকটে না পাওয়ায় কি ভাবে উহা সম্পন্ন করিতে হইবে তদ্বিষয় লইয়া নানা জল্পনা তাহাদিগের মধ্যে উপস্থিত হইল। পূজা, ষোড়শোপচারে অথবা পঞ্চোপচার হইবে, উহাতে অন্নভোগ দেওয়া হইবে কি না, পূজকের পদ কে গ্রহণ করিবে ইত্যাদি বিষয়ের কোন মীমাংসা না করিতে পারিয়া অবশেষে স্থির হইল, গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ এবং ফলমূল মিষ্টান্নমাত্র সংগ্রহ করিয়া রাখা হউক, পরে ঠাকুর যেরূপ বলেন, করা যাইবে। কিন্তু সেই দিবস এবং পূজার দিনের অর্দ্ধেক অতীত হইলেও ঠাকুর ঐ সম্বন্ধে আর কোন কথা তাহাদিগকে বলিলেন না।

ক্রমে সূর্য্যাস্ত হইয়া রাত্রি প্রায় ৭টা বাজিয়া গেল। ঠাকুর তখনও তাহাদিগকে পূজা সম্বন্ধে কিছুই না বলিয়া অন্য দিবসের ন্যায় স্থিরভাবে শয্যায় বসিয়া আছেন দেখিয়া তাহারা তাঁহার সন্নি-কটে পূর্ব্বদিকের কতকটা স্থান মার্জ্জনা করিয়া সংগৃহীত দ্রব্য সকল আনিয়া রাখিতে লাগিল। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে গন্ধপুষ্পাদি পূজোপকরণ লইয়া ঠাকুর কখন কখন আপনাকে আপনি পূজা করিতেন। ভক্তগণের কেহ কেহ উহা দেখিয়াছিল। অদ্যও সেই-রূপে তিনি নিজ দেহমনরূপ প্রতীকাবলম্বনে জগচ্চৈতন্য ও জগচ্ছক্তি-রূপিণীর পূজা করিবেন, অথবা ৺জগদম্বার সহিত অভেদজ্ঞানে শাস্ত্রোক্ত আত্মপূজা সম্পন্ন করিবেন, তাহারা পরিশেষে এই মীমাং-সায় উপনীত হইয়াছিল। সুতরাং পূজোপকরণ সকল তাহারা

এখন ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে পূর্ব্বোক্তরূপে সাজাইয়া রাখিবে: ইহা বিচিত্র নহে। ঠাকুর তাহাদিগকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া কোনরূপ অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না।

ক্রমে সকল উপকরণ আনয়ন করা হইল এবং ধূপ দীপসকল প্রজ্বালিত হওয়ায় গৃহ আলোকময় ও সৌরভে আমোদিত হইল। ঠাকুর তখনও স্থির হইয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া ভক্তগণ এখন তাঁহার নিকটে উপবেশন করিল এবং কেহ বা তাহার আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া একমনে তাঁহাকে দেখিতে এবং কেহ বা জগজ্জননীর চিন্তা করিতে লাগিল। ঐরূপে গৃহ এককালে নীরব এবং ত্রিশ বা ততোধিক ব্যক্তি উহার অন্তরে অবস্থান করিলেও জনশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কতক্ষণ ঐরূপে অতীত হইল, ঠাকুর কিন্তু তখনও স্বয়ং পূজা করিতে অগ্রসর হওয়া অথবা আমাদিগের কাহাকেও ঐ বিষয়ে আদেশ করা কিছুই না করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া রহিলেন।

যুবক ভক্তগণের সহিত মহেন্দ্রনাথ, রামচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি প্রবীণ ব্যক্তিসকলেই তখন উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে গিরিশচন্দ্রের 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনার বিশ্বাস' বলিয়া—ঠাকুর কখন কখন নির্দ্দেশ করিতেন। পূজা সম্বন্ধে ঠাকুরকে ঐরূপ ব্যবহার করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের অনেকেও এখন বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ঠাকুরের প্রতি অসীম বিশ্বাসবান গিরিশচন্দ্রের প্রাণে কিন্তু উহাতে অন্য ভাবের উদয় হইল। তাঁহার মনে হইল, আপনার জন্য ঠাকুরের ৺কালীপূজা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি বল অহেতুক ভক্তির প্রেরণায় তাঁহার পূজা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে—তাহা হইলে উহা না করিয়া একপে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন কেন? অতএব তাহাও বোধ হইতেছে না; তবে কি তাঁহার শরীররূপ জীবন্ত প্রতিমায় জগদম্বার পূজা করিয়া ভক্তগণ ধন্য হইবে বলিয়া এই পূজায়োজন?—নিশ্চয় তাহাই। ঐরূপ ভাবিয়া তিনি উল্লাসে অধীর হইলেন এবং তিনি কি করিতেছেন

তাহা ভক্তগণের জানিবার পূর্ব্বে সম্মুখস্থ পুষ্প-চন্দন গ্রহণপূর্ব্বক জয় মা বলিয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। ঠাকুরের সমস্ত শরীর উহাতে সহসা শিহরিয়া উঠিল এবং তিনি গভীর সমাধি মগ্ন হইলেন! তাঁহার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় এবং দিব্য হাস্যে বিকশিত হইয়া উঠিল এবং হস্তদ্বয় বরাভয় মুদ্রা ধারণপূর্ব্বক তাঁহাতে ৺জগদম্বার আবেশের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল! এত অল্প-কালের মধ্যে এই সকল ঘটনা উপস্থিত হইল যে, পার্শ্ববর্ত্তী ভক্তগণের অনেকে ভাবিল ঠাকুরকে ঐরূপ ভাবাবিষ্ট হইতে দেখিয়াই গিরিশ তাঁহার শ্রীপদে বারম্বার অঞ্জলি প্রদান করিতেছেন এবং যাহারা কিঞ্চিদ্দূরে ছিল তাহারা দেখিল ঠাকুরের স্থলে কোথা হইতে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীপ্রতিমা সহসা তাহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছেন।

বলা বাহুল্য, ভক্তগণের প্রাণে এখন উল্লাসের অবধি রহিল না। তাহারা প্রত্যেকে কোনরূপে পুষ্পপাত্র হইতে ফুল চন্দন গ্রহণ করিয়া যাহার যেরূপ ইচ্ছা মন্ত্র উচ্চারণ ও ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম পূজাপূর্ব্বক 'জয় জয়' রবে গৃহ মুখরিত করিয়া তুলিল। কতক্ষণ ঐরূপে গত হইলে ভাবাবেশের উপশম হইয়া ঠাকুরের অর্দ্ধবাহ্য অবস্থা উপস্থিত হইল। তখন পূজার নিমিত্ত সংগৃহীত ফল মূল মিষ্টান্নাদি পদার্থ সকল তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে খাইতে দেওয়া হইল। তিনিও ঐসকলের কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া ভক্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ভক্তগণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাহারা সকলে প্রাণের উল্লাসে ৺দেবীর মহিমা কীর্ত্তন ও নাম-গুণ-গানে অতিবাহিত করিল।

ঐরূপে ভক্তগণ সেই বৎসর অভিনব প্রণালীতে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা করিয়া যে অভূতপূর্ব্ব উল্লাস অনুভব করিয়াছিল তাহা চিরকালের নিমিত্ত তাহাদিগের প্রাণে জাগরূক হইয়া রহিয়াছে—এবং দুঃখ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়া যখনই তাহারা অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে তখনই ঠাকুরের সেই দিব্যহাস্যফুল্ল প্রসন্ন আনন ও

বরাভয়যুক্ত করদ্বয় তাহাদিগের সম্মুখে উদিত হইয়া তাহাদিগের জীবন সর্ব্বথা দেবরক্ষিত, এই কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ।

(যেমনটী দেখিয়াছি)

উপসংহার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(সিষ্টার নিবেদিতা)

১৯০২ খৃষ্টাব্দের বড়দিনের অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দের কতিপয় শিষ্য ঐ উৎসব করিবার জন্য কটকের সন্নিকটস্থ খণ্ডগিরিতে সমবেত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যাকাল, আমরা একখানা জ্বলন্ত মোটা কাঠের চারি ধারে ঘাসের উপর বসিয়াছিলাম। আমাদের একপার্শ্বে গুহা ও ক্ষোদিত প্রস্তরবিশিষ্ট পাহাড়গুলি উঠিয়াছে, আর চারি-ধারে সুপ্ত অরণ্যানী মারুতহিল্লোলে অস্পষ্ট শব্দ করিতেছে। পূর্ব্বে রামকৃষ্ণসঙ্ঘে খৃষ্ট-জন্মদিনের পূর্ব্ববর্ত্তী নিশা যেরূপে যাপিত হইত, আমরাও সেইরূপে উহা যাপন করিব স্থির করিয়াছিলাম। সাধু-দিগের মধ্যে একজনের হাতে একগাছি লম্বা বাঁকানমাথা মেষ তাড়াইবার মত ছড়ি ছিল, এবং আমাদের সঙ্গে একখানি সেণ্ট লিউক প্রণীত ঈশা-জীবনী ছিল—তাহা হইতে দেবদূতগণের আবির্ভাব এবং পাশ্চাত্য জগতের প্রথম স্তুতিগান* পাঠ ও মনে মনে কল্পনা করিতে হইবে।

---

* ঈশ্বরের নাম সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হউক, এবং পৃথিবীতে মানবগণের মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাব বিরাজ করুক।"—দেবদূতগণের গীতি।

কিন্তু আমরা গল্পটী পড়িতে পড়িতে মাতিয়া গেলাম ; খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বরজনীর বর্ণনাতেই পাঠ শেষ হইল না ; আপনা হইতেই একের পর একটী করিয়া ঘটনা পড়া হইয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে সেই অদ্ভুত জীবনের সমগ্র অংশই আলোচিত হইল, তৎপরে মৃত্যু এবং সর্ব্বশেষে পুনরুত্থান। আমরা গ্রন্থের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে আসিলাম এবং এক একটী করিয়া ঘটনা পড়া হইতে লাগিল।

কিন্তু গল্পটী আমাদের কাণে এমন শুনাইতে লাগিল, যাহা পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। যাহার বিভিন্ন অংশের প্রাঞ্জলতা ও পূর্ব্বাপর সঙ্গতি দৃষ্টে তাহার সত্যাসত্যতা বিচার করা হইবে, এমন একটা সন তারিখযুক্ত এবং সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত আইন সঙ্গত দলিলের পরিবর্ত্তে, উহা এখন, এক ব্যক্তি যে ইন্দ্রিয়ের অগোচর একটী ব্যাপারের কথা লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছে, তাহার হাঁপাইতে হাঁপাইতে, অর্দ্ধোচ্চারিত ভাষায় প্রদত্ত সাক্ষ্যের ন্যায় শুনাইতে লাগিল। পুনরুত্থানের বর্ণনাটী আর আমাদের নিকট কোন একটী ঘটনার বিবরণের ন্যায় ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য বলিয়া বোধ হইল না। উহা চিরকালের জন্য একটী আধ্যাত্মিক অনুভূতির বর্ণনারূপে স্থান লাভ করিল—যাঁহার ঐ অনুভব হইয়াছিল তিনি উহাকে ভাষায় নিবদ্ধ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সকল স্থলে সফলকাম হন নাই, এই মাত্র। সমগ্র অধ্যায়টী অসম্পূর্ণ এবং আঁচে ইসারায় বলা এইরূপ বোধ হইতে লাগিল—যেন এক ব্যক্তি আগ্রহের সহিত শুধু পাঠকের নয়, কতকটা স্বয়ং লেখকেরও বিশ্বাস উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

কারণ, আমরাও কি ঐরূপ এক পুনরাগমনের কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হই নাই—যাহা পূর্ব্বোক্ত ইতিহাসের সহিত মিলাইয়া দেখা যাইতে পারে ? আমাদের আচার্য্যদেব স্বয়ং যাহা স্পষ্ট ভাষায় এবং জানিয়া শুনিয়া বলিয়াছিলেন, তাহা সহসা আমাদের মনে পড়িল এবং তাহার অর্থও তখনি বুঝিতে পারিলাম—"জীবনে আমি অনেকবার পরলোকগত আত্মা সকলকে পুনরায় এজগতে আসিতে দেখি-

য়াছি ; এবং একবার যে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির দর্শন করিলাম, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পরসপ্তাহে !"

আমরা প্রত্যক্ষভাবে শুধু শিষ্যগণের স্বস্বরূপপ্রাপ্ত প্রভুকে (ঈশাকে) আর একবার দেখিবার আকাঙ্ক্ষাই অনুভব করিলাম না, সেই অবতারপুরুষের স্বীয় বিরহকাতর শিষ্যগণকে সান্ত্বনা দিবার ও আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য পুনরাগমনের বহুগুণে প্রগাঢ়তর কামনারও চাক্ষুষ পরিচয় পাইলাম।

বাইবেলে লিখিত আছে—"পার্শ্বপার্শ্বে তিনি যতক্ষণ আমাদের সহিত কথা কহিতেছিলেন, ততক্ষণ আমরা প্রাণের ভিতরে একটা উৎকট আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম। আমাদের আচার্য্যদেবের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কয়েক সপ্তাহে আমরাও কি ঐরূপ ক্ষণিক অপূর্ব্ব অনুভূতির অজস্র প্রমাণ পাই নাই ?—তখন ত আমরা প্রায় বিশ্বাসই করিয়াছিলাম যে, তিনি সত্য সত্যই আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন।

বাইবেলে আরও বর্ণিত আছে—"রুটী প্রসাদ ভাগ করিয়া দিবার সময় তাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।"—ঠিক কথা। কখনও একটু আভাস, কখনও একটী কথা, কখনও একটী মুহূর্ত্তমাত্র স্থায়ী মধুর অনুভূতি, অথবা সহসা মনের ভিতরে জ্ঞানালোকের স্পষ্ট প্রকাশ— আমাদের ঐ প্রথম কয়েক সপ্তাহে এই সকলের কোন একটী নানা সময়ে উপস্থিত হইবামাত্র অমনি হৃৎপিণ্ড নাচিয়া উঠিত, মনে হইত, ঐ বুঝি তিনি রহিয়াছেন, এবং তীব্র আকাঙ্ক্ষাপ্রসূত সংশয় ও নিশ্চয়তা, এ দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিয়া যাইত।

সে রাত্রিতে খণ্ডগিরিতে আমরা পুনরুত্থানের বর্ণনার সেই অংশগুলি ছাড়িয়া দিয়া গেলাম, যেগুলি বোধ হয় যেন অপরাপর ব্যক্তি গল্পটীকে অবিকল, অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া পরে জুড়িয়া দিয়াছিলেন। এই পুরাতনের উপর নূতন চূণকাম করা বিবরণের প্রাচীনতর অংশটুকুর বিষয়েই আমরা নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিতেছিলাম,—সেই সাদাসিধা প্রাচীন বিবরণ, যাহাতে পুনঃ পুনঃ

চকিতের ন্যায় প্রভুর দর্শন ও অদর্শনজনিত হর্ষবিষাদের করুণ ছবি রহিয়াছে, যাহাতে দেখিতে পাই, কতবার একাদশ শিষ্য একত্র হইয়া চুপে চুপে আপনাদের মধ্যে "দেখ দেখ! সত্যই প্রভু পুনরুত্থিত হইয়াছেন" এইরূপ বলাবলি করিতেছেন, এবং পরিশেষে সকলে তাঁহার নিকট আশীর্ব্বাদ লাভান্তে পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।

পড়িতে পড়িতে আমাদের মনে হইতে লাগিল যে ঐ প্রাচীনতর কাহিনীতে আদৌ ঈশার স্থূলদেহের পুনরাবির্ভাবের কথা বলা হয় নাই, বলা হইয়াছে শুধু সহসা এবং অপ্রত্যাশিতভাবে প্রভু ও শিষ্যগণের ইচ্ছাশক্তির সম্মিলন, জ্ঞান ও প্রেমের বিবৃদ্ধি, প্রার্থনাকালে ক্ষণিক তন্ময়তা প্রাপ্তি, এই সকল ব্যাপার। প্রভু তখন জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং অতি অন্তরতম সূক্ষ্ম এক আকাশে বিরাজ করিতেছেন; আমরা ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে বদ্ধ থাকায় সে ভূমির কথা ধারণাই করিতে পারি না।

আবার সেগুলি এত স্থূল ব্যাপার ছিল না যে, সকলে সমভাবে এই অর্দ্ধশ্রুত অর্দ্ধদৃষ্ট ক্ষণিক আভাসগুলি ধরিতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যাঁহারা স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহারা উহাদিগকে মোটেই ধরিতে পারেন নাই। এমন কি যাঁহারা অতি সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন তাঁহাদের নিকটও ঐগুলি সন্দেহস্থল ছিল, যাহার সম্বন্ধে আগ্রহসহকারে আলোচনা করিতে হয়, এবং সমস্ত অংশগুলি একত্র করিয়া যাহা বুঝিতে ও সযত্নে হৃদয়ে ধারণ করিতে হয়। খৃষ্টের অতি অন্তরঙ্গ এবং সর্ব্বজনগ্রাহ্য শিষ্যগণের মধ্যেও কেহ কেহ হয়ত উহা আদৌ বিশ্বাস করেন নাই। তথাপি সেই রাত্রে খণ্ডগিরির সেই সকল গুহা ও অরণ্যানীর মধ্যে বসিয়া খৃষ্টানদিগের এই পুনরুত্থানকাহিনী পড়িতে পড়িতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, ইহার মধ্য দিয়া একটী সত্য সূত্রের আভাস পাওয়া যাইতেছে; বিশ্বাস হইল যে, কোথাও কোন এক সময়ে একজন মানব সত্য সত্যই এই ক্ষণিক উপলব্ধিটী করিয়া তাহার যে স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহাই অনুধাবন

করিতে চেষ্টা করিতেছি। এইরূপই আমরা বিশ্বাস করিলাম, এই-রূপই অনুভব করিলাম, কারণ অতীব ক্ষণস্থায়ী হইলেও, ঐরূপ একটী অনুভূতি ঐরূপই এক সময়ে আমাদেরও হইয়াছিল।

ঈশ্বর করুন যেন আমাদের আচার্য্যদেবের এই জীবন্ত সত্তা, স্বয়ং মৃত্যুও আমাদিগকে যাহা হইতে বঞ্চিত করিতে পারে নাই, তাহা যেন তাঁহার শিষ্য আমাদের নিকট শুধু একটা স্মরণীয় বস্তু না হইয়া চিরকাল জ্বলন্ত জাগ্রৎভাবে সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

(সমাপ্ত)

টলষ্টয়ের আদর্শ *

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়)

পাশ্চাত্য জগতে খৃষ্টানধর্ম্ম নামে যাহা পরিচিত, তাহা খৃষ্টের প্রচারিত ধর্ম্ম নহে,—এই কথা শুনিলে বড় আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু রুষদেশীয় বিখ্যাত চিন্তাশীল মনীষী টলষ্টয় ইহা বলিয়াছেন, এবং খৃষ্টের প্রচারিত ধর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে কি তাহা স্বয়ং আচরণ দ্বারা দেখাইয়াছেন। এই মহাপুরুষ কি বলিয়াছেন তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নাই।

যিনি যীশুখৃষ্টের মত অনুসারে চলিবেন তিনি যুদ্ধ করিতে পারিবেন না, তিনি অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধান অনুমোদন করিতে পারিবেন না, ইহাই টলষ্টয়ের মত। বলা বাহুল্য, এই মত গৃহীত হইলে পাশ্চাত্য জগতের রাষ্ট্রীয় জীবন আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

---

* এই প্রবন্ধে Tolstoi তাঁহার প্রণীত 'My Religion' নামক পুস্তকে যে মত বিবৃত করিয়াছেন তাহাই সংক্ষেপে প্রকাশ করা হইয়াছে।

কিন্তু টলষ্টয় তাহাতে ক্ষতি হইবে এরূপ বিবেচনা করেন না। তিনি কোনও দিক দিয়াই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে একটা বড় জিনিষ বলিয়া স্বীকার করেন না। তথাকথিত সভ্যতা এবং উন্নতির সন্ধানে মানুষ প্রেতাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় অনর্থক প্রাণপাত করিতেছে ইহাই তাঁহার বিশ্বাস।

যীশু স্পষ্ট বলিয়াছেন, "কাহাকেও হত্যা করিতে পারিবে না", "অপরকে বিচার করিতে পারিবে না।" তথাকথিত খৃষ্টধর্ম্মের ধর্ম্ম-যাজকগণ এই সকল বচনের সরল অর্থ গ্রহণ না করিয়া বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহারা বলেন, হত্যা করা অন্যায়, কিন্তু সম্রাটের আদেশে যুদ্ধে শত্রু নিপাত করা এবং অপরাধীর প্রাণদণ্ড দেওয়া অন্যায় নয়; অন্যের দোষ দেখা ভাল নয়, কিন্তু বিচারালয়ে অপরাধীর দোষ অবশ্য অনুসন্ধান করিতে হইবে। টলষ্টয় বলেন, এই সকল "কিন্তু"র কোনও অবসর নাই। যীশুখৃষ্টের সে প্রকার অভিপ্রায় ছিল না। থাকিলে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিতেন। তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা সরলভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। বর্ত্তমান সভ্যতাকে বজায় রাখিয়া তাঁহার কথা বুঝিতে হইবে - এই রকম মনের ভাবটাই যত অনর্থের মূল।

যীশুর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কি কোনও সন্দেহ হইতে পারে? তিনি বলিয়াছেন, "যে তোমার দক্ষিণ গালে আঘাত করে, তাহাকে তোমার বাম গাল ফিরাইয়া দাও", "যে তোমার গায়ের জামা কাড়িয়া লইবে, তাহাকে তোমার গায়ের চাদরও ছাড়িয়া দাও", "তোমার শত্রুকে ভালবাসিও"। এই সকল কথা কি যথেষ্ট স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই? ধর্ম্মযাজকগণ বলেন, "এ সকল কথা অতি মহৎ, অতি সুন্দর; এই সব মনে কল্পনা করিলে হৃদয় উন্নত হয়;—কিন্তু কার্য্যে আচরণ করিবার কথা নহে।"

অর্থাৎ, কথায় এক কার্য্যে আর। ইহাকে কি ভণ্ডামি বলা যায় না? যীশু কি কবিতা রচনা করিবার জন্য জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন? সুন্দর কথার মালা গাঁথাই কি তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল?—না

তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন, কি ভাবে জীবন যাপন করা উচিত— সরল, সহজ ভাষায় বুঝাইয়াছিলেন, যে ভাষা মৎস্যব্যবসায়িগণ এবং তাবৎ দরিদ্র নিরক্ষর জনসাধারণ বুঝিতে পারে, যাহারা অলঙ্কার, ভাবরাজ্য—এ সকলের ধার ধারে না। এবং তাহাদিগকে বাক্যে বুঝাইয়া যীশু কি স্বয়ং তাহা আচরণ করিয়া ক্রুশের উপর প্রাণ বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করেন নাই? টলষ্টয় বলেন, হে ধর্ম্মযাজকগণ, তোমরা স্পষ্ট করিয়া বল যীশুর উপদেশ তোমরা পালন করিবে না; কিন্তু যীশুর উপদেশের বিকৃত ব্যাখ্যা করিও না; তোমাদের কথাতে কত সরল হৃদয় ব্যক্তি প্রতারিত হইতেছে। তাহাদিগকে প্রতারণা করা মহাপাপ। তাহারা যথার্থই যীশুর মত অনুসারে চলিতে চাহে, এবং তোমাদের বিকৃত ব্যাখ্যা না শুনিলে বোধ হয় যীশুর সরল উপদেশ সহজভাবে বুঝিয়া তদনুযায়ী কাজ করিত।

যুদ্ধ, বিচারালয় এই সকল বিষয়েই যীশুর সাধারণ উপদেশ খাটাইতে হইবে—"অন্যায়কে বাধা দিও না।"* শত্রু তোমার দেশ আক্রমণ করিয়াছে—সে অন্যায় করিতেছে; কিন্তু যীশু বলিতে-ছেন তুমি তাহাকে বাধা দিবে না। তিনি শুধু অন্যায় যুদ্ধ নিষেধ করেন নাই। কোনও যুদ্ধই করিতে পারিবে না। দস্যু তোমার বা তোমার প্রতিবেশীর যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইল, যে বাধা দিতে গিয়াছিল তাহাকে হত্যা করিয়া গেল। যীশু বলিতেছেন, তুমি তাহাকে দণ্ড দিও না, কারণ, অন্যায়কে বাধা দিতে পারিবে না।

স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে, তাহা হইলে ত দেশ অরাজক হইবে। দুর্দ্দান্তজাতি সকল নিরীহ জাতিদিগকে পদদলিত করিবে। সমাজে পরস্বাপহারী দস্যু তস্করেরা প্রভুত্ব করিবে। খৃষ্টানধর্ম্মযাজক-গণের তাহাই মনে হইয়াছিল। তাই তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "না ধর্ম্মযুদ্ধ ও বিচারালয় নিষেধ করা যীশুর অভিপ্রায় ছিল না।" কিন্তু যীশু স্বয়ং যাঁহাদিগকে ধর্ম্ম প্রচার করিতে পাঠাইয়াছিলেন তাঁহারা কি বলিয়াছেন শোনা যাউক।

* "Resist not evil."

জেম্‌স্‌ বলিয়াছেন,

"যে ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার বিচার করে, সে ভগবানের নির্দেশ লঙ্ঘন করে, (কারণ ভগবান্‌ বলিয়াছেন, তুমি কাহারও বিচার করিতে পারিবে না), এবং ভগবানের নির্দেশের বিচার করে। তুমি যদি সেই নির্দেশ বিচার কর, তাহা হইলে তুমি (নির্দেশবর্ত্তী) ভৃত্য হইলে না, তুমি বিচারক হইলে। নির্দেশ দিবার সেই একজনই আছেন, তিনি রক্ষাও করিতে পারেন, তিনি বিনাশ করিতেও পারেন। তুমি কে, যে অপরকে বিচার করিবে ?"

এখানে আর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনও সংশয় হইতে পারে না। জেম্‌স্‌ স্পষ্টই বলিয়াছেন বিচারালয়ে অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া অন্যায়, কারণ উহা ভগবানের নির্দেশের বিরুদ্ধ। এবং নিশ্চয়ই বর্ত্তমান ধর্ম্মযাজকগণ যীশুর আদেশ ও উদ্দেশ্য যেরূপ বুঝিতে পারেন, জেম্‌স্‌ তদপেক্ষা ভাল বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

কথাটা এই, তুমি ভগবানে বিশ্বাস কর কি না ? ভগবান্‌ যে সর্ব্বশক্তিমান্‌, তাঁহার ইচ্ছা যে মঙ্গলময়, ইহা স্বীকার কর কি না ? ঐ যে দস্যুগণ তোমার গৃহ লুণ্ঠন করিতেছে, ভগবান্‌ ইচ্ছা করিলে কি তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিতেন না ? তাহা যখন করিতেছেন না, তখন বুঝিতে হইবে লুণ্ঠন করুক, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। তবে তুমি কেন দল বাঁধিয়া লাঠি লইয়া তাড়া করিয়া যাইবে এবং তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে ? ভগবানের ত্রুটি তুমি সংশোধন করিবার আস্পর্দ্ধা রাখ ! তুমি তাহা হইলে ভগবানের আজ্ঞাধীন ভৃত্য নহ ; তুমি একজন ঈশ্বরবিদ্বেষী। টলষ্টয় এইরূপ কথা বলিয়াছেন।

যে যীশুর আদেশ অনুসারে চলিবে দস্যু বা অত্যাচারকারী তাহার কি করিবে ? তাহার অর্থ কাড়িয়া লইবে ? লউক্‌। যীশু বলিয়াছেন, অর্থ থাকিলে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন, দরিদ্রের পক্ষে সে পথ অপেক্ষাকৃত সহজ। তাহার সঞ্চয় কাড়িয়া লইবে ? লউক। যীশু বলিয়াছেন, কল্যকার চিন্তা করিও না। যিনি অরণ্যের পক্ষি-

দিগকে খাদ্য দিয়াছেন, যিনি অযত্নসম্ভূত কুমুদফুলকে সোলেমন অপেক্ষা সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছেন, তিনি তোমার আহার দিবেন, তোমার বস্ত্র দিবেন। ঐশ্বর্য্যে ত সুখ নাই। দীনহীন হইয়া ভগবানের ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া মানবের সেবা করিতে পারিলেই ত সুখ। এইরূপ দীনহীনভাবে যাহারা জীবন যাপন করিবে, পরের সেবা করাই যাহাদের কার্য্য, তাহাদের উপর অত্যাচার করিলেও যাহারা ক্রোধ না করিয়া সকল অন্যায় সহ্য করিবে—অত্যাচারীর হৃদয় যতদূরই নির্দ্দয় হোক না কেন, সে ঈদৃশ লোকদিগকে অকারণে হত্যা করিবে না, তাহাদিগকে অনাহারে মারিয়া ফেলিবে না। লোকে পশুদিগকেও খাইতে দেয়, আর এই সকল সেবাপরায়ণ লোকদিগকে খাইতে দিবে না? তাহাদের আচরণ দেখিয়া অত্যাচারীর হৃদয় কোমল হইবে। অত্যাচার করিতে আর তাহাদের স্পৃহা হইবে না। এইভাবে জগতে ভগবানের রাজ্য আসিবে।

টলষ্টয়ের আদর্শ অনুসারে পৃথিবী বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত থাকা উচিত নহে। তিনি বলেন রাজ্যের গঠন, রাজকর্ম্মচারির নিয়োগ, আইন, আদালত, জেল, পুলিস, এ সকলই ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানব প্রচলিত করিয়াছে। সামাজিক গঠনেরও আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। ধনী ও দরিদ্র এরূপ বিভাগ থাকিবে না। কল কারখানা তুলিয়া দিতে হইবে। বড় বড় নগরে লক্ষ লক্ষ লোক বাস করিবে, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। বর্ত্তমান সভ্য জীবনটাই একটা ভুল। ইহাতে ধনী বা দরিদ্র কেহই সুখী হয় না। এইরূপ জীবন যাপনের ফলে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব প্রভৃত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কাহারও মনে শান্তি থাকে না। বর্ত্তমান সভ্যসমাজে যিনি বড়লোক বলিয়া পরিচিত তিনি যদি তাঁহার সকল ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে গিয়া দীন কৃষকের জীবন যাপন করেন তাহা হইলে তিনি বেশী সুখী হইবেন। সুখ মনে করিয়া যাহার জন্য তিনি প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা বাস্তবিক সুখ নহে। তাঁহার সম্পূর্ণ বুঝিবার ভুল।

বুঝিবার দোষে অসংখ্য লোক সভ্যতার করাল কবলে পড়িয়া বিনষ্ট হইতেছে—ইহাই টলষ্টয়ের মত।

সৌখীন পরিচ্ছদ, সুসজ্জিত অট্টালিকা, মূল্যবান্ অলঙ্কার, দাস দাসী, গাড়ী ঘোড়া এ সকলে তোমার কোনও প্রয়োজন নাই। এ সকলে তোমার প্রকৃত সুখ হয় না। ইহারা যথার্থ সভ্যজীবনের অঙ্গ নহে। মানব কিসে প্রকৃত সুখী হয় তাহা একবার ভাবিয়া দেখুক। টলষ্টয় সাংসারিক সুখের নিম্নলিখিত তালিকা দিয়া দেখাইয়াছেন যে, নগরবাসী উচ্চপদস্থ ব্যক্তির তাহা অধিগম্য নহে, পল্লীগ্রামের কুটিরবাসী এই সকল বিষয়ে সমধিক সৌভাগ্যশালী।

প্রকৃতপক্ষে সুখী হইতে হইলে প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রাখা প্রযোজন। উন্মুক্ত আকাশ, বিশুদ্ধ বায়ু, উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ, শ্যামল তরুলতা, পশু পক্ষী সকলের সান্নিধ্য—এ সকলই প্রকৃত সুখের কারণ। সভ্যতার অত্যাচারে এই সকল অনায়াসলভ্য সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া মানুষ নগরে গিয়া নিরাপদে জীবন যাপন করে। সেখানে কল কারখানার কর্কশ শব্দ, গাড়ীর ঘর্ঘর ধ্বনি, কামানের গর্জ্জন, এই সব শুনিতে পায় এবং দূষিত বায়ু সেবন করে।

তাহার পর, কায়িক পরিশ্রম এবং রুচি অনুসারী মানসিক পরিশ্রম উভয়েই প্রকৃত সুখের কারণ। সভ্য জীব প্রথমটা বর্জ্জন করে—ফলে ক্ষুধামান্দ্য অনিদ্রা প্রভৃতিতে তাহার শরীর নষ্ট হইয়া যায়; এবং অপ্রীতিকর ও অত্যাধিক মানসিক পরিশ্রম করে—ফলে তাহার স্বভাব রুক্ষ হইয়া যায়, সহজেই বিরক্ত হয়, জীবন অশান্তিপূর্ণ হয়। ব্যাঙ্কার, উকীল, রাজকর্ম্মচারী, কেহই নিজ কার্য্যে সন্তুষ্ট নহে।

তৃতীয়তঃ, নিজের স্ত্রী পুত্র পরিবার—ইহারা সুখের কারণ। কিন্তু সভ্যসমাজে যাহার যত প্রতিষ্ঠালাভ হইয়াছে নিজের পরিবারবর্গ হইতে তাহাকে তত বিচ্ছিন্ন হইতে হইয়াছে। শিশুদের সাহচর্য্যে আনন্দ লাভ করিবার প্রবৃত্তি ও সময় তাহাদের নাই। অশিক্ষিত দাস দাসীর উপর সন্তান পালনের ভার অর্পণ করিয়া তাহারা

এক ভগবদ্দত্ত প্রকৃত সুখ হইতে নিজেদের বঞ্চিত করে এবং সন্তানদের প্রতি কর্ত্তব্যপালন করে না।

সমাজে সকল লোকের সহিত অবাধে মিলিয়া জীবন যাপন করা সুখের কারণ। কিন্তু সভ্যসমাজের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সাধারণ মানবের সহিত মিশিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত। যে সমানপদস্থ নহে, তাহার সহিত হাসিয়া প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতে মর্য্যাদাহানি হইবে এই ধারণাতে তাহারা সশঙ্কিত। যাহার পদ যত উচ্চ, তাহার সমানপদস্থ ব্যক্তি তত কম। সকলে যেন কৃত্রিম কারাগার রচনা করিয়া বসিয়া আছে। যে যত বড় লোক তাহার কারাগার তত সঙ্কীর্ণ। যে দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় লোক—তাহার প্রায় নির্জ্জন কারাবাস।

সর্ব্বশেষে সুস্থ ও বলিষ্ঠ দেহ এক সুখের কারণ। কিন্তু নগর-বাসী ধনীদের অপেক্ষা পল্লীবাসী কৃষকদের শরীর যথেষ্ট ভাল থাকে।

প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মের সহিত টলষ্টয়ের আরও মতভেদ আছে। টলষ্টয় বলেন দাম্পত্য বন্ধন কোন কারণেই বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায় না, অর্থাৎ তিনি divorce প্রথার বিরোধী। ভবিষ্যতে একদিন সকল মৃত ব্যক্তির আত্মা পুনরায় জাগিয়া উঠিবে এবং ঈশ্বরের বিচার অনুসারে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিবে—ইহা তিনি মানিতেন না। আত্মার অমরত্ব বলিতে তিনি বুঝিতেন ব্যক্তিগত জীবনের সার্ব্বজনীন জীবনে বিলীন হওয়া। ভগবানের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করিয়া যে তাহার ব্যক্তিগত জীবন এইভাবে সার্ব্বজনীন জীবনে বিলীন করিতে পারে সেই অমর হইল। নচেৎ যে ইহজীবন স্বার্থ এবং সুখানুসন্ধানে অতিবাহিত করে, মৃত্যুর সহিত সে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

আমরা এইখানে প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পৃথিবীতে অন্যায় আছে। সে অন্যায় উচ্ছেদ করিবার উপায় কি? জগৎ বলে, তাহার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ কর। যীশুখৃষ্ট বলেন, বলপ্রয়োগ অন্যায়, এবং বল প্রয়োগ দ্বারা অন্যায়ের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইবে না; কিছুকাল

চাপা থাকিতে পারে, কিন্তু অনুকূল অবস্থা হইলে অন্যায় পুনরায় জাগিয়া উঠিবে। অন্যায়কে নিঃশেষ করিবার একমাত্র উপায় প্রেম। যে তোমার অনিষ্ট করিবে, তাহাকে ভালবাস, দেখিবে ক্রমশঃ তাহার অনিষ্ট করিবার প্রবৃত্তি বিনষ্ট হইবে। এই ভাবে অন্যায়ের যে উচ্ছেদ হইবে তাহার আর পুনরুত্থান হইবে না।

আমাদের দেশে গান্ধি এই আদর্শ প্রচার করিতেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে তিনি যে অভিযান করিয়াছিলেন তাহাকে Passive Resistance এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। গান্ধি তাহার নাম দিয়াছেন Soul force। তিনি বলেন আত্মা যখন জড়দেহ হইতে বড় জিনিষ, তখন আত্মার বল জড়দেহের বল অপেক্ষা বেশী কার্য্যকরী হইবে। পাশবিক বল দ্বারা কেহ আত্মাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না। ব্যক্তিগত জীবনেও গান্ধি সকল প্রকার বিলাস সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া টলষ্টয়ের প্রচারিত উচ্চ আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

বিবেকানন্দ স্মরণে।

(শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম এ, পি-এইচ ডি, পি আর এস)

বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্র হইতে যখন মহৎ ব্যক্তিগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন তখন নানা দিক হইতে স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের বিচিত্র মহিমা আমাদের মানসপটে আজ মুদ্রিত হইয়া যাইবে। তাঁহার ব্যক্তিত্ব বিশাল ও বিরাট, সমুদ্রের ন্যায় গভীর ও অতলস্পর্শ। কখনও সেখানে হাস্য কৌতুকের চঞ্চল লহরী খেলিয়া বেড়াইতেছে, কখনও তাহা নির্ম্মল উষায় বালার্ক কিরণদীপ্ত সমুদ্রের মত ক্রীড়ামত্ত বালকের স্বচ্ছ ও সরল হর্ষে পরিপূর্ণ, কখনও তাঁহার

অধ্যাত্মজীবনের শান্তি ও গভীরতা অতল সমুদ্র অপেক্ষাও নির্ব্বিকল্প ও গভীর, আবার কখন ব ত্যাবিক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্রের মত তাঁহার আত্মা অসীম উদ্বেগপূর্ণ অসাম ব্যথায় প্রপীড়িত, অনাদি ক্রন্দনে বিমূঢ়,—আর ইহাও ঠিক সমুদ্রেব ম ত তাঁহাব বিরাট আত্মা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে জুড়িয়া দিবা—অর্থ ও পণ্যের বিনিময় নহে. শক্তি ও ত্যাগেব, বিচার ও ভক্তির, কর্ম্ম ও জ্ঞানেব বিশ্বের যুগধর্ম্মোপযোগী এক অদ্ভুত বিনিময়ের সৃষ্টি ও বিকাশ সাধন করিযাছে; আ· সর্ব্বাপেক্ষা এইটাই ঠিক দিবসেব বা রজনীর, জাগরণের বা স্বপ্নেব প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তাঁহার জীবনের প্রত্যেক ইচ্ছা ও উদ্বেগ ভারত-সমুদ্র তরঙ্গেব মত একটির পর একটি আপনি উঠিয়া দেশেব মলিনতা ও কলঙ্ক ধুইযা দিতে চাহিযাছে, পারে নাই, আবার উঠিযা শুষ্ক বেলা ভূমি বা মরু বা‍স্তাবে আছড়াইযা পড়িযাছে—এই ক্লান্তিহীন নিরুত্তমহীন হইতে যাওযা এরূপ কাতব হইয়া নিজেব অন্তরের শক্তি ও লীলার মধ্যে ফিবিয়া আসা ইহার আদিও নাই অবসানও নাই—"সাগর লহরী সমানা"। এইটাই তাঁহার ব্যক্তিত্বেব বর্ত্তমান ভারতেব আসল ··বিবার ও সাধন করিবার দিক। আমি তাঁহার অতলস্পর্শ ব্যক্তিত্বের যেট এক·াবে বাহিবের দিক—তাঁহার ধর্ম্ম তাঁহার চিন্তা, তাঁহাব অধ্যাত্মজীবন নহে,—তাঁহার বাহিরেব কর্ম্মের যতটুকু অংশ দেশেব কর্ম্মজীবনকে স্পর্শ কবিয়াছে, শুধু এইটুকুব কথা কিছু বলিতে চেষ্টা কবিব।

এই সংস্পর্শের কথা আলোচনা কবিতে গেলেই আমবা তাঁহাকে যুগপ্রবর্ত্তকরূপে পাই। "পরানুবাদ, পরানুকরণ, দাস সুলভ দুর্ব্বলতার" যুগে যখনি তিনি চিকাগোব ধর্ম্মসভায় হিন্দুর বেদান্তবাদ ব্যাখ্যা করিয়া বর্ত্তমান যুগধর্ম্মোপযোগী পরিণামবাদের সহিত তাহার সৌসামঞ্জস্য দেখাইয়াছিলেন তখন সেটা শুধু ভারতীয় দর্শনের মহিমা-প্রচার হয় নাই- সেটা বিশ্বসভ্যতায় ভারতীয় সভ্যতার বাণী-প্রচার হইল। কারণ—

বেদান্তবাদ ভারতের শুধু দর্শন নহে, বেদান্তবাদ যে ভারতের কর্ম্ম। ভারতের সমাজ গঠন, ভারতের সামাজিক রীতি নীতি,

ভারতের আচার অনুষ্ঠান, পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় যে এই বেদান্তবাদকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে ও বিকাশ লাভ করিয়াছে। ভারতের এই বেদান্তবাদকে না বুঝিলে ভারতীয় সভ্যতার অধিকারভেদ ও ব্যক্তির স্বাধীনতা, প্রতিযোগিতা ও সমবায়, ত্যাগ ও শক্তির, ভোগ ও বৈরাগ্যের, কর্ম্ম ও মুক্তির যে অদ্ভুত সমন্বয় সাধিত হইয়াছে তাহা কিছুতেই বুঝা যাইবে না।

স্বামী বিবেকানন্দের নূতন ভারত গঠনের যন্ত্র, আশ্রয় ও আধার হইল—এই বেদান্তবাদ। হিন্দুর মায়াবাদ যেখানে অত্যধিক সংসার-বিমুখীনতার প্রশ্রয় দিয়া দুর্ব্বলতার নামান্তর মাত্র হইয়াছে তাহা তিনি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বৈরাগ্য যে শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা যে শক্তের ভূষণ, অক্ষমের নহে। হিন্দুর বেদান্তবাদ যেখানে অধ্যাত্ম জীবনের রসসঞ্চারে অভিভূত ও আবদ্ধ, স্বামী বিবেকানন্দ সেই বেদান্তবাদকে কর্ম্মজীবনে প্রযোগ করিয়া সফল করিয়া তুলিতে আমন্ত্রণ দিলেন। সে আমন্ত্রণ সে আহ্বান গীতার সেই অমর আহ্বানের মত, "ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং, ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ"—দেশের প্রতি গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধায়, ও স্বীয় স্বরূপজ্ঞানের ও প্রত্যক্ষানুভূতির জ্বলন্ত বিশ্বাসে তাহা পাঞ্চজন্যের আহ্বানের মত শুনাইয়াছিল।

যুগশক্তি বাস্তবিকই মহাপুরুষের এই আহ্বানের প্রতীক্ষা করিতেছিল। শাসন নাই, শিক্ষা নাই, সমাজব্যবস্থা নাই, আমাদের সভ্যতা পরমুখাপেক্ষী হইয়া একবারে আত্মবিক্রয় করিয়া বসিতেছিল। বাহির হইতে বণিকের তুলাদণ্ড ও রাজার শাসনদণ্ড হইতে জড়বাদ আপনার গুরুভারে ও প্রভুর খেতাবে স্ফিত ও স্ফীত হইয়া দেশের হৃদয়-সিংহাসন জুড়িয়া বসিতেছিল। ভিতর হইতে অসংযম ও বিলাসিতা দেশের চিরন্তন সংযম ও বৈরাগ্যের ভিত্তিকে নষ্ট করিতে উদ্যত। ভারতীয় সমাজের একান্নবর্ত্তী পরিবার, গ্রাম্য সমাজ, নানা সামাজিক সম্বন্ধসমূহ ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছিল। সমাজ যখন খণ্ডবিখণ্ডতা প্রাপ্তির দিকে দ্রুত অগ্রসর তখন সত্য সত্যই

একটা বন্ধনীশক্তির নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিভা এই বন্ধনীশক্তি।

পূর্ব্বে দুই জন তাঁহার অগ্রে সমাজ বন্ধনের রজ্জু লইয়া আসিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন ও ভূদেব। কিন্তু কালের কুটিল গতিতে আমরা দুইজনকে তেমন নিবিড়ভাবে গ্রহণ করিতে পারি নাই। এক জন রহিয়া গেলেন শুধু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, আর এক জন শুধু সনাতন ধর্ম্মের প্রচারক।

স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা বরণ করিয়া লইয়াছি, যুগধর্ম্ম-নির্দ্দেষ্টারূপে, যুগপ্রবর্ত্তকরূপে।

কেমন করিয়া তাঁহার বেদান্তবাদ সমাজকে স্বৈরাচার ও খণ্ড-বিখণ্ডতা প্রাপ্তি হইতে রক্ষা করিল তাহা বলিতে হইবে না। তিনি বলিলেন, তুমি তোমাকে ভাল করিয়া জান, অনুভব কর, সমাজের সকলেই যে তুমি, তোমার মুখ দিয়া তাহারা আহার ভোগ্যবস্তু গ্রহণ করিতেছে, তুমিই রাজারূপে ঐশ্বর্য্য বিভব ভোগ করিতেছ, আবার তুমিই দীনহীন ভিখারীর বেশে প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে দয়া ও প্রেম যাচিতেছ। সমাজ যে তোমারই শরীর। তোমার সুখ দুঃখ অনুভব যে অন্যের, নিখিল প্রাণীর, জগতের সুখ দুঃখ ভোগের ভিতর দিয়া। সমাজের মঙ্গল না হইলে যে তোমার মঙ্গল নাই। সভ্যতার মুক্তি না হইলে যে তোমার মুক্তি নাই। তিনি আরও বলিলেন, তুমিই নারায়ণ, আর এই সমাজ নারায়ণের বিরাট শরীর। তুমি দরিদ্রনারায়ণ দুঃখীনারায়ণ, আতুরনারায়ণের সেবা কর, সেই সেবাতেই তোমার ভিতর যে পূর্ণ অথচ ক্রমবিকাশমান, বিশ্বব্যাপক অথচ জীগিষু আত্মাটি আছে তাহার তৃপ্তি হইবে। সভ্যতার চঞ্চল জীবনে মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান যে অপরিসীম শক্তি অথবা ভোগ প্রদান করিতে পারে তাহাতে চরম তৃপ্তি নাই। বৈরাগ্যেই পরম আনন্দ ও বল, সম্ভোগে অতৃপ্তি, অবসাদ ও ব্যর্থতা। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি তাঁহার এই বজ্রগম্ভীর সতর্কবাণী।

বিবেকানন্দ প্রচারিত দর্শন আজ হিন্দু সভ্যতার স্বধর্ম্ম রক্ষার

সহায় হইয়াছে। তাঁহার সেবামন্ত্র আজ নূতন ভারতকে বিচিত্র-ভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নূতন ত্যাগ, ও কর্ম্মের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে। নূতন সেবাধর্ম্ম যে শুধু সমাজকে খণ্ডবিখণ্ডতা প্রাপ্তি হইতে রক্ষা করিয়াছে তাহা নহে, সাহিত্য, শিল্প, রাষ্ট্র, লোকহিত প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহা এক অভিনব ভাবুকতার সৃষ্টি ও বিকাশ সাধন করিয়া চলিয়াছে। নূতন ভারতের কর্ম্মের যজ্ঞশালায় তিনিই প্রধান ঋত্বিক। আমাদের এই যজ্ঞের প্রিয়তম ঋত্বিকের পূজা আমার ভারতের নবীন কর্ম্মোপাসনার দ্বারা।

স্বামিজী সমাজের পুনর্গঠনের জন্য সমাজসংস্কার চাহিয়াছিলেন। সমাজকে তিনি কম বিদ্রূপ করেন নাই কম তীব্র কষাঘাত করেন নাই। সকলের মূলে তাঁহার হিন্দুসভ্যতার অতীত ও ভবিষ্যতের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্বদেশবাসীর প্রতি অসীম প্রীতি। তাই তিনি যখন তিরস্কার করিয়াছিলেন তাহা সন্ন্যাসীর স্নেহাশীর্ব্বাদ-রূপে লোকে গ্রহণ করিয়াছিল। বিভিন্ন বর্ণ যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে তাহার তিনি প্রতিরোধ করিতে চাহিয়াছিলেন। অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিও যে বিবাহ-কর্ম্মকে অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করিয়া সমাজে পরমুখাপেক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে তাহার বিরুদ্ধেও তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃত শিক্ষার তিনি সংস্কার চাহিয়াছিলেন, লোকশিক্ষার বিস্তারকল্পে তিনি ম্যাজিকলণ্ঠন সাহায্যে নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছিলেন, গ্রামে গ্রামে বিজ্ঞান, শিল্প ও ব্যবহারিক বিদ্যার প্রচার তিনি চাহিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শন সার্ব্বজনীন; হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুর আচার ও অধিকারভেদ হইতে তিনি যাহা কিছু সঙ্কীর্ণ, দ্বন্দ্ব ও ভেদজ্ঞাপক, কাহারও আত্মার পূর্ণ বিকাশ ও বিস্তৃতির বিরোধী তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

তরুণ সন্ন্যাসীর আশা দুর্নিবার, বাসনা অসীম ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার ঐশ্বর্য্য ও ভোগের আড়ম্বরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া গৈরিক-বসনধারী যষ্টিমাত্র সম্বল শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য সন্ন্যাসী সিদ্ধগুরুর গুরুদায়িত্ব

বরণ করিয়াছিলেন। প্রাচ্য জগতের নিষ্ঠা, প্রেম, সহানুভূতি ও বৈরাগ্যের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ হইয়া তিনি পাশ্চাত্য জগৎকে এক অভিনব মন্ত্রে দীক্ষা দিবার ভার লইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে তাঁহার দায়িত্ব আরও গুরুতর, কর্ত্তব্য আরও কঠিন হইয়াছিল। তিনি লোকসমূহের যুগ-পরম্পরাসঞ্চিত হলাহল পান করিয়া, বিশ্বসংসারের আর্ত্তি দুঃখ-ভাবনাদায়ের জটাভার মস্তকে গ্রহণ করিয়া, ললাটে গুরুর আশী-র্ব্বাদের চিরনবীন শশীতিলক ধারণ করিয়া আপনাকে সেই জীবন-মরণজয়ী বৈরাগীর মত উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নসূর্য্যের প্রখর দীপ্তিতে যেখানে কৃষক গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে নিযুক্ত, তাহার উদ্বেগ ও বেদনা, ভীতি ও নৈরাশ্য তিনি বরণ করিয়াছিলেন, যেখানে মাঝিমাল্লা উজান গঙ্গায় নৌকার দাঁড় টানিতে টানিতে গান ধরিয়াছে—মন মাঝি তোর বৈঠা নেবে, আমি আর বাইতে পারি না—তাহার বিশ্বাস ও বল আপনার করিয়া তিনি তাহাদের বৈঠা লইয়াছিলেন। কলিকাতার রাস্তায় কুলী যেখানে গুরুভার মোট বহিতে না পারিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া আপনার দুরদৃষ্ট স্মরণ করিয়াছে তাহার অদৃষ্টকে তিনি খণ্ডন করিতে চাহিয়াছিলেন। অসংখ্য জনপূর্ণ কোলাহলমুখরিত রাজনগরীর উন্মত্তপায় জন-স্রোতের দ্রুতপদসঞ্চার তাহার শিরায় শিরায় কল কল্লোলিনী সুর-তরঙ্গিণী সঞ্চার করিত। জন-সমূহ মনের শক্তি ও উদ্বেগ পূতগঙ্গা-বারির মত বিন্দু বিন্দু এমনি পান করিয়া, সকল লোকের উদ্বেগ আপনার বিরাট বক্ষে এমনি ধারণ করিয়া, তিনি আপনার হৃদয় শান্ত ও শীতল করিতেন। তাহার পর সেই আনন্দ ও শান্তিধারায় জগৎকে প্লাবিত করিতে চাহিতেন। কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম্ম, কুপ্রথাদুষ্ট সমাজ, অজ্ঞানাচ্ছন্ন জনসমাজ, পরমুখাপেক্ষী দেশবাসী, বিরোধী যুগশক্তির মধ্যে বাংলার পিঞ্জরাবদ্ধ রাজব্যাঘ্রের বেদনা ও নৈরাশ্য তাঁহার ভাগ্যে বিধাতাপুরুষ লিখিয়াছিলেন। বাস্তব ও তাঁহার আদর্শের বিরোধ যে তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতে-ছিলেন না, তাই যখন তাঁহার শক্তি ও সাধনার চরম অবস্থা, যখন

তাঁহার অবসন্ন দেহ তাঁহার] আত্মার অসীম উদ্বেগের উত্তাপ সহ্য করিতে একবারে অপারগ না হইয়া উঠিতেছিল, তখন বিধাতপুরুষ তাঁহাকে সেই দেহ হইতে আপনার বিরাট শান্তির ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। তবুও তিনি আশা ছাড়েন নাই, ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন, আমি যদি না পারি, আমার কাজ করিবার জন্য অন্য কেহ নিশ্চিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বা করিবেন,—

উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা,
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।

আমার সমানধর্ম্মা অন্য কোন ব্যক্তি আছেন বা উৎপন্ন হইবেন—কারণ কালের অন্ত নাই এবং পৃথিবীও বিপুলা।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের tragedy টুকু, তাঁহার চিত্তের রুদ্ধ আবেগ, তাঁহার হৃদয়ের অনাহত সঙ্গীত, তাঁহার মর্ম্মের অকথিত বাণীই আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে ও আঘাত দেয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আমাদের সভ্যতা আজ বিষম অগ্নিপরীক্ষা ও বিপদের মধ্যে পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য জগৎ বিবেকানন্দের বৈরাগ্যবাণী আজও শুনে নাই। আমাদের সভ্যতারও সংস্কার হয় নাই। "সেই পরানুবাদ, পরানুকরণ, দাসসুলভ দুর্ব্বলতা", যাহার বিরুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দ সমস্ত জীবন ধরিয়া অসীম অধ্যবসায়ে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা আজও যায় নাই। আমরা মনশ্চক্ষে দেখিতেছি একটা নূতন ভারত— যেখানে লোকে একমন, সমান্তঃকরণ-বিশিষ্ট হইয়া কাজ করিতেছে, সকলেই আশিষ্ট, বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, মেধাবী, জ্ঞানে ও কর্ম্মে, ধর্ম্মানুশীলনে ও বিদ্যাচর্চ্চায়, শিল্প ও ব্যবসায়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রে এক সরল, সহজ, সতেজ স্বাধীন জীবন গড়িয়া উঠিতেছে—সে জীবনে দৈনন্দিন কর্ত্তব্যগুলি কেমন এক সুরে বাঁধা, ইন্দ্রিয়ভোগ কেমন বৈরাগ্যের সংস্পর্শে রূপান্তরিত, সেখানে সমাজের প্রত্যেক বিভাগ পরস্পরের কল্যাণে নিয়োজিত, পুরোহিত শিক্ষিত ও যুগধর্ম্ম-নির্দ্দেষ্টা, যজমান শিক্ষিত ও অধ্যবসায়শীল, বৈজ্ঞানিক ব্যবহারিক বিদ্যায় নিপুণ, বণিক সাহসিক ও উৎসাহী, কৃষকশিল্পী শ্রমজীবী শিক্ষিত

ও শ্রমকুশল, শ্রমজীবিগণ আপনারাই আপনাদের কারখানার পরিচালনের ভার লইয়াছে, সেখানে হাট হইতে, বাজার হইতে, মুদীর দোকান হইতে, ভুনাওয়ালার উনানের পাশ হইতে, মুচী মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হইতে নূতন ব্যক্তিত্বের অভিনব পরিচয় পাওয়া যায়—তাহাদের আশা আছে, ভরসা আছে, শিক্ষা আছে, সুবিধা আছে। নারী সেখানে বিদুষী ও শক্তিমতী হইয়া সমগ্র সমাজকে আপনার স্বজনগৃহরূপে পালন করিতেছেন—এই জীবন যখন ফুটিয়া উঠিতে থাকিবে তখনই বিবেকানন্দের হৃদয়ের অনাগত গীত ও রুদ্ধ আবেগ মুক্ত হইয়া অসংখ্য নর নারীর হৃদয় আলোড়িত করিয়া তাহাদের জ্ঞানে ও কর্ম্মে উদ্দাম ভাবে জাগিয়া উঠিবে।

সেই জাগরণের দিনে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃত, সহজ, অবাধ ও স্বাধীন জীবন দেখিব। কারণ তিনি যে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন তাহার সফলতা অপেক্ষা ব্যর্থতাই আমাদের নিকট অধিক শিক্ষাপ্রদ, তাঁহার সেই অধীরতা—"আমি ভাঙ্গিব পাষাণ কারা, ঢালিব করুণাধারা, জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া আকুল পাগল পারা"—ইহা তাঁহার তৃপ্তি ও আনন্দ অপেক্ষা আমাদের সাধনার শ্রেষ্ঠতর ধন।

যে দিন সে জাগরণ আসিবে, সে দিন নূতন যুগের নূতন যুগশক্তির উপযোগী কর্ত্তব্য আমরা সম্পাদন করিব—সমাজে, শিক্ষায়, বিজ্ঞানুশীলনে, রাষ্ট্রশিল্পে, সাহিত্যে আমরা জাতীয় প্রাণধারটি খুঁজিয়া বাহির করিয়া আবার নূতন ভাবে সকলই গঠন করিয়া তুলিব। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট আরও নূতন নূতন জটিল ও দুরূহ সমস্যা উঠিয়াছে। বৈষয়িক সমস্যা, শ্রমজীবিসমস্যা, সমাজ ও রাষ্ট্রসংগঠন সমস্যা, অন্তর্জ্জাতীয় সমস্যা, শান্তি সমস্যা নূতন ভাবে হিন্দু সভ্যতাকে বুঝিতে হইবে ও সেই সকল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। যুদ্ধের মধ্যেই হউক, যুদ্ধাবসানে হউক,—হিন্দু সভ্যতা যদি এখন বাঁচিয়া থাকে তবে ইহা সে করিবেই—কারণ প্রতিক্রিয়াই যে জীবনের চিহ্ন।

সে দিন হিন্দু সভ্যতার অন্তঃস্থল হইতে পরিব্রাজক আবার বাহির হইবেন একটা আত্মঘাতী সভ্যতার হস্ত হইতে শাণিত তরবার কাড়িয়া লইবার জন্য। তিনি হিংসাপ্রপীড়িত পাশ্চাত্য জগৎকে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিবেন, মা হিংস। কাহাকে হিংসা করিতেছ, মারিতেছ, কাটিতেছ,—তোমাকেই ত। আপনাকে কেহ কখনও হিংসা করে না। বিজ্ঞান সভ্যতার শত্রু হইয়াছে। বিজ্ঞান-কাল-সর্পের বিষদন্ত তিনি উৎপাটন করিয়া তাহাকে দিয়া শিব ও সুন্দরের লজ্জা নিবারণ করাইবেন, সত্যের অলঙ্কাররূপে সাজাইবেন। বিজ্ঞান বলিতেছে, হিংসার ভিতর দিয়া জীবের উন্নতি। পরিব্রাজক বলিবেন, জীবের পক্ষে যাহা সত্য, মানুষের পক্ষে তাহা মিথ্যা। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পরস্পরের শত্রুতাচরণ করিতেছে; পরিব্রাজক বলিবেন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যদি পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে সমাজ-দেহের অকল্যাণ। জাতিগণ ভূমি ও অর্থলোভে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। পরিব্রাজক বলিবেন, জাতির নিকট সাহিত্য, আর্ট, অধ্যাত্ম-সাধনাই আসল সম্পদ্; তাহাই সর্ব্বকালের ও সর্ব্বজাতির। তাহাদের পুষ্টিবিধানে একের স্বার্থসাধন নহে, সকলের কল্যাণবিধান। বিভিন্ন জাতিসমুদয় নারায়ণের বিরাট আত্মা। প্রত্যেক জাতির বিশিষ্ট সাধনায় ঐ বিরাট ক্রমবিকাশমান্ আত্মার এক একটি স্বতন্ত্র ভাব ও ক্রিয়া অভিব্যক্ত, এবং তাহার নিরোধে সেই বিরাট আত্মার হিংসা ও অবমাননা। সে দিন পরিব্রাজক পাশ্চাত্যের সর্ব্বজাতিসভায় অহিংসা, মৈত্রী ও সখ্যের মন্ত্র প্রচার করিয়া বলিবেন, জাতিতে জাতিতে সখ্যবন্ধনে ও পরস্পরের কল্যাণসাধনে সেই অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাসের প্রীতিসাধন।

রোমীয় সভ্যতার বিজয়ের মোহ, যাহা অতীতের কত শতাব্দী ধরিয়া পাশ্চাত্য জগৎকে বিপথে প্রেরণ করিয়াছে, বর্ত্তমান সভ্যতার হিংস্র ও পরশ্রীকাতর জাতীয়তা, যাহা ভগবানের শান্তিরাজ্যে অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহের আয়োজন করিয়াছে, তাহার এতকাল পরে একান্ত বিনাশ সাধন হইবে। হিন্দুর এই জগদ্বিজয়ের নেতা হইবে সীজার,

নেপোলিয়ন নহে, তাহার উপকরণ হইবে সেনাবল নহে, তাহার নেতা ও উপকরণ হইবে পরিব্রাজক ও বৈরাগী এবং তাঁহাদের অলক্ষ্যে বুদ্ধ, অশোক, ভিক্ষু ও শ্রমণগণের অশরীরী আত্মা চঞ্চল হইয়া আপনাদের শান্তিনিবাস ত্যাগ করিয়া, বিশ্বজগতের অসংখ্য লৌহবর্ত্ম ও বাণিজ্য পথে পরিব্রাজকের অগ্রে অগ্রে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের বিপুল বিশ্বযজ্ঞের স্বস্তিবাচন করিবেন।

সেদিন বেলুড় মঠের নিভৃত কোঠায় তীর্থযাত্রীর বিপুল সমারোহ, দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতটে কুললক্ষ্মীগণ স্তবগান করিতে করিতে নির্নিমেষ-নেত্রে প্রাতঃসূর্য্যকে বরণ করিবে, হরিনামগানমত্ত বৈরাগী সেদিন গৃহে গৃহে অধিকতর সময় যাপন করিবে, আগতশ্রী পল্লীগ্রামের কৃষি-শিল্পবিদ্যালয়ে, শ্রমজীবিগণের স্বচালিত কর্ম্মশালায়, আমাদের নৈশবিদ্যালয়সমূহে সেদিন অফুরন্ত উৎসব। সেদিন মায়াবতী ও নৈনীতালের গিরিনিতম্ব নূতন সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া অভ্যস্ত পথিকের দৃষ্টি হরণ করিবে, হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গে নক্ষত্রখচিত রাত্রি মনকে আরও উদাস ও ব্যাকুল করিবে, কাশীতলবাহিনী গঙ্গা আরও দ্রুতগতিতে সমুদ্রের দিকে ধাবমান হইবে, মাদ্রাজ বন্দরে সমুদ্রতরঙ্গ নাচিতে নাচিতে তাহাদের হর্ষ জ্ঞাপন করিবে,—আর অনন্ত শস্য-শ্যামলা, সহস্রস্রোতস্বতীমাল্যধারিণী বাংলাদেশের সে রূপের কথা কি বলিব! আপনারা কি সে রূপ দেখিতেছেন? সে জাগরণ কি আসিয়াছে? বিবেকানন্দ কি আসিয়াছেন? আপনারা অনুভব করিতেছেন, আপনারা বলুন।

সেই জীবনই ধন্য যাহা বর্ত্তমানে আবদ্ধ নহে, যাহা অতীত হয় না, এবং যাহা বর্ত্তমান ও অতীতের সমস্ত সঞ্চিত শক্তি পুঞ্জীভূত করিয়া নূতন ভাব ও রূপ গ্রহণ করিতে করিতে চির অগ্রসর।*

---

* বিগত ১৯শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দের বাৎসরিক স্মৃতিসভায় ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে পঠিত।

স্বপ্নতত্ত্ব।

(ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার।)

(৩)

স্বপ্নতত্ত্ব আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে আমাদের মন যেন কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। বাহ্যস্তরের মানসিক ক্রিয়া সকলই আমরা জাগ্রৎকালে জানিতে পারি; কিন্তু নিম্নস্তরে যে সকল ক্রিয়া হয়, তাহা আমাদের জাগ্রৎকালে অনুভূত জ্ঞানের দ্বারা ধরিতে পারি না; তথাপি ঐ স্তরের (Subconscious) ক্রিয়া সকলই আমাদের বাহ্য জ্ঞানগোচর মানসিক ক্রিয়া সকলকে প্রধানতঃ নিয়মিত করিয়া থাকে। সাধক গাহিয়াছেন,—

'ঘুমাইলে যে জেগে থাকে সে তোমার গুরু বটে—আছে সে দেহের মধ্যে, ধ্যান কর তায় অকপটে'—এই গীতি দ্বারা তিনি কি মনের ঐ অজ্ঞাত স্তরের প্রাধান্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন?

ডাক্তার ফ্রুড (Freud) মনের ঐ নিম্নস্তরের ক্রিয়া সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, কামনাসমূহ কেবল যে আমাদের মনের বাহ্য স্তরে থাকে এমত নহে, কিন্তু নিম্নস্তরও উহাদের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়; তবে ঐ বিষয় আমরা সাধারণতঃ জাগ্রৎ অবস্থায় উপলব্ধি করিতে পারি না। আবার অনেক অপ্রীতিকর বিষয় আমরা নিজের নিকট প্রকাশ হইতে দিই না, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ—উহারই নাম আত্মবঞ্চনা। ঐ আত্মবঞ্চনারূপ বিনাশের পথে মানব কি প্রকারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় তাহা গীতাকার এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

২য় অধ্যায়— ৬২, ৬৩।

রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

মা আমায় ঘুরাবি কত ;
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত।
ভবের হাটে জুড়ে দিয়ে মা,
পাক দিতেছ অবিরত।
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি,
দেখি মা তোর অভয় পদ॥

মনস্তত্ত্বের পূর্ব্বোক্ত সত্যই উহার দ্বারা নিরূপিত হইতেছে। আমাদের মনের চক্ষে কাম বা কামনার ঠুলি রহিয়াছে বলিয়াই আমরা ভবের হাটে ঘুরিতেছি, অথচ আপনাকে চক্ষুষ্মান বলিয়া মনে করিতেছি। মনের নিম্নস্তরে অবস্থিত সংস্কারগুলিকে যখন আমরা ধরিতে পারিয়া দূর করিয়া দিতে সমর্থ হইব তখনই আর আমাদিগকে সংস্কারসমূহের ঠুলিদ্বারা চালিত হইতে হইবে না।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কামকাঞ্চন ত্যাগের উপদেশ দ্বারা আমাদিগকে মনের নিম্নস্তরের বাসনাসমূহকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। মনের নিম্নস্তরকে কামনাশূন্য বা হীন সংস্কার-রহিত করিতে না পারিলে সাধক পূর্ণ সংযমে কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না এবং ঐ বিষয় যে করিতে পারা যায় তাহা তাঁহার জীবনের নানা ঘটনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। যথা—

নিদ্রার সময়েও কাঞ্চনস্পর্শমাত্র তাঁহার হস্ত সঙ্কুচিত ও অবশ হইয়া যাইত। ব্যাধি আরোগ্য হওয়া অথবা অন্য কোন হীন কামনার সিদ্ধির জন্য তাঁহার পদধূলি লইলে তিনি পদতলে বৃশ্চিকদংশনের যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। মনের অন্তরতম স্তর হইতে হীন কামনা-সমূহ সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জিত হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার নিদ্রাদি

সময়েও দেহ ঐ ভাবে স্বতঃ নিয়ন্ত্রিত হইত—উহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়।

মনের নিম্ন বা অন্তরতমস্তরসমূহে কামকাঞ্চনাসক্তির মূল নিহিত থাকায় উহা আমাদের জাগ্রৎ মনের প্রবৃত্তি সকলের পরিচালক হইয়া রহিয়াছে, এ কথা বলা হইয়াছে; তথাপি উহা যে অপর অসাধারণ বিভূতি সকলের আধার, তাহা স্বপ্নাবস্থার প্রত্যক্ষ সকলের দ্বারা মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হয়।

স্বপ্নে কখন কখন নূতন রকমের মানসিক ক্রিয়ার প্রকাশ দেখা যায়। ইহাকে clairvoyance অথবা স্বপ্নের দূরবর্ত্তী পদার্থ দেখিবার শক্তি বলা যাইতে পারে। ইহাতে স্বপ্ন দর্শনকারী দূরের ঘটনার ঠিক অনুরূপ দর্শন করেন, অথবা ভবিষ্যতের ঘটনার স্পষ্ট আভাস প্রাপ্ত হন। কিন্তু ভবিষ্যৎ ঘটনার আভাস অপেক্ষা দূরের ঘটনার অনুরূপ দর্শনই অধিক সময় হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে স্বপ্নের সংজ্ঞা অনুসারে ভবিষ্যৎ ঘটনা বুঝিয়া লইবার প্রথাও প্রচলিত আছে। যেমন আমাদের দেশে স্বপ্নে সর্পদংশন বংশবৃদ্ধির পরিচায়ক বলিয়া প্রবাদ আছে। দৈবক্রমে কখন কখন ঐরূপ হইয়াও থাকে। কিন্তু সকল স্বপ্নই যে কোন না কোন ভবিষ্যৎ ঘটনা প্রকাশ করে, ঐ বিষয় বৈজ্ঞানিকভাবে এখনও প্রমাণিত হয় নাই।*

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি স্বপ্নে কিরূপে অজ্ঞাত মনের লুপ্ত স্মৃতি এবং জাগ্রৎ মনেরও অস্পষ্ট অনুভূতি-

* আমাদের দেশে 'কাকচরিত্র' পুস্তকের মত স্বপ্নব্যাখ্যা করিবার জন্য কতকগুলি পুস্তক আছে। এগুলি বৈজ্ঞানিকভাবে লিখিত নহে। পাশ্চাত্য দেশে ঐরূপ কাকচরিত্রের মতন স্বপ্নব্যাখ্যা-পুস্তক অনেক আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংরাজীতে Dreams,—Scientific and Practical Interpretations—by G. H. Muller বলিয়া একখানি পুস্তকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যদিও এই পুস্তকের নাম স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলা হইয়াছে, তথাপি বৈজ্ঞানিক হিসাবে উহার মূল্য কাকচরিত্রের মত।

সমূহের পুনরুদ্ধার হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াগিয়াছেন—

"অশেষ জ্ঞান ও অনন্ত শক্তির আকর ব্রহ্ম, প্রত্যেক নরনারীর অভ্যন্তরে সুপ্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, সেই ব্রহ্মকে জাগরিত করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। ঐ কথা অন্যপ্রকারে এইভাবে বলা যাইতে পারে,—মানবের ভিতর যদি জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত প্রস্রবণ বিদ্যমান না থাকিত তাহা হইলে সহস্র চেষ্টাতেও সে কখনও জ্ঞানী বা শক্তিমান হইতে পারিত না।"

মনের যে অংশ আমাদের নিকট অপরিচিত হইয়া রহিয়াছে এবং স্বপ্ন দ্বারা যাহার অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় আমরা ঐরূপে মধ্যে মধ্যে পাইয়া থাকি তাহা কি পূর্ব্বোক্ত এই সুপ্তব্রহ্মেরই ক্ষমতা? মনের নিজের বিশেষ ক্ষমতাব দ্বারা ঐ অজ্ঞাত অংশ স্বপ্নকালে তথ্য আবিষ্কার করিয়া জাগ্রৎ মনকে জানাইয়া দিয়াছে, এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে নিম্নে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া গেল।

মারকয়েস দে করূডারসে (Marquess de Corderect) একজন প্রসিদ্ধ গণিতশাস্ত্রবিদ্ ছিলেন। তিনি ২২বৎসর বয়সের সময় জটিল অঙ্কশাস্ত্রের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি যখন অঙ্কশাস্ত্রের কোন কঠিন প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিতেন না, তখন তিনি ঘুমাইয়া পড়িতেন; স্বপ্নে তাঁহার প্রশ্নের সমাধান হইয়া যাইত, এবং তিনি জাগিলে উক্ত সমাধান তাঁহার স্মরণ থাকিত। লেখকের নিজ জীবনেরও একটি ঘটনা স্মরণ আছে যাহাতে তিনি জ্যামিতির একটি কঠিন সমস্যা নিদ্রিত অবস্থায় সমাধান করিয়া ছিলেন। কেবানিস্ (Cabanis) জাগ্রৎ অবস্থায় যে সকল কূট রাজনৈতিক বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারিতেন না, নিদ্রিত অবস্থায় সেই সকলের মীমাংসা হইয়া যাইত।

একজন আইনব্যবসায়ী একটি জটিল মকদ্দমার কাগজপত্র পড়িয়া উহার মর্ম্মোদ্ধার ও তাঁহার মক্কেলের স্বপক্ষের হেতুগুলি

সংগ্রহ করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি সেই মকদ্দমার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে রাত্রে ঘুমাইয়া পড়েন। তাঁহার স্ত্রী রাত্রে লক্ষ্য করেন যে, তাঁহার স্বামী হঠাৎ রাত্রে উঠিয়া কতকগুলি কাগজ লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ঐরূপ কতকক্ষণ লিখিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন। পরদিন স্বামী তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন যে, তিনি তাঁহার মকদ্দমার বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া বিশেষ কিছু স্থির করিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি যেন স্বপ্নে এই বিষয়ের অতিসুন্দর মীমাংসা করিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া তাঁহার স্ত্রী গতরাত্রের লিখিত কাগজগুলি বাহির করিয়া দিলেন। স্বামী স্বহস্তলিখিত এই মকদ্দমা সম্বন্ধে এরূপ সুযুক্তিপূর্ণ মীমাংসা করা রহিয়াছে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

টারটিনি (Tarteni) বলিয়া একজন সঙ্গীতজ্ঞ 'শয়তানের রাগিণী' (Devil's Sonata) বলিয়া একটি নূতন রাগিণী পাশ্চাত্য সঙ্গীতশাস্ত্রে সংযোজিত করিয়াছেন। এই রাগিণী আবিষ্কারের ইতিহাস এইরূপ। তিনি একরাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে তিনি যেন আপনাকে শয়তানের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। অর্থাৎ Faust (ফষ্টের) গল্পের মতন তাঁহার শয়তানের সহিত সর্ত্ত হইল যে, কিছুদিনের জন্য শয়তান তাঁহার দাসস্বরূপ হইয়া আজ্ঞা পালন করিবে, পরে ঐ কার্য্যের মূল্যস্বরূপে শয়তান তাঁহার আত্মার অধিকারী হইবে। পরে তিনি তাঁহার নিজের বেহালা শয়তানকে দিয়া তাহাকে একটি গৎ বাজাইতে অনুরোধ করেন। শয়তানের বাদ্য এরূপ অত্যাশ্চর্য্যরূপে সুন্দর হইল যে টারটিনি জাগিয়া উঠিয়া লাফাইয়া নিজের বেহালা হস্তে লইলেন। শয়তানের নিকট শুনা সুর তাঁহার কানে তখনও ঝঙ্কার দিতেছিল। যে সুর স্বপ্নে শুনিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজের বেহালায় আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করেন। যাহা শুনিয়াছিলেন, ঠিক তাহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই, তবে যতটা পারিয়াছিলেন তাহা 'শয়তানের রাগিণী' বলিয়া পাশ্চাত্যের সঙ্গীত-শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

সাহিত্যও স্বপ্নলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে, ইহারও অনেক দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ আছে। আর এল ষ্টিভেন্‌সন্ (R. L. Stevenson) স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্য লইয়াই গল্প লিখিতেন। তিনি একটি গল্পের বিষয় স্থির করিয়া লইয়া রাত্রে নিদ্রা যাইতেন। স্বপ্নে তাঁহার গল্পের নায়ক নায়িকা প্রভৃতি যেন রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়া গল্পের অভিনয় করিত। তিনি প্রত্যহ স্বপ্নে যাহা দেখিতেন তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন। একদিনের স্বপ্নে সমস্ত গল্পটি ফুরাইত না। পূর্ব্বরাত্রে যাহা স্বপ্ন দেখিতেন পরের রাত্রের স্বপ্ন তাহার পরের ঘটনা হইতে আরম্ভ হইত। এইরূপে গল্প চলিত। জেমস্ পেন, (James Payne) যিনি একজন বিখ্যাত লেখক, তিনি একস্থলে লিখিয়া গিয়াছেন, ষ্টিভেন্‌সন্ (Stevenson) নিজের স্বপ্নলব্ধ অভিজ্ঞতা অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ (Dr. Jekyll and Mr Hyde) লিখিয়াছেন।

ডাক্তার ফ্রুড কবিত্বের একটি চমৎকার কৌতূহলপ্রদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে কবিত্ব আমাদের বাহ্য বা জাগ্রৎ মনের ব্যাপার নহে, যে মনের দ্বারা আমরা স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করি, ইহা সেই অজ্ঞাত মন হইতে উদ্ভূত। এই জন্য কবিতার ভাব অনেক স্থলে স্বপ্নময়। স্বপ্ন যেমন ভাবগুলিকে অনেকস্থলে চিত্রাকারে অঙ্কিত করিয়া যায়, কবিতাতেও ভাবসমূহ সেইরূপ চিত্রের আকারে অঙ্কিত হয়। স্বপ্নের ভাবের ন্যায় কবিতার ভাবও অনেক স্থলে সহজ বোধ্য হয় না, তথাপি তাহা আমাদের সেই অজ্ঞাত মনের নিম্নস্তরের তন্ত্রীতে এমনভাবে প্রতিঘাত করে যে আমরা তাহার সকল অর্থ সম্যক্ নির্দ্দেশ ও প্রকাশ করিতে না পারিলেও উহার ভাব বুঝিয়াছি বলিয়া মনে হয়। মনে করুন, একজন উচ্চকার্য্যে ব্রতীর মনের গভীর স্তরে এই ভাব রহিয়াছে যে, তিনি কখনও লোক প্রতিষ্ঠা চাহিবেন না, হয়ত তিনি একদিন স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি মানগাছের গোড়ায় ছাই ঢালিতেছেন, কিন্তু এই স্বপ্নের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহা তিনি নিজেও বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু এমন হইতেও

পারে যে বহুদিন পূর্ব্বে তিনি "মানের গোড়ায় না দিলে ছাই, মান কি মিলে কথার ছলে" এই সঙ্গীতের ঐ চরণটি শুনিয়াছিলেন।

কবিতাতেও কবির মনের অনেক গূঢ় ভাব তাহার নিজের অজ্ঞাতে চিত্রাকারে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "সোনার তরী" কবিতাটির আমরা উল্লেখ করিতে পারি। এইরূপ কবিতার অর্থ স্পষ্ট নহে বলিয়া কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্পষ্টার্থ কবিতা অপেক্ষা এই শ্রেণীর কবিতা নিকৃষ্ট বলিয়াছেন। তিনি, "সোনার তরী" কবিতার সমালোচনা উপলক্ষে এই শ্রেণীর কবিতাকে অর্থহীন কবিতা বলিয়া বিরুদ্ধ-সমালোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু যদি ফ্রুডের কথা সত্য বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় স্বপ্নের মত কবিতার অন্তর্নিহিত গূঢ়ভাব এবং ইঙ্গিতই যেন কবিতাকে অধিকতর প্রাণময় করিয়া তুলে। দৃশ্যহিসাবে 'সোনার তরীর' চিত্র এইরূপ, "চতুর্দ্দিকে জলবেষ্টিত ক্ষেত্রের মধ্যে কেহ তাঁহার বহুদিনের পরিশ্রমে যে ধান্যগুচ্ছ ফলবতী হইয়া সুপক্ক হইয়াছে সেই রাশি রাশি ধান্য কর্ত্তন করিয়া স্তূপ করিতেছেন;—তিনি সোনার তরীতে তাঁহার সেই ধান্য অথবা স্বকৃত কর্ম্মফল রাশি তুলিয়া দিলেন কিন্তু ঐ তরীতে তাঁহার নিজের স্থান হইল না, তিনি রিক্ত হস্তে নদী তীরে একাকী পড়িয়া রহিলেন।" এই চিত্রে কবির অন্তরের গূঢ় আত্মসমর্পণের ভাবই পরিস্ফুট হইয়াছে, "চির জীবনের সকল ফল সোনার তরীতে তুলিয়া দিব, কিন্তু নিজে সে তরীতে স্থান জুড়িয়া রহিব না। কর্ম্মফল জগৎকে দান করিব, কিন্তু প্রতিষ্ঠা হইতে নিজেকে নির্ব্বাসিত করিব" এই গূঢ় ভাবটি এইরূপে চিত্রাকারে অঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের সহজ বোধ্য না হইলেও আলোকরশ্মি যেমন ইথারে স্পন্দন উৎপাদন করে, তেমনি কবির ঐভাব আমাদের ভাব-রাজ্যে একটি অনুভূতির কম্পন উৎপাদন করে, ভাব ভাবকে স্পর্শ দ্বারা সজাগ করিয়া তুলে সুতরাং অর্থ স্পষ্ট না বুঝিলেও মনে

হয় যেন কবিতার সুরের সহিত আমাদের মনের সুরটিও মিলিয়া যাইতেছে।

কবিতার সহিত স্বপ্নের অপর এক মিল, দ্ব্যর্থবোধক বাক্যে। যেমন "মানের গোড়ায় না দিলে ছাই, মান কি মিলে কথার ছলে" এখানে এক 'মান' শব্দটিই দ্ব্যর্থবোধক হইয়া কবিতাকে প্রাণময় করিয়াছে। অর্থের হিসাবেও গোল নাই, মান গাছের গোড়ায় ছাই দিলে মান গাছ যথার্থই বৃদ্ধি পায়, সম্মান তুচ্ছ করিলে রাশি রাশি সম্মান আপনা হইতে আসিয়া জুটে, ইহাও সত্য। আবার দ্ব্যর্থবোধক "মান" শব্দটি কবিতায় এইরূপ ভাবে গ্রথিত করায় ভাবটি যেরূপ সুস্পষ্ট হইয়াছে তাহা অনেক কথাতেও সেইরূপ বুঝান যাইত না। এখানে কবিতার সহিত স্বপ্নের আর একটি মিল উল্লেখ করা যায়, সেটি অল্প কথায় ভাবকে বিস্তৃতরূপে প্রকাশ করা। ফ্রুড বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ঐরূপ চিত্র সহায়ে ভাব প্রকাশ কেবল কবিতাতে নহে, সাধারণ হাস্য কৌতুকেও যে রস থাকে তাহাতেও লক্ষিত হয। পরিহাসে অনেক সময়ে একটি সামান্য শব্দের ভিতর অনেক অর্থ থাকে। ফ্রুড বলেন এই পরিহাসরসও আমাদের সাধারণ মনোজগতের নহে, ইহা স্বপ্নরাজ্যের মনের নিকট হইতে ধার করিয়া লওয়া হইয়া থাকে। অতএব রূপকে, দ্ব্যর্থযুক্ত বাক্যে অথবা সঙ্ক্ষিপ্তের মধ্যে বহুলার্থের যাহাতে প্রকাশ সেইরূপ রসিকতা সমুদয়ে তাঁহার মতে স্বপ্ন-রাজ্যের ছাপ মারা রহিয়াছে। একজন অপরের ভাবকে একটি ভাবময় চিত্র গঠন করিয়া পরিহাসচ্ছলে আঘাত করিল, সেও আবার সেইরূপেই তাহার পাল্‌টা জবাব দিল। এইরূপ ভাব-রাজ্যের চিত্রে বস্তুতন্ত্রতা থাকে না, তথাপি উহাতে স্বপ্নরাজ্যের ব্যাপারের ন্যায় পরস্পরের ভাবের উপর ঘাত প্রতিঘাত হয। একজন বন্ধুকে রসিকতা করিয়া বলিতে চায় যে "তুমি ছুটী লইয়া বেশ মদ খাইয়া কাটাইতেছ।" সে তাহার বন্ধুকে লিখিল তোমার Alco-holidays কেমন কাটিতেছে?" Alcohol এবং holidays এই

দুইটি কথা মিলাইয়া (Alcoholidays) একটি নূতন সংক্ষিপ্ত কথা সৃষ্টি করিয়া ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিল, এখানে এইটিই রসিকতার প্রাণ। ফ্রুড দেখাইতে চাহিয়াছেন যে বাক্যসমূহের ঐরূপ অপূর্ব্ব জমাটবাঁধা (condensation) স্বপ্নরাজ্যের অনুকরণে হইয়া থাকে। ফ্রুড পাশ্চাত্য দেশ-প্রচলিত রসিকতার অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া রসিকতা বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্ত বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের দেশ-প্রচলিত রসিকতার মধ্যে খুঁজিলেও ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটি সেকালের রসিকতার দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করিতেছি. এইটিতে দ্ব্যর্থ সহায়ে ভাবের দ্বারা ভাব প্রতিহত হইতেছে বুঝা যায়।

একজন ব্রাহ্মণ পথে যাইতে যাইতে একটি শিবমন্দির দেখিতে পাইলেন। তিনি একটু অধিক শাস্ত্রজ্ঞ এবং নিজেকে বিজ্ঞ বলিয়া জানেন। অতএব এই মন্দিরস্থ শিবলিঙ্গ যদি কোন নীচজাতির স্থাপিত হয় তবে তাঁহার মত নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের প্রণাম করা উচিত নয়, অথচ শিবপ্রণাম করাও শাস্ত্রাদেশ। অতএব দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন ঐ সময় আর একজন ব্রাহ্মণকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে পণ্ডিত বোধে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কিম্ অয়ম্ শম্ভুঃ স্বয়ম্ভূঃ ?

এই শম্ভু কি স্বয়ম্ভূ ? অর্থাৎ অন্যের দ্বারা স্থাপিত না মৃত্তিকা ভেদ করিয়া নিজেই প্রকাশিত হইয়াছেন ?

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন—"নাযম্ স্বয়ম্ভূঃ কিন্তু শম্ভুঃ"

ইনি স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ ব্রহ্ম নহেন, কিন্তু শিব।

তাহাতে প্রথম ব্রাহ্মণ কিছু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"স্বয়ং ভূ ভবতি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা কিম্ স্বয়ম্ভূঃ শম্ভুঃ ন উচ্যতে।" আপনা হইতে হইয়াছেন এইরূপ ব্যুৎপত্তি ভাবিয়া কি শম্ভুকে স্বয়ম্ভূ বলা যায় না ?

ইহাতে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন,

"গচ্ছতি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা ভবান্ অপি গো।"

চলিয়া বেড়াইতে পারেন যদি এই ব্যুৎপত্তি ধরা যায় তাহা হইলে আপনিও গরু।

এখানে এই রসিকতায় ভাবের দ্বারা ভাবকে আঘাত করা হইতেছে। প্রথম ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্যাভিমানে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ ব্যুৎপত্তি অর্থ ধরিয়া আপনিও গরু এই রসিকতা দ্বারা আঘাত করিলেন। অথচ এখানে গচ্ছতি হইতে গো শব্দের উৎপত্তি ইহাও শব্দশাস্ত্রসঙ্গতই বটে।

শব্দের মারপেঁচে এইরূপ এককে বিভিন্নরূপে দেখানো যাইতে পারে। স্বপ্নে সেটি চিত্রের হিসাবে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যেমন wall streetকে দ্বিতীয় প্রবন্ধে কুমারী দেয়াল দেখিয়াছিল, ইহাতে শব্দের অর্থের সহিত ভাবের অর্থ যে দেয়াল তাহা হইতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার আশ্চর্য্য সঙ্গতি দেখা যায়। সেইরূপ এখানে "গচ্ছতি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা ভবান্ অপি গো" এই শব্দার্থের সঙ্গতির সহিত ভাবের অর্থ শিব প্রণাম করিতে গিয়া যে এইরূপ বাছাবাছি করে সে গরু ভিন্ন আর কি ? এই ভাবার্থেরও সঙ্গতি রহিয়াছে। এইরূপ শব্দার্থের সহিত ভাবার্থের সুস্পষ্ট মিল, কবিতায় পরিহাসে ও স্বপ্নে দেখা যায়।

কবিতার সহিত স্বপ্নের আর একটি মিল আছে। চিত্রাকারে নাটকীয় দৃশ্যের ঘটনাবলীর ন্যায় যে সকল ভাব আকার ধারণ করিয়া স্বপ্নে আমাদের মনোরাজ্যে পরিস্ফুট হয়, সেই সকল দৃশ্যের মধ্যে স্বপ্নদ্রষ্টার অস্তিত্ব যেমন সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান, কবিতাতেও প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে কবির অস্তিত্ব সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান থাকে।

(ক্রমশঃ)

অজ্ঞান বা মায়া।

(স্বামী অমৃতানন্দ)

যে জন্য আমরা জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধিরূপ মহান্ দুঃখাদি ভোগ করি, কামনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া পরে নৈরাশ্যের ঘাত প্রতিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে থাকি, নিজেরা মহান্ হইলেও নিজকে অতি ক্ষুদ্র মনে করি, যাহার নিবারণে আমাদের সকল দুঃখের নিবারণ হয়, যাহার অপসারণে সকল আবরণ অপসারিত হয়, যাহার নিবৃত্তিতে জ্ঞানজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তাহাই অজ্ঞান। স্বস্বরূপ আত্মা কালত্রয় কর্তৃক অনবচ্ছিন্ন হইলেও এবং সেই আত্ম স্বরূপ প্রকৃত বস্তু হইলেও যে কারণে উহাকে আমরা প্রকৃত বস্তুরূপে উপলব্ধি করিতে পারি না এবং আত্মা নির্ব্বিকার, নিরবয়ব হইলেও যে জন্য উহাকে বিকারী সাবযব বলিয়া মনে করি, তাহাকে অজ্ঞান বলে।

যে অজ্ঞান নির্ব্বিকার, নিরবয়ব, কালত্রয় কর্তৃক অনবচ্ছিন্ন ব্রহ্মকে যেন বিকারী, সাবয়ব ও কালত্রয় কর্তৃক অবচ্ছিন্ন বোধ করাইতেছে তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি? তাহা সৎ না অসৎ?

অজ্ঞান সৎ নহে, কারণ জ্ঞানোদয়ে উহা থাকে না এবং উহা শশবিষাণের ন্যায় অসৎও নহে; যেহেতু ঐ অজ্ঞানই 'ব্রহ্ম যেন অবস্তু' এইরূপ বোধের কারণ। যাহা অসৎ তাহা কখনও কারণ হইতে পারে না সুতরাং অজ্ঞান সৎও নহে অসৎও নহে অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়। যাহা অনির্ব্বচনীয় তাহা কি অভাব পদার্থ?

উহা অভাব পদার্থ নহে; কারণ শ্রুতিতে আছে—"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং" অর্থাৎ অজ্ঞান অজ, এক এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক। শ্রুতিতে দেখা যায় যে কোনও কোনও মহাপুরুষ এই অজ্ঞানকে জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈ-

নিগূঢ়া"। মায়ার কার্য্য দ্বারাও মায়া যে অভাব পদার্থ নহে ইহা অনুমান করা যায়।

এই অজ্ঞান যদি অভাব পদার্থ না হয় তাহা হইলে ইহার নিবৃত্তির উপায় কি?

এই অজ্ঞান জ্ঞানের বিরোধী সুতরাং আত্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানের দ্বারা ইহার নিবৃত্তি করা যায়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।'

আমাদের অজ্ঞতা আমরা অনেকসময়ে উপলব্ধি করিয়া থাকি, ইহাই অজ্ঞান যে অভাব পদার্থ নহে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সুষুপ্তি অবস্থা তাহার একটি বিশেষ উদাহরণস্থল। সুষুপ্তিকালে যে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞান ছিলাম, ইহা জাগ্রৎ হইবার পর বেশ অনুভব করিয়া থাকি।

মায়া ত্রিগুণাত্মক ও ভাবরূপ হইলেও 'ইহা এইপ্রকার' এইরূপ বলিয়া স্থূল পদার্থের ন্যায় দেখাইতে পারা যায় না সুতরাং মায়া 'যৎকিঞ্চিৎ' এইরূপ বলা হয়।

"জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান" ইহাও বলা যায় না। আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে জ্ঞানের অভাবই অজ্ঞান এইরূপ ভাবে কথাটির অর্থ করিয়া থাকি বটে কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, বস্তুতঃ কখনও জ্ঞানের অভাব হয় না; শাস্ত্রে চৈতন্যকে জ্ঞান বলে, বুদ্ধিবৃত্তিকেও কেহ কেহ জ্ঞান বলে, আবার কেহ কেহ জ্ঞানকে আত্মার গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। অজ্ঞান এই তিন প্রকার জ্ঞানের মধ্যে কোন্ প্রকার জ্ঞানের অভাব? তদুত্তরে বলা যায়, প্রথমোক্ত জ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্যই জ্ঞান, উহা নিত্য, সুতরাং সে জ্ঞানের অভাব হইতে পারে না। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি, উহা স্বয়ং জড় এবং সেই বুদ্ধিবৃত্তি চৈতন্যব্যাপ্ত হইয়াই বস্তু প্রকাশ করে। বুদ্ধিবৃত্তি যখন চৈতন্যের সাহায্য ব্যতীত বস্তু প্রকাশ করিতে সক্ষম নহে তখন উহা জড়। কিন্তু চৈতন্যের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে বলিয়া লোকে তাহাকে

জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করে। বুদ্ধিবৃত্তি যখন জড় তখন উহা জ্ঞান নহে। সুতরাং অজ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তিরূপে উল্লিখিত জ্ঞানের অভাবও নহে। জ্ঞান নামক আত্মগুণের একেবারে অভাব হওয়া অসম্ভব। কারণ, যখনই "আমি অজ্ঞান ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই" বলিবে তখনই তোমার জ্ঞানের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইবে। সে সময়ে অন্য প্রকার জ্ঞান না থাকিলেও অজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান ছিল, অর্থাৎ অজ্ঞান অবস্থার অনুভব যে জ্ঞান দ্বারা হইযাছিল সেই জ্ঞান ছিল সুতরাং তৃতীয় প্রকার আত্মগুণরূপ জ্ঞানের অভাবও সম্ভবপর হইল না। অতএব অজ্ঞান জ্ঞানের অভাবরূপী নহে উহা যৎকিঞ্চিৎ।

ব্রহ্মের শক্তি মায়া—জগৎকারণ সদ্বস্তু যে ব্রহ্ম তাহা হইতে পৃথক্ সত্তা রহিত যে পরমাত্মশক্তি তাহাই মায়া। যেমন দাহ আদি কার্য্য দেখিয়া অগ্নির শক্তি অনুমান করা যায় তদ্রূপ জগৎপ্রপঞ্চরূপ কার্য্য দেখিয়া ব্রহ্মের মায়া শক্তি অনুমান করা যায়। কারণ, কার্য্য ব্যতিরেকে যখন কোন বস্তুর শক্তি বোধগম্য হয় না। ব্রহ্মের শক্তি মায়া হইলেও এবং তাহার পৃথক্ সত্তা না থাকিলেও ব্রহ্মের স্বরূপ মায়া এইরূপ বলা যায় না। যেরূপ অগ্নির দাহিকাশক্তিকে অগ্নির স্বরূপ বলা যায় না কিন্তু অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি অভেদ সেইরূপ ব্রহ্ম ও তাহার শক্তি মায়া অভেদ।

ব্রহ্ম ও মায়া যদি অভেদ হয়, তাহা হইলে মায়ার নাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মেরও নাশ হইতে পারে?

অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি অভেদ হইলেও যেমন মণিমন্ত্রাদির দ্বারা অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তির ব্যবধান হইলে পর তখন সেই অগ্নির দাহিকাশক্তির অভাব হইলেও অগ্নির অস্তিত্ব থাকে তেমনি মায়ার নাশ হইলেও ব্রহ্মের অস্তিত্ব থাকে।

মায়া স্বতন্ত্রা ও অস্বতন্ত্রা—মায়া চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে সুতরাং মায়াকে স্বতন্ত্র বলা যায় না। চৈতন্য ব্যতিরেকে মায়ার প্রকাশ হয় না বলিয়া মায়া অস্বতন্ত্রা। আবার অসঙ্গ চৈতন্যকে যেন সসঙ্গ করে বলিয়া অর্থাৎ পটকে আশ্রয় করিয়া রং যেমন নানা-

প্রকার লোহিত, পীত চিত্রের সৃষ্টি করে সেইরূপ অসঙ্গ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া মায়া আকাশাদি বিরাট বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করে বলিয়া তাহাকে স্বতন্ত্র বলিতে পারা যায়।

মায়া ঐন্দ্রজালিক শক্তি—মায়ার কার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয় এবং উহার কার্য্য বিচার করিতে যাইয়া উহাকে এক অপূর্ব্ব ঐন্দ্রজালিক শক্তি ব্যতিরেকে অন্য আখ্যা দিতে পারা যায় না। একটি অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে বিশাল বটবৃক্ষের সৃষ্টি হইল! কি প্রকারেই বা এই বিশাল বটবৃক্ষের স্থিতি সেই ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে সম্ভবপর হইল। মায়ার এই সকল কার্য্যকে অদ্ভুত ইন্দ্রজাল ছাড়া আর কি বলা যায়। অতএব মায়া এক অপূর্ব্ব ঐন্দ্রজালিক শক্তি।

মায়া অঘটন-ঘটন-পটিয়সী—অসঙ্গ নিগুর্ণ ব্রহ্মকে বিকার না করিয়াই কিরূপে মায়া এই জগৎ রচনা করিল? মায়া অঘটন-ঘটন-পটিয়সী সুতরাং ব্রহ্মের বিকার না করিয়াই সে গিরি, নদী, বন কত কি সৃষ্টি করিয়া থাকে। মায়া চমৎকারা, তাহার পক্ষে সবই সম্ভবপর? যেমন জলের দ্রবত্ব, প্রস্তরের কঠিনত্ব, বায়ুর স্পন্দনত্ব, আকাশের শব্দত্ব ও অগ্নির দাহকত্ব শক্তি, সেইরূপ মায়ার অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তি।

মায়া ব্রহ্মের এক পাদে স্থিত—শ্রীরামকৃষ্ণদেব গাহিতেন "এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে"। মায়া চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে মায়া ব্রহ্মের সর্ব্বাংশে স্থিত। ব্রহ্মের শক্তি যদি মায়া হয় তাহা হইলে তাঁহার একাংশে ঐ শক্তি আছে ও অন্যাংশে নাই, এইরূপ সম্ভাবনা কি প্রকারে হইবে? উহা সম্ভবপর। যেমন মৃত্তিকাতে ঘটত্ব শক্তি আছে বটে কিন্তু উহা সকল রকম মৃত্তিকাতে নাই, কেবল মাত্র নরম মৃত্তিকাতেই আছে। ঐরূপ এই মায়া শক্তি কেবলমাত্র ব্রহ্মের এক পাদে আছে, আর অপর তিন পাদ মায়াতীত।

সমষ্টি ও ব্যষ্টি অজ্ঞান—বাস্তবিক পক্ষে মায়া এক হইলেও সমষ্টিভাবেই ইহাকে এক বলা হয় কিন্তু ব্যষ্টিভাবে ইহা অনেক

এইরূপ ব্যবহার হয়। যেমন "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" এস্থলে "মায়াভিঃ" এই বাক্যে বহুবচন ব্যবহার হইয়াছে। মায়া এক হইলেও এস্থলে ব্যষ্টি মায়াকে লক্ষ্য করা হইয়াছে তজ্জন্য বহুবচন হইয়াছে। যেমন 'বন' এই কথা বলিলে আমরা বহু বৃক্ষের সমষ্টি বুঝি, যেমন বহু নদী কূপ তড়াগাদির সমষ্টিকে এক জলাশয় বলি, সেইরূপ অন্তঃকরণ ও উপাধিভেদে নানারূপে প্রতীয়মান জীবগত অজ্ঞান সমুদয়ের সমষ্টিকে এক মায়া বলা হইয়াছে। যেমন বনের ব্যষ্টি এক একটি বৃক্ষ তেমনি সেই এক অজ্ঞানের ব্যষ্টি প্রত্যেক জীবগত অজ্ঞান।

সমষ্টি ও ব্যষ্টি অজ্ঞানে ভেদ—জীবগত নিকৃষ্ট অন্তঃকরণ উপাধি-যুক্ত বলিয়া ঐ অজ্ঞান ব্যষ্টি ও মলিন সত্ত্বপ্রধান, এবং রাগাদিদোষশূন্য সকল প্রপঞ্চের মূল সমষ্টিঅজ্ঞান উৎকৃষ্ট উপাধিযুক্ত বলিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান। মায়া ত্রিগুণাত্মিকা অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই ত্রিগুণ-ময়ী। তন্মধ্যে সমষ্টি মায়া বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান ও ব্যষ্টি মায়া মলিন সত্ত্ব-প্রধান। রজঃ ও তমোগুণ কর্ত্তৃক সত্ত্বগুণটি মলিনীকৃত বলিয়া এবং ব্যষ্টি অজ্ঞান তমঃপ্রধান বলিয়া উহাকে মলিন সত্ত্বপ্রধান বলে এবং সমষ্টি অজ্ঞান সত্ত্বগুণপ্রধান অর্থাৎ তাহাতে সত্ত্বগুণেরই প্রধান্য আছে সেই হেতু উহাকে বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান বলা হইল।

আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি—অজ্ঞানের দুইপ্রকার শক্তি আছে আবরণ শক্তি ও বিক্ষেপ শক্তি। আবরণের অর্থ অপ্রকাশ রাখা ও বিক্ষেপের অর্থ অন্য প্রকার দেখান। সূর্য্যমণ্ডল অতি সুবিস্তীর্ণ হইলেও যেমন এক খণ্ড ক্ষুদ্র মেঘ কেবল মাত্র চক্ষু আচ্ছাদন করিলে সাধারণ ব্যক্তি মনে করে যে সেই সুবিস্তীর্ণ সূর্য্যমণ্ডল আবৃত হইয়াছে, সেইরূপ অবিবেকী পুরুষের জ্ঞান মাত্রকে যাহা আচ্ছাদিত করিয়াছে তাহা অনাদি অনন্ত অসঙ্গ ব্রহ্মকেও অপ্রকাশ করিয়াছে এইরূপ মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক আচ্ছাদিত করে নাই। যে শক্তি এই ব্রহ্মের উপরোক্তভাবে আচ্ছাদকরূপে কার্য্য করে উহাই অজ্ঞানের আবরণ শক্তি। শক্তি এই অর্থে বলা হইতেছে যে নিত্যমুক্ত স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে অপ্রকাশ রাখিতে সমর্থ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মের এক পাদে

মাত্র মায়া অবস্থিত, সুতরাং অজ্ঞান তাঁহার একপাদে থাকিয়া অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করিতে পারে না কিন্তু সামান্য ব্যক্তির অল্প জ্ঞান মাত্রকে আচ্ছাদন করে এবং তজ্জন্যই সাধারণ ব্যক্তি স্বস্বরূপ অজ্ঞাত থাকে। ইহাই অজ্ঞানের আবরণ শক্তি। উহা যেমন রজ্জুর স্বরূপ অজ্ঞাত থাকায় তাহাকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, যেমন শুক্তিকে রজত বলিয়া ভ্রম হয়, তদ্রূপ অকর্ত্তা যে স্বস্বরূপ আত্মা তাহা অজ্ঞাত থাকায় সেই আত্মাকে কর্ত্তা, ভোক্তা, সুখী ও দুঃখী ইত্যাদি মনে করে। অজ্ঞান অবিবেকী পুরুষের জ্ঞানকে আচ্ছাদন করায় সে তাহার অকর্ত্তা, অভোক্তা স্বস্বরূপ জানিতে পারে না এবং সে ভ্রমবশতঃ আত্মাকে কর্ত্তা, ভোক্তা ইত্যাদি কল্পনা করে।

অজ্ঞানের যে শক্তি সেই নিত্য মুক্ত আত্মাকে অনিত্য বদ্ধ বলিয়া বোধ করায় অর্থাৎ যাহা যা নহে তাহাকে সেইরূপ দেখায়, যেমন রজ্জুকে সর্প দেখায়, তাহাকে উহার বিক্ষেপ শক্তি বলে। যুক্তির দ্বারা অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি দেখান হইল; এক্ষণে অনুভব প্রমাণ দ্বারা উহা স্থির করা যায় কিনা দেখা যাউক। যদ্যপি কোনও জ্ঞানী পুরুষ কোন অবিবেকী পুরুষকে কূটস্থচৈতন্যের কথা জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে সে অবশ্যই বলিয়া থাকে যে কূটস্থচৈতন্য কি তাহা আমি জানি না। নিজে নিত্যমুক্ত কূটস্থচৈতন্য হইলেও তাহার নিকট উহা প্রকাশ পায় না অর্থাৎ সে সেই কূটস্থচৈতন্যের অপ্রকাশ অনুভব করে সুতরাং উহার কারণ অজ্ঞানের ঐ আবরণ শক্তি। কাহারও কাহারও মনে এইরূপ তর্কও উপস্থিত হইতে পারে যে আলোক ও অন্ধকার যেরূপ একত্র সম্ভবপর নয় সেইরূপ নিত্য জ্ঞানস্বরূপ কূটস্থ-চৈতন্যের অজ্ঞানও অসম্ভব; সুতরাং অজ্ঞানের আবরণ শক্তিও সম্ভব-পর নহে কিন্তু ঐরূপ আবরণ শক্তির যখন অনুভব হইতেছে তখন আর তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না এবং নিজের অনুভবেও যদি বিশ্বাস না হয় তাহা হইলে তর্ক দ্বারা তত্ত্ব নিরূপণ অসম্ভব। কারণ তর্কের সমাপ্তি নাই অর্থাৎ একজন তর্ক দ্বারা এক প্রকার

সিদ্ধান্ত করিল, অপর একজন তদপেক্ষা বুদ্ধিমান তাহা খণ্ডন করিয়া অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারে। যদিও তর্কদ্বারা তত্ত্ব নিশ্চয় হয় না তথাপ নিজের অনুভবের অনুকূল তর্ক আলোচনা করা উচিত কিন্তু কুতর্ক করা উচিত নহে; কারণ তাহাতে তত্ত্ব নিশ্চয় হওয়া দূরে থাকুক বরং অনিষ্টই হয়। বিক্ষেপ শক্তির প্রমাণ অনুভব, কারণ প্রতি কার্য্যে প্রতিক্ষণে আমরা নিজেকে কর্ত্তা, সগুণ ও বদ্ধ এইরূপ অনুভব করিতেছি।

এই অনির্ব্বচনীয, চমৎকার, অঘটন-ঘটন-পটিয়সী, একটা কিছু, ঐন্দ্রজালিক শক্তি যে অজ্ঞান, উহাই সেই নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপক, আনন্দময চৈতন্যকে সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি দ্বয়ের দ্বারা নানাভাবে দেখাইতেছে। সুতরাং এই অজ্ঞানের নিবারণ করিতে পারিলেই সেই স্বয়ম্প্রকাশ স্বস্বরূপ আত্মা প্রকাশ হইযা পড়িবে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন -

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাসিতমাত্মনঃ।
তেষাং আদিত্যবজ্‌ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন "চিদানন্দ আছেই;—কেবল আবরণ ও বিক্ষেপ"। আত্মজ্ঞান লাভ হইলে আর কোনও দুঃখ থাকে না—"তরতি শোকমাত্মবিৎ"। তখন সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, সকল সংশয় বিদুরিত হয় এবং সকল কর্ম্মেব অবসান হয।

বাণী-আহ্বান।

(শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ।)

আসিছে সারদা আবার বঙ্গে,
তুষার ইন্দু-বরণী।
হিমের প্রতাপ নাহি এবে আর,
শোভা সম্পদে ভরা চারি ধার,
ফাল্গুনের নব কনক রৌদ্রে,
হাসিছে বিশ্ব ধরণী
বহিছে মন্দ মলয় সমীর,
আম্র-মুকুল-গন্ধ-অধীর
মাধবী-কুঞ্জে ধাইছে ভৃঙ্গ,
মুখরিত করি অরণী।

শ্বেতভুজে, তব বোধন মন্ত্রে,
ধ্বনিত আজ এ বঙ্গ।
বিহগ তুলিয়া সপ্তমে তান,
করিছে তোমার বন্দনা গান,
সেজেছে বনানী কুসুম ভূষণে,
পুলক শিথিল অঙ্গ।
গগনে নীলিমা আজি ঘনতর
নব তৃণদলে ঢাকা প্রান্তর,
যাচিছে বকুল-প্রসুন-পুঞ্জ
অলস সমীর সঙ্গ।

অলক্তক নব অরুণ রাগে
চরণ সরোজ রক্ত,

পঙ্কজে ঘিরি লুব্ধ ভ্রমর,
গুঞ্জরে যথা তৃষ্ণা-কাতর,
ওই দুটি তব চরণে, তন্বি,
গুঞ্জরে শত ভক্ত।
বীণা হতে উঠে ঝঙ্কার তান,
কতই মূর্চ্ছনা কতই গান
পূরিছে নিখিল ভকত প্রাণ
করিয়ে চরণাসক্ত।
শুভ্রকমলে সমাসীনা তুমি,
শুভ্র তোমার বর্ণ।
নীল মেঘ সম আঁখি পল্লবে,
কজ্জল লেখা অনুপম শোভে,
স্তনমূলে দোলে মুক্তার মালা,
কর্ণিকা শোভিতকর্ণ
হস্তেতে বীণা পুস্তক আর,
পৃষ্ঠেতে কৃষ্ণ কুন্তল ভার,
রাজে প্রকোষ্ঠে কঙ্কণ কিবা
জড়িত মুকুতা স্বর্ণ।
রুষ্টা কমলা—তোমার প্রসাদে
পুষ্ট যে জন মহীতে,
বিহীন বিত্ত অতি দীন হীন,
অনশনে তার কেটে যায় দিন,
সে যেন এসেছে জনসঙ্ঘের,
ধিক্কার-শত সহিতে।
ভ্রূক্ষেপ তবু নাহি তাহে তার,
নাহি লয় খোঁজ মণি মুক্তার,
সে চাহে কেবলি প্রসাদ তোমার,
শ্রদ্ধায় শিরে বহিতে।

জননি, তোমার বীণার তন্ত্রী,
আবার বাজাও হর্ষে,

সুপ্ত পরাণ-উঠুক শিহরি,
গভীর ছন্দে দাও দিক ভরি,
নাচিয়া উঠুক আবার বঙ্গ
তব পদরেণু স্পর্শে।

কাব্য গণিত দর্শন আর,
বিজ্ঞান গীত কলা সুকুমার,
সকল মানবের অন্তরে যেন,
অমৃতের ধারা বর্ষে।

কল্যাণি, তব চরণ কমলে,
শীর্ষ নোয়ায়ে বন্দি।

বর্ষে বর্ষে এমনি করিয়া,
শুষ্ক হৃদয় দাও মা ভরিয়া,
মুছাও অশ্রু কর-পল্লবে,
ভকত-হৃদয় নন্দি।

হাসুক বঙ্গ হাসিত যেমন,
জ্ঞানালোকে হোক পূর্ণিত মন,
ধা'ক তোমা পানে লক্ষ পরাণ,
অমৃতের অনুসন্ধি।

ভারতীয় শিক্ষা।

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

Did the Hindus do any injury to any nation? What little good they could do, they did for the world. They taught it science, philosophy, religion, and civilised the savage hordes of the earth

- Vivekananda.

ভারত জগতের আদি শিক্ষাগুরু ইহা প্রায় সকলেই বলিয়া থাকেন। পুরাবৃত্ত ও প্রত্নতত্ত্ব আলোচনার অভ্যুদয়ে এই সত্য দিন দিন দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে 'আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ এবং আমরা অপদার্থ' এ ঘুমের ঘোরও কাটিতেছে। কিন্তু ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া মনে হয় এ যেন ঠিক "ঠাকুরমার ঝুলির" রূপকথার আলোচনা করিতেছি। প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি সত্ত্বেও নিগমনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। মনে হয় যাহারা নিজের দেশবাসীকে ঘৃণা করে তাহারা অপরদেশে ভাষা, জ্ঞান ও ধর্ম্মের বিস্তার করিল কি করিয়া? যাহাদের গ্রামের বাহিরে গেলে জাতি-ভ্রষ্ট হইতে হয় তাহারা মেক্সিকো হইতে আলেকজান্দ্রিয়া (Alexendria) পর্য্যন্ত স্বদেশীয়-সভ্যতা প্রচার করিল কি করিয়া? যাহা হউক স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলেও যেমন বুক দুর্ দুর্ করে ইহাও অনেকটা সেই প্রকারের। যাহারা স্বজাতির ধর্ম্ম, বেশভূষা, ভাষা, আচার ব্যবহার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত—যদিও সে ত্যাগের মূল ব্যভিচার, সে অনুকরণের পরিণাম মৃত্যু—তাহারা হয়ত উক্ত সত্য মানিবে না—তাহারা হয়ত বলিয়া বসিবে, "যে সকল ভারতবাসী ইংরাজের ন্যায় শ্বেতচর্ম্ম ও ইংরাজদিগের আচার ব্যবহার, পরিচ্ছদ ও ভাষা প্রভৃতি অনুকরণ করেন, তাঁহারা স্বভাবতঃ অনেক স্থলেই জীবন-সংগ্রামের হাত এড়াইয়া জেতার প্রাপ্যের টুক্‌রোটাক্‌রা পাইয়া থাকেন। অনুকরণ যত সম্পূর্ণ হইবে, ভারতবাসী জেতা ও বিজিতের মধ্যে জীবন-

সংগ্রামের হাত ততই এড়াইতে সক্ষম হইবে। আচার ব্যবহার, পরিচ্ছদ ভাষা, নাম, ধর্ম্ম এবং সর্ব্বাগ্রে চর্ম্ম, এই সকলে যিনি ইংরাজের যত অনুকরণ করিতে পারিবেন, তিনি তত জীবন-সংগ্রামের অতীত হইয়া সংসারের সুখ সকল উপভোগ করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। * * * জীবন-সংগ্রামে যে কোন উপায়ে বাঁচা দরকার। বাঁচিতে গেলেই দুর্ব্বলের পক্ষে সবলের অনুকরণ আবশ্যক"। এ মীমাংসার মর্ম্ম অবধারণ করিতে আমরা একেবারেই অসমর্থ। আমরা বুঝি অনুকরণ মানে আত্মহত্যা। ইহাতে আত্মশক্তির মূলোচ্ছেদই হয় বিকাশ হয় না। কিন্তু ইহাও সত্য যে কোন একটী জাতির মধ্যে সমস্ত সত্য ও উচ্চাদর্শগুলি নিহিত নাই। সেইজন্য জাতীয় জীবনের পুষ্টিসাধন করিতে হইলে অপরাপর জাতিসকলের গুণগুলিও গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু অনুকরণ করিলে গুণ গ্রহণ করা হয় না। উহাদিগকে স্বায়ত্তীভূত করিয়া লইয়া একেবারে নিজেদের করিয়া লইয়া সমাজে এবং ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে। ঐরূপ করিতে পারিলে শুধু সমকক্ষত্ব কেন শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয়। টুক্‌রোটাকরা লোভী অনুকরণেচ্ছুগণ যদি ভারতের অতীত ইতিহাস আলোচনা করেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেরূপ মৌলিকতাপ্রিয় ছিলেন, তেমনি তাঁহাদের বিশাল হৃদয় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের রাজ্যে অপরের গুণ-গ্রহণেও সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। তাঁহাদের এই স্বায়ত্তীভূত করিবার গুণ ছিল বলিয়াই তাঁহারা এক-সময়ে সমগ্র জগতের সম্মুখে জ্ঞান-বর্ত্তিকা ধারণে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদান প্রদান যে শুধু উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতেই চলিতেছে তাহা নয়। যীশুখৃষ্ট জন্মাইবার বহুপূর্ব্ব এবং পরবর্ত্তী শতাব্দীতেও ভারতবাসীর সহিত তাৎকালীন সভ্যসমাজের যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল সে বিষয়ে বহুপ্রমাণ পাওয়া যায়। **এই আদান প্রদানের ধারা এবং ঐ ধারায় ভারতবর্ষের স্থান নির্দ্দেশ করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।**

গর্গ সংহিতায় গর্গঋষি যবনদের জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন,

ম্লেচ্ছাহি যবনাস্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রমিদং স্থিতম্।
ঋষিবত্তেঽপি পূজ্যন্তে কিং পুনর্দ্দৈববিদ্ দ্বিজঃ॥

এতদ্ব্যতীত গার্গ্যের সহিতও যে যবনদিগের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহাও বিষ্ণু পুরাণে বর্ণিত আছে। যবনদিগের সাহায্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা তিনি যথেষ্ট করিয়াছিলেন (বিষ্ণুপুরাণ, ৫ম অংশ, ২৩ অধ্যায়, ১—৫)। যাঁহারা প্রাচীন ইতিবৃত্ত আলোচনা করেন তাঁহারাই অবগত আছেন যে গ্রীকেরাই এই জ্যোতিষজ্ঞ যবন। অস্মদ্দেশীয় ও বিদেশীয় গ্রন্থে এতদ্ সম্বন্ধে বহু প্রমাণ আছে। বৃহৎ সংহিতা, পুলিশ সিদ্ধান্ত, রোমক সিদ্ধান্ত ও মণিথ নামে গ্রন্থ ও ঐ নামধেয় গ্রীক গ্রন্থকারের নাম; দিন গণনারম্ভ প্রসঙ্গে যবনপুর নামে একটী নগরের নাম; বরাহমিহিরকৃত বৃহৎ সংহিতায় ছত্রিশটি গ্রীক শব্দের সন্নিবেশ, যথা, ক্রিয়, তাম্বুরি, জিতুম, হেলি, হিম্ন, কোন, হোরা, কেন্দ্র, দ্রেক্কাণ, লিপ্তা, অনফা, সুনফা ইত্যাদি; বাদরায়ণ কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ একখানি জাতকে আপোক্লিম, পনফর প্রভৃতি কতকগুলি গ্রীক শব্দের বিদ্যমানতা; বহু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে রাশিচক্রের প্রসঙ্গ-হীনতা পরন্তু বরাহমিহির কৃত একখানি গ্রন্থের নামের অর্দ্ধাংশে গ্রীক ভাষা থাকায় এবং একখানি জ্যোতিষ শাস্ত্রের নামে গ্রীক হোরা শব্দের প্রয়োগ এবং উক্ত শাস্ত্রে গ্রহ ও রাশি সমুদয়ের গ্রীকনাম ব্যবহার; গ্রহগণের সংস্কৃত নামের সহিত গ্রীকনাম ব্যবহার এবং রাশিগণের গ্রীক নাম সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করা এই সকল কারণে গ্রীকেরা যে লিখিয়া গিয়াছেন হিন্দুরা তাহাদের শাস্ত্রে বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন ও উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তিরা উহা শিক্ষা করিয়া থাকেন তাহা সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হয়।*

* (Kern's Preface to Brihat Samhita of Varahamihir pp. 28, 29, 48, 51, 54 Webers History of Indian literature.)

পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া কেহ যেন মনে না করেন ভারতবর্ষে ইতিপূর্ব্বে জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা ছিল না। বহুপূর্ব্ব হইতেই এদেশে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা ছিল (বেদ প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থ সকল ইহার প্রমাণ)। পরে গ্রীক যবনদের সহিত আদানপ্রদানে ইহার সম্যক্ পুষ্টি সাধিত হয়; এবং তাহারই ফলে এদেশে আর্য্যভট্ট এবং শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় মনীষী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারাই জগতে সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন যে, পৃথিবী গোলাকার উহা মেরুদণ্ডের উপর আবর্ত্তন করায় দিবা রাত্র হয় এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে। এত সকল তত্ত্বের আজ কাল আরও উন্নতি করিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জগতের অশেষ কল্যাণ করিয়াছেন।

চতুর্থশতাব্দীর প্রারম্ভে ইউসিবিয়াস (Eusebius) তাঁহার গ্রন্থের একস্থলে লিখিয়াছেন "ভারতবাসী ও ব্যাকটি যাবাসিগণের মধ্যে বহু সহস্র ব্রাহ্মণ আছেন"।* ম্যাক্ষমূলার ইহার প্রতিবাদে লিখিতেছেন, "ব্যাকট্রিয়ায় যে ব্রাহ্মণদের কথা লিখিত হইয়াছে উহাতে বৌদ্ধগণকেই বুঝাইতেছে কারণ, গোঁড়া ব্রাহ্মণগণের নিজেদের দেশ ছাড়িয়া অপর দেশে যাওয়া স্বভাবই ছিল না এবং বৌদ্ধগণকেও ব্রাহ্মণের পদবীসমূহ সম্মানের চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করিতে দেখা যায়।" ধম্মপদ প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে প্রকৃত ব্রাহ্মণকে খুব উচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছে বটে। কিন্তু কোন বৌদ্ধ কি নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন কিন্তু রেভারেণ্ড জন মরেস (Mores) তাঁহার গ্রন্থে† ইউসিবিয়াসের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন প্লেটো ব্রাহ্মণদিগের শিষ্য ছিলেন এবং সক্রেটীস একজন ভারতবাসীর নিকট হইতে 'যদি আধ্যাত্মিক সত্য না জানা যায় তাহা হইলে জাগতিক সত্যের কিছুই জানা যায় না' এই

* Prep Ev, vii, 10

† Notes on the 1st dialogue on the "Conversion of learned and philosophic Hindus".

সত্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। উসিবিয়াসের এই উক্তির আলোচনা করিতে যাইয় ম্যাক্সমূলার নিজেই লিখিয়াছেন, 'উসিবিয়াস, এরিষ্টক্লিস লিখিত প্লেটো দর্শন হইতে দেখাইয়াছেন, এরিষ্টটল শিষ্য এরিষ্টোজেনিস বলিতেছেন, এক জন ভারতীয় দার্শনিক এথেন্সে আসেন এবং তাঁহার সহিত সক্রেটীসের কথাবার্তা হয়। উক্ত কথাবার্ত্তার সময় সক্রেটীস বলেন মানুষের জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাই তাঁহার দর্শন, তাহাতে ভারতীয় দার্শনিকটি হাসিয়া উত্তর দেন, আধ্যাত্মিক সত্য জানিতে না পারিলে আধিভৌতিক সত্য জানা যায় না। প্রত্যুত্তরটী এরূপ ভারতবর্ষীয় ভাবাপন্ন যে, উহাই ভারতবর্ষের দার্শনিকের এথেন্স-আগমন ব্যাপারটী সত্য বলিয়া প্রতীয়মান করাইয়া দেয়।*

ভৃগুকচ্ছ (Broach) নিবাসীর এথেন্সে অগ্নিপ্রবেশ প্রভৃতি উপাখ্যান হইতে এবং ম্যাক্সমূলারেরই স্বীয় মন্তব্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ দেশ ছাড়িয়া এমন কি সুদূর গ্রীসদেশে পর্য্যন্ত গমন করিতেন—এরূপ ক্ষেত্রে উসিবিয়াস কথিত ব্যাকট্রিয়াবাসী ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ ছিলেন কি ব্রাহ্মণ ছিলেন পাঠকেরা নিজেরাই বিচার করিবেন। তবে ব্রাহ্মণেরা যেমন এই সকল দেশে যাতায়াত করিতেন, বৌদ্ধেরাও পরবর্ত্তী সময়ে তাহাদের প্রতিপত্তি ঐ সকল দেশে

---

* "Eusebius (Prep. Ev., xi, 3) quotes a work on Platonic philosophy by Aristocles, who states there on the authority of Aristoxenes, a pupil of Aristotle, that an Indian philosopher came to Athens, and had a discussion with Socrates. There is nothing in this to excite our suspicion, and what makes the statement of Aristoxenes more plausible in the observation itself which this Indian philosopher is said to have made to Socrates. For when Socrates had told him that his philosophy consisted in inquiries about the life of man, the Indian philosopher is said to have smiled and to have replied that no one could understand things human who did not understand things divine. Now this is a remark so thoroughly Indian that it leaves on my mind the impression of being possibly genuine."—(Theosophy or Psychological Religious Lecture).

যথেষ্ট বিস্তার করেন। এ সকল বিষয় Essene এবং Theraputicদের প্রসঙ্গে লিখিত হইবে। ঊসিবিয়াস কথিত ভারতীয় দার্শনিকেরা যে বৌদ্ধ নয় তাহার প্রমাণ সক্রেটীস, প্লেটো, বুদ্ধ এবং অশোকের তারিখগুলি। সক্রেটীস খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৭০ ও প্লেটো ৪২৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন; আর শ্রীবুদ্ধ প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৭৮ খৃষ্টাব্দে দেহ ত্যাগ করেন।

অতএব এত অল্প সময়ের মধ্যে যে বৌদ্ধপ্রচারকেরা গ্রীস পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন তাহা সম্ভবপর নহে।

সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোকের পূর্ব্বে যে কোনও বৌদ্ধ গান্ধার কিম্বা বহ্লিক (Balkh) দেশ পার হইয়াছিলেন ইহা বোধ হয় না। অশোক ২৬০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে রাজা হন। অতএব বৌদ্ধগণ উহার পরে ঐ সকল দেশে অভিযান আরম্ভ করেন। তাঁহাদের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরাই শিক্ষা, প্রচার ও অন্যান্য কার্য্যব্যপদেশে ঐ সকল দেশে গমনাগমন করিতেন ইহাই প্রমাণিত হয়।

সক্রেটীস ও প্লেটোর পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিক পিথাগোরাস, তাঁহারা সমসাময়িক ডিমক্রিটাস এবং পরবর্ত্তী এারিষ্টটলও পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে হিন্দু দর্শনের সহিত পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন—তাহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। গ্রীকদর্শন পাঠের সময় মনে হয় যে ভারতীয় দর্শনই একটু অদল বদল করিয়া বিভিন্ন ভাষায় পড়িতেছি। প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যে বরাবর একটি প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছিল যে থেল্‌স্‌, এম্‌পিডোক্লিস্‌, এনেক্সেগোরাস ডিমোক্রিটাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পূর্ব্বদেশ হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছিলেন। এখন গ্রীকদর্শনের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু দর্শনের সহিত ঐ দর্শনের সাদৃশ্য স্থানগুলির উল্লেখ করা যাউক, তাহা হইলে বিষয়টি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে;—

ইলিয়েটিক্সদের মতে ঈশ্বর ও জগৎ এক, বহুত্বের সত্যতা নাই, সৎ এবং চিৎ একই—এই সকল মতবাদ উপনিষদেও আছে।

এম্পিডোক্লিসের মতে অসৎ হইতে সৎএর উৎপত্তি হইতে

পারে না এবং যাহা সৎ তাহা কখনও অসৎ হইতে পারে না—ইহা ভারতীয় সাংখ্য দর্শনের মূল।

ডিমোক্রিটাসের পরমাণুবাদ, তাঁহার পূর্ব্বদেশে যাওয়ার প্রবাদ অথবা চ্যালডিয়ান পণ্ডিতগণের নিকট তাঁহার বিদ্যা শিক্ষা প্রভৃতি হইতে অনুমিত হয় যে ইহা অস্মদ্দেশীয় কনাদদর্শনের (বৈশেষিক) প্রতিধ্বনি মাত্র।

পিথাগোরাসের পূর্ব্বদেশ ভ্রমণ (এপুলিয়াস বলেন যে তিনি ভারতে আসিয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকট শিক্ষা লাভ করেন) এবং তাঁহার মতবাদের অন্তর্গত জন্মান্তরবাদ, সাংখ্যদর্শন (Philosophy of Numbers), পঞ্চভূতবাদ, সুল্‌ভ সূত্র ও জ্যামিতির সূত্র, ভাব (Mistical Speculation), পরকায় প্রবেশ (Metempsychosis), সঙ্ঘের নিয়মাবলী ও হিন্দু আশ্রমের নিয়মাবলী, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার প্রভৃতি বিষয় তদ্দেশীয় লোকদের নিকট তিনিই প্রথমে প্রচার করায় মনে হয় অন্ততঃ তিনি ঐ সকল তত্ত্বের সহিত পরিচিত ভারতবর্ষ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া গিয়াছিলেন।

সক্রেটীস ও প্লেটোর prototype, architype, Ideal or Essence (শব্দ ব্রহ্ম), transcendentalism (পরোক্ষানুভূতি), Tansmigration of Soul (পুনর্জন্মবাদ), ব্রাহ্মণগণের নিকট শিক্ষা হইতে এবং পূর্ব্বদেশ-ভ্রমণ হইত পুষ্টি লাভ করে।

এরিষ্টটলের ভূততত্ত্ব, এবং তাঁহার ছাত্র আলেকজাণ্ডারকে নাগাসন্ন্যাসীদের (the Indian Gymnosophists) সহিত দেখা করিবার জন্য আদেশ এবং এসিয়ামাইনরে হারমিসের পালিত কন্যাকে বিবাহ করিয়া বহুকাল অবস্থান হইতেই বেশ বুঝা যায় যে তিনি ভারতীয় দর্শনের সহিত পরিচিত ছিলেন। হিন্দুদিগের (গৌতম ন্যায়ের) ত্র্যবয়বীবাক্য (Syllogism) পাঁচ ভাগে বিভক্ত যথা (১) প্রতিজ্ঞা (proposition), (২) হেতু কিম্বা অপদেশ (reason), উদাহরণ কিম্বা নিদর্শন (instance) (৪) উপনয়ন (application of the reason) (৫) নিগমন (conclusion)।

হিন্দুদিগের ত্র্যবয়বী বাক্যের প্রথম কিম্বা শেষ দুই অংশ যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে এরিষ্টটলের সম্পূর্ণ প্রমাণ প্রণালীতে পরিণত হয়। তারিখের তুলনা করিয়া বোধ হয় হিন্দুরা প্রথম ন্যায় শাস্ত্র আবিষ্কার করেন পরে গ্রীকেরা তাহাদিগের নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিয়া পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

মাঁয়ার্স সাহেব এক স্থানে বলিয়াছেন, এম্পিডোক্লিস ও এরিষ্টটল ভূততত্ত্ব নিজেরা স্বয়ং উপপাদন না করিয়া যে অপর কোন জাতির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন—তদ্ সম্বন্ধে অনেকটা নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ শিক্ষা দেয় যে জগত-সৃষ্টির মূলে চারিটী তত্ত্ব ব্যতীত ব্যোম নামক আর একটী তত্ত্ব আছে, উহার সহিত এরিষ্টটলের ওভপিয়ার (o'vpia) সহিত মিল আছে।*

পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি আলোচনা করিলে মনে হয় গ্রীসদেশীয় দার্শনিকেরা হয় ভারতবর্ষে আসিয়া নানা বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন, আর না হয় পারস্য, চ্যালডিয়া, এসিয়ামাইনর, মিসরে হিন্দু সভ্যতার প্রভাব যথেষ্ট ছিল সেখান হইতে গ্রীস দেশীয় দার্শনিকেরা শিক্ষা করিয়া যাইতেন। দ্বিতীয় মতটী সত্য হইতে পারে। ঐ সকল দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলেই স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে ইহাদের সকলেরই সভ্যতার মূলে ভারতবর্ষ। যেমন ভূগর্ভে স্তর আছে জগতের ইতিহাসেরও তেমনি স্তর আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা একটির পর একটি করিয়া উহা প্রকাশ করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের গৌরব মুকুট উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর কান্তি ধারণ করিতেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্য ওপাশ্চাত্যের মিলনে শুভ মুহূর্ত্তের উদয় হইয়াছে। এই মিলন জগতের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের অশেষ কল্যাণ-কর। কোনও ইংরাজ রাজনৈতিক কখনও কল্পনা করেন নাই যে তাঁহারা ভারতবর্ষ জয় করিবেন। কোন ভারতবাসীও কখন

* Myer's History of Chemistry.

কল্পনা করেন নাই যে ইংরাজ বণিকেরাই তাঁহাদের ভাগ্যলিপির লেখক হইবেন। ট্রোজেন যুদ্ধে অলক্ষিতে যেমন দেবতারা যুদ্ধ করিতেন এবং তাঁহাদেরই জয় পরাজয়ে গ্রীক ও ট্রোজেনদের ভাগ্য-চক্রের পরিবর্ত্তন হইত তেমনি এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মহা-সম্মিলনেও কোন্ অলক্ষিত মহাশক্তি ক্রীড়া করিতেছেন যাঁহার ভ্রূভঙ্গে আজ ইংরাজ ভারতের রাজা? এই মহাসম্মিলনে আমাদের জড়তা এবং কুসংস্কার যেমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে আবার এ দেশের বেদান্ত, এদেশের উচ্চ চিন্তা সকল ইউরোপের মনীষী ও দার্শনিকের মন অধিকার করিয়া বসিতেছে। গ্রীস ও ভারতীয় সভ্যতার আলোকে একবার যেমন সমগ্র জগৎ হাসিয়া উঠিয়াছিল এবারও তেমনি ভারত ও ইউরোপীয় সভ্যতায় জগৎ পুনরায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

(ক্রমশঃ)

সৎকথা।

ধর্ম্ম সকলের হয় না, কেন না কেউ গুরুর আজ্ঞাধীন থেকে তাঁর উপদেশ পালন করে জীবন যাপন করতে চায়না। সকলেই স্বাধীন হতে চায়, অধীন হতে চায় না।

* * * *

আপন খেয়ালে চল্‌লে মানুষ বিগড়ে যায়; ভগবানের বা সাধু সজ্জনের নিদেশ মত চল্‌লে মানুষ বেঁচে যায়।

* * * *

ভগবান্ বল্‌ছেন বিষয় বাসনা ছাড়্‌লে আমাকে পাবে—বিষয় পেতে হলে আমাকে পাবে না, দুইই এক সঙ্গে পাবে না।

এজগতে সুখ নাই, সব মিথ্যা; একমাত্র ভগবানই সার, এ সব কথা কি সকলে বুঝ্তে পারে; ভগবানের বিশেষ দয়া না হলে এ সকল কথা ধরা যায় না।

*　　　*　　　*　　　*

জীব কর্ম্ম কর্‌তে বাধ্য। সৎকাজ কর্‌লে নিজেরও কল্যাণ পরেরও কল্যাণ। আর অসৎ কাজ কর্‌লে নিজের এবং অপরের সকলের অকল্যাণ।

*　　　*　　　*　　　*

ভগবান্ লাভ করবার জন্য কজন লেখাপড়া শেখে! যে শেখে সেই ভাগ্যবান্। লেখাপড়া শিখে ধন মান হবে এই জন্যই চেষ্টা—একেই বলে অর্থকারী বিদ্যা; তাতে উন্নতি হয় না।

*　　　*　　　*　　　*

আমি অমুক, আমি খুব বড়লোক এই ভাব থেকেই মনে হিংসা জেগে উঠে। কিন্তু আমার অপেক্ষা অনেক বড়লোক আছেন, আমি অতি সামান্য আমি যা কর্‌ছি সে সমস্তই ভগবানের কৃপায়, এইরূপ বিচার কর্‌লে হিংসা দ্বেষ ক্রমে ক্রমে চলে যায়।

*　　　*　　　*　　　*

"গুরু এবং ইষ্ট এক"। এই একই আবার লীলাতে বহু—ইনিই ব্রহ্ম, আদ্যাশক্তি জীব ও জগৎ, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, সব রূপই ইষ্টের। অজ্ঞানবশতঃ ভেদবুদ্ধি আসে বটে তজ্জন্য গুরু এবং বেদান্তবাক্যে খুব বিশ্বাস রেখে সাধন ভজন ও বিচার কর্‌তে হয়। গুরু এবং ইষ্টে খুব নিষ্ঠা চাই। ক্রমে ক্রমে সব অভেদ উপলব্ধি হবে। তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বঘটে আছেন।

*　　　*　　　*　　　*

ভগবান্ জীবকে শক্তি দিয়াছেন। যে ঐ শক্তি সৎদিকে নিয়ে যায় সে সৎ হয়, আর যে ঐ শক্তিকে অসৎদিকে নিয়ে যায় সে অসৎ হয়।

বুড়ো মনে করে যে চিরকালই আমি ঐরূপ থাক্‌ব, যুবক মনে করে

যে সেও চিরকাল ঐরূপই থাক্‌বে কখনও বুড়ো হবে না। কিন্তু মৃত্যু যে ঘাড়ে চেপে আছে, কাল হাঁ করে আছে, বুঝ্‌তে পারে না। এরই নাম মায়া।

* * * *

হে জীব সত্যকে ভালবাসবার চেষ্টা কর, সত্য উপলব্ধি কর্‌বার চেষ্টা কর। ভগবান্ সত্যস্বরূপ—সেখানে মিথ্যা হিংসা যেতে পারে না—সেখানে কোন ভেল নাই।

* * * *

বুদ্ধদেব ইচ্ছা কর্‌লে মরাছেলে বাঁচাতে পারেন, এই বিশ্বাস করে একজন স্ত্রীলোক তাঁর মরা ছেলে নিয়ে এসে বুদ্ধদেবকে বাঁচিয়ে দিতে বল্‌লেন। বুদ্ধদেব ঐ কথা শুনে বল্‌লেন—তোমাকে এক কাজ কর্‌তে হবে। যার বাড়ীতে কেউ মরে নি তার বাড়ী থেকে একমুটো চাল নিয়ে এসো। সেই চাল আন্‌লে তোমার ছেলেকে বাঁচাব। স্ত্রীলোকটী ঐস্থলে অনেকের বাড়ীতে গেল এবং সকলেই বল্‌লে আমার অমুক মরেছে। এইরূপে অনেক বাড়ী ঘুরে এসে বুদ্ধদেবকে বল্‌লে, এইরূপ বাড়ীর চাল পেলাম না। তখন বুদ্ধদেব তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন, তোমার ছেলেই শুধু মারা যায় নি, সকলের ঘরেই এইরূপ। তখন ঐ স্ত্রীলোকটী বুঝ্‌তে পার্‌লে এবং বুদ্ধদেবের শিষ্যা হয়ে গেল।

* * * *

নিজের দুঃখ যেমন বোঝ, অপরের দুঃখও তেমনি বোঝ। মানুষ অপরের দুঃখ বোঝে না বলেই কষ্ট পায়। আর অপরের দুঃখ বুঝে সেটা দূর কর্‌বার চেষ্টা কর; ভগবান্ তোমাকে যতটুকু শক্তি দিয়েছেন, সেই অনুপাতেই চেষ্টা কর। বুদ্ধদেবের জীবের জন্য প্রাণ কেঁদেছিল,! সেইজন্য তিনি সমস্ত ত্যাগ করেছিলেন। তুমি কি তা পার্‌বে? তবে যতটা পার, তার মধ্যে যেন জুয়াচুরি না থাকে। এইরূপে জীবসেবা কর্‌তে কর্‌তে বুঝ্‌তে পার্‌বে, ভগবান্‌কে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ত্র্যশীতীতম জন্মোৎসব।

বিগত ৩০শে ফাল্গুন, ১৩২৪ সাল, ইং ১৪ই মার্চ্চ, ১৯১৮ খৃঃ বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিপূজা ও ৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ তদুপলক্ষে মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

তিথিপূজার দিন অহর্নিশ শ্রীশ্রীঠাকুরের, অন্যান্য অবতারগণের ও শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় ও ভক্তগণের ভজনে উক্ত দিবস মঠবাটী একটী অধ্যাত্মভাবে ভরপুর হইয়াছিল। ঐ দিন প্রায় ৪।৫ শত ভক্ত তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মদিনে তাঁহারা যে আনন্দ ও শান্তির আস্বাদ করিতেছেন ঐ আনন্দ ও শান্তির ধারা সমগ্র জগৎ প্লাবিত করুক, ইহাই তাঁহাদের সকলের আন্তরিক কামনা। ভক্তহৃদয়ের এ ব্যাকুল প্রার্থনা কখনই বিফল হইবার নহে।

পরবর্ত্তী রবিবার বিরাট উৎসবের দিন। সে দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির, স্বামিজীর সমাধিমন্দির নানাবিধ পুষ্প ও লতা পাতা দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। মঠবাড়ী নানারূপ পতাকা দ্বারা শোভিত হইয়াছিল। মনে হইতেছিল, উহারা যেন যে বিরাট আনন্দোৎসব হইবে তাহারাই সূচনা করিয়া দিতেছে। মঠপ্রাঙ্গণে ও দক্ষিণের বিস্তৃত প্রান্তরের উপর ছোট বড় নানাপ্রকারের চন্দ্রাতপ স্থাপিত হওয়ায় মঠের শোভা দ্বিগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল। প্রান্তরের উত্তরদিকে একটী মণ্ডপমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি বৃহৎ আলেখ্য বিচিত্র ভাবে সজ্জিত করিয়া রাখায় সকলের চিত্তাকর্ষণ করিতেছিল।

পূর্ব্ব পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারও মেসার্স হোরমিলার কোম্পানী ষ্টীমারের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সকাল ৭।০ টা হইতে রাত্রি ৮।০ পর্য্যন্ত উক্ত কোম্পানীর ষ্টীমার কলিকাতা ও মঠের মধ্যে

যাতায়াত করায় গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। প্রাতঃকাল হইতেই জনসঙ্ঘের সমাগম হইতে আরম্ভ হয়। ষ্টীমারে, নৌকায়, গাড়ীতে, হাঁটা পথে ও রেলে প্রায় ৩০।৩৫ হাজার লোক উপস্থিত হইয়াছিল।

অন্যূন ৮।১০ হাজার ভক্ত জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে এক পংক্তিতে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। বাস্তবিকই সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! বেলুড় মঠ যেন জগন্নাথক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। মানাপমান জ্ঞান নাই, জাতিত্বের গৌরব নাই, পদমর্য্যাদার অভিমান আক্রোষ অথবা অর্থের গর্ব্বিত বক্রদৃষ্টি নাই—আছে উদারতা, মৈত্রী, সমদর্শন—আছে আচণ্ডালে শিবজ্ঞান, অন্ন ব্যঞ্জনাদিতে প্রসাদ জ্ঞান। সম্মুখে স্তূপীকৃত অন্ন ব্যঞ্জন,—পার্শ্বে সহস্র সহস্র নারায়ণ সেবা, আর মধ্যে মধ্যে ভক্তহৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাসজ্ঞাপক ভগবানের নামে জয়ধ্বনি—সে দৃশ্য যে দেখিয়াছে সেই ভুলিয়াছে। আর এই বিরাট দৃশ্য, যে মহাপুরুষের আচণ্ডালপ্রবাহিত গভীর প্রেম, অনন্ত সহানুভূতি, অসীম উদারতা, এবং বালসুলভ সরলতা ও নিরভিমানিতার কণামাত্র বিকাশ, তাঁহার উদ্দেশে হৃদয়ের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছে।

ঐ প্রসাদবিতরণ কার্য্যে স্বেচ্ছাসেবকগণের নম্রতা, পরিশ্রম ও কার্য্যপটুতা দর্শন করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। যাঁহারা প্রসাদ গ্রহণ স্থলে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের জন্যও তাঁহারা একটী স্বতন্ত্র তাঁবু হইতে প্রসাদ বিতরণের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই সুব্যবস্থার জন্য সকলেই উক্ত দিবসের বিরাট ভোগের কিছু না কিছু অংশ গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিল।

উৎসবের আর একটা প্রধান অনুষ্ঠান শ্রীভগবানের নাম গান। তাহাও শ্রীশ্রীঠাকুরের বিভিন্ন ভক্তসম্প্রদায়সমূহের সহযোগীতায় সাফল্য লাভ করিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের আলেখ্য সম্মুখে সুগায়ক বৈষ্ণব চরণ কর্ত্তৃক পদাবলী গীত হওয়ায় স্থানটীকে আনন্দময় করিয়া ভক্তগণের প্রাণ দ্রবীভূত করিয়া দিতেছিল। আবার মঠপ্রাঙ্গণে

আন্দুল ও ব্যাঁটরা কালীকীর্ত্তন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক মধুর কণ্ঠে মাতৃনাম গীত হওয়ায় সে স্থানে যে অপূর্ব্ব ভাবোৎস প্রবাহিত হইতেছিল তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বাউল ও তরজা গান, মান্দ্রাজী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ভজন গান, দক্ষিণারঞ্জন বাবুব কনসার্ট প্রভৃতিও উৎসবের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল।

জনসঙ্ঘের সেবার জন্য আহিরীটোলা নিবাসী সতীশ বাবুর উদ্যোগে তৃষ্ণাতুরকে সরবৎ দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং "বসুমতীর" স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তামাক সেবনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই সেবা সার্থক হইয়াছে। তাঁহারা যে কত লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন তাহা বলা যায় না। তাঁহাদের এই সেবাভাব সকলের প্রাণে ঐভাব জাগরিত করুক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সামান্য বৃষ্টি হওয়ায় একটু অসুবিধা হইলেও বাজী পোড়ানর পর উৎসব সমাপ্ত হয়।

প্রতি বৎসর নূতন নূতন শতশত ব্যক্তির আগমন এবং ক্রম বর্দ্ধমান জনসঙ্ঘের সমাগম দেখিলে মনে হয় শ্রীশ্রীঠাকুর নিজ ভাব নিজেই প্রচার করিতেছেন তাহা না হইলে এরূপ অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটন করা মানবের সাধ্যাতীত।

কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে ১৭ই মার্চ্চ, রবিবার, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। সাধু ভোজন, সংকীর্ত্তন, শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক হিন্দীভাষায় শ্রীশ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধীয় বক্তৃতা, ভজন ও প্রসাদ বিতরণ উক্ত উৎসবের অঙ্গস্বরূপ হইয়াছিল।

কনখল, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ১৭ই মার্চ্চ, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত দিবস পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র শর্ম্মণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ মহাশয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

দেব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এতদ্ব্যতীত গান, ভজন ও সাধু ভক্তেরও সেবা করা হইয়াছিল।

মান্দ্রাজ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে ১৭ই মার্চ্চ, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম-মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভজন, দরিদ্র নারায়ণ গণকে প্রসাদ দান, হরিকথা—নৌকা চরিত এবং পুদুকোটের দেওয়ান পেসকার শ্রীযুক্ত বি, ডি কামেশ্বর আয়ার এম, এ মহাশয় কর্ত্তৃক 'শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার জীবনী ও শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা উক্ত উৎসবের প্রধান অঙ্গস্বরূপ হইয়াছিল।

কিষণপুর (দেরাদুন), শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, ভজন গান, প্রসাদ বিতরণ ব্যতীত তথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয় আলোচনা করিবার জন্য একটী সভা আহূত হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত এলাহাবাদ, বৃন্দাবন, ঢাকা, বরিশাল, মেদিনীপুর প্রভৃতি মিশন ও মঠের কেন্দ্রসমূহে ও সলপ প্রভৃতি অন্যান্য স্থানে উক্ত দিবস শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আমরা বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের দাতব্য ঔষধালয়ের ইং ১৯১৭ সালের সাম্বাৎসরিক কার্য্য বিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি।

ইং ১৯১৬ সাল অপেক্ষা ১৯১৭ সালে রোগীর সংখ্যা প্রায় শত করা ৫০ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯১৬ সালের ১০,৪৭০ খানির স্থলে আলোচ্যবর্ষে ১৫,১৬১ খানি ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র দান

করা হইয়াছিল। রোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবৎসর রোগীর সংখ্যা ৪,৩৭২ জন হইয়াছিল তন্মধ্যে হিন্দু ৩১৩২ এবং মুসলমান ১২৪০।

ঔষধ দান ব্যতীত কয়েকজনকে পথ্য দিতে হইয়াছিল এবং যাহারা মঠে আসিতে অক্ষম তাহাদের বাড়ীতে যাইয়াও চিকিৎসা করা হইয়াছে।

উক্ত ঔষধালয় হইতে শুধু যে বেলুড় গ্রামেরই জনসাধারণ ঔষধ গ্রহণ করেন তাহা নহে চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহ হইতেও এমন কি গঙ্গার অপর তীরস্থ গ্রাম সকল হইতে ঔষধ লইতে আসেন।

মেসার্স বি, কে, পাল এণ্ড কোং সম্বৎসর বিনামূল্যে ঔষধ দান করায় রোগিগণকে সেবা করা সম্ভব হইযাছিল। এতদ্ব্যতীত মেসার্স বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, মেসার্স ডি গুপ্ত এণ্ড কোং, ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ, বাবু হরিদাস মল্লিক, ডাক্তার কে, সি বসু, বাবু সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, বাবু শশীভূষণ ঘোষ, বাবু সুরেন্দ্রনাথ সেন, বাবু পঞ্চানন ঘোষ এবং সতীশ চন্দ্র চন্দ্র মহাশয়গণ মাঝে মাঝে সাহায্য করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

নিম্নলিখিত সহৃদয় ব্যক্তিগণও অর্থ সাহায্য করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন,—শ্রী এ, আর কুমারগুরু, বাঙ্গালোর ৩৲; শ্রীচারুচন্দ্র দাস, কলিকাতা ১৲; শ্রীরাজেন্দ্র কুমার দত্ত, চিত্রকোট ১৲; শ্রীগিরীন্দ্রনাথ রায় কাশীপুর ২০৲; শ্রীগৌরীকান্ত বিশ্বাস, পুনা ২০৲; কাপ্তেন এস, ডি, আয়ার, আই এম এস, বম্বে ১০০৲; ডাঃ শ্রী বি, এম, বসু, ইনানঘাট, ৫৲; শ্রীশশীভূষণ বসাক, কলিকাতা ২০৲; শ্রী এম, এস দোড়াপাসাপ্পা, সিমোগা, ৫৲; শ্রী বি, কে, দত্ত, ২৲। বালি মিউনিসিপালিটিও মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিতেছেন।

যাঁহারা এ পর্য্যন্ত ঔষধলয়টীকে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদিগের নিকট এবং সহৃদয় জনসাধারণের নিকট আমাদিগের বিনীত নিবেদন তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত উক্ত সেবা কার্য্য চালান অসম্ভব। অতএব যাঁহার যাহা ক্ষমতা তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে। (১) সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ

মিশন, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা, (২) প্রেসিডেন্ট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ, পোঃ বেলুড়, হাওড়া।

———

বিগত ১৯শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটীর তত্ত্বাবধানে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনিষ্টিটিউট হলে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সভা অহূত হয়। মান্যবর বর্দ্ধমানাধিপতি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মঙ্গলাচরণ করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমে সোসইটীর সম্পাদক, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, সোসাইটীর বাৎসরিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন। সাধারণ-সভা আহূত করিয়া বেদান্তাদি আলোচনা, দরিদ্র ছাত্রগণকে সাহায্য দান, ঔষধ বিতরণ প্রভৃতি কার্য্যের প্রসারতার সহিত সোসাইটীর সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখা যায়। সভাপতি মহাশয় তৎপরে তাঁহার অভিভাষণে বাঙ্গলাভাষায় স্বামীজির গুণানুকীর্ত্তনের পর বলেন, এই সোসাইটী স্বামীজির স্মৃতিরক্ষার্থ স্থাপিত হইয়াছে। স্বামীজি তাঁহার গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী জগতে প্রচার করেন অতএব সোসাইটীও যদি প্রচারক পাঠাইয়া ঐ প্রচার কার্য্য করিতে পারেন তাহা হইলেই ঠিক ঠিক স্বামীজির স্মৃতিরক্ষা করা হইবে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় স্বামীজির উক্তি সকলের উল্লেখ করিয়া স্বামীজির শ্রেষ্ঠত্ব ও মহাপ্রাণতার নির্দ্দেশ করেন এবং ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক শক্তিদ্বারা জগত বিজয় করিবে স্বামীজির এই বাণীর উল্লেখ করিয়া উপস্থিত জন সাধারণকে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভে যত্নবান হইতে বলেন। ডাঃ প্রভুদয়াল শাস্ত্রী মহাশয় স্বামীজি যুক্তি ও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অনুভূতির মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে তাহা নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন, ইহার উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। অবশেষে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় মহাশয় স্বামীজির সম্বন্ধে দুই চার কথা বলিবার পর মহামহোপাধ্যায়

পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেই সভা ভঙ্গ হয়।

সভায় প্রায় ৩।৪ হাজার জন সমাগম হইয়াছিল, ইনিষ্টিটিউটের প্রশস্ত হলটীতে আর একজনেরও দাঁড়াইবার স্থান ছিল না।

এ বৎসরের সভায় সকলেই আমাদের স্বদেশীয় ভাষায় বক্তৃতা করেন।

বৃন্দাবনস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ফেব্রুয়ারী মাসের যে সংক্ষিপ্তবিবরণী আমরা পাইয়াছি তাহা হইতে জানা যায় যে গত জানুয়ারী মাসের ৮জন ব্যতীত, আলোচ্যমাসে আরও ১৬জনকে আশ্রমে রাখিয়া সেবা করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১২ জন আরোগ্যলাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছে ১ জন দেহত্যাগ করিয়াছেন ১ জন চিকিৎসা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এবং ১০ জন এখনও চিকিৎসাধীন আছে।

১৮৫৪ জনকে দাতব্য ঔষধালয় হইতে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল তন্মধ্যে ৩৫৭ জন নূতন এবং ১৪৯৭ জন উহাদেরই পুনরাবর্ত্তক।

ঐ মাসে ২ জন রোগীকে তাহাদের নিজ বাটীতে যাইয়া ঔষধ এবং ডাক্তার দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছিল।

উক্ত মাসে আশ্রমের আয় চাঁদা হিসাবে ৪৮৷৷০ ; এক কালীন দান ৫৩ মোট ১০১৷৷০। ব্যয় হিসাবে সেবাশ্রমের ব্যয় ২০৬।৫ এবং বিল্ডিং ফণ্ড এর ব্যয় ২২।১০।

বিগত ১৭ই মার্চ্চ, ৩রা চৈত্র, ১৩২২, ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সাম্বাৎসরিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঢাকার এডিসানাল মেজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত জি, ই, লেম্বোরণ উক্ত সভার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন।

আরামবাগে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব কল্পে একটী সভা আহূত হয়। স্থানীয় বহুলোক উক্ত সভায় যোগদান করেন। উপস্থিত অনেকে

শ্রীশ্রীঠাকুরের ও তৎপ্রচারিত আদর্শসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। উক্ত দিবস নগরসংকীর্ত্তনাদিও হইয়াছিল।

লাবান (শিলং) সনাতন ধর্ম্মসভার উদ্যোগে তথায় ৩রা চৈত্র, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সম্পাদিত হয়। কীর্ত্তন, পূজা, প্রসাদ বিতরণ পাঠ ভজনাদি উক্ত উৎসবের অঙ্গস্বরূপ হইয়াছিল।

মথুরাজেলার সাহায্য-কেন্দ্র দুইটী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জল শুকাইয়া যাওয়ায় ব্যাধির প্রকোপও কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু কেন্দ্র দুইটী বন্ধ করিয়া দেওয়ার পর বম্বের দানশীল টায়েরজী এণ্ড সন্স ৭৫০ খানি কম্বল বান্যাক্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে বিতরণ করিবার জন্য দেওয়ায় উক্ত কেন্দ্র দুইটী পুনরায় অস্থায়ীভাবে খুলিতে হইয়াছে।

সুখের বিষয় জলপ্লাবিত এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে এ বৎসর প্রচুর গম জন্মিয়াছে।

শ্রীহট্ট রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির উদ্যোগে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব কল্পে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানত্রয় মহাসমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। ১১ই মার্চ্চ সেবাসমিতির সাম্বৎসরক অধিবেশন হয় উক্ত অধিবেশনের সভাপতিত্ব জেলা জজ্ মিঃ এইচ, সি, লিডেল মহোদয় গ্রহণ করেন। ১৪ই মার্চ্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথি পূজা ও ১৭ই সাধারণ উৎসব সম্পাদিত হয়। উৎসব দিবসে কুষ্ঠাশ্রমবাসি-গণকে ও দরিদ্র নারায়ণ গণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান।

(স্বামী সারদানন্দ)

(৪)

শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের ভিতরে দিব্যশক্তি ও দেব-ভাবের পরিচয় ভক্তগণ পূর্ব্বোক্তরূপে কেবল মাত্র বিশেষ বিশেষ পর্ব্বকালেই যে পাইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু সহসা যখন তখন তাঁহাতে ঐরূপ ভাবের বিকাশ দেখিবার অবসর লাভ করিয়া তাঁহার প্রতি তাহাদিগের দেব-মানব বলিয়া বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। ঐ ভাবের ঘটনাসকল ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত ঘটনাগুলির ন্যায় অনেক সময়ে সকলের সমক্ষে উপস্থিত না হইলেও ভক্তগণের মধ্যে যাহারা উহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল অগ্রে তাহাদিগের প্রাণে, এবং পরে, তাহাদিগের নিকটে শুনিয়া অপর সকলের প্রাণে পূর্ব্বোক্ত ফলের উদয় করিয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপে কয়েকটির এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠকের ঐ বিষয় বোধগম্য হইবে—

বলরামের সম্বন্ধে কোন কোন কথা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। তিনি এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন বলিয়া তাঁহার আত্মীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিলেন। ঐরূপ হইবার তাঁহাদিগের কারণও যথেষ্ট ছিল।

প্রথম তাঁহারা বৈষ্ণব বংশে জন্মগ্রহণ করায় প্র[illegible]নু- সারে তাঁহাদিগের ধর্ম্মমত যে কতকটা একদেশী এবং [illegible]মাত্রায় বাহ্যাচারনিষ্ঠ হইবে ইহা বিচিত্র নহে। সুতরাং সকল প্রকার ধর্ম্ম-মতের সত্যতায় স্থিরবিশ্বাসসম্পন্ন, বাহ্যচিহ্নমাত্র ধারণে পরাঙ্মুখ ঠাকুরের ভাব তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না—ঐরূপ করিবার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করিতেন না। অতএব ঠাকুরের সঙ্গগুণে এবং কৃপালাভে বলরামের দিন দিন উদারভাব-সম্পন্ন হওয়াটা তাঁহারা ধর্ম্মহীনতার পরিচায়ক বলিয়া ধারণা করিয়া-ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ—ধন, মান, আভিজাত্যাদি পার্থিব প্রাপ্তি মানবের অন্তরে প্রায় অভিমান অহঙ্কারই পরিপুষ্ট করে। পুণ্যকীর্ত্তি ৺কৃষ্ণরাম বসু যে কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন সেই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারাও আপনাদিগকে সমধিক মহিমান্বিত জ্ঞান করিতেন। ঐ বংশমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া বলরাম ইতরসাধারণের ন্যায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে ধর্ম্মলাভের জন্য যখন তখন উপস্থিত হইতেছেন এবং আপন স্ত্রী কন্যা প্রভৃতি পুরস্ত্রীগণকেও তথায় লইয়া যাইতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না জানিতে পারিয়া তাহাদিগের অভিমান যে সুতরাং বিষম প্রতিহত হইবে, একথা বলা বাহুল্য। অতএব ঐ কার্য্য হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে তাঁহাদিগের বিষম আগ্রহ এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছিল।

সৎ উপায় অবলম্বনে কার্য্যসিদ্ধি না হইলে অহঙ্কৃত মানবকে অসদুপায় গ্রহণ করিতে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। বল-রামের আত্মীয়বর্গের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির প্রায় ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল। কালনার ভগবানদাস প্রমুখ বৈষ্ণব বাবাজীদিগের নিষ্ঠা ও ভক্তি-প্রেমের আতিশয্য কীর্ত্তন করিয়া এবং আপনাদিগের বংশ-গৌরবের কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিয়াও যখন তাঁহারা বল-রামের ঠাকুরের নিকটে গমন নিবারণ করিতে পারিলেন না, তখন ঠাকুরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া তাঁহারা কখন কখন তাঁহার অযথা নিন্দাবাদ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিলেন না। অবশ্য অপরের

নিক[illegible] হইতে শ্রবণ করিয়াই যে তাঁহারা ঠাকুরকে নিষ্ঠাপরিশূন্য, সদাচারবিরহিত, খাদ্যাখাদ্যবিচারবিহীন, কণ্ঠী তিলকাদি বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণের বিরোধী ইত্যাদি বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, একথা বলিতে হইবে। যাহা হউক, উহাতেও কোন ফলোদয় হইল না দেখিয়া তাঁহারা অবশেষে ঠাকুরের ও বলরামের সম্বন্ধে নানা কথার বিকৃত আলোচনা তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতৃদ্বয় ৺নিমাইচরণ ও ৺হরিবল্লভ বসুর কর্ণে উত্থাপিত করিতে লাগিলেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে একস্থলে বলিয়াছি, বলরামের ভিতরে দয়া ও ত্যাগবৈরাগ্যের ভাব বিশেষ প্রবল ছিল। জমিদারী প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে অনেক সময় নির্ম্মম হইয়া নানা হাঙ্গামা না করিলে চলে না দেখিয়া তিনি নিজ বিষয় সম্পত্তির ভার নিমাই বাবুর উপরে সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে প্রতি মাসে আয়স্বরূপে যাহা পাইতেন অনেক সময়ে উহা পর্য্যাপ্ত না হইলেও তাহাতেই কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার শরীরও ঐ সকল কর্ম্ম করিবার উপযোগী ছিল না। যৌবনে অজীর্ণ রোগে উহা এক সময়ে এতদূর স্বাস্থ্যহীন হইয়াছিল যে একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর অন্ন ত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে যবের মণ্ড ও দুগ্ধ পান করিয়া কাটাইতে হইয়াছিল। ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তিনি ঐ সময়ের অনেক কাল পুরীধামে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের নিত্য দর্শন ও পূজা, জপ, ভাগবতাদি শাস্ত্র শ্রবণ এবং সাধুসঙ্গাদি কার্য্যেই তাঁহার তখন দিন কাটিত, এবং ঐরূপে তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিতরে ভাল ও মন্দ যাহা কিছু ছিল সেই সকলের সহিত সুপরিচিত হইবার বিশেষ অবসর ঐকালে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে কার্য্যানুরোধে কলিকাতায় আসিবার কিছুকাল পরেই ঠাকুরের দর্শন ও পূতসঙ্গে তাঁহার জীবন কিরূপে দিন দিন পরিবর্ত্তিত হয় তদ্বিষয়ের আভাস আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রদান করিয়াছি।

প্রথমা কন্যার বিবাহ দানের কালে বলরামকে কয়েক সপ্তাহের জন্য কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। নতুবা পুরীধামে অতিবাহিত পূর্ণ

একাদশ বৎসরের ভিতর তাঁহার জীবনে অন্য কোন প্রকারে শান্তি ভঙ্গ হয় নাই। ঐ ঘটনার কিছুকাল পরেই তাঁহার ভ্রাতা হরিবল্লভ বসু রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটস্থ ৫৭ নং ভবন ক্রয় করিয়াছিলেন এবং সাধু-দিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবশতঃ পাছে বলরাম সংসার পরিত্যাগ করেন এই ভয়ে তাঁহার পিতা ও ভ্রাতৃগণ গোপনে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে ঐ বাটীতে বাস করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ঐরূপে সাধুদিগের পূতসঙ্গ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিত্যদর্শনে বঞ্চিত হইয়া বলরাম ক্ষুণ্ণমনে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। এখানে কিছু-দিন থাকিয়া পুনরায় পুরীধামে কোন প্রকারে চলিয়া যাইবেন, বোধ হয় পূর্ব্বে তাঁহার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু ঠাকুরের দর্শনলাভের পরে ঐ সঙ্কল্প এককালে পরিত্যাগ করিয়া তিনি ঠাকুরের নিকটে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাসের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং পাছে হরিবল্লভ বসু তাঁহাকে উক্ত বাটি খালি করিয়া দিতে বলেন, অথবা নিমাই বসু বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিবার জন্য তাঁহাকে কোঠারে আহ্বানপূর্ব্বক ঠাকুরের পুণ্য সঙ্গে বঞ্চিত করেন এই ভয়ে তাঁহার অন্তর এখন সময়ে সময়ে বিশেষ ব্যাকুল হইত।

অন্তরের চিন্তা সময়ে সময়ে ভবিষ্যৎ ঘটনার সূচনা করে। বল-রামেরও এখন ঐরূপ হইয়াছিল। তিনি যাহা ভয় করিতেছিলেন প্রায় তাহাই উপস্থিত হইল। আত্মীয়বর্গের গুপ্ত প্রেরণায় তাঁহার উভয় ভ্রাতাই তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এইরূপ ইঙ্গিত করিয়া পত্র পাঠাইলেন এবং হরিবল্লভ বসু তাঁহার সহিত পরামর্শে বিশেষ প্রয়োজনীয় কোন বিষয় স্থির করিবার অভিপ্রায়ে শীঘ্রই কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার সহিত একত্রে কয়েক দিন অবস্থান করিবেন, এই সংবাদও অবিলম্বে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। অন্যায় কিছুই করেন নাই বলিয়া বলরামের অন্তরাত্মা উহাতে ক্ষুব্ধ না হইলেও ঘটনাচক্র পাছে তাঁহাকে ঠাকুরের নিকট হইতে দূরে লইয়া যায় এই ভয়ে তিনি অবসন্ন হইলেন। অনন্তর অশেষ চিন্তার পরে স্থির করিলেন ভ্রাতারা অপরের কথা শুনিয়া যদি তাঁহাকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত

করেন তথাপি তিনি ঠাকুরের অসুখের সময়ে তাঁহাকে ফেলিয়া অন্যত্র যাইবেন না। ইতিমধ্যে হরিবল্লভ বাবুও কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত অবস্থানকালে ভ্রাতাকে যাহাতে কোনরূপ কষ্ট বা অসুবিধা ভোগ করিতে না হয় এইরূপে সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া বলরাম নিজ সঙ্কল্প দৃঢ় রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করিতে এবং ঠাকুরের নিকটে প্রতিদিন যে ভাবে যাতায়াত করিতেন প্রকাশ্যভাবে তদ্রূপ করিতে লাগিলেন।

মুখই মনের প্রকৃষ্ট দর্পণ। হরিবল্লভ বসু কলিকাতায় আসিবার দিবসে বলরাম ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিয়া লইলেন তাহার অন্তরে কি একটা সংগ্রাম চলিয়াছে। বলরামকে তিনি বিশেষ ভাবে আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতেন; তাহার বেদনায় ব্যথিত হইয়া তাহাকে নিজ সমীপে ডাকিয়া প্রশ্নপূর্ব্বক সকল বিষয় জানিয়া লইলেন এবং বলিলেন, "সে লোক কেমন? তাহাকে (হরিবল্লভ বসুকে) একদিন এখানে আনিতে পার?" বলরাম বলিলেন, "লোক খুব ভাল, মশায়! বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, সদাশয়, পরোপকারী, দান যথেষ্ট, ভক্তিমানও বটে, দোষের মধ্যে, বড় লোকের যাহা অনেক সময় হইয়া থাকে, একটু 'কান পাতলা'—এ ক্ষেত্রে অপরের কথাতেই কি একটা ঠাওরাইয়াছে। এখানে আসি বলিয়াই আমার উপরে অসন্তোষ, অতএব আমি বলিলে এখানে আসিবে কি?" ঠাকুর বলিলেন, "তবে থাক, তোমার বলিয়া কাজ নাই; একবার গিরিশকে ডাক দেখি।"

গিরিশচন্দ্র আসিয়া সানন্দে ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, 'হরিবল্লভ ও আমি যৌবনের প্রারম্ভে কিছুকাল সহপাঠী ছিলাম, সেজন্য কলিকাতায় আসিয়াছে শুনিলেই আমি তাহার সহিত দেখা করিয়া আসি, অতএব এই কাজ আমার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে, অদ্যই আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব।'

পরদিন অপরাহ্নে প্রায় ৫টার সময় গিরিশচন্দ্র হরিবল্লভ বাবুকে

সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুরের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করিবার মানসে বলিলেন, 'ইনি আমার বাল্যবন্ধু, কটকের সরকারী উকীল হরিবল্লভ বসু, আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।' ঠাকুর ঐকথা শুনিয়া তাঁহাকে পরম সমাদরে নিজ সমীপে বসাইয়া বলিলেন, "তোমার কথা অনেকের নিকটে শুনিয়া তোমাকে দেখিবার ইচ্ছা হইত, আবার মনে ভয়ও হইত যদি তোমার পাটোয়ারী বুদ্ধি হয়! (গিরিশকে লক্ষ্য করিয়া) কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাহা ত নয়, (হরিবল্লভ বসুকে নির্দ্দেশ করিয়া) এ যে বালকের ন্যায় সরল! (গিরিশকে) কেমন চক্ষু দেখিয়াছ ? ভক্তিপূর্ণ অন্তর না হইলে অমন চক্ষু কখন হয় না! (হরিবল্লভ বাবুকে সহসা স্পর্শ করিয়া) হাঁ গো, ভয় করা দূরে থাকুক তোমাকে যেন কত আত্মীয় বলিয়া মনে হইতেছে।" হরিবল্লভ বাবু প্রণাম ও পদধূলী গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন, 'সেটা আপনার কৃপা।'

গিরিশচন্দ্র এইবার বলিলেন, 'যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে উঁহার ত ভক্তিমান হইবারই কথা ; ৺ কৃষ্ণরাম বসুর ভক্তি তাঁহাকে প্রাতঃস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহার কীর্ত্তিতে দেশ উজ্জ্বল হইয়া রাহিয়াছে। তাঁহার বংশে যাঁহারা জন্মিয়াছেন তাঁহারা ভক্তিমান হইবেন না ত হইবে কাহারা।'

ঐরূপে ভগবদ্ভক্তির প্রসঙ্গ উঠিল, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস ভক্তি ও ঐকান্তিক নির্ভরতাই মানবজীবনের চরম সার্থকতা ঐ বিষয়ে নানা কথা উপস্থিত সকলকে বলিতে বলিতে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। অনন্তর অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর আমাদিগের এক জনকে একটি ভজন সঙ্গীত গাহিতে বলিলেন এবং উহার মর্ম্ম হরিবল্লভ বাবুকে মৃদুস্বরে বুঝাইয়া বলিতে বলিতে পুনরায় গভীর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। সঙ্গীত সম্পূর্ণ হইলে দেখা গেল, দুই তিন জন যুবক ভক্তেরও ভাবাবেশ হইয়াছে এবং ঠাকুরের ভাবোজ্জ্বল মূর্ত্তি ও মর্ম্মস্পর্শী বাণীতে এককালে মুগ্ধ হওয়ায় হরিবল্লভ বাবুর নয়নদ্বয়ে প্রেমধারা বিগলিত হইতেছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল গত

হইয়া পরে হরিবল্লভ বাবু সে দিন ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাইতাম, আগন্তুক কোন ব্যক্তি ঠাকুরের মতের বিরোধী হইয়া তাঁহার সহিত বাদানুবাদ আরম্ভ করিলে, অথবা কোন কারণে তাঁহার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া কেহ উপস্থিত হইলে ঠাকুর কথা কহিতে কহিতে তাহাদিগকে কৌশলে স্পর্শ করিতেন এবং ঐরূপ করিবার পরমুহূর্ত্ত হইতে তাহারা তাঁহার কথা মানিয়া লইতে থাকিত! অবশ্য যাহাদিগকে দেখিয়া তাঁহার মন প্রসন্ন হইত তাহাদিগের সম্বন্ধেই তিনি ঐরূপ ব্যবহার করিতেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি এক দিবস আমাদিগের নিকটে ঐ বিষয়ের এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। 'অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অথবা আমি কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহি এইরূপ ভাব লইয়াই লোকে কাহারও কথা সহজে মানিয়া লইতে চাহে না। (আপনার শরীর নির্দ্দেশ করিয়া) ইহার ভিতরে যে রহিয়াছে তাহাকে স্পর্শ মাত্র তাহার দিব্যশক্তিপ্রভাবে তাহাদিগের ঐ ভাব আর মাথা উঁচু করিতে পারে না। সর্প যেমন্ ফণা ধরিবার কালে ওষধিস্পৃষ্ট হইয়া মাথা নিচু করে, তাহাদিগের অন্তরের অহঙ্কারের অবস্থাও তখন ঠিক ঐরূপ হয়। ঐ জন্যই কথা কহিতে কহিতে কৌশলে তাহাদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া থাকি।'

হরিবল্লভ বাবুকে ঐদিন ঠাকুরের নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব লইয়া সশ্রদ্ধ হৃদয়ে চলিয়া যাইতে দেখিয়া আমাদিগের মনে ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত কথার উদয় হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, বলরাম ঠাকুরের নিকটে যাতায়াত করায় অন্যায় করিতেছেন এইরূপ ভাব তাঁহার ভ্রাতৃগণের হৃদয়ে এখন হইতে আর কখনও দেখা দেয় নাই।

———

সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের আদর্শ।

(স্বামী বিবেকানন্দ)

আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ যে কোন বস্তুকেই গ্রহণ করুক না কেন, অথবা আমাদের মন যে কোন বিষয় কল্পনা করুক না কেন, সর্ব্বত্রেই আমরা দুইটী শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাই— একটী অপরটীর বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছে এবং আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ জটিল ঘটনা-রাজি ও আমাদের অনুভূত মানসিক ভাবপরম্পরার অবিশ্রান্ত লীলা-বিলাস সংঘটন করিতেছে। বহির্জগতে এই বিপরীত শক্তিদ্বয় আকর্ষণ ও বিকর্ষণ অথবা কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তিরূপে, এবং অন্তর্জগতে রাগদ্বেষ ও শুভাশুভরূপে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা কতকগুলি জিনিষকে আমাদের সম্মুখ হইতে অপসারিত করিয়া দিয়া থাকি, কতক-গুলিকে আবার আমাদের নিকট টানিয়া লই। আমরা কাহারও প্রতি আকৃষ্ট হই, আবার কাহারও নিকট হইতে দূরে থাকিতে চাই। আমাদের জীবনে এরূপ অনেকবার হইয়া থাকে যে, কোনই কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না অথচ কোন কোন লোকের প্রতি যেন আমাদের মন টানিতেছে, আবার অন্য অনেক সময়ে যেন কোন কোন লোক দেখিলেই বিনা কারণে পলাইতে ইচ্ছা করে। পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহা সকলেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারেন। আর এই শক্তির কার্য্যক্ষেত্র যতই উচ্চতর হইবে, এই বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয়ের প্রভাব ততই তীব্র ও পরিস্ফুট হইতে থাকিবে। ধর্ম্মই মানবের চিন্তা ও জীবনের সর্ব্বোচ্চ স্তর এবং আমরা দেখিতে পাই, ধর্ম্মজগতেই এই শক্তিদ্বয়ের ক্রিয়া সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট হইয়াছে। অতি গভীর ভালবাসা— মানুষ কোনও কালে যাহার আস্বাদ পাইয়াছে—তাহা ধর্ম্ম হইতেই আসিয়াছে, এবং ঘোরতম পৈশাচিক বিদ্বেষের ভাব, যাহা মানব হৃদয়ে সমুদিত হইয়াছে—তাহারও উদ্ভব ধর্ম্ম হইতে। জগৎ

কোনও কালে যে মহত্তম শান্তিবাণী শ্রবণ করিয়াছে, তাহা ধর্ম্মরাজ্যের লোকদিগের মুখ হইতেই বাহির হইয়াছে এবং জগৎ কোন কালে যে তীব্রতম নিন্দা ও অভিশাপ শ্রবণ করিয়াছে, তাহাও ধর্ম্ম-রাজ্যের লোকদের মুখ হইতেই উচ্চারিত হইয়াছে। কোনও ধর্ম্মের উদ্দেশ্য যত উচ্চতর এবং উহার কার্য্যপ্রণালী যত সূক্ষ্ম, তাহার ক্রিয়াশীলতা ততই অদ্ভুত। ধর্ম্মপ্রেরণায় মানুষ জগতে যে রক্তবন্যা প্রবাহিত করিয়াছে, মনুষ্যহৃদয়ের অপর কোন প্রেরণায় তাহা করে নাই—আবার ধর্ম্মপ্রেরণায় মানুষ যত চিকিৎসালয়, আতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, আর কিছুতেই তাহা হয় নাই। মনুষ্যহৃদয়ের অপর কোন বৃত্তি তাহাকে—শুধু মানবজাতির জন্য নহে, নিকৃষ্টতম প্রাণিগণের জন্য পর্য্যন্তও—যত্ন লইতে প্রবৃত্ত করে নাই। ধর্ম্মপ্রেরণায় মানুষ যত নিষ্ঠুর হয় এমন আর কিছুতেই নহে, আবার ধর্ম্ম প্রেরণায় মানুষ যত কোমল হয় এমন কিছুতেই হয় না। অতীতে এইরূপই হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও খুব সম্ভবতঃ এইরূপই হইবে। তথাপি বিভিন্ন ধর্ম্ম ও জাতির সংঘর্ষোত্থিত এই দ্বন্দ্ব কোলাহল, এই বিবাদ বিসম্বাদ, এই হিংসাদ্বেষের মধ্য হইতেই সময়ে সময়ে এমন বজ্রগম্ভীর বাণী উত্থিত হইয়াছে, যাহা এই সমুদয় কোলাহলকে ছাপাইয়া জগতে শান্তি ও মিলনের বার্ত্তা তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছে—যেন সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত ইহার বজ্রগম্ভীর আহ্বান মানবজাতিকে শুনিতে বাধ্য করাইয়াছে। জগতে কি কখনও এই সমন্বয়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে?

ধর্ম্মরাজ্যের এই প্রবল বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন মিলনসূত্র কি কখনও বিদ্যমান থাকা সম্ভব? বর্ত্তমান শতাব্দীর শেষভাগে এই মিলনের সমস্যা লইয়া জগতে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সমাজে এই সমস্যাপূরণের নানারূপ প্রস্তাব উঠিতেছে এবং সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার নানাবিধ চেষ্টা চলিতেছে; ইহা যে কতদূর কঠিন তাহা আমরা সকলেই জানি। জীবনসংগ্রা-মের ভীষণতা দূর করা—মানবমনে যে প্রবল স্নায়বিক উত্তেজনা রহিয়াছে তাহা মন্দীভূত করা, মানুষ এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া

দেখিতে পায়। এক্ষণে জীবনের যাহা বাহ্য স্থূল এবং বহিরংশমাত্র সেই বহির্জগতে সাম্য ও শান্তি বিধান করাই এত যদি কঠিন হয়, তবে মানুষের অন্তর্জগতে সাম্য ও শান্তি বিধান করা তদপেক্ষা সহস্রগুণ কঠিন। আপনাদিগকে বাক্যজালের ভিতর হইতে কিছুক্ষণের জন্য বাহিরে আসিতে হইবে। আমরা সকলেই বাল্যকাল হইতে প্রেম, শান্তি, মৈত্রী, সাম্য, সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি অনেক কথাই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু সেগুলি আমাদের কাছে কতকগুলি নিরর্থক বাক্যে পরিণত হইয়াছে মাত্র। আমরা সেগুলি তোতাপাখীর মত আওড়াইয়া থাকি এবং উহাই আমাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা ইহা না করিয়াই পারি না। যে সকল মহাপুরুষ প্রথমে তাঁহাদের হৃদয়ে এই মহান্ তত্ত্বগুলি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহারাই এই শব্দগুলির সৃষ্টি করেন। তখন অনেকেই ইহাদেব অর্থ বুঝিত। পরে অজ্ঞ লোকেরা এই সমস্ত কথা লইয়া ছেলেখেলা করিতে থাকে, অবশেষে ধর্ম্ম জিনিষটাকে কেবলমাত্র কথার মারপেঁচ করিয়া দাঁড় করাইয়াছে—উহা যে জীবনে পরিণত করিবার জিনিষ তাহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহা "পৈত্রিক ধর্ম্ম" "জাতীয় ধর্ম্ম" "দেশীয় ধর্ম্ম" ইত্যাদিরূপে পরিণত হইয়াছে। শেষে, কোন ধর্ম্মাবলম্বী হওয়াটা স্বদেশ-হিতৈষিতার একটা অঙ্গ হইয়া দাড়াইযাছে আর স্বদেশহিতৈষিতা সদাই একদেশী। বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা বাস্তবিক কঠিন-ব্যাপার। তথাপি আমরা এই ধর্ম্ম সমন্বয়সমস্যার আলোচনা করিব।

আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেক ধর্ম্মের তিনটী বিভাগ আছে—আমি অবশ্য প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বজনপরিচিত ধর্ম্মগুলির কথাই বলিতেছি। প্রথমতঃ, দার্শনিক ভাগ—যাহাতে সেই ধর্ম্মের সমগ্র অবয়ব অর্থাৎ উহার মূলতত্ত্ব, উদ্দেশ্য ও তল্লাভের উপায় নিহিত। দ্বিতীয়তঃ, পৌরাণিক ভাগ—উহা স্থূলদৃষ্টান্ত দ্বারা দার্শনিক ভাগের বিবৃতিস্বরূপ। উহাতে সাধারণ বা অপ্রাকৃত পুরুষসমূহের জীবনের উপাখ্যানাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উহাতে সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বগুলি সাধারণ বা অপ্রাকৃত পুরুষ-সকলের অল্পবিস্তর কাল্পনিক জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা স্থূলভাবে বিবৃত

হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, আনুষ্ঠানিক ভাগ—উহা ধর্ম্মের আরও স্থূলভাগ—উহাতে পূজাপদ্ধতি, আচারানুষ্ঠান, বিবিধ শারীরিক অঙ্গ-বিন্যাস, পুষ্প, ধূপধূনা প্রভৃতি নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার আছে। আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম এই সকল লইয়া গঠিত। আপনারা দেখিতে পাইবেন, সমুদয় বিখ্যাত ধর্ম্মের এই তিনটী বিভাগ আছে। কোন ধর্ম্ম হয়ত দার্শনিক ভাগের উপর বেশী জোর দেয়, কোন ধর্ম্ম অপরটীর উপর। এক্ষণে প্রথম অর্থাৎ দার্শনিক বিভাগের কথা ধরা যাউক। সার্ব্বজনীন দর্শন বলিয়া কিছু আছে কিনা? এখনও পর্য্যন্ত ত হয় নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মই তাহার নিজ নিজ মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়া সেইগুলিকেই একমাত্র সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে জেদ করে। কেবল মাত্র ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। পরন্তু সেই ধর্ম্মাবলম্বী মনে করে যে, যে সেই সেই মতে বিশ্বাস না করে, সে কোন ভয়ানক স্থানে গমন করিবে। কেহ কেহ আবার অপরকে স্বমতে আনিতে বাধ্য করিবার জন্য তরবারী পর্য্যন্ত গ্রহণ করে। ইহা যে তাহারা দুষ্টামি করিয়া করে তাহা নহে,—গোঁড়ামি নামক মানব-মস্তিষ্ক-প্রসূত ব্যাধি-বিশেষের তাড়নায় করিয়া থাকে। এই গোঁড়ারা খুব অকপট—মানবজাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অকপট কিন্তু তাহারা জগতের অন্যান্য পাগলের ন্যায় সম্পূর্ণ কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত। এই গোঁড়ামি একটী ভয়ানক ব্যাধি। মানুষের যত রকম দুষ্টামীবুদ্ধি আছে, সব এই গোঁড়ামী দ্বারা জাগিয়া উঠে। ইহার দ্বারা ক্রোধ জাগ্রত হয়, স্নায়ুমণ্ডলী অতিশয় চঞ্চল হয় এবং মানুষ ব্যাঘ্রের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠে।

বিভিন্ন ধর্ম্মের পুরাণগুলির ভিতরে কি কোন সাদৃশ্য বা ঐক্য আছে?—এমন কি কোন সার্ব্বভৌমিক পৌরাণিকতত্ত্ব আছে, যাহাকে সকল ধর্ম্মই গ্রহণ করিতে পারে? নিশ্চয়ই না। সকল ধর্ম্মেরই নিজ নিজ পুরাণ আছে—কিন্তু প্রত্যেকেই বলে, "আমার পুরাণোক্ত গল্পগুলি কেবল উপকথা মাত্র নহে।" এই বিষয়টী উদাহরণ-সহায়ে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। আমার উদ্দেশ্য—মদুক্ত বিষয়টী দৃষ্টান্তদ্বারা বিবৃত করা মাত্র—কোন ধর্ম্মের সমালোচনা করা নহে।

খৃষ্টান বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর ঘুঘুপক্ষীর আকার ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট ইহা ঐতিহাসিক সত্য—পৌরাণিক গল্পমাত্র নহে। হিন্দু আবার গাভীর মধ্যে ভগবতীর আবির্ভাব বিশ্বাস করেন। খৃষ্টান বলেন, এরূপ বিশ্বাসের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই—উহা পৌরাণিক গল্পমাত্র, কুসংস্কার মাত্র। ইহুদিগণ মনে করেন, যদি একটী বাক্স বা সিন্দুকের দুই পার্শ্বে দুইটী দেবদুতের মূর্ত্তি স্থাপন করা যায়, তবে উহাকে মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ গুহ্যাতিগুহ্য পবিত্রতম স্থানে স্থাপন করা যাইতে পারে—উহা জিহোবার দৃষ্টিতে পরম পবিত্র। কিন্তু মূর্ত্তিটী যদি কোন সুন্দর নর বা নারীর আকারে গঠিত হয় তাহা হইলে তাহারা বলে, "উহা একটা বীভৎস পুতুলমাত্র—উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেল!" পৌরাণিকভাবে ত এই আমাদের মিল! যদি একজন লোক দাঁড়াইয়া বলে, "আমাদের অবতার এই এই অত্যাশ্চর্য্য কাজ করিয়াছিলেন," অপর সকলে বলিবে—"ইহা কেবল কুসংস্কার মাত্র" কিন্তু তখনই তাহারা বলিবে যে, তাহাদের নিজেদের অবতার ইহাপেক্ষাও অধিক আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার করিয়াছিলেন এবং তাহারা সেগুলিকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া দাবী করে। আমি যতদূর দেখিয়াছি, এই পৃথিবীতে এমন কেহই নাই, যিনি এই সকল লোকের মাথার ভিতরে ইতিহাস ও পুরাণের সূক্ষ্ম পার্থক্যটীকে ধরিতে পারিয়াছেন। এই প্রকারের গল্পগুলি—তাহা যে ধর্ম্মের হউক না কেন—প্রকৃতপক্ষে পৌরাণিক, কখন কখন হয়ত উহাদের মধ্যে একটু আধটু ঐতিহাসিক সত্য থাকিতে পারে।

তৎপরে আনুষ্ঠানিক ভাগ। সম্প্রদায়বিশেষের হয়ত কোন বিশেষ প্রকার অনুষ্ঠান-পদ্ধতি আছে এবং তাঁহারা উহাকেই যথার্থ ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া বিশ্বাস করেন, পক্ষান্তরে অপর সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান-গুলিকে ঘোর কুসংস্কার বলিয়া মনে করেন। যদি এক সম্প্রদায় কোন বিশেষ প্রকারের প্রতীকোপাসনা করেন, তবে অপর সম্প্রদায় বলিয়া বসেন "ওঃ, কি ভয়ঙ্কর!" একটী সাধারণ প্রতীকের কথা ধরা যাউক। লিঙ্গোপাসনায় ব্যবহৃত প্রতীক নিশ্চয়ই পুংচিহ্ন বটে

কিন্তু ক্রমশঃ উহার ঐদিকটা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে এবং এখন উহা ঈশ্বরের স্রষ্টা ভাবটীর প্রতীকরূপে গৃহীত হইতেছে। যে সকল জাতি উহাকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা কখনও উহাকে পুংচিহ্নরূপে চিন্তা করে না।—উহাও অন্যান্য প্রতীকের ন্যায় একটী প্রতীক—বাস্ এই পর্য্যন্ত। কিন্তু অপর জাতি বা সম্প্রদায়ের একজন লোক উহাতে পুংচিহ্ন ব্যতীত অপর কিছু দেখিতে পায় না। সুতরাং সে উহার নিন্দাবাদ আরম্ভ করে। আবার সে হয়ত তখন এমন কিছু করিতেছে, যাহা তথাকথিত লিঙ্গোপাসকদের চক্ষে অতি বীভৎস ঠেকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ লিঙ্গোপাসনা ও স্যাক্রামেণ্ট (Sacrament) নামক খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠানবিশেষের কথা ধরা যাউক। খৃষ্টানগণের নিকট লিঙ্গোপাসনায় ব্যবহৃত প্রতীক অতি কুৎসিত এবং হিন্দুগণের নিকট খৃষ্টানদের Sacrament বীভৎস বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা বলেন যে, কোন মানুষের সদ্‌গুণাবলী পাইবার আশায় তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ ও রক্তপান করা পৈশাচিক নৃশংসতা মাত্র। কোন কোন বন্যজাতিও এইরূপ করিয়া থাকে। যদি কোন লোক খুব সাহসী হয়, তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার হৃৎপিণ্ড ভক্ষণ করে; কারণ তাহারা মনে করে, ইহাদ্বারা তাহারা সেই ব্যক্তির সাহস ও বীরত্ব প্রভৃতি গুণাবলী লাভ করিবে। স্যার জন লাবকের ন্যায় ভক্তিমান্ খৃষ্টানও একথা স্বীকার করেন এবং বলেন যে বন্যজাতিদের এই ধারণা হইতেই খৃষ্টান অনুষ্ঠানটীর উদ্ভব। অন্যান্য খৃষ্টানেরা অবশ্য উহার উদ্ভব সম্বন্ধে এই মত স্বীকার করেন না এবং উহা দ্বারা যে ঐরূপ ভাবের একটা আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাও উহাদের মাথায় আসে না। উহা একটী পবিত্র জিনিসের প্রতীক—এইটুকু মাত্র তাহারা জানিতে চায়। সুতরাং আনুষ্ঠানিক ভাগেও এমন কোন সাধারণ প্রতীক নাই যাহা সকল ধর্ম্মমতই স্বীকার করে ও গ্রহণ করিতে পারে। তাহা হইলে ধর্ম্মমত সকলে সার্ব্বভৌমিকত্ব কোথায়? সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম কিরূপে সম্ভবে? বাস্তবিক কিন্তু তাহা পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে। এখন দেখা যাক্ তাহা কি।

আমরা সকলেই সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের কথা শুনিতে পাই এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় উহার বিশেষ প্রচারে কিরূপ উৎসাহী তাহাও দেখিয়া থাকি। আমার একটী পুরাতন গল্প মনে পড়িতেছে। ভারতবর্ষে মদ্যপান অতি মন্দকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। দুই ভাই ছিল, তাহারা এক রাত্রে লুকাইয়া মদ খাইবার ইচ্ছা করিল। পার্শ্বের ঘরেই তাহাদের খুড়া নিদ্রা যাইতেছিলেন—তিনি একজন খুব নিষ্ঠাবান লোক ছিলেন। এই কারণে মদ খাইবার পূর্ব্বে তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—"আমাদের খুব চুপিচুপি কাজ সারিতে হইবে. নতুবা খুড়া জাগিয়া উঠিবে।" তাহারা মদ খাইতে খাইতে বারম্বার 'চুপ চুপ খুড়ো জাগ্‌বে' এই কথা বলিয়া পরস্পরকে থামাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল! এই গোলমালে খুড়ার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল তিনি ঘরে ঢুকিয়া সমস্তই দেখিতে পাইলেন। আমরা ঠিক এই মাতালদের মত চীৎকার করি—সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব! আমরা সকলেই সমান, অতএব এস আমরা একটা দল করি? কিন্তু যখনই তুমি দল গঠন করিলে, তখনই তুমি সাম্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছ এবং তখনই আর সাম্য বলিয়া কোন জিনিষ রহিল না। মুসলমানগণ সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব, ভ্রাতৃভাব করে; কিন্তু বাস্তবিক কাজে কতদূর দাঁড়ায়? দাঁড়ায় এই, যে মুসলমান নহে, তাহাকে আর এই ভ্রাতৃসঙ্ঘের ভিতর লওয়া হইবে না—তাহার গলা কাটা যাইবারই অধিক সম্ভাবনা। খ্রীষ্টানগণ সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের কথা বলে কিন্তু যে খৃষ্টান নহে তাহার জন্য অনন্ত নরক বন্দোবস্ত।

এইরূপে আমরা 'সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব' ও সাম্যের অনুসন্ধানে সারা পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। যখন তুমি কোথাও এই ভাবের কথা শুনিবে, তখনই আমার অনুরোধ, তুমি একটু ধীর ও সতর্ক হইবে, কারণ এই সকল কথাবার্ত্তার অন্তরালে প্রায়ই ঘোরতর স্বার্থপরতা লুকাইয়া থাকে। কথায় বলে, "যত গর্জ্জে তত বর্ষে না।" সেইরূপ যাহারা প্রকৃত কর্ম্মী এবং অন্তরে বাস্তবিক সকলের প্রতি প্রেম অনুভব করে, তাহারা মুখে লম্বা চওড়া করে না, ভ্রাতৃভাব প্রচারের জন্য দল-

গঠন করে না, কিন্তু তাহাদের ক্রিয়াকলাপ, তাহাদের গতিবিধি তাহাদের সারা জীবনটার উপর লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, যে তাহাদের অন্তর সত্য সত্যই মানবজাতির প্রতি প্রেমে পূর্ণ, তাহারা সকলকে ভালবাসে এবং সকলের ব্যথার ব্যথী, তাহারা কথায় না কহিয়া কার্য্যে দেখায়—আদর্শানুযায়ী জীবনযাপন করে। সারা দুনিয়ায় লম্বাচওড়া কথার মাত্রা এত বেশী যে দুনিয়া ছাপাইয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছে। আমরা চাই কথা কম হইয়া যথার্থ কাজ কিছু অধিক হউক।

এতক্ষণ আমরা দেখিলাম যে ধর্ম্ম বিষয়ে কোন সার্ব্বভৌমিক ভাব খুঁজিয়া বাহির করা খুব কঠিন; তথাপি আমরা জানি উহা বর্ত্তমান। আমরা সকলেই মানুষ কিন্তু আমরা কি সকলে সমান? কখনই নহে। কে বলে আমরা সমান? কেবল বাতুলেই একথা বলিতে পারে। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, আমাদের শক্তি আমাদের শরীর কি সব সমান? এক ব্যক্তি অপরাপেক্ষা বলশালী, একজনের বুদ্ধিবৃত্তি অপরের চেয়ে ঢের বেশী। যদি আমরা সকলে সমানই হই, তবে এই অসামঞ্জস্য কেন? কে এই অসামঞ্জস্য করিয়াছে?—আমরা নিজেরাই উহা করিয়াছি। আমাদের পরস্পরের মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য, বিদ্যাবুদ্ধির তারতম্য এবং শারীরিক বলের তারতম্য আছে বলিয়া আমাদের পরস্পরের মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে। তথাপি আমরা জানি যে এই সাম্যবাদ আমাদের সকলেরই হৃদয়স্পর্শ করিয়া থাকে। আমরা সকলেই মানুষ বটে—কিন্তু তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পুরুষ কতকগুলি স্ত্রীলোক। কেহ কৃষ্ণকায় কেহ শ্বেতকায়—কিন্তু সকলেই মানুষ—সকলেই এক মনুষ্যজাতির অন্তর্ভুক্ত। আমাদের মুখের চেহারা নানারকমের। আমি দুইটী ঠিক এক রকমের মুখ দেখি না; তথাপি আমরা সকলেই এক মানুষ। মনুষ্যত্বরূপ সাধারণ বস্তুটী কোথায়? আমি কোন গৌরাঙ্গ বা কৃষ্ণাঙ্গ নর বা নারীকে দেখিলাম কিন্তু তাহাদের সকলের মুখে মনুষ্যত্বরূপ একটী ভাব আছে যেটী সকলের মধ্যেই বর্ত্তমান। যখন আমি উহাকে

ধরিবার চেষ্টা করি, উহাকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে যাই, যখন বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতে যাই, তখন ইহা দেখিতে না পাইতে পারি; কিন্তু যদি কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার নিশ্চিত জ্ঞান থাকে তবে আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বরূপ এই সাধারণভাবই সেই বস্তু। প্রথমে এই মানবত্বরূপ সামান্যজ্ঞান হওয়ার পরে আমি তোমাকে নর বা নারীরূপে জানিতে পারি। সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এই কথা। ইহা ঈশ্বররূপে পৃথিবীর যাবতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মসমূহের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা অনন্তকাল ধরিয়া বর্ত্তমান আছে এবং নিশ্চিতই থাকিবে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।" আমি এই সমুদয় মণিগণের ভিতর সূত্ররূপে বর্ত্তমান রহিয়াছি—এই এক একটী মণিকে এক একটী ধর্ম্মমত বা তদন্তর্গত সম্প্রদায়বিশেষ বলা যাইতে পারে। পৃথক্ পৃথক্ মণিগুলি এইরূপ এক একটী ধর্ম্মমত এবং প্রভুই সূত্ররূপে সেই সকলের মধ্যে বর্ত্তমান। তবে অধিকাংশ লোকেই এতৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

বহুত্বের মধ্যে একত্বই সৃষ্টির নিয়ম। আমরা সকলেই মানুষ অথচ আমরা সকলেই পরস্পর পৃথক্। মনুষ্যজাতির অংশ হিসাবে আমি ও তুমি এক, কিন্তু যখন আমি অমুক তখন আমি তোমা হইতে পৃথক্। পুরুষ হিসাবে তুমি স্ত্রী হইতে বিভিন্ন কিন্তু মানুষ হিসাবে তুমি ও স্ত্রী এক। মানুষ হিসাবে তুমি জীবজন্তু হইতে পৃথক্ কিন্তু প্রাণী হিসাবে স্ত্রী, পুরুষ, জীবজন্তু ও উদ্ভিদ্ সকলেই সমান; এবং সত্তাহিসাবে তুমি বিরাট্ বিশ্বের সহিত এক। সেই বিরাট্ সত্তাই ভগবান্—তিনিই এই বৈচিত্র্যময় জগৎপ্রপঞ্চের চরম-একত্ব। তাঁহাতে আমরা সকলেই এক। কিন্তু ব্যক্তপ্রপঞ্চের মধ্যে এই ভেদগুলি অবশ্য চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে। বহির্দ্দেশে প্রকাশিত আমাদের প্রতি কার্য্যকলাপে ও চেষ্টার মধ্যে এই ভেদ সদাই বিদ্যমান থাকিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম মানে যদি ইহাই হয় যে, কতকগুলি বিশেষ মত জগতের সমস্ত লোকে বিশ্বাস করিবে তাহা হইলে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহা কখনও হইতে পারে না—এমন

সময় কখন হইবে না যখন সমস্ত লোকের মুখ এক রকম হইবে। আবার, যদি আমরা আশা করি যে, সমস্ত জগত একই পৌরাণিক তত্ত্বে বিশ্বাসী হইবে, তাহাও অসম্ভব; তাহাও কখন হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, সমস্ত জগতে কখনও এক প্রকার অনুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রচলিত হইতে পারে না। এরূপ ব্যাপার কোন কালে কখন হইতেই পারে না; যদি কখনও হয় তবে সৃষ্টি লোপ পাইবে, কারণ বৈচিত্র্যই জীবনের মূলভিত্তি। কে আমাদিগকে আকৃতি-বিশিষ্ট করিয়াছে?—বৈষম্য। সম্পূর্ণ সাম্যভাব হইলেই আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সমান পরিমাণ ও সম্পূর্ণভাবে বিকিরণ-প্রবণতাই উত্তাপের ধর্ম্ম; মনে করুন, এই ঘরের সমুদয় উত্তাপটী সেই ভাবে বিকীর্ণ হইতে পারে, তাহা হইলে কার্য্যতঃ উত্তাপ বলিয়া পরে কিছু থাকিবে না। এই জগতে গতি সম্ভব হইতেছে কিসের জন্য? সমতাচ্যুতি ইহার কারণ। যখন এই জগৎ ধ্বংস হইবে তখনই কেবল চরম-সাম্য আসিতে পারে। অন্যথা এরূপ হওয়া অসম্ভব। কেবল তাহাই নহে, এরূপ হওয়া বিপজ্জনক। আমরা সকলেই এক প্রকার চিন্তা করিব এরূপ ইচ্ছা করা উচিত নহে। তাহা হইলে চিন্তা করিবার কিছুই থাকিবে না। যাদুঘরে অবস্থিত (museum) ইজিপ্টদেশীয় 'মামিদের' (mummies) মত আমরা সকলেই এক রকমের হইয়া যাইব, পরস্পরের দিকে হা করিয়া চাহিয়া থাকিব—আমাদের মনে কোন ভাবই উঠিবে না। এই পার্থক্য, এই বৈষম্য, আমাদের পরস্পরের মধ্যে এই সাম্যভাব আমাদের উন্নতির প্রাণ—আমাদের যাবতীয় ভাবের প্রসূতি। এই বৈচিত্র্য সর্ব্বদাই থাকিবে।

(ক্রমশঃ)

শিখগুরু।

নানক।

(শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র)

শিখ-ধর্ম্ম-নেতাদিগের বৃত্তান্ত ভারতেতিহাসের এক অপূর্ব্ব কাহিনী। এই সকল গুরুদিগের জীবন শিখজাতি ও শিখসমাজের উন্নতি অবনতির সহিত অচ্ছেদ্যবন্ধনে বিজড়িত রহিয়াছে। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই ইঁহাদিগের সহিত পরিচিত আছেন; সাধারণতঃ, প্রথম-গুরু নানক ও গোবিন্দসিংহের কথাই আমরা শুনিয়া থাকি, কিন্তু এতদ্ব্যতীত অপর আটজন ধর্ম্মনেতাদিগের কার্য্যাবলীর সহিত সম্যক্‌রূপে পরিচিত না হইলে আমরা শিখজাতির ধর্ম্মেতিহাস সম্পূর্ণ-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইব না। আমরা পাঠককে স্বল্পপরিসরে শিখগুরুদিগের একটী সংলগ্ন বিবরণী প্রদানে মনস্থ করিয়াছি।

শিখ-ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নানকের নাম চিরবিশ্রুত। তিনি খৃষ্টাব্দের ১৪৬৮ বর্ষে পাঠান-সম্রাট বল্লাল লোদীর রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করেন। নানকের পিতা কুল্লু লাহোরের নিকটবর্ত্তী তিলওয়ান্দী গ্রামে বাস করিতেন। তিনি জাতিতে ছত্রি ছিলেন।

ভারতবর্ষীয় প্রায় সকল ধর্ম্মাবতারেরই জন্মবিবরণের সহিত কোন না কোন অলৌকিক ঘটনা জড়িত আছে। এ স্থলেও উক্ত নিয়মের কোনরূপ ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না। কথিত আছে, কুল্লুর বিবাহের পর অনেকদিন কাটিয়া গেল কিন্তু সন্ততিলাভের কোন আশা না দেখিয়া অবশেষে ব্যথিতচিত্তে তিনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া ফকিরী গ্রহণ করিলেন। কিছুকাল অতীত হইলে একদিবস মধ্যাহ্নে কুল্লুর পর্ণকুটীরে একজন ফকির উপস্থিত হইল। অতিথিকে পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া তাঁহার দয়ার্দ্রচিত্ত বিগলিত হইল। কোনরূপ প্রসঙ্গের পূর্ব্বেই কুটীরে যে সকল ফলমূল সঞ্চিত ছিল কুল্লু

তাহাই পথিককে প্রদান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রম্ভালাপের পর কুল্লু তাঁহার চিরপোষিত মনঃকষ্টের কথা তাহাকে জ্ঞাপন করিলে ফকির প্রস্থানসময়ে বলিয়া গেল—"আহারান্তে যাহা কিছু রহিল তোমার স্ত্রীকে ভোজন করিতে বলিও, তাহা হইলেই তিনি অবিলম্বে একটী সুসন্তান প্রসব করিবেন। এই পুত্র ভবিষ্যজীবনে অত্যন্ত উন্নত ও মহৎ হইয়া তোমার মুখোজ্জ্বল ক'রবে, সন্দেহ নাই।" এই ফকির কে এবং কোথা হইতে তাহার আগমন এ বিষয় কুল্লু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না—উহা যেন প্রহেলিকা হইযা রহিল।

উক্ত আদেশমত কার্য্য সম্পন্ন করিলে কুল্লু বহুদিনের ঈপ্সিত ফললাভে ধন্য হইলেন। তাঁহার স্ত্রী নিজ পিত্রালয় মারি নামক গ্রামে গমন করিয়া পুত্র প্রসব করিলেন। ভবিষ্যতে এই পুত্রই নানক নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

এইরূপে মনোভিলাষ কার্য্যে পরিণত দেখিয়া কুল্লু তিলওয়ান্দী গ্রামে ফিরিয়া গৃহস্থাশ্রমে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। প্রথমে তিনি ব্যবসায় লিপ্ত হইলেন। কালক্রমে তাঁহার একটী কন্যাও জন্মিয়াছিল। নানক বাল্যকাল হইতেই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। চার বৎসর বয়সে তাঁহাকে স্থানীয় একটী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। শিক্ষক মহাশয় এই ক্ষুদ্র বালকের অদ্ভুত মেধা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি একজন নির্গুণ ঈশ্বরবাদী ছিলেন। কথিত আছে, একদিন তিনি উক্ত মতবাদের যাথার্থ্য ও সত্যতা নানককে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন; শিক্ষকের সকল যুক্তি ও গবেষণা শ্রবণ করিয়া বালক নানক স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'মহাশয়! ভগবান্ যে সত্য সত্যই আছেন তাহার কোন প্রমাণ দিতে পারেন কি?' বাল-কণ্ঠোত্থিত এরূপ প্রশ্ন শ্রবণে শিক্ষক চমকিত হইলেন! তৎপরে সবিশেষ তথ্য সংগ্রহ করিয়া জানিতে, পারিলেন উক্ত শিশুই সন্ন্যাসীদত্ত পুত্র। ঐ শিক্ষক পরজীবনে ফকিরবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

বাল্যাবধি নানক সাধুসন্ন্যাসীর প্রতি অত্যধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধান্বিত

ছিলেন; ইহার ফলে অনেক সময়ে তাঁহাকে পিতার নিকট হইতে তিরস্কার ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। একসময়ে কুল্লু পুত্রকে কিছু অর্থ প্রদান করিয়া দূরবর্ত্তী কোন গ্রামে লবণ-ব্যবসায়ের জন্য পাঠান। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার অর্থাগমের উপায় অনেকটা সুগম হইতে পারে। পথিমধ্যে নানক দেখিলেন—কয়েক-জন ফকির দলবদ্ধ হইয়া চলিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই পথশ্রমে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এবং নানক জানিতে পারিলেন তাঁহাদের তিন দিন আহার হয় নাই। নানকের একান্ত ইচ্ছা—তাঁহাদিগের সহিত কিয়ৎক্ষণ শাস্ত্রালোচনা করেন, কিন্তু যাঁহারা তিন দিবস অনাহারী তাঁহাদিগের আর বাক্যালাপের শক্তি কোথা হইতে আসিবে? এরূপ অবস্থায় তিনি স্থির করিলেন, তাঁহার নিকট যে অর্থ আছে তদ্দ্বারা সাধুসেবা করিয়া ধন্য হইবেন। তদীয় সহচর বলসাধুর মত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—'শুভ ও সৎকর্ম্মে বিলম্ব একান্ত দোষাবহ।' এইরূপে উৎসাহিত হইয়া নানক আনন্দচিত্তে সমুদয় অর্থ সাধু-সেবায় খরচ করিয়া গৃহে ফিরিলেন, তাঁহার লবণব্যবসায় হইল না! এই ঘটনায় তদীয় পিতার অসন্তোষ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কথিত আছে, "সাধুসেবার দ্বারা যে ধন অর্জ্জন করিয়াছি তাহা অন্য কোন ব্যবসায় দ্বারা অর্জ্জন করা অসম্ভব"—এই বলিয়া নানক পিতাকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করেন।

বিষয়কর্ম্মে পুত্রের অনাস্থা দেখিয়া কুল্লু অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন; নানক বাল্যকাল হইতে জাগতিক ভোগবিলাস ও সুখদুঃখকে অতীব তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। কিছুদিন পরে পিতা সুলতানপুর নামক গ্রামে একখানি দোকান খুলিয়া উহার সম্পূর্ণ ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু পরে দেখিলেন, উক্ত ব্যবসায় হইতে কোনরূপ লাভের পরিবর্ত্তে ক্ষতির পরিমাণ অত্যন্ত বেশী হইতেছে। নানক সাধুসেবা পূর্ব্ববৎ চালাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে পিতা ব্যথিতচিত্তে উক্ত ব্যবসায় উঠাইয়া

দিলেন। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া কুল্লু অবিলম্বে পুত্রের বিবাহ দিলেন। তিনি জানিতেন যে ফকির ও সাধুদিগের প্রতি অতীব ভক্তি ও শ্রদ্ধাই ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্য হওয়ার প্রধান কারণ। বিবাহবন্ধনে পুত্রকে আবদ্ধ করিয়া কুল্লু ভাবিয়াছিলেন, উহা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া যাইবে। কিন্তু কালক্রমে উক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি আরও ঘনীভূত হইতে লাগিল এবং বিবাহ করিলেও তিনি সাধু ও ফকিরদিগের সহিতই অধিক সময় যাপন করিতেন। এবং নানকও বুঝিলেন যে, ক্রমে তাঁহার বন্ধন বাড়িতেছে ; উহা উপলব্ধি করিয়া তিনি অচিরে গৃহত্যাগ করিয়া অরণ্যবিহারে সন্ন্যাসীজীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে নানকের সংসার-জীবনের অবসান হইল। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উক্তকালে তিনি বালকমাত্র ছিলেন। একাদশ বয়ঃক্রম হইতেই তাঁহার নবজীবন আরম্ভ হইল। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে অন্যান্য সাধুদিগের সহিত তর্কবিচারাদিতে স্বীয় প্রতিভা ও বুদ্ধির যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছিলেন। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, প্রবল তিতিক্ষা ও অসাধারণ মেধায় মুগ্ধ হইয়া পরে অনেকেই তদীয় শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে মুরদানা নামক এক মুসলমান যুবকের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিবার সময় নানক এই যুবকের সুমিষ্ট বাদ্য উপভোগ করিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বুধ ও লেনা নামক শিষ্যদ্বয়ও বিখ্যাত। বুধ নানকের মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন—তিনি একটী ঘটনা হইতে নানকের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

টুঙ্গ নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন এক প্রান্তরে একদা বুধ গাভী চরাইতেছিল। তখন দ্বিপ্রহর, নানক ঐস্থান দিয়া যাইতেছিলেন কিন্তু পথিমধ্যে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হওয়ায় অপরিচিত বুধের নিকট বারিপানের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলেন। ইহা শুনিয়া বুধ বলিল, 'মহাশয় ! নিকটে কোনস্থানে ত জল নাই, সুতরাং আমাকে বহু-দূর গমন করিতে হইবে, তবে আপনি যদি আমার গাভীগুলি রক্ষণের

ভার লন, তাহা হইলে আমি শীঘ্র আপনাকে জল আনিয়া দিব। এ স্থানের সন্নিকটেই একটী পুষ্করিণী আছে কিন্তু এখন তাহাতে জল নাই।' ইহা শুনিয়া নানক বলিলেন, 'যে পুষ্করিণীর কথা তুমি বলিতেছ তাহাতে যথেষ্ট জল আছে, তুমি লইয়া আইস।' এ উক্তির সত্যতায় বুধের বিশ্বাস হইল না; তাহাতে নানক বলিলেন—'ঐস্থানে স্বয়ং যাইলেই সত্য মিথ্যার প্রমাণ পাইবে।' বুধ তৎক্ষণাৎ জল আনিতে ছুটিল। শুষ্ক, জলহীন পুষ্করিণী স্বচ্ছ জলপূর্ণ দর্শনে বুধের আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না। প্রাতঃকালে ঐস্থান দিয়া যাইবার সময় সে জলের চিহ্নমাত্র দেখিতে পায় নাই। এই ঘটনা হইতেই বুধ স্পষ্ট বুঝিল নানক সাধারণ ব্যক্তি নহেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হইল। নানকের সমসাময়িক বলিয়া পরবর্ত্তী শিখগুরু অর্জ্জুন ও হরগোবিন্দ তাঁহাকে অতীব সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। গুরু অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া বুধ সানন্দে ঐ পুষ্করিণী দেখাইয়া দিয়াছিল। তখন হইতে ঐ পুষ্করিণীটীকে সকলেই পবিত্র বলিয়া মনে করিত।

লেনার সম্বন্ধে কথিত আছে যে, পুণ্যতীর্থ জ্বালামুখী অভিমুখে যাত্রা করিবার পথে নানকের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হয়। নানকের গুণে মুগ্ধ হইয়া অবিলম্বে লেনা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

অতঃপর আমরা নানক-প্রচারিত ধর্ম্মমত ও তৎপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

মনে রাখিতে হইবে যে, নানক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বা গোঁড়ামির স্থান ছিল না। সে সময়ে হিন্দু সমাজে জাতিবিচার প্রচলিত, সুতরাং নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণ সমাজকর্ত্তৃক একপ্রকার পরিত্যক্ত ও নির্ব্বাসিত হইত। ইহাদিগকে নানাবিধ অভাব অভিযোগের মধ্যে সামান্যভাবে কালাতিপাত করিতে হইত। নানক বাস্তবিকই ইহাদিগের দুঃখকষ্টে সমবেদনাশীল ছিলেন, ইহাদিগের শোচনীয় অবস্থার প্রতি তিনি কখনও ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন

নাই। সুতরাং তৎপ্রচারিত ধর্ম্মে ইহাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে স্থানদান করা হইয়াছিল। তিনি নিজ শিষ্যনির্ব্বাচনে কোনরূপ জাতিবিচার মানিয়া চলেন নাই, বরং নীচজাতি হইতেই অধিক সংখ্যক শিষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তদীয় শিষ্যসংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে অপর একটী বিষয়ে বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছিল—উহা মুসলমানদিগের অত্যাচার ও সঙ্কীর্ণতা। সে সময়ে মুসলমান ভারতের অধীশ্বর, সুতরাং মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীদিগের যে প্রবল প্রতাপ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? নানক আপনার জীবন-ব্যাপী সাধনার ফলস্বরূপ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে চিরদিনের বিদ্বেষ ও অসদ্ভাবের পরিবর্ত্তে একতা বা সাম্য আনয়নে কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়া সকলের পূজ্য ও মাননীয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ ও বাণীতে হিন্দুর প্রতিমাপূজার প্রতি শ্লেষ ও তৎসহ মুসলমানের সঙ্কীর্ণতার প্রতি কটাক্ষ উভয়ই দেখিতে পাই। তৎপ্রচারিত ধর্ম্মকে আমরা এক কথায় নির্গুণ ঈশ্বরবাদ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। তিনি নিজ শিষ্যমণ্ডলীকে একমাত্র পরমেশ্বরের আরাধনা করিতে বলিতেন। তাঁহার মতে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী এবং প্রবল পরাক্রমশালী। ভগবান মানবের প্রত্যেক কর্ম্মের সহিত পরিচিত, মানবগণের গভীরতম অনুভূতি পর্য্যন্তও তাঁহার নিকট অজ্ঞেয় নহে। তিনি দেশকালের অতীত—অবিনশ্বর, নিত্য মুক্ত। মানবের যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, সমস্তই তাঁহার দান। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে কিন্তু তাঁহার ধ্বংস নাই। জগতের প্রতি অণুপরমাণু জগদীশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়। তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান। একদা নানক পশ্চিম দিকে পা করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে এক মোল্লা আসিয়া বলিল—"এ ব্যক্তি একান্ত অবিশ্বাসী, ইহার এত স্পর্দ্ধা যে ভগবানের বাসস্থান মক্কার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করে!" ইহা শুনিয়া নানক উত্তর করিলেন—'ভগবান কোথায় অবিদ্যমান তাহা আমাকে বলিয়া দিতে পার?"

এই উক্তি হইতে আমরা তাঁহার ধর্ম্মমত স্পষ্টই অনুমান করিতে পারি। এইরূপে সর্ব্বভূতে পরমেশ্বরের সত্ত্বা সম্যক্‌রূপে অনুভব করিয়া এবং মানবের প্রতি তিনি কিরূপ করুণাপরবশ তাহা হৃদয়ে অনুভব করিয়া নানক জাগতিক ধনজনসম্পদ তৃণাদপি তুচ্ছ বিবেচনা করিতেন। তাঁহার যাহা কিছু অর্থ ছিল সমুদয়ই তিনি বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি কোন মানবকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না, কারণ তিনি জানিতেন যে সকলের মধ্যেই শ্রীভগবানের সত্ত্বা বিদ্যমান।

যাঁহারা বলেন যে ভগবদাজ্ঞার অবহেলাবশতঃই আদিমানব স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, নানক তাঁহাদিগের মত সমর্থন করিতেন না। তিনি বলিতেন, নিষ্পাপ ও সৎ হইতে হইবে, সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে ভগবান মানবের প্রত্যেক কর্ম্মের গুণাগুণ বিচার করিতেছেন—ইহাতেই সমগ্র সুখ নিহিত নতুবা ঐরূপ চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই।

তিনি পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করিতেন; তাঁহার মতে সাধু ও সৎব্যক্তিগণই মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করিবে। যাহারা ভগবদ্‌নাম-মাহাত্ম্যে আস্থাহীন অথচ যাহারা অসৎজীবন অতিবাহিত করে না এরূপ মানবদিগকে মৃত্যুর পর আবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু যাহারা পাপজীবন যাপন করে তাহাদিগকে মৃত্যুর পর পুনর্ব্বার মনুষ্য জন্মের পরিবর্ত্তে নীচ প্রাণীজন্ম লইতে হইবে। কোন কোন শিখধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে আমরা অবগত হই যে, নানক তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিতেন,—ঈশ্বর মানুষের হাতেই তাহার স্বর্গ কিংবা নরকগমনের ভার সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। মানুষ এতদুভয়ের নির্ব্বাচনে কতকটা স্বাধীন।

নানক অধিকাংশ সময় ভগবদ্‌পূজা ও আরাধনায় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার শিষ্যেরা সকলেই বিশ্বাস করিতেন যে তাঁহার ভগবদ্দর্শন হইয়াছিল। উহার বিবরণ আমরা বহু পুস্তকে দেখিতে পাই। একদা নানক এক অত্যাশ্চর্য্য আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন।

"ওয়া গুরুজী!" "ওয়া গুরুজী" ধ্বনিতে নভঃস্থল বিদীর্ণ হইল। এই অদ্ভুত স্বর তাঁহাকে বারংবার আহ্বান করাতে তিনি উহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। ঐ স্বর বলিল—'হে নানক! তুমি আমার প্রিয় শিষ্য, কলিতে তুমি আমার নাম ও মহিমা প্রচার কর।' ইহা শুনিয়া করজোড়ে নানক উত্তর করিলেন—"হে ভগবন্! আমি অতি দীনহীন, আপনার অপূর্ব্ব নাম প্রচারে আমার শক্তি নাই, আপনার সাহায্য ব্যতীত আমি এরূপ কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতেছি না।" উত্তর আসিল, "আজি হইতে আমি তোমার সহিত সর্ব্বদা বসবাস করিব, তোমার কোন আশঙ্কা নাই—আমি তোমার পরম সহায়, তুমি নির্ভয়ে কর্ম্ম ক্ষেত্রে অগ্রসর হও। আমি তোমার গুরুরূপে বিদ্যমান। বৈরাগী যেরূপ সর্ব্বদা রামনাম উচ্চারণ করিতে থাকে, সন্ন্যাসী যেরূপ 'ওঁ নারায়ণ' বলে, সেইরূপ তুমি তোমার শিষ্যদিগকে 'পুরী' 'পুরী' এই নাম উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দাও। আমি স্বয়ং তোমার শিষ্যদিগের রক্ষাকর্ত্তা, তাহাদিগের অনিষ্টসাধনে কোন ব্যক্তি সমর্থ নহে। তুমি শিষ্যসহ ধর্ম্মশালায় বসবাস করিবে, তাহাদিগের সকলের সংসার-ত্যাগের কোন প্রয়োজন নাই। তোমার সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিনটী মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে এবং অনুক্ষণ উহাদিগের সাধনে তৎপর থাকিতে হইবে। প্রথম—ভগবদ্‌নামে অচলা ভক্তি, দ্বিতীয়—সর্ব্বজীবে দয়া এবং তৃতীয়—ঈশ্বরের পূজা ও আরাধনা। ঐ মন্ত্রত্রয়ই সাফল্যের মূলস্বরূপ। হে নানক! তোমাতে ঐশী শক্তির পূর্ণ প্রকাশ বিদ্যমান, কলির পাপাপহরণে তুমিই উপযুক্ত।" সেই অদ্ভুত স্বর অনন্তে মিশাইবার পূর্ব্বে আবার বলিল—"ওয়া গুরু"! "ধন্য নানক! তুমি ধন্য!"

এইরূপে ভগবদ্‌শক্তির দ্যোতনায় হৃদয়মন পূর্ণ করিয়া গুরু নানক প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইলেন। যে শক্তি তাঁহাকে ঐ কার্য্যে ব্রতী করিয়াছিল উহার অভূতপূর্ব্ব মহিমা তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন; এবং তদীয় প্রচারকার্য্যে তাহারই প্রতিধ্বনি আমরা পাইয়া

থাকি। তিনি আর্য্যাবর্ত্ত এবং সিন্ধুপ্রদেশের অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এমন কি, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে তিনি মক্কাতেও গমন করিয়াছিলেন।

তাঁহার অপূর্ব্ব বাণীর সত্যতা ও মহিমা সকলেই উপলব্ধি করিয়াছিল এবং তদীয় শিষ্যসংখ্যা তৎকারণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি নিজ সম্প্রদায়ে গোহত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন; তিনি গাভীকে ভক্তির চক্ষে দেখিতেন এবং শিষ্যগণও যাহাতে উক্ত গর্হিতকার্য্যে প্রবৃত্ত না হয় তজ্জন্য তাহাদিগকে বিশেষরূপে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি আপনাকে মহম্মদের পরবর্ত্তী অবতার বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি মহম্মদকে সম্মান করিতেন সন্দেহ নাই কিন্তু মহম্মদের গোহত্যা ও হিন্দুবিদ্বেষ প্রভৃতি কোন মতে সমর্থন করিতেন না।

নানক আপনার দীর্ঘজীবন পচারকার্য্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারে কোন বাহ্যাড়ম্বর ছিল না, সামান্য একটী বটবৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া তিনি শিষ্যদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেন। তাঁহার অধ্যাত্মনয়ন খুলিয়া গিয়াছিল। অনুভূতিজাত উচ্ছ্বাস ও আবেগ যেমন ছিল তাঁহার তদ্রূপ মনোভাব প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ভাষাও ছিল। তিনি ভজন করিবার জন্য ভগবদুদ্দেশ্যে কতকগুলি সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন—এইগুলি শিষ্যসহ প্রায়ই পাঠ করিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রচারকার্য্যের জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতেন; এই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। পারস্য, আরব প্রভৃতি দেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি কিছুদিনের জন্য ফকিরের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্ববৎ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কতকগুলি হিন্দু যোগী অতীব ক্রুদ্ধ হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় অসাধারণ শক্তির প্রভাবে সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প ইত্যাদি প্রাণীরূপ ধারণ করিয়া নানকের ভয়োৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। এক ব্যক্তি অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বগ্রাস করিতে লাগিল এবং অন্য একজন ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া নভস্তল হইতে তারকারাশি উৎপাটন করিয়া ক্রুদ্ধ

প্রলয় আনয়নে নানকের তথাকথিত গর্হিতকর্ম্মের প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যস্ত হইল। কিন্তু নানক ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না দেখিয়া তাহারা ক্ষান্ত হইয়া তাঁহাকে কোন অলৌকিক শক্তি প্রকাশে অনুরোধ করিল। উহাতে তিনি উত্তর করিলেন—"আমার কোন অলৌকিক ক্ষমতা নাই। আমি একজন সামান্য ধর্ম্মনেতা। সত্যপ্রচারই আমার জীবনের উদ্দেশ্য।" এই উক্তি হইতে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে তিনি কখনও আপনাকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতেন না। কিন্তু শিখ-ধর্ম্মগ্রন্থে নানকজীবনের সহিত অনেকগুলি অলৌকিক ঘটনা সন্নিবেশিত রহিয়াছে। এস্থলে একটীর উল্লেখ করিব। নানকের জীবন যে পবিত্র এবং অমূল্য তাহা যেন প্রকৃতি দেবীও জানিতেন—তৎসম্বন্ধে বর্ণিত আছে—শিশু নানক ক্ষেত্রে গরু চরাইতে গিয়া যখন দ্বিপ্রহরে অতীব ক্লান্ত হইয়া পড়িত তখন পাছে তাহার মুখমণ্ডলে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত করে সেই জন্য স্বয়ং সর্পরাজ ফণা বিস্তার করিয়া থাকিতেন।

অতঃপর আমরা নানক-প্রণীত প্রধান শিখধর্ম্মগ্রন্থগুলির বিষয় কিছু বলিব। প্রথম গ্রন্থের নাম "প্রাণ সাঙ্কুলী"। ইহা শিখধর্ম্মাবলম্বীদিগের জীবন সৎপথে নিয়ন্ত্রিত করিবার অভিপ্রায়ে রচিত হইয়াছিল—ইহাতে কতকগুলি নিয়মাদি উল্লিখিত আছে। উহা নানকের পরজীবনে রচিত প্রধান পুস্তক "গ্রন্থের" প্রথমভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। এই "প্রাণ সাঙ্কুলী" গ্রন্থ নানকের পূর্ব্বজীবনের রচনা। এই কার্য্যে তিনি জনৈক রাজার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই রাজা সর্ব্বপ্রথমে নানককে তাঁহার সম্পত্তির কিয়দংশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করায় তিনি উত্তর করিয়াছিলেন—"আমি ফকির, আমার অর্থের কোন প্রয়োজন নাই।" নানকের চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া এই নৃপতি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নানক-প্রণীত ধর্ম্মপুস্তক "গ্রন্থ" শিখধর্ম্মসম্প্রদায়ের পরিচালনার জন্য রচিত হইয়াছিল। নানক দেখিলেন, তাঁহার শিষ্যসংখ্যা ক্রমশঃ

বাড়িয়া উঠিতেছে, সুতরাং তাহাদিগের জীবনযাপন প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত তৎসংক্রান্ত প্রত্যেক আবশ্যকীয় আদেশ লিপিবদ্ধ করিবার একান্ত প্রয়োজন। এই পুস্তকে নানক প্রচারিত ধর্ম্মমতের সকল তথ্য নিহিত আছে। শিখধর্ম্মাবলম্বিগণ ইহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখেন। কিন্তু কালক্রমে এই "গ্রন্থ" আবার দুইভাগে ভাগ হইয়া গেল—প্রথম ভাগের নামকরণ হইল "আদিগ্রন্থ" অর্থাৎ যাহা নানক ও তৎপরবর্ত্তী কয়েকজন গুরু দ্বারা রচিত দ্বিতীয় ভাগ—দশম নেতা গুরু গোবিন্দ রচিত পুস্তক। ইহার নাম—"দশম বাদশাকী গ্রন্থ"। এই দুই বিভিন্ন ভাগের মধ্যে মতের পার্থক্য অনেক। এমন কি আমরা ইহাদিগকে সম্পূর্ণ পৃথক্ পুস্তক বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।

নানক-প্রচারিত শিখধর্ম্ম প্রতিহিংসার পরিবর্ত্তে করুণা বা দয়ার উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি আপন শিষ্যদিগকে জাগতিক ঐশ্বর্য্যের আপাতরম্য সৌন্দর্য্যকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহা-দিগকে সর্ব্বপ্রকার কোলাহল ও চাঞ্চল্য হইতে দূরে থাকিয়া শান্ত পবিত্র ও সাধুজীবন অতিবাহিত করিতে হইত। সৈনিকবৃত্তি অব-লম্বন করিয়া সর্ব্বদা উত্তেজনাপূর্ণ ও চাঞ্চল্যময় জীবন-যাপন নানকের মনোভিলাষ ছিল না। কিন্তু দেশ কাল ও পাত্র ভেদে শিখজাতিকে অস্ত্র ধারণ করিতে হইয়াছিল।

শিখজাতি কালক্রমে নানক প্রচারিত ধর্ম্ম অর্থাৎ আদি গ্রন্থে যাহা আমরা পাইয়া থাকি তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল; নানকের দীক্ষামন্ত্র গুরু গোবিন্দের পর শিখসমাজ ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে লাগিল। এই আমূল পরিবর্ত্তন কিরূপে সাধিত হইয়াছিল তাহা আমরা পরবর্ত্তী গুরুদিগের জীবনেতিহাস আলোচনা করিবার কালে পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। নানকের শেষজীবন সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

জীবনের শেষভাগ নানক রাভি নদীর তীরে কাটাইয়াছিলেন। ঐস্থানে তিনি তাঁহার পরিবারবর্গ লইয়া থাকিতেন। তিনি দুইটী

পুত্র রাখিয়া যান। প্রথমটীর নাম লক্ষীদাস, দ্বিতীয় শ্রীচাঁদ। লক্ষ্মীদাস বিবাহ করিয়াছিলেন। ইঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি জীবিত আছেন। শ্রীচাঁদ বিবাহাদি করেন নাই—ফকির হইয়াছিলেন--ইঁহার শিষ্যেরা উদাসী ফকির নামে বিখ্যাত।

অপর মতে নানকের কোন পুত্রাদি হয় নাই। ইঁহারা বলিয়া থাকেন, নানকের লাল্লু নামে এক পিতৃব্য ছিলেন। তিনি নানককে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। পিতৃব্যপুত্র লক্ষ্মীদাসের সহিত নানকের অত্যন্ত সৌহার্দ্দ ও প্রীতি ছিল। নানক বলিতেন তাঁহাদিগের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না—উভয়েই এক ছিলেন। এই লক্ষ্মীদাসের পুত্রাদিই নানকপুত্র নামে পরিচিত ছিল।

এই ভাবে দীর্ঘকাল শ্রীভগবানের নাম ও তাঁহার মহিমা প্রচার-কল্পে রত থাকিয়া গুরু নানক একসপ্ততিবর্ষ ধরাধামে অবস্থান করিয়া খ্রীষ্টাব্দের ১৫৩৯ বর্ষে নরকলেবর পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া যান। রাভি নদীর উপকূলে কুলান্নুর নামক গ্রামের সন্নিকটে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হয়। এই স্থান অদ্যাপি 'কীর্ত্তিপুর' নামে বিখ্যাত হইয়া পুণ্যপীঠরূপে বিরাজ করিতেছে। শত শত তীর্থযাত্রী এস্থান ভ্রমণ করিয়া আপনাদিগের নরজন্ম সার্থক বিবেচনা করিয়া থাকে।

স্বপ্নতত্ত্ব।

দূরদর্শন-শক্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত।

(ডক্টার শ্রীসরসীলাল সরকার।)

(৪)

মানবের সকল প্রকার মানসিক অনুভব বা ক্রিয়া কেবল যে দেহ-যন্ত্রের সহায়ে এবং উহার মধ্য দিয়া হইয়া থাকে তাহা নহে, কিন্তু ঐরূপ প্রত্যেক ক্রিয়া ও অনুভবের সহিত অবিচ্ছেদ্য পৃথক্ পৃথক্ দৈহিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। উহাকে আমরা ঐ ক্রিয়ার দৈহিক প্রতিচ্ছবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। দেখা যায়, দেহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল ক্রিয়ারও পরিবর্ত্তন হয় এবং পূর্ব্বোক্ত দৈহিক প্রতিচ্ছবি বা পরিবর্ত্তন স্নায়ুমণ্ডলী ও মস্তিষ্কেই প্রধানতঃ উপস্থিত হইয়া থাকে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ঐ জন্য মস্তিষ্ককেই ঐ ক্রিয়া-সমূহ উৎপাদনের একমাত্র যন্ত্র বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, আমাদের যাবতীয় মানসিক ক্রিয়া ও অনুভব মস্তিষ্কের কোষ-সমূহের উত্তেজনা এবং বিভিন্ন অবস্থায় পরিণতি হইতেই উপস্থিত হয়। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি প্রবৃত্তিমূলক দেহীর স্থূল মনোভাব-সমূহের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত মতের সত্যতা কতকাংশে অস্বীকার করিতে না পারিলেও তাহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনেকগুলি মনোভাবের বিশ্লেষণপূর্ণ আলোচনায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ঐ মত বাধ্য হইয়া অস্বীকার করিতে হয়। হিন্দু দার্শনিকগণের মতে মৃত্যুর পরেও মানবের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে এবং ঐ অবস্থাতেও সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্ম জড়োপাদানে গঠিত তাহার মনের লোপ হয় না—কেবল জীবৎ-কালের ন্যায় স্থূল দেহযন্ত্রের ভিতর দিয়া না হইয়া তাহার মনের ক্রিয়া সকল তখন তাহার সূক্ষ্ম দেহাবলম্বনে প্রকাশ পাইয়া থাকে। হিন্দু দার্শনিকগণ ঐরূপে জন্ম জরা মৃত্যুর অধীন জীবের স্থূল দেহের অভ্য-

স্তরে একমাত্র ব্রহ্মবিজ্ঞান দ্বারা নাশিত সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, এ কথা বলিতে হইবে না।

স্বপ্নাবস্থায় অনুভূত মানবমনের কতকগুলি প্রত্যক্ষ (Phenomena) প্রাচ্য দার্শনিকগণের পূর্ব্বোক্ত মত অনেকাংশে সত্য বলিয়া সমর্থন করে, এ কথা আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব। বাস্তবিক সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির-অগোচর মৃত্যুর পারের অবস্থা ও অনুভব সকলের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা জীবৎকালেই কখন কখন এমন সকল মানসিক ক্রিয়ার সম্মুখীন হই যে, তাহাদিগকে মস্তিষ্কের উত্তেজনা ও বিকৃতি-পরিণতি কিছুতেই বলা চলে না। পাশ্চাত্যের জড়বাদ অবলম্বনে ঐরূপ ঘটনা সকলের কোনরূপ ব্যাখ্যাই পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপে স্বপ্নাবস্থায় দূরস্থিত বস্তু ও ব্যক্তি সম্বন্ধী ঘটনা দর্শন-বিষয়ক যে কথা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি তৎসম্বন্ধে আমরা এখানে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

উক্ত দূরদর্শন বা clairvoyance রূপ ব্যাপারটি প্রফেসর ক্রুকস্ প্রমুখ (Professor Crookes) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অন্য সকল মানসিক ক্রিয়া ও অনুভবের ন্যায় জড়বাদ অবলম্বনে মস্তিষ্কের স্নায়ুকম্পন-প্রসূত বলিয়া brain wave theory দ্বারা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত—একজনের চিন্তা আর এক জনের মনে বিনা তারে প্রচরণশীল তড়িৎবার্ত্তার (wireless telegraphy) ন্যায় সংক্রমিত হয়। বাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে উত্তেজিত মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ বিভাগস্থ কোষ সকলের কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভিতরে বিভিন্ন চিন্তাতরঙ্গের উদয় হইয়া থাকে। আবার (ether) বা যে পদার্থ অবলম্বনে আলোকরশ্মি এবং তড়িতকম্পন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রসৃত হয়—জগতের অন্তর্ব্বহিঃ সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং আমাদিগের মস্তিষ্কের কোষগুলির চতুষ্পার্শ্বেও যে ইথার রহিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। অতএব ব্যক্তিবিশেষের মস্তিষ্ক-কোষ-সকলের কম্পন ঐ ইথার সহায়ে সংক্রমিত হইয়া অন্য এক ব্যক্তির

মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে অনুরূপ কম্পনের উদয় করিবে, ইহাতে বৈচিত্র্য কি? সুতরাং বুঝা যাইতেছে, দূরদর্শন শ্রবণাদি ব্যাপারে চিন্তাবিশেষ-প্রেরণকারীর মস্তিষ্কের কোষসকলের কম্পন ইথার সহায়ে চালিত হইয়া যাহার নিকট চিন্তা প্রেরিত হইতেছে তাহার মস্তিষ্কস্থ কোষ-সকলে আঘাত ও সমসমান কম্পন উৎপাদনপূর্ব্বক তাহার মনে অনুরূপ চিন্তা উপস্থিত করিয়া থাকে। ক্রুকস্ প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষি-গণের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাহা বলা যাইতে পারে, তদ্বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা তাঁহাদিগের সংগৃহীত ঘটনাবলীর মধ্যে এক বিষয়ে লক্ষ্য করিতে পাঠককে অনুরোধ করি। পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকগণ দূরদৃষ্টি সম্বন্ধী যে সকল প্রত্যক্ষ ইংলণ্ড এবং পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশে সংগ্রহ করিয়াছেন সেই সকলের আলোচনায় দেখিতে পাওয়া যায়, উহাদিগের অধিকাংশগুলিতেই দূরে অবস্থিত আত্মীয়-বর্গের নিকটে নিজ সংবাদপ্রেরণকারী ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে অচৈতন্য অবস্থায় পতিত থাকিবার কালেই ঐরূপ করিতেছেন। ঐরূপ প্রত্যক্ষ-সকল আমাদিগের দেশেও বিরল নহে। শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় তৎকৃত 'ভাষা ও আদিরস এবং পরবশতা' নামক গ্রন্থে যে ঊনত্রিশটি সফলীকৃত স্বপ্নবিবরণ প্রদান করিয়াছেন তন্মধ্যে নয়টি ঐরূপ দূরদর্শন-শ্রবণাদিমূলক। নিম্নে উদ্ধৃত ঐ কয়টি পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, উহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সংগৃহীত ঘটনাবলীর ন্যায়।

(১) রংপুর জেলার পুলিস অফিসের হেড ক্লার্ক শ্রীমান রজনীকান্ত মৈত্রেয় তাহার পিতৃবিয়োগ সময়ে স্বপ্ন দেখিয়াছিল; এবং পরে সেই স্বপ্ন সত্য বলিয়া জানা গিয়াছিল।

(২) রাজসাহী জেলার জজ কোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন ঘটক স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার পিতা ভিজা গায়ে, ভিজা কাপড়ে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। পিতার আর্দ্র কেশ এবং আর্দ্রবস্ত্র হইতে বিন্দু বিন্দু জল পড়িতেছে; এবং তিনি শীতে পীড়িত হইয়াছেন। এই স্বপ্ন দেখিবার পর মোহিনীমোহনের নিদ্রাভঙ্গ হয়। পরদিন তিনি জানিতে পারিলেন যে তাঁহার পিতা

স্বপ্নদৃষ্ট সময়েই নৌকা ডুবিয়া গোয়ালন্দের নিকট নদী মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিলেন; এবং তখনই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

(৩) শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, জেলা পাবনা, মহকুমা সিরাজগঞ্জের অধীন মেটুয়ানী গ্রামে বাস করেন। এই ব্যক্তি অল্পদিন হইল স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার পৌত্রী আসিয়া বলিতেছে, "দাদা, তুমি আমাকে আনিলে না; আমি একাই আসিলাম।" পৌত্রী নিকটবর্ত্তী কান্সোনা গ্রামে বাস করিত। এই স্বপ্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভাত সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দর্শন করেন। পরে বেলা ৯।১০ টার সময় সংবাদ পাইলেন যে ঐ স্বপ্নদৃষ্ট সময়ে তাঁহার পৌত্রীর মৃত্যু হয়।

(৪) গত ২০শে শ্রাবণ (১৩১৩ জেলা রাজসাহী, ষ্টেশন বড়াইগ্রামের অধীন নগরগ্রাম-নিবাসী জানকীনাথ রক্ষিত রামপুর-বোয়ালিয়াতে শেষরাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার স্বগ্রামবাসী একব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছে, "আপনি এখানে কি করিতেছেন? আপনার কন্যা বাঁচে না।" কন্যা ইন্দুপ্রভা তখন নগরগ্রামে তাঁহার নিজ বাটীতে ছিল। রক্ষিত মহাশয় এই স্বপ্ন দেখিয়া জাগ্রত হন। তারপর দিন বেলা ২ টার সময় টেলিগ্রামে সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে, তাঁহার কন্যা অত্যন্ত কাতর। ঐ টেলিগ্রাম প্রাতে ১০॥০ টার সময় নগরের নিকটবর্ত্তী চাটমোহর আফিসে করা হইয়াছিল। এই স্বপ্নটির সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবেন যে, তৃতীয় ব্যক্তি কন্যার কাতর সংবাদ বলিয়াছিল, কন্যা স্বয়ং বলে নাই এবং কন্যা মৃত্যুমুখেও পতিত হয় নাই।

(৫) ২৪ পরগণার অন্তর্গত বাওয়ালী গ্রামে শ্রীযুক্ত গুরুদাস আদক বাস করেন। তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর। ৭।৮ মাস হইল বাওয়ালিতে একদিন প্রায় শেষ রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন, তাঁহার ঠাকুরমাকে গঙ্গাযাত্রা করান হইতেছে, এবং তিনি কাঁদিতেছেন। ঠাকুরমা তৎকালে ভবানীপুরে চিকিৎসা করাইতেছিলেন। ঐ স্বপ্ন দেখিবার পরদিবস একব্যক্তি আদক মহাশয়কে বলিল, "তোমার

ঠাকুরমা মারা গিয়াছেন।" তাঁহার ঠাকুমার প্রকৃতই সেই রাত্রে মৃত্যু হইয়াছিল।

(৬) রাজসাহীর উকীল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় মাতুলালয়েই প্রতিপালিত। তাঁহার মাতুল তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক রাত্রে স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁহার মাতুলানী বিধবা হইয়াছেন। মাতুলের স্বাস্থ্য সে সময় ভাল ছিল, তাঁহার মৃত্যুর কোন আশঙ্কা ছিল না। পরে দেবেন্দ্রবাবু জানিতে পারিয়াছিলেন যে, যে রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন সেই সময়েই তাঁহার মাতুলের মৃত্যু হইয়াছিল।

(৭) বগুড়ার উকীল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মজুমদার মহাশয়ের পুত্রের নাম যামিনীকান্ত ও পুত্রবধূর নাম কুমুদিনী ছিল। ১৩০৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে যামিনী তাঁহার স্ত্রীকে নিজ বাড়ী ঢাকা জেলাস্থ কোরহাটী গ্রামে আনিলেন। তখন ঐ গ্রামে ওলাউঠা হইতেছিল। কুমুদিনী স্বীয় পতিকে বলিলেন যে, তাঁহাকে "এ সময় আনা হইল, পাছে কি হয়।" এই কথায় বোধ হয় যে কুমুদিনী ওলাউঠার ভয়ে ভীতা হইয়াছিলেন। ইহার দুই তিন দিন পর যামিনী কলিকাতা আসিলেন; তথায় অল্পদিন থাকিবার পর ১৫ই অগ্রহায়ণ রাত্রি প্রভাত হইবার সময় (তখন ৫টা বাজিয়াছিল) যামিনী স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহার স্ত্রীর তলপেটে ব্যথা, হাতে খিঁচুনি (cramp) হইতেছে, এবং তিনি বারম্বার জল খাইতে চাহিতেছেন। যামিনীর তখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি স্বীয় পত্নীর ওলাউঠা হওয়া বিবেচনা করিলেন। স্বপ্নে তিনি কয়েকটী আত্মীয়স্বজনকে কুমুদিনীর শয্যার পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন; এবং কুমুদিনীকেও শয়নাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে (১৬ই অগ্রহায়ণ) তিনি সেই স্বপ্নের কথা আত্মীয়গণকে বলিয়া সেই দিনই বাড়ী রওনা হইলেন; এবং সেই দিনই রাত্রি ৮৷৯ টার সময় বাড়ী পৌছিলেন। তখন দেখেন যে, সত্যই তাঁহার স্ত্রীর পূর্ব্বরাত্রি দুই তিন ঘটিকার সময়, অর্থাৎ স্বপ্ন দেখিবার দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে ওলাউঠা হইয়াছিল। যামিনী স্বপ্নে

যে সকল লক্ষণ দেখিয়াছিলেন, এবং যে ব্যক্তিদিগকে কুমুদিনীর শয্যার পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন, তাহাই প্রকৃতপক্ষে দেখিতে পাইলেন। শেষ রাত্রি (১৬ই অগ্রহায়ণ) প্রায় প্রভাতের সময় কুমুদিনীর মৃত্যু হয়।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিম্নলিখিত স্বপ্ন দুইটী শশধর বাবুর পুস্তকে মুদ্রণের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন—

(৮) আমার খুল্লতাত ৺রুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদের আবাস বাটীতে পীড়িত ছিলেন। আমি সে সময়ে হাজারিবাগ কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের কার্য্য করিতাম। একদিন রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখিলাম যে, খুল্লতাত মহাশয়কে ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনিতেছি—দেহ অসাড়; প্রাতঃকালেই আমি উঠিয়া সেই তারিখটি ও আনুমানিক সময়টি লিখিয়া রাখিলাম। তাহার কয়েকদিন পরেই বাটীর পত্রে জ্ঞাত হইলাম যে, খুল্লতাত মহাশয় ঠিক সেই তারিখেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

(৯) আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ মহাশয় কলিকাতা সেণ্ট্রাল কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক। তিনি বলিয়াছেন যে, যখন আমাদের তৃতীয়া মাসীমাতা ঠাকুরাণীর পরলোকপ্রাপ্তি হয়, তখন তিনি সেই ঘটনার বিষয় স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, একদিন প্রভাতে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে মাসীমা হরিনামের মালা হাতে করিয়া শীর্ণদেহে তাঁহার নিকট বলিতেছেন, "ত্রৈলোক্যনাথ, তোরা খুব সংকীর্ত্তন কর।" দাদা-মহাশয় তৎপর দিবসই বাটী হইতে পত্র পাইলেন যে, ঠিক সেই দিন এবং ঠিক সেই সময়েই মাসীমাতা ঠাকুরাণী দিব্যধামে প্রস্থান করেন।

দূরদর্শন সম্বন্ধী ঐরূপ কয়েকটি ঘটনা বর্ত্তমান লেখকও স্বয়ং সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছে; ঐগুলিও এখানে সন্নিবেশিত হইল।

(১০ একজন ব্যারিষ্টার তাঁহার কলিকাতার বাসাবাড়ীতে জ্বর-বিকাররোগে আক্রান্ত হন; তাঁহার স্ত্রী ও শিশু পুত্র ঐ সময়ে তাঁহার শ্বশুরালয় উলুবেড়িয়াতে ছিল। বিকারাবস্থায় তিনি সহসা বলিতে

লাগিলেন, "একি! আমার ছেলের মুখে রক্ত কেন?" রোগীর নিকটস্থ সকলেই তখন মনে করিল, উহা বিকারের খেয়ালপ্রসূত প্রলাপ বাক্য ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। কিন্তু পরে জানা গিয়াছিল, তাঁহার উলুবেড়িয়াস্থ শ্বশুরালয়ে ঐ কালে এমন একটি ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল যাহা কোনরূপ অচিন্ত্য উপায়ে দর্শন করিয়াই তাঁহার মুখে ঐরূপ বাক্য নির্গত হইয়াছিল। তাঁহার চারি পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশু তাহার সঙ্গীদের সহিত খেলা করিতে করিতে সহসা শূন্যের দিকে চাহিয়া ঐ সময়ে বলিয়াছিল, "একি! আমার বাবা এখানে কেন?" ঐ কথা বলিয়াই সে ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া যায় এবং একটি ইষ্টকের উপর পড়িয়া যাওয়ায় মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কাটিয়া তাহার মুখ রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছিল।

(১১) নিম্নলিখিত বিবরণটি আমার পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাত ৺দ্বারিকা নাথ সরকার রায়বাহাদুর মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম। ইনি নদীয়া জেলার ডিষ্ট্রীক্ট ইন্‌জিনিয়ার ছিলেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর বিয়োগের পরে তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তান সুশীল কুমার আমাদের পরমারাধ্যা পিতামহী ঠাকুরাণীর নিকটে থাকিয়া লালিত পালিত হইত। ১০।১১ বৎসরের সময় সুশীলের মৃত্যু হয়। তখন সে ফরিদপুর জিলার রামদিয়া গ্রামে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের বাসভবনে পিতামহী ঠাকুরাণীর সহিত অবস্থান করিতেছিল। সুশীলের মৃত্যুর দিনে আমার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় উচ্চপদস্থ কোন সাহেব কর্ম্মচারীর সহিত নদীয়া জেলার মফঃস্বলে কোন স্থানে কর্ম্মোপলক্ষে গমনপূর্ব্বক তাম্বু খাটাইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঐ রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন, তাঁহার পুত্র সুশীল মৃত্যুশয্যায় শায়িত রহিয়াছে এবং তাঁহার মৃতা পত্নী বহুপূর্ব্বে পরলোকগত তাঁহার দুইটি সন্তানকে সঙ্গে লইয়া তাহাকে নিজ সমীপে লইয়া যাইবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। অনন্তর প্রভাত হইবামাত্র তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে সাহেবের নিকটে স্বপ্নঘটনার উল্লেখ করিয়া ছুটি চাহলেন। সাহেবও দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ছুটি দিলেন এবং সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, স্বপ্নের ঘটনা কখন

সত্য হয় না ; পত্নী ও পুত্রগণের প্রতি ভালবাসা হইতেই তিনি ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন। উত্তরে জেঠামহাশয় সাহেবকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী ও পুত্রগণ জীবিত থাকিলে এতদিনে যত বড় হইত স্বপ্নে তিনি তাহাদিগকে তত বড় দেখিয়াছেন। এবং কোনরূপ সুস্পষ্ট কারণ দেখাইতে না পারিলেও তাঁহার মনে স্থির বিশ্বাস হইয়াছে, যথার্থই তিনি তাঁহার পরলোকগত পত্নী এবং পুত্র দুইটিকে দেখিতে পাইয়াছেন এবং তাঁহার কণিষ্ঠ সন্তানটি সত্য সত্যই মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। অনন্তর তারযোগে সংবাদ আনয়নপূর্ব্বক তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, সত্যই সুশীল কুমারের ঐ রাত্রে মৃত্যু হইয়াছিল।

(১২) জেঠাইমাতার মৃত্যুর সময়েও জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় স্বপ্নে ঐ বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন। জেঠাইমা ঐ সময়ে তাঁহার পিত্রালয় দুর্ল্লভপুর গ্রামে সূতিকা রোগে ভুগিতেছিলেন। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় ঐকালে এক রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, কোন স্ত্রীলোক বিষম পীড়িতা এইরূপ সংবাদ পাইয়া তাহাকে দেখিতে আসিবার জন্য কেহ তাঁহাকে নৌকায় করিয়া ডাকিতে আসিতেছে। সংবাদ পাইলেই তিনি ঐ সময়ে পীড়িত দরিদ্রদিগের সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান এবং সময়ে সময়ে হোমিও-প্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতেন। কোন দরিদ্রার পীড়া হইয়াছে অনুমান করিয়া তিনি যেন তৎক্ষণাৎ স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তির সহিত নৌকা-রোহণে রোগীকে দেখিতে যাইলেন এবং কোন এক স্থানে পৌঁছিয়া দেখিলেন, এক শীর্ণকায়া রমণী উদারাময়, জ্বর ও পেটের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শয্যাতলে পড়িয়া ছটফট করিতেছে। ঐরূপ দেখিবার পরেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। অনন্তর প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিবামাত্র শুনিলেন, দুর্ল্লভপুর হইতে তাঁহাকে লইতে লোক আসিয়াছে। তিনি বলিতেন, তথায় পৌঁছিয়া তিনি পত্নীকে ঠিক স্বপ্নদৃষ্টা রমণীর ন্যায় উদরাময়, জ্বর ও পেটের বেদনায় আর্ত্ত দেখিয়াছিলেন।

(১৩) আমাদের পরম পূজনীয়া স্বর্গীয়া পিতামহী ঠাকুরাণী "আমার

জীবন"* আখ্যা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার সমসাময়িক কালের উজ্জ্বল চিত্র-সহ নিজ জীবনের অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে তিনি নিজ জীবনের জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় অবস্থাকালে দুরদৃষ্টি শক্তির পরিচায়ক যে কয়েকটি ঘটনা স্বয়ং উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ঘটনাটি আমরা উহা হইতে সংক্ষেপে এখানে প্রদান করিতেছি। আমার মধ্যম জ্যেষ্ঠতাত ৺প্যারিলাল সরকার মহাশয় বহরমপুর কলেজে পঠ-দ্দশায় মৃত্যু মুখে পতিত হইবার কালে আমাদের পিতামহী ঠাকুরাণী রামদিয়া গ্রাম হইতে ঐ ঘটনা স্বপ্নযোগে দর্শন করিয়াছিলেন।

(১৪) নিম্নলিখিত স্বপ্ন বিবরণটি ৺অঘোরনাথ ভাদুড়ী ডাক্তার মহাশয় তাঁহার পিতৃদেব সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ৺বিহারীলাল ভাদুড়ী মহাশয়ের নিকট শুনিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন। "একদা তিনি রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন, কোন এক রোগীর বাটী হইতে একটি লোক তাঁহাকে ডাকিতে আসিল। এবং তিনি ঐ লোকটির দ্বারা আনীত গাড়ীতে সেই রোগীকে দেখিতে যাইলেন। গাড়ী কিয়দ্দূর গমন করিলে রাস্তা হইতে অন্য একজন লোক ডাকিয়া বলিল কাহার গাড়ী যায়, ডাক্তার বাবুর সঙ্গের লোকটি উত্তর দিল, হাঁ। রাস্তায় দণ্ডায়মান লোকটি ঐ কথা শুনিয়া বলিল আর যাইতে হইবে না, রোগীর মৃত্যু হইয়াছে। পিতৃদেব ভাদুড়ী মহাশয় ঐরূপ স্বপ্ন দেখিবার পরে জাগিয়া ঐ বিষয় আমার জননীকে গল্প করিতেছেন এমন সময়ে বাহিরের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় দেখিলেন, স্বপ্নে দৃষ্ট-ব্যক্তির ন্যায় এক ব্যক্তি কোন এক রোগীর বাড়ী হইতে সত্য সত্যই তাঁহাকে লইতে আসিতেছে। অনন্তর বাহিরে আসিয়া তিনি ঐ ব্যক্তিকে নিজ স্বপ্ন বিবরণ বলিয়া তাহার সহিত যাওয়া নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বারম্বার বুঝাইতে লাগিলেন। আগন্তুক লোকটি কিন্তু তাঁহার ঐ কথায় কর্ণপাত না করিয়া বিশেষ উপরোধ করাতে

---

* পুস্তকখানি ৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ 'ইণ্ডিয়ান পাবলিসিং কোং' পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

তাঁহাকে অগত্যা তাহার সঙ্গে গাড়ী চড়িয়া যাইতে হইল এবং ঠিক স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার অনুরূপভাবে রাস্তা হইতে ফিরিয়া আসিতে হইল।"

আসন্নমৃত্যু ব্যক্তিগণের ঐরূপে দূরে চিন্তা প্রেরণাদি কার্য্যকুশলতা এবং তাহাদিগের আত্মীয়বর্গের ঐ বিষয়ে জ্ঞানলাভসম্বন্ধী স্বপ্ন-বৃত্তান্তের বিবরণ আমাদের দেশ হইতেই অনেকগুলি সংগৃহীত হইল। ঐ সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য বিদেশী বিবরণও অপর্য্যাপ্ত বিদ্যমান। পাঠকের তুলনায়-আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া উহাদিগের দুই চারিটি মাত্র নিম্নে প্রদান করা গেল।

(১৫) পুরাকালের বিখ্যাত ল্যাটিন কবি পেট্রার্ক (Petrarch) তাঁহার প্রিয়তম পত্নী লরা (Laura) ইহধাম পরিত্যাগ করিবার পর সেই রজনীতেই পুনরায় তাহাকে স্বপ্নে সন্দর্শন করেন এবং ঐ ঘটনা অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার বিখ্যাত কবিতা মৃত্যুর জয় (Triumph of Death) লিখিয়া যান—একথাপ্রসিদ্ধ আছে।

(১৬) বিখ্যাত লেখক Cicero তাঁহার একখানি পুস্তকে দুইজন আরকেডিয়ান (Arcadians) ভ্রমণকারীর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অদ্ভুত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা দুইজনে একত্র ভ্রমণ করিতে করিতে একস্থলে পৌঁছিয়া কোন কারণে একজন একটি সরাইএ এবং অন্য ব্যক্তি একটি ভদ্র লোকের বাটীতে রাত্রিবাসের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করেন। যিনি ভদ্র লোকের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি ঐ রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন তাঁহার বন্ধু বিশেষ বিপন্ন হইয়া যেন তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করিতেছেন। অনন্তর নিদ্রাভঙ্গ হইলে উহাকে মিথ্যা দুঃস্বপ্ন জ্ঞানে মন হইতে তাড়াইয়া তিনি পুনরায় নিদ্রা যাইতে লাগিলেন, সেবারেও তিনি স্বপ্ন দেখিলেন তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটি যেন তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন, দুষ্টেরা তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার মৃতদেহের উপর একখানি জীর্ণ গোশকট ও জমীর সার চাপা দিয়া অমুক স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছে ; আসিতে বিলম্ব করিলে তাহারা উহা অন্যত্র সরাইয়া ফেলিবে। ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ঐ ব্যাক্তি ঐ বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার

বন্ধুর মৃত দেহ ঐরূপ অবস্থাতেই পাওয়া গিয়াছিল। সিসিরো উক্ত ঘটনা উপলক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন যে, দেবতারা যাহাদিগকে ভালবাসেন তাহাদিগকে স্বপ্ন সহায়ে ঐরূপ অনেক জটিলরহস্য জানাইয়া দেন।

(১৭) ইতিপূর্ব্বে আমরা একজন ব্যারিষ্টারের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার অল্পবয়স্ক শিশুসন্তানকে দেখা দিবার কথা পাঠককে বলিয়াছি। ক্যামাইল ফ্লামেরিওন নামক একজন ফরাসি জ্যোতির্ব্বিদ লিখিত একখানি পুস্তকে* ঠিক ঐরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। একটি বালক খেলা করিতে করিতে ভীত হইয়া সহসা মা মা বলিয়া ডাকিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিল, সে এই মাত্র তাহার মাকে দেখিয়াছে। পরে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল, তাহার মাতা ঐ স্থান হইতে বহুদূরে ঠিক সেই সময়ে ইহধাম পরিত্যাগ করিতে ছিলেন।*

(১৮) সিপাহিযুদ্ধের সময় একজন কাপ্তেনের স্ত্রী স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাঁহার স্বামী বুকে হস্ত দিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহার মুখে দারুণ যন্ত্রণাব্যঞ্জক চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। উহা দেখিয়া উক্ত রমণীর স্থির প্রত্যয় হইল তাঁহার স্বামী হত হইয়াছেন। ১৪ই নভেম্বর তারিখে তিনি ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। উহার কয়েকদিন পরে যুদ্ধের অফিস War Office হইতে সংবাদ প্রকাশিত হইল যে ঐ কাপ্তেন ১৫ই নভেম্বর তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। রমণীর স্বপ্নের তারিখের সহিত যুদ্ধের অফিস হইতে প্রকাশিত কাপ্তেনের মৃত্যুর তারিখ বিভিন্ন হওয়ায়, পরে ঐবিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধানপূর্ব্বক জানা গিয়াছিল যুদ্ধের অফিসেরই ঐবিষয় প্রকাশে ভ্রম হইয়াছে।

ভারত ও তদেতর দেশসমূহে সংগ্রহপূর্ব্বক দূরদর্শন শ্রবণাদি বিষয়ে যে সকল বিবরণ প্রদান করা হইল তাহা হইতে আমরা

* "The Unknown, by Camille Flammarion—published by Harper & Brothers. (Page 124.)

ইতিপূর্ব্বে যে কথা পাঠককে বলিয়া আসিয়াছি তাহাই প্রতীয়মান হয়; যে—মরণোন্মুখ বা সদ্যোমৃতগণের উৎকট চিন্তা সকল যেন আকার ধারণপূর্ব্বক অপরের বোধগম্য হয়। ঐরূপ হইবার কারণ ও প্রণালী সম্বন্ধে জড়বিজ্ঞান, ইথার নামক সূক্ষ্ম পদার্থসহায়ে মস্তিষ্কের স্নায়ুকম্পনের প্রসার ও অন্য ব্যক্তির মস্তিষ্কে আঘাতপূর্ব্বক অনুরূপ চিন্তা ও চিত্রপরম্পরার উদয় করিবার ক্ষমতারূপ যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন—তাহাও আমরা পাঠকের গোচরে ইতিপূর্ব্বে উপস্থিত করিয়াছি। কোন কোন জড়বাদী পণ্ডিত পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা অসঙ্গত বোধে ঐরূপ ঘটনা সকলের অন্যরূপ কারণ নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন—অশরীরী আত্মাসকল ভাব বিনিময়ের নিমিত্ত আমাদিগের ন্যায় স্থূল ইন্দ্রিয় ও বাগ্‌যন্ত্রাদির ব্যবহার করিতে কখনই সমর্থ নহেন। কারণ, তাহাদের স্থূল শরীর নাই। সেইহেতু তাহাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুকম্পন অন্য মস্তিষ্কের অনুভূতিগম্য কখনই হইতে পারে না। সুতরাং, ভাব বিনিময়ের নিমিত্ত তাহাদের আমাদিগের অপরিচিত কোন প্রকার সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় থাকাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় এবং আমরা যে তাহাদিগের মনের চিন্তা বা ভাববিশেষ দূরদৃষ্টি ঘটিত স্বপ্নসহায়ে কখন কখন বুঝিতে সমর্থ হই তাহাতে আমাদের অভ্যন্তরেও বর্ত্তমান বিজ্ঞানের অজ্ঞাত ঐ প্রকার ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব—স্পষ্ট অনুমতি হয়। একটি দৃষ্টান্তদ্বারা ঐ বিষয়টি বিশেষরূপে বুঝা যাইতে পারে।

জন্মগ্রহণকাল হইতে মানবশিশুর মুখের ভিতর দুধের দাঁত ও স্থায়ী দাঁত উভয় প্রকার দন্তের বীজই নিহিত থাকে। কিন্তু এমন কোন শরীর ব্যবচ্ছেদকের অস্তিত্ব যদি কল্পনা করা যায়, যিনি শিশু পরে সদন্ত হইবে, একথা একেবারেই জ্ঞাত নহেন, তাহা হইলে তিনি দন্তবিহীন উক্ত শিশুর মাড়ী ব্যবচ্ছেদপূর্ব্বক উহার ভিতর দন্তের বীজ আবিষ্কার করিলেও উহার সার্থকতা কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। সেইরূপ মৃত্যুর পরের অবস্থা আমরা কিছুই জানিনা বলিয়া দূরদৃষ্টিসূচক স্বপ্ন সকলের সার্থকতা কিছুমাত্র বুঝিতে পারি না। তত্রাচ ঐরূপ দূরদৃষ্টিঘটিত স্বপ্নসকলের অস্তিত্ব হইতে স্পষ্ট অনুমিত হয়,

মানবের মধ্যে এমন একটি ইন্দ্রিয় বীজভাবে নিহিত রহিয়াছে যাহা মৃত্যুর পরবর্ত্তী কালে বিকাশলাভপূর্ব্বক তাহার তাৎকালিক অবস্থার কার্য্যসাধনের উপযোগী হইয়া থাকে।

সত্য বা মিথ্যা যাহাই হউক না কেন, শেষোক্ত মীমাংসা যে পূর্ব্বোক্ত মস্তিষ্ককোষ-কম্পন-সিদ্ধান্ত অপেক্ষা অনেক ভাল তাহা বলিতে হইবে না। মস্তিষ্কের কোষসকলের কম্পন হইতে ইথারের (ether) মধ্যে কম্পনসৃষ্ট হইয়া, অন্য মস্তিষ্কে অনুরূপ কম্পন উৎপাদনপূর্ব্বক সংবাদ বহন করিবার সিদ্ধান্ত যদি সত্য হইত, তাহা হইলে মৃত্যুর আগমনে মানবমস্তিষ্কের কোষ সকল যখন নিস্তেজ হইয়া পড়ে তখনই অধিকাংশ ঐরূপ সংবাদ প্রেরিত হইত না। উপসংহারে বক্তব্য, দূরদর্শনশ্রবণাদি-মূলক স্বপ্ন বিবরণসকলের যাথার্থ্য নিরূপণ করিতে যাইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঈদৃশ জটিল ও রহস্যময় সত্য ঘটনাসমূহের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, জড়বাদাবলম্বনে ঐ বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রায় ভিত্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আমরা পাঠককে উহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

দীনের প্রার্থনা।

(স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ)

এ আর্ত্তের চির ক্রন্দন
এ দীনের শত বন্ধন
আজি ঘুচাও হে প্রভু ঘুচাও হে

এ হতাশের শত লাঞ্ছনা
এ অনাথের চির গঞ্জনা
আজি দূরে লহ, সব ভুলাও হে।

এ বৃশ্চিক শত দংশন
এ দাবানল সম বেদন
সবি ঘুচায়ে দাও জীবন

পুণ্য পরশ আশে তোমার
অনুখন অনুমগন
কর, দেব হে নিরঞ্জন।

ভারতীয় শিক্ষা।

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

"In speaking of the Sages of India, my mind goes back to those periods of which history has no record, and tradition tries in vain to bring the secrets out of the gloom of the past.

"Like the gentle dew that falls unseen and unheard, and yet brings into blossom the fairest of roses, so has been the contribution of India to the thought of the world. Silent unperceived, yet omnipotent in its effect, it has revolutionised the thought of the world, yet no body knows when it did so".

— *Vivekananda.*

ভারতীয় ও গ্রীকদার্শনিকগণের মতবাদের ঐক্য আমরা পূর্ব্ব-প্রবন্ধে দেখিয়াছি। গ্রীকদার্শনিকগণ দ্বারা উপনীত বিশ্বকারণ, বিশ্ব-সৃজন, প্রলয়, অদৃষ্ট, জড়ের নিত্যতা ও উহার সহিত মনের সম্বন্ধ, পরমাণুবাদ, ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য, ঈশ্বর জীব ও জগতের কারণ, জীবের

পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্তি, গৌতম ও এরিষ্টটলের মতের সাদৃশ্য, লিউক্রিশিয়সের 'অবস্তু হইতে বস্তুর উৎপত্তি হয় না' এই মতটির সাংখ্য মতের সহিত ঐক্য, ইলিয়েটিক সম্প্রদায়ের ঈশ্বরই জগৎ ও জগৎই ঈশ্বর এই বেদান্ত মত, স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর, জীবের সূক্ষ্ম শরীর লইয়া আপন আপন অজ্ঞান ও অধর্ম্মের তারতম্যানুসারে পশু পক্ষী, মৎস্যাদিযোনি ভ্রমণ, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, পরমাত্মা সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বব্যাপী, দেহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া দেবস্বরূপত্ব প্রাপ্তি, গুপ্ত মন্ত্রে দীক্ষা, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন, আমিষ ভক্ষণে অশ্রদ্ধা, বৃথা মাংস ভোজনের অবৈধ্যত্ব, শিষ্যদের প্রতি বৃক্ষাদি ছেদন ও তাহাতে আঘাত প্রতিষেধ, ওসেলস নামক গ্রীকপণ্ডিতের ভূলোক, স্বর্গলোক ও অন্তরীক্ষ অর্থাৎ ভূর্ভুবঃস্বঃ প্রভৃতি বেদোক্ত বিশ্বের বিভাগ দেখিয়া উইলসনের ভাষায় বলিতে হয় যে হিন্দুদিগের গ্রীকদিগের নিকট হইতে কোন দার্শনিক আদর্শবিশেষ গ্রহণ করা একরূপ অসম্ভব বলা যাইতে পারে বরং গ্রীকদিগের হিন্দুদিগের নিকট হইতে ঐ সকল আদর্শ গ্রহণ অনেকটা সম্ভবপর।

কোলব্রুকও বলিয়াছেন, "এই বিষয়ে হিন্দুগণ ছাত্রের পরিবর্ত্তে শিক্ষকেরই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন"।

কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়া থাকেন, গ্রীকেরা ঐ সকল মতবাদ মিশর এবং কালদে (Chaldaea) বা বাবিলি হইতে প্রাপ্ত হন। তাঁহারা বলেন গ্রীকদার্শনিকদের শিক্ষালাভের জন্য পূর্ব্বদেশে আগমনের কথা যাহা শুনা যায় তাহা এই কালদে ও মিশরে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলেও গ্রীক শিক্ষা যে ভারতীয় শিক্ষার অনুকরণ মাত্র তাহাও দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারা যায়। কারণ, মিশর এবং কালদের ইতিহাস আলোচনার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে তদ্দেশীয় সভ্যতা ও শিক্ষা ভারতীয় জ্ঞানরাশির কলামাত্র অনুকরণের ফলস্বরূপ। প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা ও দেশ বিদেশ ভ্রমণের ফলে কত যে ইতিবৃত্তের সত্যসমূহ প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ইহার ফলে পৃথিবীর সমগ্র জাতি ধীরে ধীরে যেন একতা সূত্রে গ্রথিত হইয়া

পড়িতেছে—মানবের আদিপুরুষেরা একই দেশে বাস করিতেন, একই ভাষা বলিতেন এবং একই ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন এই সত্য বিধাতা এতদ্দিন ভূগর্ভে, পর্ব্বত গাত্রে, শিলাফলকে ও প্রস্তর ভবনে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। আমাদিগকে ঐ সকল বিষয় জানিতে উৎসুক দেখিয়া যেন তিনি সময় বুঝিয়া ঐ অসংখ্য রত্নমালার সুদৃঢ় পেটিকা আজ মানব সমক্ষে খুলিয়া ধরিয়াছেন। উক্ত কারণে বিশ্বপ্রেমমূলক যে ভাবসমূহ জগতে প্রচারিত হইতেছে তাহা দেখিয়া আজ মানব বিস্মিত। বর্ণ ও ধর্ম্মের বিভিন্নতা ভুলিয়া স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় মানব পরস্পরের মুখের প্রতি চাহিয়া মনে করিতেছে যেন 'ইহাকে কোথায় দেখিয়াছি, ইহাকে আমি খুব জানি, ইনি আমার খুব আপনার।' অতঃপর আমরা মিশর যে ভারতবাসীর নিকট অপরিচিত ছিল না তাহা পণ্ডিতগণের উক্তি ও গবেষণার উল্লেখ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব।

যখন মিশরের সহিত ফরাসির যুদ্ধ বাধে তখন একদল ভারতীয় সিপাহী লোহিত সাগর উত্তীর্ণ হইয়া নীল (Nile) নদীর ধারে যায়। সেখানে দেনদেরার (Dendera) মন্দিরে আথরের (Athor) প্রস্তরনির্ম্মিত গাভী দেখিয়া সিপাহীরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে।* মিশর-বাসী ও ভারতবাসীদিগের মধ্যে গাভীপূজার সাদৃশ্য দেখিয়া অনেক ফরাসী পণ্ডিত এবং ইংরাজ ঐতিহাসিক স্থির করেন মিশর এবং ভারতের আদিপুরুষেরা এক স্থানেই বাস করিতেন এবং তাহাদের সভ্যতার উৎপত্তিস্থান এক। কিন্তু ডাক্তার ফারগুসন ইজিপ্টের স্থাপত্য নিদর্শনের পার্শ্বে ভারতীয় কিঞ্চিৎ আধুনিক অজান্তা, ইলোরা প্রভৃতি স্থাপত্য নিদর্শন ধরিয়া শেষোক্তটি অত্যন্ত আধুনিক, অতি পুরাতন মিশরীয় স্থপতিবিদ্যার সহিত উহার তুলনা করা যাইতে পারে না বলিয়াছেন। এবং আরও বলিয়াছেন, ভারতে বৌদ্ধযুগের বা তৎপরবর্ত্তী যুগের স্থপতিবিদ্যার নিদর্শন ছাড়া তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যুগের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। উক্ত কারণে তিনি বলেন, ভারতে

* Ruins of Sacred and Historical Land.

স্থপতি-বিদ্যার অনুশীলন মিশরের বহু পরে আরম্ভ হয়। তিনি উহা বলিতে পারেন কিন্তু জগতের ইতিহাসের এই সত্য এই পৃষ্ঠায় না থাক অপর পৃষ্ঠায় আছে এবং তাঁহার জানা উচিত বৌদ্ধযুগের যে অদ্ভুত স্থপতিবিদ্যা তাহা এক দিনের অনুশীলনের ফলে হয় নাই। স্থপতিবিদ্যার বিশেষ অনুশীলন যে ঋগ্বেদের সময় হইতেই ছিল তাহারও প্রমাণ উহার বহু পৃষ্ঠায় পাওয়া যায় যেমন লৌহ নগর (৭ম, ৩, ৭; ৭ম, ১৫, ১৪ ; ৭ম, ৯১, ১ ইত্যাদি), শত প্রস্তর নির্ম্মিত নগর (৭ম, ৩০, ২০), সহস্র স্তম্ভযুক্ত প্রাসাদ (২য়, ৪১, ৫ ; ৫ম, ৬২, ৬ ইত্যাদি)। ইহা হইতেই বেশ বোধগম্য হয় যে স্থপতি-বিদ্যার অনুশীলন যে ভারতে কেবল বৌদ্ধযুগে বা তৎপরবর্ত্তী যুগেই হইয়াছিল তাহা নহে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যুগেও ইহার অনুশীলন হইত। কিন্তু কালের করাল প্রকোপে অদ্য তাহার নিদর্শন নাই। আর ভূগর্ভ খননকার্য্য অন্যান্য দেশে যেমন দৃঢ়তার সহিত চলিয়াছিল সেরূপ এদেশে হয় নাই। এদেশের প্রত্নতত্ত্বের গতি—অত্যন্ত পরিশ্রম ও ব্যয় সাপেক্ষ বলিয়া—অতি মন্থর, কারণ এদেশের অধিবাসী অত্যন্ত গরীব। পুরাণোক্ত স্থানগুলিতে যদি অনুসন্ধান করা যায় তাহা হইলে তথা হইতে বহু সত্য বাহির হইতে পারে ইহা ধ্রুব সত্য ঐ সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও সমসাময়িক মিশর না হয় ভারত অপেক্ষা স্থপতিবিদ্যায় অধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল কিন্তু তাহা হইলেও গাভী পূজারূপ আদর্শ সকলের বিনিময় পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা কিরূপে নিরাকৃত হয় তাহা বুঝিয়া উঠা অসম্ভব।

কারল্ হেকেল (Karl Heckel) বলেন ইজিপ্টের ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি যতই আলোচনা করিতেছেন ততই তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে যে নানা যোনি-ভ্রমণ (Metemphychosis) প্রভৃতি মত-বাদ, অসিরিস শিক্ষা (Osiris teachings) হইতে মিশরবাসীরা প্রাপ্ত হয় নাই, ইহা সম্পূর্ণ হিন্দুমতবাদ ; তাহারা হিন্দুদের নিকট হইতেই ইহা শিক্ষা করিয়াছিল।

অতঃপর আমরা কতকগুলি ভৌগলিকতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বার্লিনের বিখ্যাত মিশরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত (Egyptologist) ডাক্তার আডল্‌ফ আরম্যান (Dr. Adolf Erman) বলেন যে মিশরবাসীদের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, একটি এসিয়া অপরটি নীল নদীর উচ্চতর তটভূমি।* হিরেন (Heeren) অতি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন যে মিশর এবং ভারতবাসী নানা জাতির কপালের (Skull) সাদৃশ্য অতি নিকট। তিনি আরও বলেন, মিশরের অতি দূর ক্ষীণতম প্রবাদ হইতে জানিতে পারা যায়, পাণ্ট (Punt) দেবতাদিগের আদি নিবাস। পাণ্ট হইতে আমেণ (Amen), হোরাস (Horus) এবং হাথরের (Hathor) নেতৃত্বে দেবতারা নীল নদীর ধারে আগমন করেন। লোহিত সাগরের (Red Sea) জলরাশি পাণ্ট পর্য্যন্ত যে সকল তটভূমি ধৌত করে তাহাকে দেবভূমি (Yaneter) বলা হয়। * * * এই কথা বলিয়া ইনি স্থির করিয়াছেন পাণ্ট সোমালিল্যাণ্ড (Somaliland) হওয়াই সম্ভব। বর্ত্তমানে যাহাকে লোহিতসাগর (Red Sea) বলে হিন্দুরা তাহাকে শঙ্খোদধি বলিতেন এবং লোহিত সাগর বা অরুণোদধি বলিতেন আরবসাগরকে (Arabian Sea) †।

"স্কন্দ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উল্লিখিত আছে, কুটিলকেশগণ ভারত হইতে শঙ্খদ্বীপে গমন করেন। ইহারা পুরাকালে কপিলাশ্রমের সন্নিকটে সাগর সঙ্গমে (অর্থাৎ আধুনিক বঙ্গদেশে) বাস করিতেন। যজ্ঞপূত অশ্বের অনুসন্ধানে কপিলের আশ্রমে গমনকালে কুটিলকেশগণ সগরের সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল এবং সগরবংশ ধ্বংসের পর তাহারা শঙ্খদ্বীপে যাইয়া বাস করে। তথায় দেবনহুষের (Dionysus) সহিত যুদ্ধে পরাভূত ও কালীতট হইতে বিতাড়িত হইয়া তাহারা শঙ্খদ্বীপের অন্তর্ভাগে (Somaliland) পলায়ন করে, এবং তথায় বাস করিতে থাকে। এই দেবনহুষই Dionysus ও কুটিল কেশগণই Gaituli জাতি। Africa শঙ্খদ্বীপ ও Nile-ই কালী নদী।

*Historians History of the World

† প্রবাসী—ভাদ্র ১৩২২—নীল নদীর উৎপত্তিস্থানের হিন্দুমানচিত্র দেখুন।

ইহার প্রমাণ মিশরীয় কবি Nounus (412 A. D. author of the Dionysiaca—History of Bacchaus or Dionysus) ও বিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত Philostratus। Philostratus (190 A. D.) তাঁহার ভারত ভ্রমণকালে ব্রাহ্মণপ্রধান যাক্ষের (Iarchas) নিকট শ্রবণ করেন, They resided, formerly in the country under the dominion of a king named Ganges (গাঙ্গেয়); during whose reign the gods took particular care of them.........but having slain their King, they were considered by other Indians as defiled and abominable... ... .Their soverign, a son of the River Ganges (গাঙ্গেয়) was near ten cubits high and a most majestic personage, that ever appeared in the form of man: under him they left India and migrated to Sanchadwip."*†

হিন্দুর ভূগোল লইয়া কেহ আলোচনা করেন না। পুরাণের মধ্যে হিন্দু সভ্যতার কত গুপ্ত রহস্য যে লুকাইত রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা নিজেরা চেষ্টা না করিলেও বিদেশীয় পণ্ডিতদের চেষ্টায় এবং নানা দেশীয় পরিব্রাজকদের ডাইরী হইতে বহু সত্য বাহির হইয়া পড়িতেছে। ভিনিষের বিখ্যাত পর্য্যটক মার্কোপোলো (Marco Polo) স্থল ও জলপথে প্রায় সমগ্র আসিয়া মহাদেশ ভ্রমণ করেন। তিনি সমগ্র ভারতকে দুইভাগে

---

* তাহারা (কুটিলকেশগণ) রাজা গাঙ্গেয়র রাজত্বে বাস করিত। গাঙ্গেয়র রাজত্বকালে দেবতাগণ তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ ছিলেন। * * * কিন্তু তাহারা নিজেদের রাজাকে হত্যা করার জন্য অন্যান্য ভারতবাসী তাহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণিত এবং পাপী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাহাদের রাজা গাঙ্গেয় পুত্র দীর্ঘে প্রায় ১০ দশ হস্ত পরিমিত ছিলেন এবং তাহার ন্যায় সুপুরুষ এবং ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তি আর কখনও দেখা যাইবে কিনা সন্দেহ। তাঁহারই অধিনায়কত্বে তাহারা ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া শঙ্খদ্বীপে গমনপূর্ব্বক বসবাস করে।

† (ভারতবর্ষ—বৈশাখ—১৩২৪—৭১০ পৃঃ)।

বিভক্ত করেন ; বৃহৎ ভারত (Greater India) ও ক্ষুদ্র ভারত (Lesser India)। খাস ভারতকেই ইনি বৃহৎ ভারত বলিয়াছেন এবং ভারতের বহির্দ্দেশ সকলকে তিনি ক্ষুদ্র ভারত আখ্যা দিয়াছেন। হাবসিদেশকে (Abyssinia) মধ্য ভারত বলিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক হইতে বোধ হয় যে ভারতবর্ষ বলিতে মাদাগাসকার (Madagascar) হইতে বলী, সুমাত্র দ্বীপ, এবং উত্তর পশ্চিমে চিনের ইডনান প্রদেশও ইহার অন্তর্গত ছিল। মার্কোপোলো যে ভারত বহির্দ্দেশ সকলকে ক্ষুদ্র ভারত আখ্যা দিয়াছেন তাহার কারণ বোধ হয় উহারা বাণিজ্য, দর্শন বিজ্ঞানাদি শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে ভারতের অধীন ছিল।

নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে মিশরদেশ যে পুরকালে ভারতবাসীর নিকট পরিচিত ছিল তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। "তৎপরে পুরাণ হইতে নীল নদীর নিম্নোক্ত প্রকার বর্ণনা সংগৃহীত হইয়াছে। পবিত্রসলিলা কালী বা কৃষ্ণা নদী (অথবা নীলা) অমর হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই অমর হ্রদ অজগর ও শীতান্ত পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী শর্ম্মস্থান নামক দেশে অবস্থিত। অজগর ও শীতান্ত সোমগিরি নামক পর্ব্বতের অংশ। সোমগিরির চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানকে চন্দ্রস্থান (Moon land) আধুনিক Somaliland বলে। কৃষ্ণানদী বর্ব্বর দেশের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া তপস্যারণ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং তৎপরে কুশদ্বীপস্থ মিশ্রদেশের মধ্য দিয়া শঙ্খঅব্দি বা শঙ্খসাগরে পতিত হইতেছে। হিন্দু ভৌগোলিকের মতে পৃথিবীর সুমেরু ও কুমেরু নামক দুই প্রধান বিভাগ—সুমেরু বর্ত্তমান সমরকন্দ। ইহা আবার নানা দ্বীপ ও উপদ্বীপে বিভক্ত। পুরাতন ভূগোলে দেশের বিবরণের মধ্যে নদী, হ্রদ, পর্ব্বতাদির নাম এবং জলবায়ু ও ফল ফুল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত কথা লিখিত আছে। এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া উইলফোর্ড বলেন নানা প্রকার প্রমাণ ও পুরাণোক্ত বিবরণের সাহায্যে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে "কুশদ্বীপ" নীল নদীর মোহানা এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বসীমা হইতে ভারতবর্ষের প্রান্তস্থিত সিরহিন্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আবার

হিন্দুরা যে স্থানকে কুশদ্বীপের প্রান্তভাগ বলিয়া অভিহিত করিতেন সেই স্থানের বর্ণনা পাঠ করিয়া উইলফোর্ড বর্ত্তমান আবিসিনিয়া ও ইথিওপিয়াই সেই স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এক্ষণে পুরাণোক্ত এই বর্ণনা যে প্রকৃত নীল নদীরই তাহা প্রমাণের সাহায্যে দেখান যাইতেছে।—

১। কালী বা কৃষ্ণা এবং নীল নদী একই ; কারণ শৈবরত্নাকর নামক গ্রন্থের একটি গল্পে বর্ব্বর দেশ ও অর্ব্বস্থান (আরব) প্রভৃতির সহিত নীলা নদীর নামোল্লেখ আছে। কালী বা কৃষ্ণা বর্ব্বরদেশ ও মিশ্রদেশ দিয়া প্রবাহিতা। সুতরাং কৃষ্ণা বা নীলা একই নদী।

২। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে "মিশ্র" ইজিপ্টেরই বহু পুরাতন নাম। মিশ্রদেশের প্রস্তুত মিষ্টান্নের নাম মিশ্রী বা মিছরী, এবং মিশ্র দেশের আধুনিক নাম মিশর। ইজিপ্ট দেশের লেখমালা হইতে জানিতে পারা যায় যে ঐ দেশেরই এক সম্প্রদায় লোক বর্ব্বর নামে অভিহিত হইত। সেই দেশকে এখনো বর্ব্বর বলে। "কুশ" আবিসিনিয়ার প্রাচীন নাম। সুতরাং বর্ত্তমান ভূগোলের ইজিপ্ট দিয়া প্রবাহিতা নীল নদী পুরাতন ভূগোলের মিশ্র বা বর্ব্বর দেশ দিয়া প্রবাহিতা কৃষ্ণা বা নীলা একই নদী। ভাষাতত্ত্বের প্রমাণের দ্বারা উইলফোর্ডের কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়।

৩। পুরাণ ঐ সকল দেশের লোককে "কুটিলকেশ", "শ্যামমুখ" বর্ব্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে এইরূপ আকৃতির লোকেই এখনও ঐ দেশে বাস করে। আবিসিনিয়ার লোকেরা পরবর্ত্তীকালে হাবসী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

১৮৬২ খৃঃ স্পিক (Speak) নীলনদীর উৎপত্তি স্থান পুনরাবিষ্কার করেন। স্পিকের আবিষ্কার বিবরণ হইতেই আমরা উইলফোর্ডের কথার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ প্রাপ্ত হই। শুদ্ধ তাহাই নহে, কেবলমাত্র হিন্দুরাই যে নীলনদীর উৎপত্তি স্থান আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন স্পিকের কথায় তাহাও স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

৪। নীল নদীর উৎপত্তি স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া

শঙ্খসাগরসঙ্গম (Mediterranean Sea) পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের পুরাণে যেরূপ বর্ণনা আছে, উইলফোর্ড নিজ প্রবন্ধে তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং সেই বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া তিনি নীল নদীর ও তন্নিকটস্থ দেশের একখানি মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। নদীর এই বিস্তৃত বিবরণ ও মানচিত্রখানি ১৮৬০ খৃঃ স্পিকের নিজের নিকট ছিল। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন নীল নদী ও সোমগিরির (Mountains of the Moon) মানচিত্র সম্বলিত একটি প্রবন্ধ আমি কর্ণেল রিগবির নিকট প্রাপ্ত হই। হিন্দুদিগের পুরাণ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া লেফ্‌টেনেণ্ট উইলফোর্ড এই প্রবন্ধটি রচনা করিয়াছিলেন। হিন্দুরাই নীল নদীর উৎপত্তি স্থানকে অমর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়া নিয়াঞ্জা নামক উত্তর-পূর্ব্ব দিকস্থ দেশ আজও অমর নামে অভিহিত হয়।

উইলফোর্ডের বিবরণ অনুসারে স্পিক সোমগিরির (আধুনিক ইংরাজী নাম Mountains of the Moon) নিকট উপস্থিত হইয়া একটি হ্রদের অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। নীল নদী ঐ হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। স্পিক ঐ অমর হ্রদ আবিষ্কার করিয়া অমর হইয়াছেন। তিনি ঐ হ্রদের নাম মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে ভিক্টোরিয়া নিয়াঞ্জা রাখিয়াছিলেন, এবং ঐ হ্রদ এখন নূতন আবিষ্কারকের প্রদত্ত আধুনিক নামেই সমধিক পরিচিত হইতেছে। ঐ হ্রদের সন্নিকটস্থ স্থান কিন্তু আজিও হিন্দুদের প্রদত্ত অমর নামেই অভিহিত হয়। তথাকার অধিবাসীবৃন্দ আজও সোমগিরিকে দেশীয় ভাষায় সোমগিরি নামেই অভিহিত করিয়া থাকে।" *

শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে লিখিয়াছেন, "পূর্ব্বকালে লিঙ্গ উপাসনা কেবল ভারতবর্ষের মধ্যে বদ্ধ ছিল না। এখনকার প্রায় অষ্টাদশ শত ক্রোশ পশ্চিমে মিশর দেশে অসীরিস নামক প্রধান দেবের লিঙ্গপূজা বাহুল্যরূপে প্রচলিত ছিল। এই অসীরিস ও তদীয়-ভার্য্যা আইসীস দেবীর

* প্রবাসী—ভাদ্র ১৩২২।

সহিত শিব ও শক্তির বিবিধ বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়। ভগবতী যেমন বিশ্বরূপা, আইসীস দেবীও সেইরূপ পৃথিবীরূপা। তন্ত্রোক্ত শক্তি-যন্ত্র যেমন ত্রিকোণাকৃতি, সেইরূপ ত্রিকোণ যন্ত্র আইসীস দেবীরও পরিচায়ক ছিল। শিব যেমন সংহার কর্ত্তা, অসীরিস সেইরূপ প্রাণ সংহারক যমস্বরূপ। শিবের বাহন বৃষ যেমন পূজনীয়, অসীরিস দেবের এপিস্ নামক বৃষও তাঁহার অংশ স্বরূপ বলিয়া পূজিত হইত। এইরূপ একটি উপাখ্যান আছে যে বেকস দেব ভারতবর্ষ হইতে দুইটি বৃষকে মিশর দেশে লইয়া যান, তাহারই একটির নাম এপিস। শিব ও অসীরিস উভয় দেবতারই শিরোভূষণ সর্প। শিবের হস্তে যেমন ত্রিশূল অসীরিস দেবের হস্তে সেইরূপ একটি দণ্ড দেখা যায়। মিশর দেশের অসীরিস দেবের অনেক পাষাণময় প্রতিমূর্ত্তিতে শিব পরিহিত ব্যাঘ্র-চর্ম্মের প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায় (উইলকিনসের "ইজিপ্টের প্রচীন অধিবাসী" নামক ইতিহাসের ৩৩ সংখ্যক ছবি)। অসীরিসের একটি প্রিয় বৃক্ষ - ছিল তাহার পত্র শিবপ্রিয় বিল্বপত্রের মত ত্রিভাগে বিভক্ত। কাশীধাম মহাদেবের যেমন প্রধান তীর্থ, মেম্ফিস (Memphis) নগর সেইরূপ অসীরিস দেবের মাহাত্ম্যভূমি বলিয়া পরিগণিত ছিল। দুগ্ধ দিয়া যেমন শিবের অভিষেক করা হয়, ফিলি দ্বীপে অসীরিস দেবের পীঠ স্থানে সেইরূপ প্রতিদিন ৩৬০ পাত্র দুগ্ধ অর্পণ করা হইত। মহাদেবের সহিত অসীরিস দেবের বিভিন্নতা এই যে শিব শ্বেতবর্ণ অসীরিস কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু মহাকাল নামক শিব বিশেষেরও মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ। মিশরদেশের স্থানে স্থানে "তও" এইরূপ একটি মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা এই দেশীয় যোনিলিঙ্গের প্রতিরূপ। ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রকারেরা যেমন শিবলিঙ্গকে শিবের সৃজনীশক্তির বিজ্ঞাপক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, মিশরদেশীয় ইতিহাসবিৎ পণ্ডিতেরা অসীরিস দেবের লিঙ্গ পূজার বিষয়েও অবিকল সেইরূপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন।"*

* Plutarch's Irsis and Isis.

গ্রীসদেশেও লিঙ্গ উপাসনার খুব প্রচলন ছিল। পথে পথে মন্দিরে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল, খুব উৎসবও চলিত ফেলিফেরিয়া নামক বেকস দেবের একটি মহোৎসবও প্রচলিত ছিল। *

রোমক জাতীয়দের মধ্যেও এই উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়।†

মিশরদেশীয় সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টানেরা লিঙ্গমূর্ত্তির ন্যায় পূর্ব্ববর্ণিত "তও" ধারণ করিতেন। খৃষ্টানদের বহু সমাধিমন্দিরে সেই "তও" মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।‡

মূর তাঁহার ওরিয়্যাণ্টল ফ্রাগ্‌মেণ্ট নামক গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন, খৃষ্টধর্ম্ম-স্বীকৃত দেশসমূহের মধ্যে একটি অতি প্রাচীন পূজাপদ্ধতির যে শেষাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়—উহাকে ফেলিক, লিঙ্গাইক বা আওনিক যিনি যে নামই দিন না কেন—তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্র এবং বিশদ আলোচনা করা অতি প্রয়োজন। আমি কোন উপাদান বিশেষ হইতে—যাহার আমি উল্লেখ করিতে চাহি না—ঐরূপ একটি পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছি। উহাতে আমার নিজস্ব মন্তব্যগুলিতে ঐ উপাসনা পদ্ধতির সহিত হিন্দুদিগের পূজার সাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

হর গৌরীর উপাসনা শুধু এখানে আবদ্ধ ছিল না। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় স্কন্ধনাভিয়াবাসী জিৎ জাতির মধ্যে শৈবীরাই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। আর্থ (পৃথিবী) ও ঈশীশ ইহাদিগের আরাধ্য দেবতা। পূর্ব্বে ইহাদিগের মধ্যে নরবলি দানের প্রথা প্রচলিত ছিল; আরাধ্যদেবী পৃথিবীর সম্মুখে নরবলি দান করা হইত। ঈশা শব্দে গৌরী এবং ঈশ শব্দে শিব বুঝায়; সুতরাং ঈশীশ শব্দে হরগৌরী বুঝায়। আমরা যেমন হরগৌরীর পূজা করি, জিৎ জাতিরাও

* (G. A. St. John's History of the manners and customs of ancient Greece Vol. I. P. 411.)

† (Tod's Rajasthan Vol. I. P. 599)

‡ Wilkinson's History of the ancient inhabitants of Egypt Vol. II. P 283.)

সেইরূপ ভক্তি সহকারে ঈশীশের আরাধনা করে। আর্ষের রথের বাহান একটি গাভী, শৈবীগণের ধর্ম্ম গ্রন্থে এ কথারও উল্লেখ আছে। হিন্দু শাস্ত্রে গোশব্দে পৃথিবী বা পৃথিবীর প্রতিমূর্ত্তি বুঝায়। সময়ে সময়ে নানা কারণে পৃথিবী গো-রূপ ধারণ করিতেন, পুরাণে ইহাও বর্ণিত আছে। * * * হিন্দুর দেব সেনানী কার্ত্তিকেয়র ন্যায় শক সেনানী বা রণদেবও ষড়ানন বলিয়া অভিহিত হয়। (রাজস্থান—রাজপুত জাতির ইতিবৃত্ত, বসুমতী এডিসন—পৃঃ ৩, ৪)।

এই হরগৌরী উপাসনা ভারতের একেবারে নিজস্ব। কি করিয়া ঐ উপাসনা জগতে ছড়াইয়া পড়ে তাহা অপর প্রবন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

(ক্রমশঃ)

শিক্ষা।

(ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের সাপ্তাহিক আলোচনা সভায় পঠিত।)

শিক্ষা শব্দের সাধারণ অর্থ জানা, কিন্তু যে কোনরূপ জানা বা যাহা কিছু জানাকে শিক্ষা বলা যায় না। শিশু কাল হইতে মানুষ জগতের প্রতিবস্তুর সহিত পরিচিত হইতে চায়, বয়োবৃদ্ধির সহিত সে কত কি জানে, কিন্তু তা বলিয়া সকলকে শিক্ষিত বলা চলে না। শিক্ষার আর এক অর্থ লিখিতে বা পড়িতে জানা—আমারা বলি অমুক দেশে শতকরা এতজন শিক্ষিত। ইংরাজীতে literate শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমাদের 'নিরক্ষর' শব্দ উহার বিরুদ্ধার্থক। কিন্তু শিক্ষাকে শুধু এইরূপ অর্থেও গ্রহণ করা যায় না—শিক্ষা কথাটি আমাদের মনে অনেক অধিক ভাব জাগাইয়া দেয়।

স্মরণাতীত কাল হইতে মানুষ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে জগতের বিষয়সমূহ সম্বন্ধে বিবিধ ধারণায় উপস্থিত হইয়াছে ও বিশেষ বিশেষ ভাবদ্বারা পরিচালিত হইয়াছে। যাহারা সেই সকল চিন্তা ও ভাবের সহিত পরিচয় লাভে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাদিগকেই সাধারণতঃ তত্তৎ-যুগের ও তত্তৎদেশের শিক্ষিত লোক বলিয়া স্বীকার করা হয়। কাল ও দেশভেদে ধর্ম্মভাব, জ্ঞানচর্চ্চা বা ঐহিকতা প্রবল হইয়া উঠে এবং জগৎ সম্বন্ধে লোকের ধারণাও পরিবর্ত্তিত হয়। বর্ত্তমান কালে মানব দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোকে বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতির যে সমস্ত রহস্য ভেদে সমর্থ হইয়াছে এবং জীবনের প্রয়োজনীয় সামস্যাসমূহ সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, যাহারা তাহাদের সহিত অল্প বা অধিক পরিচিত তাহাদিগকেই বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত লোক বলা হইয়া থাকে। শিক্ষিত শব্দের এই অর্থের সহিত শিক্ষার সাধারণ অর্থের অর্থাৎ লেখাপড়া জানার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কারণ, গ্রন্থাদির মধ্য দিয়াই বিভিন্ন স্থানের মনীষিগণের চিন্তা ও ভাবের আলোক সাধারণের উপর আসিয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমানের জ্ঞান অতীতে-রই জ্ঞান সাপেক্ষ। আর মানবের অতীত অভিজ্ঞতা গ্রন্থমধ্যে যেরূপ সন্নিবদ্ধ অন্য কোথাও সেরূপ নাই। বস্তুতঃ গ্রন্থসমূহ মানব-জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডারস্বরূপ।

শিক্ষিতের সম্বন্ধে উক্তরূপ ধারণায় উপস্থিত হইয়াই সম্ভবতঃ Lord Brougham বলিয়াছেন, "An educated man is he who knows something of everything and everything of something." যিনি সকল বিষয়েরই সাধারণ জ্ঞান এবং কতকগুলি বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনিই শিক্ষিত। কিন্তু এইরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইলেও শিক্ষা শব্দের সম্পূর্ণ গৌরব রক্ষা হয় না। অপরাপর বহুশব্দের ন্যায় 'শিক্ষা' ও বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। মস্তিষ্ক পরিচালনা দ্বারা কতকগুলি তথ্য অবগত হইলে এবং কতকগুলি ভাব পোষণ করিলে শিক্ষার সার্থকতা হয় না। কিন্তু শিক্ষার সহিত জীবন গঠনের ভাবটিও গ্রহণ করা

উচিত। যতদিন মানুষ উচ্চচিন্তার আলোকে জগৎ সম্বন্ধে একটি নিজস্ব চিন্তাপ্রণালী খুঁজিয়া না পায় এবং মহৎ ভাবদ্বারা তাহার হৃদয় অনুপ্রাণিত ও তাহার কার্য্য পরিচালিত না হয় ততদিন তাহাকে ঠিক শিক্ষিত বলিতে মন কুণ্ঠিত হয়। কারণ জীবন গঠনেই জ্ঞানের যথার্থ পরিচয়।

অতএব শিক্ষা শব্দে একদিকে যেমন বাহ্যজ্ঞান লাভ বুঝায় অপরদিকে তেমনি উহার সহায়ে মানসিক শক্তির উৎকর্ষ বিধান ও অন্তর্নিহিত সম্ভাবসমূহের বিকাশ সাধন বুঝায়। ইংরাজী Education এইরূপ অর্থে প্রযুক্ত হয়। E— out , ducere to lead, to draw, to bring forth what is within অর্থাৎ অন্তরস্থ বৃত্তিসমূহের বিকাশ সাধন। আবার দেহ ও মনের এরূপ নিকট সম্বন্ধ যে অধিকাংশ স্থলেই একটিকে ছাড়িয়া আর একটি অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না।

জগতের শ্রেষ্ঠতম চিন্তা ও ভাবসমূহ পরিজ্ঞাত হইয়া তদনুযায়ী জীবন গঠনে যেমন শিক্ষার পরিণতি, তেমনি উক্ত জ্ঞান লাভের অধিকারী বা উপযুক্ত হইবার চেষ্টায় শিক্ষার আরম্ভ। গীতায় উক্ত হইয়াছে, "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।" অবশ্য এখানে পরাজ্ঞানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তথাপি বিদ্যার্থী মাত্রেরই যে শ্রদ্ধা আবশ্যক তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু বর্ত্তমান কালে এই মহাসত্যটি খুব কম লোকেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। তাই আজ শ্রদ্ধাভাববশতঃ কত যুবক দুর্গম সারস্বত তীর্থ গমনের উচ্চাভিলাষী হইয়াও সংশয়াবর্ত্তে পড়িয়া জ্ঞানালোকের দিকে অগ্রসর হইতেছি মনে করিয়া আত্ম প্রবঞ্চনা করিতেছে। ঐ শ্রদ্ধার অভাব লক্ষ্য করিয়াই Lord Tennyson তাঁহার "In Memorium" কবিতায় লিখিয়াছেন,

"Let Knowledge grow from more to more,
But more of reverence in us dwell."

কবিবর reverence শব্দ ঈশ্বর বিশ্বাস অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন।

শ্রদ্ধা শব্দে শুধু গুরুভক্তি কেন সত্যনিষ্ঠা এবং অস্তিক্য বুদ্ধিও বুঝাইয়া থাকে। গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা—বেদান্তসারঃ। কিন্তু কাল-ধর্ম্মে মানব প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে শ্রদ্ধা আপন পূর্ব্বতন গৌরব হারাইয়াছে। Reverence বা শ্রদ্ধা আজ স্বীয় সরল স্বাভাবিকতা বর্জ্জিত হইয়া discipline এর কঠোর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। প্রাচীনকালের শিক্ষাক্ষেত্র শ্রদ্ধার স্নিগ্ধ সরসতায় পূর্ণ—আধুনিক বিদ্যালয় discipline এর কর্কশতায় ত্রস্ত। বস্তুতঃ এই দুইটি শব্দের পার্থক্যই আমাদের মনে প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষা রাজ্যের দুই বিভিন্ন চিত্র প্রতিফলিত করে।

শ্রদ্ধা মানব হৃদয় হইতে স্বতঃ উচ্ছ্বসিত হইয়া মহতের মহিমা অনুভব করিয়া আপনাকে ছোট করিতেই গৌরব বোধ করে; অপরটি শাসনের কঠোরতা দ্বারা অবাধকে শিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া স্পর্দ্ধানুভব করে।

প্রাচীনকালে শ্রদ্ধার যেরূপ প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে উহার অভাব শিক্ষাবিভাগকে যেরূপ বিড়ম্বিত করিতেছে তাহাতে এ সম্বন্ধে আর দুই একটি কথা বলা যাইতে পারে। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে শ্রদ্ধা আত্মসম্মানের রূপান্তর। যাহার আত্মসম্মান বোধ নাই সে কি করিয়া পরের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে? আমরা যে অপরকে সম্মান প্রদর্শন করিতে পরাঙ্মুখ—তাহার কারণ আমাদের মনের ভাব এই য আমরা উহা দ্বারা নিজকে ছোট করিয়া ফেলি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। জ্ঞানীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন দ্বারা আমাদের মধ্যে জ্ঞানের মহিমাবোধের যে শক্তি আছে তাহারই পরিচয় দেওয়া হয়। কাজেই উহা দ্বারা প্রকারান্তরে নিজেরই গৌরব রক্ষা করা হয়। আবার মহতের সম্মান দ্বারা শুধু যে নিজের অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব প্রকাশ পায় তাহা নয়, অধিকন্তু অপরের মহিমা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আপন মহত্ত্ব বিকাশের সুবিধা ঘটে। অতএব শ্রদ্ধা দ্বারা কাহারও গৌরবের হানি হয় না, পরন্তু আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষা ও আত্মোৎকর্ষ সাধন হয়। জ্ঞান ও ধর্ম্মের পথে যিনি যত অগ্রসর তিনি তত অধিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন। কথায় বলে, গুণীই গুণীর আদর বোঝে। অতএব আত্মসম্মানবোধই শ্রদ্ধার বীজ। শিক্ষার্থীর প্রাণে উহা জাগ্রত করিয়া দেওয়াই শিক্ষকের প্রধানকর্ত্তব্য; তাহা হইলে আর শিক্ষককে ছাত্রের নিকট শ্রদ্ধা যাচ্ঞা করিয়া কৃতার্থ হইতে হইবে না, বরঞ্চ ছাত্রই তাঁহাকে উহা দিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিবে। বর্ত্তমানে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের আত্ম-

সম্মানের অভাবই সমস্ত অনর্থের মূল। শিক্ষক ছাত্রের সংঘর্ষ, তথা কথিত শিক্ষিতের আবির্ভাব, শিক্ষাকার্য্যে লোকের অনাস্থা প্রভৃতি উহারই ফল। এখন আত্মসম্মানের পরিবর্ত্তে অভিমান এবং শ্রদ্ধার স্থলে সংশয় শিক্ষারাজ্যে বিরাজ করিতেছে। তাই শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বত্র disobedience, insubordination এর বিভীষিকা এবং অপর পক্ষে নিয়মের কঠোর বাঁধন।

এখন শিক্ষাকার্য্যকে মোটামুটি নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—

১। ভাষা শিক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক উন্নতি সাধন, ইন্দ্রিয় সংযম আত্মসম্মানের উন্মেষ ও শ্রদ্ধার উদয়।

২। মানব-জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান এবং রুচি ও অধিকারভেদে বিষয়বিশেষের সম্যক্ জ্ঞান লাভ।

৩। লব্ধজ্ঞানের সহায়তায় স্বাধীন চিন্তার বিকাশ এবং সদ্ভাব-সমূহের উৎকর্ষসাধন।

৪। উচ্চতম আদর্শের সহিত পরিচিত হইয়া তদনুসারে জীবন গঠন।

কিন্তু মানুষ শক্তি ও স্বভাব অনুসারে বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করিয়া বিভিন্ন আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বিভিন্ন ভাবে জীবন গঠন করিয়া থাকে। তবে কি জীবনের কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য নাই? যদি না থাকে তবে শিক্ষাও লক্ষ্যহীন হইয়া পড়ে। স্বাস্থ্য, জ্ঞান ও চরিত্র জীবন গঠনের অপরিহার্য্য উপাদান বটে, কিন্তু উহারা জীবনের উদ্দেশ্য নয়। তবে শিক্ষার লক্ষ্য কি?

মানব ভূমিষ্ঠ হইয়াই দেখিতে পায়, সে এক অজ্ঞাত অপরিচিত রাজ্যে উপস্থিত। বস্তুমাত্রই যেন কি এক অজ্ঞানতার আবরণ পড়িয়া তাহার নিকট আসে। শুধু দর্শনে তৃপ্ত না হইয়া সে বিবিধ ইন্দ্রিয় দ্বারা উহাদের স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করে। ক্রমে ধীরে ধীরে এই অজ্ঞানান্ধকার অপসৃত হইতে থাকে। কিন্তু যতই সে আলোক পায় ততই অধিক লাভের জন্য তাহার প্রাণ আকুল হইয়া পড়ে। এই রূপে উৎকণ্ঠার তৃপ্তি হইতে না হইতেই সে দেখিতে পায় জীবন অবসান প্রায়—কাল রজনী সমাগত। তখনও তাহার হৃদয় "Light! More Light!" বলিয়া কাঁদিয়া উঠে।

অতএব দেখা যায় মানব অন্তরে এক অদম্য অনন্ত জ্ঞান-পিপাসা বর্ত্তমান। ইহারই প্রভাবে মানুষের দৃষ্টি এক দিকে অন্তরীক্ষের মহাশূন্যতার দিকে ছুটিয়াছে, অপর দিকে ভূগর্ভের ঘনান্ধকার ভেদ

করিতে চলিয়াছে। এক দিকে জড় জগতের বিশ্লেষণের পর বিশ্লেষণ এবং নব নব মতবাদের সৃষ্টি, অপর দিকে জীবজগতের স্বভাব ও গতিবিধির পর্য্যবেক্ষণ এবং জীবনসমস্যার অনন্ত অভিনব সমাধান। শুধু বাহ্য জগতের কেন, মানুষ আপন অন্তরেরও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যালোচনায় নিমগ্ন। এইরূপে জগতে ভূবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, দর্শন, রসায়ন মনোবিজ্ঞান, উদ্ভিদতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি কত বিদ্যা, কত বিজ্ঞান, কত তত্ত্বেরই যে উদ্ভব হইতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

এখন মানবের এই জ্ঞান-পিপাসার মূল কি? কেহ কেহ বলেন প্রকৃতির যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া উহাকে মানবের আয়ত্তাধীন করতঃ যথাসম্ভব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি করা ইহার উদ্দেশ্য। একথা আংশিক সত্য হইলেও যাহারা এই ফলাভিসন্ধিকেই সর্ব্ব-জিজ্ঞাসার মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে তাহারা মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট ধারণায় উপস্থিত হইতে পারে নাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে ইহা মানবঅন্তরের স্বভাবসিদ্ধ প্রেরণামাত্র। বিশ্বতত্ত্ব, প্রকৃতির কোমল কঠোর মূর্ত্তি, প্রাণিরাজ্যের অদ্ভুত বৈচিত্র্য, সংসারের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন—জন্ম, মৃত্যু, নিদ্রা, স্বপ্ন প্রভৃতি সর্ব্বদাই মানবমনে এক দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকার সৃষ্টি করিতেছে। এই জগৎ রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য মানব-অন্তরের অতি নিভৃত কোণে এক আকুল ক্রন্দনের সুর যেন নিয়তই বাজিতেছে। সে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এমন কিছু জানিতে চায় যাহা সমস্ত পরিবর্ত্তনের অতীত—যাহা জানিলে আর কিছু জানিবার থাকে না।

"যেন জ্ঞাতেন সর্ব্বং বিজ্ঞাতং তৎ ত্বং বিজিজ্ঞাসস্ব—" ইহাই জীবন সমস্যার শেষ কথা।

ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির মধ্য দিয়া মানুষ চিরকালই এক চরম সত্যের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। ঋষিমুখ উচ্চারিত "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"র ন্যায় Platoর *Idea*, Virgilএর *Spiritus*, Hegelএর *Absolute*, Shelleyর *Impersonal Love*, Wordsworthএর *Soul of all the worlds*; আধুনিক বিজ্ঞানের *Principle of Life* বহুর মধ্য দিয়া একেরই সংবাদ বহন করিয়া আনে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের অনেকের ধারণা অনন্ত মনের অংশরূপী মানব-মন শিক্ষাপ্রভাবে সেই অনন্তজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয়! এ সম্বন্ধে আমাদের প্রাচ্য মত স্বামী বিবেকানন্দের নিম্নলিখিত উক্তিটিতে

পাওয়া যায়। "Education is the manifestation of the perfection already in man" কিন্তু স্বামিজী এখানে চরম বিকাশের ফলস্বরূপ যে পূর্ণত্বকে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাকে তাহারা যেন নিশ্চেষ্ট জড়ভাব বলিয়াই মনে করেন। তাহাদের মতে মানবমন চিরকালই অনন্ত জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইবে;—অনন্তের শেষ কিরূপে সম্ভব? কিন্তু স্বামীজি এখানে পূর্ণেরই পূর্ণত্ব লাভ বুঝাইয়াছেন।

এই অখণ্ডৈকত্বের উপলব্ধি এই ব্রহ্মানুভূতিই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। শাস্ত্রে ইহার অনুশীলনকে "পরাবিদ্যা" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে তবে "অপরা বিদ্যা" আলোচনার আবশ্যক কি?—না থাকিলেও আছে। যেহেতু বিষয়াকৃষ্ট মানব ইহা ছাড়িতে চাহিলেও ছাড়িতে পারে না। তাই ঐহিক বিদ্যার মধ্য দিয়া মানবকে চরম সত্যের আভাষ প্রদানপূর্ব্বক তদুপলব্ধির জন্য পরা বিদ্যার প্রতি আকর্ষণ করাই শিক্ষার লক্ষ্য। জগতের বিবিধ বিষয় আলোচনা করিয়াও যে মানুষ এক অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানময় প্রেমময় সত্তার সন্ধান পাইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নয়।

নব বর্ষ।

(শ্রীমতী সরলাবালা দাসী)

নববর্ষের প্রারম্ভে সর্ব্বশুভদাতাকে প্রণাম করিয়া এই প্রার্থনা করি, সাধনা আবার নব বৎসরে নব উদ্বোধনে উদ্বোধিতা হউন। দিনের পুনরাবৃত্তি, বৎসরের পুনরাবৃত্তি, জন্ম মৃত্যুর আবর্ত্তনে জীবনের পুনরাবৃত্তি,—একই ইষ্টমন্ত্র বার বার উচ্চারণ, একই সত্য নব নব স্বরূপে বারবার উপলব্ধি,—একই জীবন বার বার নব নব তপস্যা-মাধুর্য্যে উপভোগের উপায় স্বরূপ হউক।

উদ্বোধন কেন প্রচারিত হইল, কি ইহার লক্ষ্য, তাহাও একবার নব বৎসরে নূতন করিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে চাই। পূর্ব্ব কালে প্রথা ছিল, যখন কোন জয়কামী বীর সংগ্রাম-ক্ষেত্রে গমন করিতেন, পুরোহিত অথবা গুরুজন তাঁহার ললাটে জয়তিলক অঙ্কিত করিয়া দিতেন। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" "উঠ, জাগ, শ্রেষ্ঠত্ব অবগত হও," এই বাণী উদ্বোধনের ললাটভূষণ জয়তিলক।

স্বামী বিবেকানন্দ এই জয়তিলক তাহার ললাটে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। 'প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব যে কি' অনন্ত কাল এই প্রশ্ন চলিয়া আসিতেছে, অনন্ত কাল এই প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া আসিতেছে। জগৎ বৈচিত্র্য পূর্ণ, এই বিচিত্র জগতের এই শ্রেষ্ঠত্বই মধ্যবিন্দু অথবা কেন্দ্র। বহু, এই শ্রেষ্ঠত্বে, একে পরিপূর্ণতা ও পরিসমাপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। জাতি মাত্রের জাতীয়ত্ব, কর্ম্মী মাত্রেরই কর্ম্ম-সাধনা, সেবকের সেবা, দাতার দান, বীরের বীর্য্য, সাধকের নিষ্ঠা বহুপথে বহুভাবে বহুধারায় সেই এক শ্রেষ্ঠত্বের বিকর্ষণে ও আকর্ষণে ব্যাপ্ত ও কেন্দ্রীভূত। ইতিহাস বহু শতাব্দীর মানব জীবনেতিহাস তাহারাই সাক্ষ্য স্বরূপ পত্রাঙ্কে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, যুগান্তরের নূতনত্বে তাহা নব নব ভাবে প্রবুদ্ধ, নব আলোকে উদ্ভাষিত। সেই বহু বিচিত্র শ্রেষ্ঠত্ব-সাধনাকে সমন্বয়ের প্রেমসূত্রে একত্রে গ্রথিত করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ নবযুগের কণ্ঠে মনুষ্যত্বের বৈজয়ন্তী-মালা প্রদান করিয়াছেন, উদ্বোধন এই বিজয়োৎসবে ভেরী-ঘোষক দূত স্বরূপ।

মানব মহিমা তিনি কি উজ্জ্বল ভাবে নিজে অনুভব করিয়াছেন ও অপরকে তাঁহার অনুভূতির দ্বারা অনুভব করাইয়াছেন তাহা যিনি তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনিই জানেন। তথাপি তিনি সন্ন্যাসের আদর্শ, যে সর্ব্বোপরি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং কোন প্রয়োজন বোধেই সে আদর্শ বিন্দুমাত্র খর্ব্ব করিতে চাহেন নাই, ইহাতে সন্ন্যাস গ্রহণই তাঁহার আদর্শ ছিল আমরা যদি এইরূপ বুঝি তাহা হইলে ভুল বুঝা হইবে। প্রকৃত সন্ন্যাস ও প্রকৃত মনুষত্ব যে একই ইহা তিনি নিজের জীবনের আচরণে, ভাবে ও কথায় বার বার বুঝাইয়াছেন। আত্ম-সঞ্চয়ে পশুত্ব এবং আত্মত্যাগেই মনুষত্ব। ত্যাগে মহীয়ান্ হইবার জন্যই মানব সাধনার নানা রূপে প্রতীক কল্পনা করে—আত্মোৎসর্গের নানা যজ্ঞবেদী রচনা করে। যাহা সঞ্চয়-মূলক তাহা যত আয়াস সাধ্য, যত অপর্য্যাপ্তই হউক না তথাপি তাহা তুচ্ছ। সঞ্চযে বদ্ধ-হস্তের কর্ম্মী হওয়া অসম্ভব, ত্যাগীই যথার্থ কর্ম্মী হইতে পারেন। একপক্ষে যেমন তিনি সকল দেশে সকল সময়ে

এমন কতকগুলি লোক থাকা প্রয়োজন মনে করিতেন, যাঁহারা সর্ব্বত্যাগী, তাঁহারা সমাজের কোন সংস্রবে না আসিলেও সমাজ তাঁহাদের ত্যাগের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠে, আবার অপর দিক দিয়া তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন, যে, কোন এক মহান্ ভাবের মধ্যে আত্মোৎসর্গ, মানবকে তাহার নিজের আজ্ঞাতেই তাহাকে সঞ্চয়ের ক্ষুদ্রত্ব হইতে প্রকৃত মনুষ্যত্বের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে। মানবের মনুষ্যত্বের এই উজ্জ্বল আদর্শ তাঁহার সম্মুখে এমন ভাবে পরিস্ফুট ছিল যে, কোন স্থানেই তাহা তাঁহার নিকট প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে নাই। ষ্টিম এঞ্জিনের আবিষ্কর্তার কর্ম্মসাধনার মধ্যেও তিনি সেই মনুষ্যত্ব দেখিতে পাইয়াছেন, তুর্কী নাবিকের নৌ চালন দক্ষতায় ও সৌজন্যে তিনি তাহার পরিচয় পাইয়া পুলকিত হইয়াছেন। সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই আত্মধর্ম্মে অকৃত্রিম একনিষ্ঠতা যেমন তাঁহার পরম শ্রদ্ধার বিষয় ছিল, সেইরূপ সকল জাতীর জাতীয়ত্ব-বোধ তিনি পরম পবিত্র বলিয়া জানিতেন। ধর্ম্ম সাধনায় যেমন প্রত্যেকে ব্যাষ্টিভাবে—সেইরূপ জাতীয়ত্বের সাধনায় সমষ্টিভাবে আদর্শমনুষ্যত্বের সম্বন্ধে নিজের সমগ্র ধারণাটী প্রকাশ করিবার প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে ইহাই তিনি যেন মনের সঙ্গে অনুভব করিতেন।

এই সর্ব্বত্রব্যাপক মহান্ মনুষ্যত্বের অনুভূতি তিনি কোথা হইতে পাইয়াছিলেন যদি বিস্মিত হইয়া আমরা তাহার মূল অনুসন্ধান করিতে যাই, তবে মূলে একটী মাত্র বস্তুর সত্তা বুঝিতে পারি—তাহা প্রেম। সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর, অথচ পুষ্পের ন্যায় কোমল। দৃঢ় প্রতিজ্ঞের প্রতিজ্ঞার ন্যায় অবিচলিত অটল, অবার জননীর মত স্নেহার্দ্র, ক্ষমাপরায়ণ। সকল শৌর্য্যের আধার, সকল কোমলতার আশ্রয়। প্রকৃত প্রেমের ইহাই স্বরূপ। মহাপুরুষগণের জীবনে এই স্বপ্রকাশ-রূপার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ন্যাসী-শ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ চিরদিন ইঁহারই উপাসনা করিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন, “ছাড় বিদ্যা যাগ যজ্ঞ বল, সার্থহীন প্রেম যে সম্বল।” একটি দান কখনও বা দাতা ও গৃহীতা

উভয়ের একের মনে অভিমান অপরের মনে নিজের হেয়ত্ব-জ্ঞান আনয়ন করে, সেই দান আবার প্রকৃত প্রেমে এমন সহজ হইয়া যায় যে দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই সমান তৃপ্তি ও প্রীতির হেতু হয়। ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন, সেই জন্য দানকে পূজায় পরিণত করিয়াছেন। ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই বলিয়াছিলেন, "সর্ব্বোচ্চ সত্য সকল সময়েই অতি সহজ।" তাঁহার নিজের নিস্বার্থ মাতৃভূমি-প্রেম সকল মাতৃভূমি-সেবকের হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দনটী পর্য্যন্ত অনুভব করিতে পারিত, তাঁহার শিশুর মত সরল ইষ্ট নির্ভরতা ও আরাধ্যের প্রতি ভালবাসা, সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের ইষ্টনিষ্ঠের হৃদয়ের সহিত নিজের হৃদয় মিশাইয়া লইয়াছিল। এই অদ্বৈতপন্থী বীর নিজে অনুভব করিয়া নবযুগকেও এই ভাবে বিভাবিত করিয়া গিয়াছেন যে, জগতে যে একত্ববোধে বহুত্ববোধ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রেম। যে বীর্য্যে সকল দুর্ব্বলতা ছিন্ন করা যায় তাহা প্রেম। এই নিস্বার্থ প্রেমই মানবের প্রকৃত স্বরূপ এই প্রেমই মানবের মনুষ্যত্ব।

শত শত মতবাদ, সম্প্রদায়, জাতি চিরকাল রহিয়া আসিতেছে ও রহিবে, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। এক দেশ এক জাতি অথবা এক মতবাদের গণ্ডীতে বহুকে এক করিতে পারে না, এক মুষ্টি সরিসা মুষ্টির দৃঢ় বন্ধনে থাকিলেও এক হয় না।

অতএব উঠ, জাগ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাত হও। তুমি মানুষ মনুষ্যত্বের অধিকারী, তোমার নিজ অধিকার নিজ বীর্য্যে জয় করিয়া লও। হে বীর, হে প্রেমিক, কোন্ বাধা তোমাকে বন্ধন করিতে পারে, কোন অন্তরায় বা তোমার অদ্বৈত সাধনার পথে প্রাচীর রচনা করিতে পারে? অভিঃ মন্ত্রের উপাসক, অমৃতের পুত্র, কোন্ ভীতিই বা কল্পিতরূপে তোমাকে অবসন্ন করিতে পারে?

আজ নববর্ষে সেই পুরোবর্ত্তী সেনাপতিগণকে আমরা প্রণাম করি, যাঁহারা সকল ক্লৈব্য হইতে, আরাম সুখ সম্পদ প্রতিষ্ঠার বন্ধন হইতে স্বাধীনতার জয়শ্রীলাভের সংগ্রামে মানবকে আহ্বান করিয়াছেন। আর যুক্তকরে ইহাই প্রার্থনা করি, প্রকৃত মনুষ্যত্ব-উদ্বোধন যদি বা

সহজসাধ্য না হয়, যেন প্রকৃত মনুষ্যত্বের নিকট সর্ব্বত্র সকল সময়েই আমরা শ্রদ্ধার সহিত মস্তক নত করিতে পারি।

শোকসংবাদ।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বিগত ৭ই বৈশাখ, শনিবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের সুযোগ্য অধ্যক্ষ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ হৃদ্রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি বিগত দুই মাস যাবৎ মায়াবতী হইতে কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসা করাইতেছিলেন এবং ক্রমশঃ সুস্থ হইয়াই উঠিতেছিলেন। এত শীঘ্র তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন তাহা কেহই এমন কি সুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরাও অনুমান করিতে পারেন নাই। ইনি বিগত দশ বৎসর যাবৎ রামকৃষ্ণমিশনে যোগদান করিয়া নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন ও মিশনের নানাকার্য্যে সহায়তা করিতেছিলেন। এক বৎসর যাবৎ দক্ষতার সহিত উদ্বোধনের সম্পাদন কার্য্য করেন। পরে গত ৪।৫ বৎসর হইতে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া তথা হইতে প্রকাশিত ইংরাজী প্রবুদ্ধ ভারত পত্র অতি সুন্দর-ভাবে পরিচালনা করেন। ধর্ম্মভিত্তিতে কিরূপে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে তৎসম্বন্ধে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত তাঁহার মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধগুলি যিনিই আলোচনা করিয়াছেন তিনিই তাঁহার সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার মধুর স্বভাব ও চরিত্রগুণে এমন কেহ নাই যিনি আকৃষ্ট না হইতেন।

তাঁহার এই অকালে (৩৯ বৎসর) দেহত্যাগে মিশন এবং সর্ব্ব-সাধারণ কি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহা আমরা ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। ভগবান্ তাঁহার শান্তিবিধান করুন।

সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের আদর্শ।*

(স্বামী বিবেকানন্দ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বলিতে তবে আমি কি বুঝি? আমি কোন সার্ব্বভৌমিক দর্শনিক তত্ত্ব, কোন সার্ব্বভৌমিক পৌরাণিক তত্ত্ব, অথবা কোন সার্ব্বভৌমিক আচার পদ্ধতি—যাহা সকলেই মানিয়া চলিবে, তাহা বলিতে চাহি না। কারণ, আমি জানি যে, নানা পাকচক্র-সমবায়ে গঠিত, অতি জটিল ও অতি বিস্ময়াবহ এই জগৎরূপ দুর্ব্বোধ্য ও বিশাল যন্ত্রটী বরাবরই চলিতে থাকিবে। আমরা তবে কি করিতে পারি?—আমরা ইহাকে সুচারুরূপে চালাইতে পারি, ইহার ঘর্ষণবেগ কমাইতে পারি, ইহার চক্রগুলি মসৃণ রাখিতে পারি। কিরূপে?—বৈষম্যের স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া। আমরা যেমন স্বভাবতঃই একত্ব স্বীকার করিয়াছি, সেইরূপ আমাদিগকে বৈষম্যও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে যে, একই সত্য লক্ষভাবে প্রকাশিত হইতে পারে, এবং প্রত্যেক ভাবটীই তাহাদের নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রকৃত সত্য। আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে যে, কোন বিষয়কে শত প্রকার বিভিন্ন দিক হইতে দেখিলে উহা একই জিনিষ থাকে। সূর্য্যের কথা ধরা যাউক। মনে করুন, এক ব্যক্তি ভূপৃষ্ঠ হইতে সূর্য্যোদয় দেখিতেছে; সে প্রথমে একটী বৃহৎ গোলাকৃতি বস্তু দেখিতে পাইবে। তারপর মনে করুন, সে একটী ক্যামেরা লইয়া সূর্য্যের অভিমুখে

* 'The Ideal of a Universal Religion' নামক বক্তৃতার অনুবাদ।

যাত্রা করিয়া যে পর্য্যন্ত না সূর্য্যে পৌঁছায় সেই পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি লইতে লাগিল। এক স্থল হইতে গৃহীত প্রতিকৃতি স্থানান্তর হইতে গৃহীত প্রতিকৃতি হইতে ভিন্ন। যখন সে ফিরিয়া আসিবে, তখন মনে হইবে, বাস্তবিক সে যেন কতকগুলি বিভিন্ন সূর্য্যের প্রতিকৃতি লইয়া আসিয়াছে। আমরা কিন্তু জানি যে, সেই ব্যক্তি তাহার গন্তব্য পথের বিভিন্ন স্থল হইতে একই সূর্য্যের বহু প্রতিকৃতি লইয়া আসিয়াছে। ভগবান্ সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ হইয়া থাকে। উচ্চ অথবা নিকৃষ্ট দর্শনের মধ্য দিয়াই হউক, সূক্ষ্মতম অথবা স্থূলতম পৌরাণিক আখ্যায়িকার ভিতর দিয়াই হউক, সুসংস্কৃত ক্রিয়াকাণ্ড অথবা জঘন্য ভূতোপাসনাদির মধ্য দিয়াই হউক, প্রত্যেক সম্প্রদায়, প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যক ধর্ম্ম, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, ঊর্দ্ধগামী হইবার—চেষ্টা করিতেছেই, ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মানুষ যত প্রকার সত্যের উপলব্ধি করুক না কেন, তাহার প্রত্যেকটী ভগবানেরই দর্শন ছাড়া অপর কিছুর নহে। মনে করুন, আমরা সকলেই পাত্র লইয়া একটী জলাশয় হইতে জল আনিতে যাইলাম। কাহারও হাতে বাটি, কাহারও বা কলসী, কাহারও বা বালতি ইত্যাদি। পরে আমরা যখন সকলেই পাত্রগুলি জলপূর্ণ করিলাম তখন প্রত্যেক পাত্রের জল স্বভাবতঃই নিজ নিজ পাত্রের আকার ধারণ করিয়াছে। যে বাটি আনিযাছে তাহার জল বাটির মত, যে কলসী আনিয়াছে তাহার জল কলসীর মত আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক পাত্রেই জল ব্যতীত অপর কিছু নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। আমাদের মনগুলি এই পাত্রের সদৃশ। আমরা প্রত্যেকেই ভগবান্ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছি। যে জলদ্বারা পাত্রগুলি পূর্ণ রহিয়াছে, ভগবান্ সেই জলস্বরূপ এবং প্রত্যেক পাত্রের নিকট ভগবদ্দর্শন তৎ তৎ আকারে আসিয়া থাকে। তথাপি তিনি সর্ব্বত্রেই এক। তিনিই ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন। আমরা সার্ব্বভৌমিক ভাবের এই একমাত্র পরিচয় পাইতে পারি।

মতবাদ হিসাবে ইহা বেশ। কিন্তু বিভিন্ন ধর্ম্মের সামঞ্জস্য-

বিধান কার্য্যে পরিণত করিবার কি কোন উপায় আছে? আমরা দেখিতে পাই, 'সকল ধর্ম্মমতই সত্য' এ কথা বহু পুরাকাল হইতেই মানুষ স্বীকার করিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষে, আলেকজান্দ্রিয়ায়, ইউরোপে, চীনে, জাপানে, তিব্বতে এবং সর্ব্বশেষে আমেরিকায় একটী সর্ব্ববাদী-সম্মত ধর্ম্মমত গঠন করিয়া সকল ধর্ম্মকে এক প্রেমসূত্রে গ্রথিত করিবার শত শত চেষ্টা হইয়া গিয়াছে। তাহাদের সকলগুলিই ব্যর্থ হইয়াছে; কারণ, তাহারা কোন কার্য্যকরী প্রণালী অবলম্বন করে নাই। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মই সত্য, একথা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের একত্রীকরণের এমন কোন কার্য্যকরী উপায় তাঁহারা দেখাইয়া দেন নাই, যাহা দ্বারা তাহারা এই সমন্বয়ের মধ্যেও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারে। সেই উপায়ই যথার্থ কার্য্যকরী যাহা ব্যক্তিগত ধর্ম্মমতের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট না করিয়া তাহাকে অপর সকলের সহিত মিলিত হইবার পথ দেখাইয়া দেয়। কিন্তু এ যাবৎ যে সকল উপায়ে ধর্ম্মজগতে সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছে তাহাতে বিভিন্ন ধর্ম্মমত সকল সত্য বলিয়া গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে গুটিকতক মত বিশেষের মধ্যে উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সেই হেতু অপর কতকগুলি পরস্পর-বিবদমান ঈর্ষ্যাপরায়ণ নূতন দলেরই সৃষ্টি হইয়াছে।

আমারও নিজের ক্ষুদ্র কার্য্য-প্রণালী আছে। জানি না ইহা কার্য্যকরী হইবে কিনা; কিন্তু আমি উহা বিচার করিয়া দেখিবার জন্য আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি। আমার কার্য্য-প্রণালী কি? মানবজাতিকে আমি প্রথমেই এই কথাটী মানিয়া লইতে অনুরোধ করি, "কিছু নষ্ট করিও না"—বৈনাশিক সংস্কারকগণ জগতের কোন উপকারেই আসে না। কোন কিছু একেবারে ভাঙ্গিও না—একেবারে ধূলিসাৎ করিও না, গঠন কর। যদি পার সাহায্য কর; যদি না পার, হাত গুটাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখ, ব্যাপার কিরূপ দাঁড়ায়। যদি সাহায্য করিতে না পার অনিষ্ট করিও না। যতক্ষণ লোকে অকপট থাকে ততক্ষণ তাহাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটী

কথাও বলিও না। দ্বিতীয়তঃ, যে যেখানে রহিয়াছে, তাহাকে সেখান হইতে উপরে তুলিবার চেষ্টা কর। যদি ইহাই সত্য হয় যে, ভগবানই সকল ধর্ম্মের কেন্দ্রস্বরূপ, এবং আমরা প্রত্যেকেই এক একটী ব্যাসার্দ্ধ দিয়া তাঁহার দিকেই অগ্রসর হইতেছি তাহা হইলে আমরা সকলে নিশ্চিতই কেন্দ্রে পঁহুছিব; এবং সকল ব্যাসার্দ্ধের মিলনস্থান সেই কেন্দ্রে আমাদের সকল বৈষম্য তিরোহিত হইবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না সেখানে পঁহুছাই সে পর্য্যন্ত বৈষম্য অবশ্যই থাকিবে। সকল ব্যাসার্দ্ধই কেন্দ্রে সম্মিলিত হয়। একজন তাহার স্বভাব অনুযায়ী একটী ব্যাসার্দ্ধ দিয়া যাইতেছে, আর একজন অপর একটী ব্যাসার্দ্ধ দিয়া যাইতেছে এবং আমরা সকলেই যদি নিজ নিজ ব্যাসার্দ্ধ ধরিয়া অগ্রসর হই, তাহা হইলে অবশ্যই এক কেন্দ্রে পঁহুছিব; কারণ, এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, "সকল রাস্তাই রোমে পঁহুছায়"। প্রত্যেকেই তাহার নিজ নিজ প্রকৃত্যানুযায়ী বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে। প্রত্যেকেই কালে চরম সত্য উপলব্ধি করিবে; কারণ, শেষে দেখা যায়, মানুষ নিজেই নিজের শিক্ষা বিধান করে। তুমি আমি কি করিতে পারি? তুমি কি মনে কর তুমি একটী শিশুকেও কিছু শিখাইতে পার?—পার না। শিশু নিজেই শিক্ষা লাভ করে। তোমার কর্ত্তব্য, সুযোগ বিধান করা—বাধা দূর করা। একটী গাছ বাড়িতেছে। তুমি কি গাছটীকে বাড়াইতে পার? তোমার কর্ত্তব্য গাছটীর চারিদিকে বেড়া দেওয়া, যেন গরু ছাগলে উহাকে মুড়াইয়া না খায়—বস্, ঐখানেই তোমার কর্ত্তব্য শেষ। গাছ নিজেই বর্দ্ধিত হয়। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। কেহই তোমাকে শিক্ষা দিতে পারে না—কেহই তোমাকে আধ্যাত্মিক মানুষ করিয়া দিতে পারে না; তোমাকে নিজেই শিক্ষা করিতে হইবে; তোমার উন্নতি তোমার নিজের ভিতর হইতেই হইবে।

বাহিরের শিক্ষাদাতা কি করিতে পারেন? তিনি জ্ঞানলাভের অন্তরায়গুলি কিঞ্চিৎ অপসারিত করিতে পারেন মাত্র। ঐখানেই তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ। অতএব যদি পার সহায়তা কর, কিন্তু বিনষ্ট

করিও না। তুমি কাহাকেও আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন করিতে পার, এ ধারণা একেবারে পরিত্যাগ কর। ইহা অসম্ভব। তোমার নিজের আত্মা ব্যতীত তোমার অপর কোন শিক্ষাদাতা নাই, ইহা স্বীকার কর। দেখা যাক, তাহাতে কি ফল হয়। সমাজে আমরা নানা বিভিন্ন স্বভাবের লোক দেখি। সংসারে সহস্র সহস্র প্রকার মন ও সংস্কারবিশিষ্ট লোক রহিয়াছে। তাহাদিগের সম্পূর্ণ সামান্যীকরণ অসম্ভব, কিন্তু আপাততঃ, আমাদের সুবিধা মত তাহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ কর্ম্মঠ ব্যক্তি; তিনি কর্ম্ম করিতে চান; তাঁহার পেশী ও স্নায়ু-মণ্ডলীতে বিপুল শক্তি রহিয়াছে। তাঁহার উদ্দেশ্য কার্য্য করা, হাঁসপাতাল তৈয়ার করা, সৎকার্য্য করা, রাস্তা প্রস্তুত করা, কার্য্য-প্রণালী স্থির করা ও সঙ্ঘবদ্ধ করা। দ্বিতীয়তঃ, ভাবুক লোক—যিনি সেই মহান্ সুন্দরকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসেন। তিনি সৌন্দর্য্যের চিন্তা করিতে, প্রকৃতির মনোরম দৃশ্যগুলিকে উপভোগ করিতে, এবং প্রেম ও প্রেমময় ভগবানকে পূজা করিতে ভালবাসেন। তিনি পৃথিবীর সকল সময়ের যাবতীয় মহাপুরুষ, ধর্ম্মাচার্য্য ও ভগবানের অবতারগণকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসেন; খৃষ্ট অথবা বুদ্ধ বাস্তবিকই ছিলেন একথা যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়, কি না হয় তাহা তিনি গ্রাহ্য করেন না; খৃষ্টের প্রদত্ত "শৈলোপদেশ" কবে প্রচারিত হইয়াছিল অথবা শ্রীকৃষ্ণ ঠিক কোন্ তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা জানা তিনি বিশেষ আবশ্যক মনে করেন না; তাঁহার নিকট তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব, তাঁহাদের মনোহর মূর্ত্তিগুলি সমধিক আদরণীয়। ইহাই তাঁহার আদর্শ - ভাবুক লোকের স্বভাবই এই প্রকার। তৃতীয়তঃ, ধর্ম্মরহস্যানুসন্ধিৎসু লোক—তিনি নিজেকে বিশ্লেষণ করিতে, মানব-মনের ক্রিয়াসমূহ জানিতে, তথায় কি কি শক্তি কার্য্য করিতেছে এবং কিরূপে তাহাদিগকে জানা যায়, পরিচালিত করা যায় ও বশীভূত করা যায়—এই সমুদয় বিষয় জানিতে চান। ইহাই ধর্ম্মরহস্যানুসন্ধিৎসু মনের স্বভাব। চতুর্থ, দার্শনিক—যিনি প্রত্যেক বিষয়টী

মাপিয়া লইতে চান এবং স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তিকে মানবীয় দর্শনের মধ্য দিয়া যতদূর যাওয়া সম্ভব, তাহারও পারে লইয়া যাইতে চান।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, যদি কোন ধর্ম্মকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লোকের উপযোগী হইতে হয়, তাহা হইলে তাহার সেই সকল বিভিন্ন লোকের মনের উপযোগী খাদ্য যোগানর ক্ষমতা থাকা চাই; এবং যে ধর্ম্মে এই ক্ষমতার অভাব সেই ধর্ম্মান্তর্গত সম্প্রদায়গুলি সকলেই একদেশী হইয়া পড়ে। মনে করুন, আপনি কোনও ভক্ত-সম্প্রদায়ের নিকট যাইলেন। তাঁহারা গান করেন, ক্রন্দন করেন, এবং ভক্তি প্রচার করেন; কিন্তু যাই আপনি বলিলেন, "বন্ধু, আপনি যাহা বলিতেছেন সবই ঠিক, কিন্তু আমি ইহাপেক্ষা আরও কিছু বেশী চাই—আমি একটু যুক্তি তর্ক, একটু দার্শনিকভাবে আলোচনা, এবং একটু বিচারপূর্ব্বক বিষয়গুলি এক এক করিয়া বুঝিতে চাই।" তাহারা তৎক্ষণাৎ আপনাকে দূর করিয়া দিবে এবং শুধু যে আপনাকে চলিয়া যাইতে বলিবে তাহা নহে, পারে ত আপনাকে একেবারে ভবপারে পাঠাইয়া দিবে। ফলে এই হয় যে, সেই সম্প্রদায় কেবল-মাত্র ভাবপ্রবণ লোকদিগকেই সাহায্য করিতে পারে। তাহারা অপরকে ত সাহায্য করেই না পরন্তু তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করে; এবং সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক ব্যাপার এই যে, সাহায্যের কথা দূরে থাকুক, অপরে যে অকপট ইহাও তাহারা বিশ্বাস করে না। আবার, আর এক সম্প্রদায় আছে—জ্ঞানী। তাঁহারা ভারত ও প্রাচ্যের জ্ঞানের বড়াই করেন এবং খুব লম্বা চওড়া পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু যদি আমার মত একজন সাধারণ লোক তাঁহাদের নিকট গিয়া বলে, "আমাকে কিছু আধ্যা-ত্মিক উপদেশ দিতে পারেন কি?" তাহা হইলে তাঁহারা প্রথমেই একটু মুচকি হাসিয়া বলিবেন, "ওহে তোমার এখনও বুদ্ধিবৃত্তিই মার্জ্জিত হয় নাই। তুমি আধ্যাত্মিকতার কি বুঝিবে?" ইঁহারা বড় উঁচুদরের দার্শনিক। তাঁহারা তোমাকে কেবল ধর্ম্মের দ্বার দেখাইয়া দিতে পারেন মাত্র। আর এক দল আছেন, তাঁহারা ধর্ম্মরহস্যানু-

সন্ধিৎসু। তাঁহারা জীবের বিভিন্ন থাক, মনের বিভিন্ন স্তর, মানসিক শক্তির ক্ষমতা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা কথা তোমাকে বলিবেন এবং তুমি যদি সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁহাকে বল, "আমাকে ভাল কিছু দেখান যাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি। আমি তত কল্পনাপ্রিয় নহি। আমার উপযোগী হয়, এমন কিছু দিতে পারেন কি?" তাঁহারা হাসিয়া বলিবেন, "নির্ব্বোধটা কি বলে শোন; কিছুই জানে না—আহাম্মকের জীবনই বৃথা।" পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ চলিতেছে। আমি এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্ব্বাপেক্ষা গোঁড়া ধর্ম্মধ্বজীদের একত্রিত করিয়া একটা ঘরে পুরিয়া তাহাদের সুন্দর বিদ্রূপব্যঞ্জক হাস্যের ফটোগ্রাফ তুলিতে চাই।

ইহাই ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা, ইহাই সকলের বর্ত্তমান মতিগতি। আমি এমন একটী ধর্ম্ম প্রচার করিতে চাই, যাহা সকল প্রকার মানসিক অবস্থার লোকের উপযোগী হইবে—ইহাতে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, ও কর্ম্ম সমভাবে থাকিবে। যদি কলেজ হইতে বৈজ্ঞানিক পদার্থবিদ্ অধ্যাপকগণ আসেন, তাঁহারা যুক্তিবিচার পছন্দ করিবেন। তাঁহারা যত পারেন বিচার করুন। শেষে তাঁহারা এমন এক স্থানে পঁহুছিবেন, যেখান হইতে যুক্তিবিচারের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না বলিয়া মনে করিবেন। তাঁহারা বলিয়া বসিবেন "ঈশ্বর, মুক্তি প্রভৃতি ভাবসকল কুসংস্কার মাত্র—উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও।" আমি বলি, "হে দার্শনিকপ্রবর, তোমার এই পঞ্চভৌতিক দেহ যে আরও বড় কুসংস্কার, ইহাকে পরিত্যাগ কর। আহার করিবার জন্য আর গৃহে কিম্বা অধ্যাপনার জন্য তোমার দর্শনের ক্লাসে যাইও না। শরীর ছাড়িয়া দাও এবং যদি না পার চুপ করিয়া বসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদ।" কারণ, দর্শন জগতের একত্ব এবং একই সত্তার অস্তিত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিবার উপায় দেখাইয়া দিবে। সেইরূপ যদি ধর্ম্মরহস্যানুসন্ধিৎসু আসেন, আমরা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বৈজ্ঞানিকভাবে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ করিয়া দিতে ও হাতে-কলমে তাহা করিয়া দেখাইতে সদা প্রস্তুত থাকিব। যদি ভক্ত

লোক আসেন, আমরা তাঁহাদের সহিত একত্র বসিয়া ভগবানের নামে হাস্য ও ক্রন্দন করিব ; আমরা 'প্রেমের পেয়ালা পান করিয়া উন্মাদ হইয়া যাইব।' যদি একজন বীর্য্যবান্ কর্ম্মী আসেন আমরা তাঁহার সহিত যথাসাধ্য কর্ম্ম করিব। এবং ভক্তি, যোগ ও কর্ম্মের এই প্রকার সমন্বয় সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের খুব নিকটতম আদর্শ হইবে। ভগবানের ইচ্ছায় যদি সকল লোকের মনেই এই জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্মের প্রত্যেকটী ভাবই পূর্ণমাত্রায় অথচ সমভাবে বিদ্যমান থাকিত! ইহাই আমার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের আদর্শ। যাহার চরিত্রে এই ভাবগুলির একটী বা দুইটী প্রস্ফুটিত হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে একদেশী বলি এবং সমস্ত জগৎ, যাহারা কেবলমাত্র নিজের রাস্তাটীই জানে, এইরূপ "একঘেয়ে" লোকে পরিপূর্ণ। এতদ্ব্যতীত অপর যাহা কিছু সমস্তই তাঁহাদের নিকট বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর। এই চারিটীদিকেই সামঞ্জস্যের সহিত বিকাশলাভ করাই, মদুক্ত ধর্ম্মের আদর্শ এবং ভারতবর্ষে আমরা যাহাকে "যোগ" বলি, তাহা দ্বারাই এই আদর্শধর্ম্ম লাভ করা যায়। কর্ম্মীর নিকট, ইহ' মানবের সহিত মানবজাতির যোগ ; যোগীর নিকট, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যোগ ; ভক্তের নিকট, নিজের সহিত প্রেমময় ভগবানের যোগ এবং জ্ঞানীর নিকট, বহুত্বের মধ্যে একত্বানুভূতিরূপ যোগ। 'যোগ' শব্দে ইহাই বুঝায়। ইহা একটী সংস্কৃত শব্দ এবং সংস্কৃতে এই চারি প্রকার যোগের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যিনি এই প্রকার যোগ-সাধন করিতে চান তিনিই 'যোগী'। যিনি কর্ম্মের মধ্য দিয়া এই যোগসাধন করেন তাঁহাকে 'কর্ম্মযোগী' বলে। যিনি ভগবানের মধ্য দিয়া এই যোগ সাধন করেন, তাঁহাকে 'ভক্তিযোগী' বলে। যিনি ধর্ম্মরহস্যানুসন্ধানের মধ্য দিয়া সাধন করেন তাঁহাকে 'রাজযোগী' বলে। এবং যিনি জ্ঞান-বিচারের মধ্য দিয়া এই যোগসাধন করেন, তাঁহাকে 'জ্ঞানযোগী' বলে। অতএব 'যোগী' বলিতে ইহাদের সকলকেই বুঝায়।

প্রথমে 'রাজযোগের' কথা ধরা যাউক। এই রাজযোগ—এই

মনঃসংযোগ ব্যাপার কি? (ইংলণ্ডে) আপনারা 'যোগ' কথাটীর সহিত ভূত প্রেত প্রভৃতি নানারকমের কিম্ভূতকিমাকার ধারণা জড়াইয়া রাখিয়াছেন। অতএব আমি প্রথমেই আপনাদিগকে বলিয়া রাখিতেছি যে, যোগের সহিত ইহাদের কোনই সংশ্রব নাই। কোন যোগেই যুক্তিবিচার পরিত্যাগ করিয়া চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া হাঁতড়াইয়া বেড়াইতে অথবা তোমার যুক্তিবিচার কতকগুলো অর্ব্বাচীন পুরোহিতের হস্তে সমর্পণ করিতে বলে না। তাহাদের কোনটীই বলে না যে, তোমাকে কোন অতিমানুষের নিকট শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করিতেই হইবে। প্রত্যেকেই বলে তুমি তোমার বিচারশক্তিকে দৃঢ়ালিঙ্গনে ধরিয়া তাহাতেই লাগিয়া পড়িয়া থাক। আমরা সকল প্রাণীর মধ্যেই জ্ঞানলাভের তিন প্রকার উপায় দেখিতে পাই। প্রথম সহজাত জ্ঞান, যাহা জীবজন্তুর মধ্যেই বিশেষ পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা জ্ঞানলাভের সর্ব্বনিম্ন উপায়। দ্বিতীয় উপায় কি? বিচারশক্তি। মানুষের মধ্যেই ইহার সমধিক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ সহজাত জ্ঞান একটী অসম্পূর্ণ উপায়। জীবজন্তু সকলের কার্য্যক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ এবং এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই সহজাত জ্ঞান কার্য্য করে। মানুষের বেলায় এই সহজাত জ্ঞান সবিশেষ পরিস্ফুট হইয়া বিচারশক্তিতে পরিণত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যক্ষেত্রও বাড়িয়া গিয়াছে। তথাপি এই বিচারশক্তিও খুব অসম্পূর্ণ। ইহা কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই থামিয়া যায় এবং আর অগ্রসর হইতে পারে না; এবং যদি তুমি ইহাকে বেশীদূর চালাইতে চেষ্টা কর তবে তাহার ফলে ভয়ানক গোলমাল উপস্থিত হইবে। যুক্তি নিজেই অযুক্তিতে পরিণত হইবে। ন্যায়ের ভাষায় ইহা চক্রক দোষে (Argument in a circle) দূষিত হইয়া পড়িবে। আমাদের প্রত্যক্ষের মূলীভূত কারণ জড় ও শক্তির কথা ধরুন। জড় কি? যাহার উপর শক্তি ক্রিয়া করে? শক্তি কি যাহা জড়ের উপর ক্রিয়া করে। আপনারা গোলমাল কি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন। ন্যায়শাস্ত্রবিদ্গণ ইহাকে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ বলেন—একটী জ্ঞান অপরটীর উপর নির্ভর করিতেছে এবং সেইটী

আবার প্রথমটীর উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং, আপনারা যুক্তির পথে এক প্রবল বাধা দেখিতে পাইতেছেন, যাহাকে অতিক্রম করিয়া যুক্তি আর অগ্রসর হইতে পারে না। তথাপি ইহার পশ্চাতে যে অনন্তের রাজ্য রহিয়াছে, তথায় পঁহুছিতে যুক্তি সদা ব্যস্ত। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও মনের বিষয়ীভূত এই জগৎ, এই নিখিল বিশ্ব আমাদের সংজ্ঞার উপর প্রতিফলিত, সেই অনন্তের এক কণিকামাত্র এবং সংজ্ঞারূপ জাল দ্বারা বেষ্টিত এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে আমাদের বিচারশক্তি কার্য্য করে—তাহার বাহিরে যাইতে পারে না। সুতরাং ইহার বাহিরে যাইবার জন্য আমাদের অপর কোন উপায়ের প্রয়োজন—অতীন্দ্রিয় বোধ সেই উপায়। অতএব সহজাত জ্ঞান বিচারশক্তি ও অতীন্দ্রিয় বোধ এই তিনটীই জ্ঞানলাভের উপায়। পশুতে সহজাত জ্ঞান, মানুষে বিচারশক্তি ও দেবমানবে অতীন্দ্রিয় বোধ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সকল মানুষের ভিতরেই এই তিনটী শক্তির বীজ অল্পবিস্তর পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মানসিক শক্তির বিকাশ হইতে হইলে উহাদের বীজগুলিও অবশ্যই মনে বিদ্যমান থাকা চাই, এবং ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, একটী শক্তি অপরটীর বিকশিত অবস্থা মাত্র; সুতরাং তাহারা পরস্পর বিরোধী নহে। বিচার শক্তিই পরিস্ফুট হইয়া অতীন্দ্রিয় বোধে পরিণত হয়; সুতরাং অতীন্দ্রিয় বোধ বিচারশক্তির পরিপন্থী নহে, পরন্তু তাহার পূর্ণতা সাধন করে। যে সকল বিষয় বিচারশক্তির দ্বারা বুঝিতে পারা যায় না, তাহাদিগকে অতীন্দ্রিয় বোধ দ্বারা বুঝা যায় এবং তাহা বিচারশক্তির বিরোধী নহে। বৃদ্ধ বালকের বিরোধী নহে, পরন্তু তাহার পূর্ণ পরিণতি। অতএব তোমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, নিম্নশ্রেণীর শক্তিকে উচ্চশ্রেণীর শক্তি বলিয়া ভুল-করা-রূপ ভয়ানক বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। অনেক সময়ে সহজাত জ্ঞানকে অতীন্দ্রিয় বোধ বলিয়া জগতে চালাইয়া দেওয়া হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যদ্বক্তা সাজিবার সকল প্রকার মিথ্যা দাবী করা হয়। একজন নির্ব্বোধ অথবা অর্দ্ধোন্মাদ ব্যক্তি মনে করে যে তাহার মস্তিষ্কে যে সকল পাগলামী

চলিতেছে সেগুলিও অতীন্দ্রিয় জ্ঞান এবং সে চায় লোকে তাহার অনুসরণ করুক। জগতে যে সর্ব্বাপেক্ষা পরস্পরবিরোধী অসম্বদ্ধ প্রলাপবাক্য প্রচারিত হইয়াছে, তাহা কেবল বিকৃতমস্তিষ্ক উন্মাদগণের সহজাত জ্ঞানলব্ধ প্রলাপকে অতীন্দ্রিয় বোধের ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টামাত্র।

(ক্রমশঃ)

শিখগুরু।

(শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র)

নানক, স্বীয় মৃত্যুর পর কে তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে, ইহা লইয়া শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে যে এক বিষম আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী তাহা স্থির জানিতেন। তিনি বুঝিলেন, পরবর্ত্তী গুরুপদপ্রার্থীর পথে বহু বাধাবিঘ্ন ও অন্তরায় বর্ত্তমান; তজ্জন্য হয়ত অসন্তোষ ও অবিচার, বৈষম্য ও অত্যাচারের পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্য অতি ভীষণ আকার ধারণ করিয়া শিখসম্প্রদায়ে বিবাদবিসম্বাদের সৃষ্টি করিবে এবং অচিরে সকল সংহতি ও ঐক্য বিনষ্ট হইবে—শিখসমাজ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী নানক প্রাণে প্রাণে ইহা অনুভব করিয়া তদীয় জীবদ্দশাতেই গুরুনির্ব্বাচন করিয়া ভবিষ্যদ্বিপদের আশঙ্কা দূর করিলেন। তিনি আপনার পুত্রদ্বয়ের অহঙ্কার ও আত্মাভিমান, উহাদিগের উদ্ধতস্বভাব ও অসদ্ব্যবহারে অতীব অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। উহারা যে গুরুপদের একান্ত অযোগ্য, তাহা স্থির জানিয়াই আপন শিষ্যমণ্ডলী মধ্যে এক-জন যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলেন। এই নির্ব্বাচনের উপর যে শিখসমাজের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, তাহা তিনি নিশ্চয়-রূপে বুঝিতেন। সুতরাং তিনি ভাবিলেন, এ বিষয়ে তাঁহাকে অতীব

বিচক্ষণতার সহিত স্থিরচিত্তে চিন্তা করিতে হইবে, অজ্ঞের ন্যায় কাজ করিলে চলিবে না। তিনি প্রথম হইতেই লেনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। লেনার সরল প্রকৃতি ও মিষ্টস্বভাব, উন্নত চরিত্র এবং তৎপ্রতি প্রবল অনুরাগ ও শ্রদ্ধা তাহাকে ভবিষ্যৎ গুরুপদের উপযুক্তই করিয়াছিল। উহার পরিচয়ও তিনি একটী ঘটনা হইতে স্পষ্ট পাইলেন। একদা বুধ ও লেনা সমভিব্যাহারে নানক একটী অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাঁহার প্রতি অধিক শ্রদ্ধাবান্, তাহা পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়েই তিনি উহাদিগকে ঐস্থানে লইয়া যান। পথিমধ্যে সহসা একটী শব দেখিতে পাইয়া নানক বুধকে উহার মাংস ভক্ষণ করিতে আদেশ দিলেন কিন্তু বুধ ঘৃণাবশতঃ উহা ভক্ষণ করিতে সম্মত হইল না। তখন তিনি লেনাকে আজ্ঞা করিলেন; গুরুর আদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ লেনা অকুণ্ঠিতচিত্তে উত্তর করিল—"প্রভো! বলুন, দেহের কোন অংশ হইতে ভক্ষণ আরম্ভ করিব।" নানক উত্তর করিলেন—"পা হইতে আরম্ভ কর"। লেনা সানন্দে প্রবৃত্ত হইল কিন্তু কি আশ্চর্য্য খাইবার পূর্ব্বেই মৃতদেহ অদৃশ্য হইয়া গেল! নানক বলিলেন—"ধন্য লেনা! তোমার অচলা ভক্তির পরিচয় পাইলাম—তুমিই গুরুপদের সুযোগ্য ব্যক্তি।" তিনি লেনাকে তখন হইতে 'অঙ্গৎ' অর্থাৎ নিজদেহ এই নামে অভিহিত করিলেন। লেনা যে নানকের সহিত অভেদাত্মা তাহা তখন হইতে প্রমাণ হইয়া গেল। এই ঘটনায় তাঁহার পুত্রদ্বয় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল এবং ভবিষ্যতে উহার প্রতিশোধ লইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। যাহা হউক, নানকের মৃত্যুর পর তদীয় প্রিয়শিষ্য লেনা 'অঙ্গৎ' এই আখ্যালাভ করিয়া গুরুপদে অভিষিক্ত হইলেন।

এস্থানে আমরা একটী কথা বলিয়া রাখি। নানকের পরবর্ত্তী চারিজন গুরু তদীয় মতবাদে সম্পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন এবং উহাদ্বারা যে শিখজাতির সর্ব্ববিধ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা তাঁহাদিগের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। সেইজন্যই তাঁহারা অন্য কোন নূতন মত প্রচার না করিয়া নানক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মতত্ত্ব মানবমণ্ডলীমধ্যে প্রচার

করিয়া ক্ষান্ত হন। কিন্তু ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের সময় হইতে শিখসমাজে ভাববৈষম্য লক্ষিত হয়—ঐ সময়েই শিখজাতি সর্ব্বপ্রথম অস্ত্রধারণ করে। এই দুই শ্রেণীর গুরুদিগের জীবন আমরা অতঃপর আলোচনা করিব।

অঙ্গৎ।

অঙ্গৎ গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই দেখিলেন তাঁহার প্রধান শত্রু নানকপুত্রদ্বয়। উহারা তাঁহার সকল কার্য্যে বাধা দিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল যে তাহাদিগকে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া লেনা অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছেন। তাঁহাকে উহার ফলভোগ করিতে হইবে। তাহারা গুরুর নামে সর্ব্বপ্রকার মিথ্যা কুৎসা রটাইয়া সম্প্রদায়স্থ স্বধর্ম্মীদিগের সহায়তা ও সমবেদনা লাভে সচেষ্ট হইল। ইহাতে বিশেষ কৃতকার্য্য না হইয়া, উহারা অবশেষে তাঁহার প্রতি বল-প্রয়োগের অভিসন্ধি করিতে লাগিল। ইহাদিগের দুর্ব্যবহারে অঙ্গৎ অত্যন্ত বিরক্ত এবং অবশেষে ভীত হইয়া কুদুর নামক স্থানে আশ্রয় লইলেন। তখন তিনি ব্যাধিগ্রস্ত। তাঁহার এই অসহায় অবস্থায় উমার দাস ভিন্ন অন্য কোন দ্বিতীয় সহায়ক ছিল না। তিনি দ্বাদশ বৎসর গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে ঐস্থানেই দেহত্যাগ করেন।

উমার দাস।

উমার দাস জাতিতে ছত্রি ছিলেন। গোবিন্দওয়াল নামক গ্রামে তাঁহার আদিম বাসস্থান ছিল। যখন নানক-পুত্রদ্বয় দ্বারা অঙ্গৎ অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া কুদুরে অবস্থান করিতেছিলেন, উমার দাস সেই সময়ে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি গুরুর প্রতি অতীব ভক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি প্রত্যহ কুম্ভপূর্ণ জল লইয়া গিয়া গুরুর পদধৌত করিয়া দিতেন। একদা রজনীকালে যখন তিনি ঐ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন তখন ভীষণ ঝড় উঠিয়া দিঙ্মণ্ডল তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। হঠাৎ পদস্খলিত হইয়া উমার দাস পড়িয়া গেলেন এবং উহার ফলে অত্যন্ত আঘাত পাইলেন। ঐ ঘটনায় অঙ্গৎ ব্যথিত

হইলেন এবং শিষ্য কিরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ তাহা বুঝিতে পারিয়া মুগ্ধ হন। তিনি বলিলেন—"জগতে তোমার আপনার বলিবার কেহ নাই বটে, কিন্তু তুমি স্থির জানিও আমি তোমার সহায়ক, তোমার কোন চিন্তা নাই।" অঙ্গৎ মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাকেই গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়া যান। ভবিষ্যতে উমারদাসকে শিখসমাজ সানন্দে গুরুপদে বরণ করিয়া লইল। তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া অতীব সুচারুরূপে কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন; তাঁহার ন্যায় বিবেচক ও পারদর্শী গুরুর অধীনে শিখজাতি উন্নতির অত্যুচ্চশিখরে উঠিয়াছিল—এইকারণেই তাঁহার স্মৃতি আজিও সকলে সযত্নে হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন। সম্প্রদায়ের কাহারও কোন অভাব অভিযোগ তাঁহাকে একবার জানাইলেই তৎক্ষণাৎ তাহা দূরীভূত হইত। স্বগ্রাম গোবিন্দওয়ালেই তিনি বসবাস করিতেন। তথায় যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য তিনি একটী পান্থনিবাস ও জলকষ্ট নিবারণার্থ একটী 'বউলী' বা কূপ খনন করাইয়া দেন। তাঁহার সময় শিখধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে দুইটী নূতন ভাব প্রবেশ লাভ করে। প্রথমটী প্রচার কার্য্য। তদীয় গুণরাজীতে মুগ্ধ হইয়া বহুসংখ্যক ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি উহাদিগের মধ্যে দ্বাবিংশ সুযোগ্য শিষ্যকে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করেন; উহার ফলে শিখধর্ম্ম শুধু পঞ্চনদের চতুঃসীমানায় আবদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল। যাহাতে শিখধর্ম্ম কালে সার্ব্বজনীনধর্ম্মে পরিণত হইয়া সমগ্র মানবজাতির হৃদয়ে সত্যের বীজ বপন করে এবং তাহাদিগকে অচিরে দীক্ষিত করিয়া ফেলে, ইহাই গুরু উমারদাসের একান্ত ইচ্ছা ছিল। এই মনোভিলাষ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি উক্ত কঠিন দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি শিখধর্ম্মসম্প্রদায়টীকে দুইটী ভাগে বিভক্ত করেন; তাঁহার সময় হইতে উদাসী ফকির ও সাধারণ শিখ পৃথক্ হইয়া গেল। গুরু উমারদাস মোহন নামক একটী পুত্র ও মোহিনী নাম্নী একটী কন্যা রাখিয়া দ্বাবিংশ বৎসর সুচারুরূপে কার্য্য করিয়া ১৫৭৪

খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দওয়ালেই দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহ ঐস্থলেই সমাধিস্থ করা হয়, কিন্তু অধুনা উহা নদী-গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

রামদাস।

গুরু উমারদাসের পর রামদাস ঐ পদ পাইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত উমারদাসের কোন বংশগত সম্বন্ধ ছিল না। তিনি সোদীবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং এক অচিন্তিত ঘটনাচক্রে উমার দাসের কন্যার পাণিগ্রহণে সমর্থ হন। শৈশবকালে তাঁহাকে অত্যন্ত দারিদ্র্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল। গোবিন্দওয়াল গ্রামে যখন উমার দাস 'বউলী' নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন, সেই সময়ে তথায় উক্ত নির্ম্মাণ-কার্য্য দর্শনের নিমিত্ত বহু জনসমাগম হয় এবং অনেকগুলি শ্রমজীবী ঐকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। লাহোর হইতে দরিদ্র রামদাসও আপন মাতাকে লইয়া ঐস্থানে ব্যবসার জন্য আগমন করেন। তিনি শ্রমজীবীদিগের নিত্য ব্যবহার্য্য নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেন। ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া তিনি বিশেষ লাভবানও হইয়াছিলেন। একদিবস গুরু উমারদাস আপনার কন্যাকে সঙ্গে লইয়া শ্রমজীবীদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে কন্যার অনুরোধে রামদাসের নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে ডাকিলেন। বলিষ্ঠকায় ও রূপবান যুবক রামদাসকে দেখিয়া মোহিনী তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন এবং মোহিনীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে গুরু উমারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া রামদাস তাহাকে বিবাহ করেন। উমারদাসের মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা রামদাস গুরুর আসন অধিকার করেন।

রামদাস অতীব দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন; তাঁহার যশ ও খ্যাতি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। মোগল বাদশা আকবরের কর্ণেও সে সংবাদ পৌঁছিল। মহামতি আকবর সকল ধর্ম্মের প্রতি সমভাবেই শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি শিখগুরুর প্রশংসা শ্রবণে একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিতে উৎসুক হইলেন। লাহোর হইতে যাত্রা করিয়া তিনি গুরু রামদাসের সহিত মিলিত

হইলেন, এবং কিয়ৎকাল তাঁহার আশ্রমেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনায় কাটাইলেন। তিনি রামদাসের নির্ম্মলস্বভাব ও অদ্ভুত প্রতিভা সন্দর্শনে অতীব চমৎকৃত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাঁহাকে কয়েক বিঘা চক্রাকার জমি দান করিলেন; উহাই 'চক্কর রামদাস' নামে খ্যাত হইয়াছে। এই পরিচয়ের পর তাঁহার প্রতি আকবরের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এবং ঐ ঘটনার কিছুদিন পরে যখন তিনি পাঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যাভিমুখে গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে পথে রামদাসের সহিত দেখা করিবার জন্য গোবিন্দওয়াল গ্রামে বিশ্রাম করেন। এবারও তিনি গুরুকে তাঁহার ইচ্ছামত কোন দান লইতে অনুরোধ করিলেন। উহাতে গুরু রামদাস বলিলেন—"মহারাজ! আমার নিজের কিছুরই অভাব নাই, তবে আমার একটী ভিক্ষা আছে। যখন আপনি লাহোর নগরে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ে কৃষকেরা খুব শস্য বিক্রয় করিয়াছিল কিন্তু আপনি ঐ স্থান পরিত্যাগ করিবার পর আজ কয়েক মাস যাবৎ তাহাদিগের আর ক্রেতা মিলিতেছে না। সুতরাং একান্ত অর্থাভাব ঘটিয়াছে। আমার অনুরোধ আপনি যেন এ বৎসর দরিদ্র কৃষকদিগের নিকট রাজস্ব গ্রহণ না করেন, তাহা হইলেই তাহাদিগের প্রভূত উপকার করা হইবে; ইহাই আমার নিবেদন।" কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া আকবর শাহ ঐ প্রস্তাব সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করিলেন এবং গুরুর একটী ইচ্ছাও যে পূর্ণ করিতে পারিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ বিবেচনা করিলেন। গুরু রামদাস দরিদ্র অসহায় প্রজাদিগের অবস্থার প্রতিও যে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন, ইহা জানিয়া উহারা তাঁহাকে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল এবং যাহাতে তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এইভাবে অভাবগ্রস্তের অভাব মোচন ও দরিদ্রের সাহায্যকল্পে স্বীয় জীবন নিয়োগ করিতে পারেন, তজ্জন্য শ্রীভগবানের নিকট সকাতর প্রার্থনা জানাইল।

পূর্ব্বগুরুর ন্যায় ইঁহারও শিষ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—

ধনবান ভূস্বামিগণ আপনাদিগের সকল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া তদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার তিনটী পুত্র হইয়াছিল। প্রথম মহাদেও—ইনি ফকির হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পৃথ্বীদাস—ইনি বিবাহাদি করেন এবং তৃতীয় পুত্র অর্জ্জুন—ইনি রামদাসের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রায় সপ্তবর্ষ গুরুপদে অবস্থিত থাকিয়া ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অমরধামে চলিয়া যান।

অর্জ্জুন।

রামদাসের তৃতীয পুত্র অর্জ্জুন গুরুপদপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার কার্য্যকালকে শিখসমাজের সমৃদ্ধির যুগ বলিয়া ঐতিহাসিকগণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। অর্জ্জুনের সময় হইতে শিখগুরুদিগের খ্যাতি দেশময় ছড়াইয়া পড়ে এবং তিনি স্বয়ং সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করেন। হিন্দুবণিকগণ তাহাদিগের দ্রব্যসম্ভার লইয়া পাঞ্জাবে ব্যবসায়ের জন্য দলবদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, কারণ তাহারা জানিত ঐ স্থানে গুরু অবস্থান করায়, বহু লোক সমাগম হইবে। গুরু অর্জ্জুনের সময় হইতেই শিখসমাজে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। নানক প্রচারিত ধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলি শিখসমাজ ক্রমশঃ বিস্মৃত হইতে লাগিল এবং কাল-ক্রমে উহা এক বিকৃত আকার ধারণ করিল। পাঠক অবগত আছেন, গুরু নানক তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে জাগতিক আনন্দোপভোগ, বিলাসব্যসন হইতে সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ থাকিতে বারবার উপদেশ দিয়াছিলেন; উহাই নানকের সমুদয় শিক্ষার সার কথা। নানক জানিতেন, যদি কোন কারণে শিখসমাজে একবার পার্থিব ভোগবিলাস প্রবেশ করে, তবে ভবিষ্যতে তাহা ক্রম-বর্দ্ধমান হইয়া শিখসম্প্রদায়ের কালস্বরূপ হইবে—উহার আর কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, জগতে সত্যই চিরস্থায়ী হয় এবং কদাচার ও কুনীতি কালে সমাজকে প্রাণহীন ও নিস্তেজ করিয়া ফেলে। আদর্শ সংযমী ও ভোগবিলাসে বীতস্পৃহ পুরুষ গঠন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি জীবিতকালে আপন

শিষ্যদিগের চরিত্র ঐ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া কতকগুলি আদর্শ পুরুষের সৃষ্টি করেন; যাঁহাদিগকে জগৎ একদিন অতীব শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখিত। তাঁহার পরবর্ত্তী গুরুত্রয় প্রাণপাতী পরিশ্রম দ্বারা ঐ আদর্শ রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু গুরু অর্জ্জুন উহা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন। জগতের সকল ধর্ম্মেরই ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, যতদিন উহাদিগের মধ্যে সংযমের ভাবটী বর্ত্তমান ছিল ততদিন উহারা মানবের এবং জগতের কল্যাণসাধনে সমর্থ হইয়াছে কিন্তু যখনই সংযমের বিপরীত ভাব, ভোগ ও বিলাস উহাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তখনই উহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং জগতের অকল্যাণের কারণ হইয়াছে। শ্রীবুদ্ধের পরার্থপরতা একদিন ভারতবাসীর কর্ণে মহামন্ত্ররূপে ধ্বনিত হইয়াছিল—তাঁহার ধর্ম্ম সমগ্র ভারত বরণ করিয়া লইয়াছিল, এমন কি সমগ্র এসিয়া ভূখণ্ডে উহা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে বৌদ্ধসঙ্ঘে নানারূপ কুপ্রথা আসিয়া উহাকে সর্ব্বতোভাবে বিনাশ করিল। ঐরূপ শিখসম্প্রদায়ের মধ্যে গুরু অর্জ্জুনের সময়ই বিলাসিতার ভাব প্রথম প্রবেশ লাভ করে এবং নানক প্রচারিত উচ্চাদর্শের পতনের সূচনা করিয়া দেয়। গুরু অর্জ্জুন জাগতিক ঐশ্বর্য্যের চাকচিক্যে ভুলিয়া গেলেন; পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুদিগের ন্যায় আর সেই সামান্য ভাবে কালযাপন নাই, সে সরলতা ও অকপটতা নাই—শিখগুরু এখন রাজোচিত পরিচ্ছদ ও নানা আড়ম্বরে পরিবেষ্টিত হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

আমরা সংক্ষেপে তাঁহার কার্য্যাবলীর সম্বন্ধে কিছু বলিব। তিনি তখনও জীবিত বৃদ্ধ বুধের পরামর্শে ও অনুরোধে অমৃতসহরে একটী পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে সর্ব্বসময়ে বসবাস করাও তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। ঐ স্থানটীকে তিনি 'হরমন্দার' বা ভগবানের গৃহ এই আখ্যা দেন। তিনিই 'আদিগ্রন্থের' রচনা শেষ করেন এবং যাহাতে শিষ্যগণ নিত্য ধর্ম্মপুস্তক পাঠ বা শ্রবণ করিতে পারে, তজ্জন্য ঐ পুষ্করিণীর তীরেই একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ

করিয়া দেন। প্রত্যহ ঐ স্থানে বহুলোক স্নান ও পুস্তকপাঠ শ্রবণ মানসে যাতায়াত করিত। এতদ্ভিন্ন অমৃতসহরের সন্নিকটে জলকষ্ট নিবারণের জন্য তিনি 'তুরন্তর' নামক অপর একটী পুষ্করিণী খনন করেন।

তাঁহার প্রভূত অর্থ ও অতুল্য সমৃদ্ধি তদীয় সহোদরদিগের চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইল। উহার অংশ পাইবার জন্য তাহারা ব্যস্ত হইয়া পড়ে এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে অতি সহজে তাঁহাকে বঞ্চিত করা যাইতে পারে, তাহারই সন্ধানে ব্যাপৃত হইল। অর্জ্জুনও তখন অপুত্রক, সুতরাং তিনি তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ভ্রাতৃগণ সম্পদের অধিকারী হইবে এই চিন্তায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ও আপনাকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য জ্ঞানে পুত্র লাভের আশায় ভগবানের নিকট হৃদয়ের সকাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। সকলে তাঁহাকে পরম জ্ঞানী ও প্রাচীন বুধের নিকট এ বিষয় জ্ঞাপন করিতে পরামর্শ দিল। উহাতে সম্মত হইয়া গুরু অর্জ্জুন এক অপূর্ব্ব শোভাযাত্রার সহিত বুধের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। বুধ তখন বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু কামনা করিতেছিলেন, তাঁহার শ্রবণ শক্তি প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল। হঠাৎ সুসজ্জিত হস্তী, উষ্ট্র প্রভৃতি প্রাণী, লোকের ভীষণ ভিড় ও বহু শকটের একত্র সমাবেশ দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ঐরূপ আড়ম্বর করিয়া গুরু যে তাঁহারই সহিত দেখা করিতে যাইতেছিলেন, তাহা প্রথমে তিনি ধারণা করিতে পারেন নাই। তাহার পর সমীপবর্ত্তী এক ব্যক্তিকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহারা কোথায় যাইতেছে?" লোকটী উত্তর করিল— "মহাশয়, শিখগুরু অর্জ্জুন পুত্রকামনায় আপনার নিকট আসিতেছেন।" উহা শুনিয়া বুধ বলিলেন—"বটে! গুরুর এত আড়ম্বর! তিনি পাগল হইয়াছেন না কি? আমার সহিত দেখা করিবার জন্য এত আয়োজন?" বৃদ্ধ ঐ সংবাদে আবার আনন্দিতও হইয়াছিলেন; এবং আপনাকে স্থির রাখিতে না পারিয়া মনের উল্লাসে দুই হাত তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে গাহিতে লাগিলেন -

"বেটা হোগো বেটা হো
জীস্‌কী যাক্‌সে হুয়েনী রো।
সব্ ভওয়ন্ কা কো সুতাজ্
রুহেগা উ সব্‌কী ইলাজ্॥"

অর্থাৎ যিনি এখন অপুত্রক, তাঁহার শীঘ্রই পুত্র হইবে এবং আমি আশা করি সকল গুরু ইহাতে তাঁহার সহায়তা করিবেন। ইহা শুনিয়া অর্জ্জুন সানন্দে বুধের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। এবং বুধের কথামত কিয়ৎকাল পরে তাঁহার এক অনিন্দ্য-সুন্দর পুত্র জন্মিল। ইনিই প্রথিতনামা হরগোবিন্দ।

সেই সময়ে চন্দুশাহ লাহোরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার সহিত পুত্রের বিবাহ লইয়া অর্জ্জুনের মনোমালিন্য ঘটিল; ইহার ফলে গুরু অর্জ্জুনকে অবশেষে আত্মহত্যা করিতে হইয়াছিল। চন্দুশাহের এক অপরূপ লাবণ্যময়ী কন্যা ছিল—কাহার সহিত তাহার বিবাহ দিবেন এ বিষয়ে যখন চন্দুশাহ চিন্তা করিতেছিলেন তখন তাঁহার বন্ধুগণ অর্জ্জুন পুত্র হরগোবিন্দই যে কন্যার যোগ্য পাত্র তাহা তাঁহাকে জানাইল। প্রথমে ইহা শুনিয়া তিনি ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিয়া গুরুকে অকথ্যভাষায় গালি দিলেন এবং বলিলেন—"অর্জ্জুন প্রভূত ধনশালী হইতে পারে, তবুও সে ভিখারী!" কিন্তু তৎপরে বন্ধুগণকর্ত্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি ঐ প্রস্তাবে সম্মত হন এবং গুরুর মতামত লইবার জন্য একজন অনুচরকে পাঠাইলেন। কিন্তু গুরু ইতঃপূর্ব্বেই ঐ গালাগালির বিষয় অবগত ছিলেন সুতরাং তিনি অনুচরকে অপমানিত করিয়া দূর করিয়া দিলেন। পূর্ব্বকৃত কুকর্ম্মের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে চন্দুশাহ স্বয়ং গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া সকাতর প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু গুরু ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না। ঈর্ষ্যা ও অভিমানে জ্বলিয়া উঠিয়া চন্দুশাহ 'এ অপমানের সমুচিত প্রতিশোধ দিব' বলিয়া নিজ আবাসে ফিরিয়া গেলেন।

চন্দুশাহের হস্ত হইতে অর্জ্জুন রক্ষা পাইলেন না। সম্রাটপুত্র

খুরমের (পরে সম্রাট সাজাহান) নিকট তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ও প্রভাব ছিল। তিনি সেই সময়ে কাশ্মীর যাইবার পথে লাহোরে দুই এক দিন অবস্থান করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। চন্দুশাহ তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন— 'যুবরাজ! অধুনা এক প্রবল পরাক্রান্ত শিখগুরু তাহার দলবল লইয়া একটা বিদ্রোহ ও অশান্তি উদ্রেকের চেষ্টা করিতেছে, ইহাতে মোগলের বিপদ্ আশঙ্কা করি। আপনি উহাকে একবার ডাকাইয়া ইহার একটা প্রতিবিধান করিয়া যান।' খুরমের কঠিন আজ্ঞায় গুরু অর্জ্জুনকে বাধ্য হইয়া যাইতে হইল। তাঁহার সম্মুখে নীত হইলে তিনি একবার মাত্র তদীয় মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—'ইনি ফকির ও সাধুব্যক্তি। ইঁহাকে এক্ষণই ছাড়িয়া দাও— ইঁহা হইতে কি কখন বিদ্রোহ আশঙ্কা করিতে পারি?'। এই বলিয়া তিনি চলিয়া যান। কিন্তু দুষ্ট চন্দুশাহের কবল হইতে অর্জ্জুনের মুক্তি নাই! তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল না, চন্দুশাহ কেবল এই মাত্র বলিলন—"কাল আবার তোমার বিচার হইবে"। ইহা শুনিয়া গুরু অর্জ্জুন বলিলেন—"মহাশয়, আমার একটী অনুরোধ আছে, আমি একবার সন্নিকটস্থ রাভি নদীতে স্নান করিয়া আসি।" চন্দুশাহের সম্মতি পাইয়া গুরু সত্বর তটিনী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণের কোন আশা নাই বুঝিয়া গুরু অর্জ্জুন স্বেচ্ছায় নদীতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে চলিলেন! চন্দুশাহের অভীপ্সিত অসহনীয় যন্ত্রণা তাঁহাকে আর সহ্য করিতে হইল না। ঐ ঘটনা ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। শিষ্যগণ তাঁহার মৃতদেহ নদীগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া লাহোর সহরের ভিতরেই স্বর্ণমণ্ডিত সমাধিমন্দিরে সমাহিত করেন—ইহা আজিও বর্ত্তমান।

অর্জ্জুন প্রথম শ্রেণীর শেষ গুরু; পরবর্ত্তী গুরু হরগোবিন্দের

* অপরমতে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে গুরু অর্জ্জুন কারাকদ্ধ হন। কারাবাসের অসহনীয় যাতনায় সর্দ্দিগরমিতে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। বলা বাহুল্য, চন্দুশাহের ষড়যন্ত্রেই ঐ কার্য্য সাধিত হইয়াছিল।

সময়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও অভিনব পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়। কিরূপে তিনি শিখসমাজের গতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে পরিচালিত করেন, তাহা আমরা আগামীবারে আলোচনা করিব।

স্বাধীনতা।

(শ্রী—)

একটু অনুধাবন করিলে আমরা দেখিতে পাই, কি মানুষ, কি পশু সকল প্রাণীর মধ্যেই একটা প্রবল ভোগ বা বাসনা পূরণের ইচ্ছা বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ ভোগেচ্ছাই তাহাদিগের সকল চেষ্টার এবং সকল কার্য্যের মূল। ঐ ভোগেচ্ছার তাড়না যাহাদিগের মধ্যে অনুভূত হয় না তাহারা জড়। জড় অপেক্ষা যাহাদের মধ্যে ঐ ভাব প্রবল তাহারা পশু এবং তদপেক্ষাও যাহাদের মধ্যে উহা আরও উগ্রভাবে অবস্থিত তাহারাই মানবপদবাচ্য। মানবের ভোগ বাসনার উগ্রত্বই তাহাকে সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান গ্রহণে উপযুক্ত করিয়াছে। সমাজগঠন, রীতি নীতির উপদেশ, আচার ব্যবহারের প্রচলন, শাসন পদ্ধতি বিকাশের উদ্দেশ্য, মানব যাহাতে তাহাদের ভোগাদর্শে সহজে পৌঁছিতে পারে, উহা প্রাপ্ত হইয়া যাহাতে রক্ষা করিতে পারে এবং সকলেই সমভাবে ভোগ করিতে পারে। এই ভোগাদর্শের তারতম্য ও প্রাপ্তি-উপায়ের বিচিত্রতাই জগতে এত ভিন্ন ভিন্ন সমাজ বা জাতির উৎপত্তি সাধন করিয়াছে।

এখন আমরা দেখিব ভোগের অর্থ কি? একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় মানুষ তাহার জীবনে যে সকল অভাব অনুভব করে তাহার পূরণের নামই ভোগ। একজন দরিদ্র ব্যক্তির অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে,—এই যে প্রয়োজন বোধ, ইহাই তাহার ভোগেচ্ছা। যখন সে উক্ত অর্থ সংগ্রহ ও স্বেচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারিল,

তখন তাহার ভোগবাসনার পূরণ হইল। এইরূপে আমরা মানবের প্রত্যেক কার্য্য বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব, তাহাদের মূলে ঐ অভাব পূরণের বা বাসনা নিবৃত্তির তাড়না রহিয়াছে। ঐ তাড়নাকে আমরা, অভাবের হস্ত হইতে মুক্ত বা স্বাধীন হইবার বলিতে পারি। অপর কথায় আমরা ভোগবাসনা পূরণের ইচ্ছা ও স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছাকে এক বস্তুরই দুইটী বিভিন্ন নাম বলিতে পারি। দেহ সম্বন্ধেই মানুষ যে শুধু এই স্বাধীনতা লাভ করিতে চাহে তাহা নহে, সে চিন্তার রাজ্যে, ভাবের রাজ্যে সর্ব্বত্রই উহা লাভ করিতে চাহে। যত দিন না সে ঐ স্বাধীনতা লাভ করিতেছে, ততদিন তাহার আকাঙ্ক্ষারও নিবৃত্তি নাই, দ্বন্দ্বেরও শান্তি নাই।

পূর্ব্ব এবং পর জন্মের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আমরা দেখি মানুষ আজীবন ভোগ নিবৃত্তির বা স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিল—তথাপি তাহার অবস্থা পূর্ব্ববৎই থাকিয়া গেল। তাহার অভাব বোধের আর শেষ হইল না। সকলেই যে জীবন সংগ্রামে পরাস্ত হয়, তাহা নহে, অনেকেই দ্বন্দ্বে বিজয় লাভ করে, কিন্তু তাহারাও আপনাদিগকে সর্ব্বাভাবের হস্ত হইতে মুক্ত বোধ করে না। বরং মনে হয় অভাব যেন আরও দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। পূর্ব্বে যাহাদের অভাব বোধ অতি সামান্য ছিল, এখন তাহারা দেখে উহা আরও বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছে। তবে কি মানব তাহার ঈপ্সীত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে না?—অভাবের হস্ত হইতে কখনই কি মুক্তি লাভ করিবে না? না, নিশ্চয়ই এমন দিন আসিবে যখন সে সমস্ত অভাবের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া অব্যাহত স্বাধীনতা ভোগ করিবে। কারণ, মানুষের উৎপত্তি স্বাধীনতা হইতে এবং স্বাধীনতাই তাহার স্বরূপ। তাহাকে তাহার উৎপত্তি স্থল স্বাধীনতার রাজ্যে পুনরায় ফিরিয়া যাইতেই হইবে। আধুনিক বিজ্ঞানও ইহার সমর্থন করে। বিজ্ঞান বলে যে স্থান হইতে যাহার উৎপত্তি তাহাকে পুনরায় বৃত্তাকারে তথায় ফিরিয়া যাইতেই হইবে।

পথে সে যতই বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পড়ুক না কেন—উৎপত্তি-স্থানই তাহার শেষ গন্তব্য। এক অনন্ত স্বাধীনসত্ত্বা সকল কবিই স্বীকার করিয়াছেন এবং বহু মনীষী তাহার দ্রষ্টা। উহার অংশ যদি মানবের মধ্যে না থাকিত, তাহা হইলে তাহার এই যে স্বাধীনতা-লাভের প্রবৃত্তি কোথা হইতে আসিল? তাহার অন্তস্থলে পূর্ণ স্বাধীনতা তরঙ্গনীর তরঙ্গ আঘাত করে বলিয়াই সে সান্তের বাঁধ ভাঙ্গিয়া স্বাধীনতার সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে চায়। বিজ্ঞান আরও বলেন অভাব হইতে ভাবের বা শূন্য হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে না। সেই জন্য মানবের মধ্যে যদি সেই পূর্ণ স্বাধীনতার একটী স্ফুলিঙ্গও না থাকিত তাহা হইলে ঐ স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা কখনও তাহার হৃদয়ে জাগরিত হইত না। তবে মানুষ স্বরূপতঃ স্বাধীন হইলেও সে যে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না তাহার কারণ মানবের স্বাধীন আত্মা এই দেশ-কাল ও কার্য্য-কারণ ভাবাত্মক জগতের মধ্যে আসিয়া বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। আবার যখন সে কার্য্যকারণাত্মক জগতের বাহিরে যাইবে, তখনই সে পুনরায় তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিবে।

এই কার্য্যকারণভাব সর্ব্বব্যাপী। কার্যকারণের সর্ব্বব্যাপীত্ব বলিতে এখানে বুঝিতে হইবে আমাদের সাধারণ ইন্দ্রিয়গোচর জগৎও তদ্ব্যতীত বুদ্ধির দ্বারা কি মনের দ্বারা, যাহা কিছু আমরা কল্পনা করিতে পারি, তাহাদেরও উপর যাহার প্রভাব রহিয়াছে। এই জগতে থাকিয়া আমরা ইহার অনুরূপই কল্পনা করিতে পারি—বড় জোর এমন কোন স্থানের কল্পনা করিতে পারি, যাহা আমাদের জগত অপেক্ষা অতীব সুন্দর, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু তাহাও আমাদের ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত কোন বিষয় নয়; কারণ, বাহ্য জগতে আমরা যাহা দেখি তদনুরূপ আমরা ধারণা করিতে সমর্থ হই—আর সেই ধারণার প্রক্ষেপণই আমাদের কল্পনা। সেই জন্য এই কার্য্য কারণাত্মক জগতে থাকিয়া আমরা এমন কিছু কল্পনা করিতে পারি না যেখানে ঐ কার্য্য কারণাত্মকভাব থাকিবে না—তাহা সুখময় স্বর্গই

হউক আর যাহাই হউক। অতএব স্বাধীন হইতে হইলে আমাদিগকে এমন স্থানে যাইতে হইবে যাহা মানব জ্ঞান-বুদ্ধির অগোচর। অন্য কথায় মানব-মনোবুদ্ধি-গোচর জগতের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে হইবে। এই জগতে থাকিব অথচ স্বাধীন হইব এরূপ ভাব ত্যাগ করিতে হইবে। এ জগতের ক্ষণস্থায়ী জীবনের মমতা, সুখের আশা, পিতা মাতা, বন্ধু-বান্ধব, এবং জগতের সকলের সহিত সম্বন্ধ নির্ম্মমভাবে ত্যাগ করিতে হইবে। তবেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব—কারণ বহুত্বই নির্ভরতার ভাব আনয়ন করে এবং যেখানে নির্ভরতা সেখানে স্বাধীনতা নাই।

উক্ত সম্বন্ধ ত্যাগের দুইটী উপায় আছে, একটী 'নেতিমুখ' অপরটী 'ইতিমুখ'। যখনই স্থির করিব এই জগতের কোন কিছুর সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, তখনই মন হইতে আত্যন্তিক ভাবে ঐ সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাই 'নেতিমুখ' পন্থা। ইহাতে কিরূপ মানসিক দৃঢ়তার প্রয়োজন, তাহা অনুমান করাও আমাদের ন্যায় মানবের পক্ষে অসম্ভব। শ্রীবুদ্ধ প্রভৃতি অবতারগণেই ঐরূপ মানসিক শক্তির বিকাশ সম্ভব। শ্রীবুদ্ধের গৃহ ত্যাগের কথা স্মরণ করুন। নগর ভ্রমণ কালে পথে জরাগ্রস্ত মানবের দৃশ্য তাঁহার মনে কি অপূর্ব্ব ত্যাগের ভাবই না জাগরিত করিয়াছিল। ব্যথিতান্তঃকরণ শ্রীবুদ্ধ স্থির করিলেন জন্মজরামৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় বাহির করিতেই হইবে। যেমন সঙ্কল্প তখনই তাহার সাধন! পিতা মাতার স্নেহ, পত্নীর ভালবাসা, সুখৈশ্বর্য্যের মোহ এই দৃঢ় সঙ্কল্পের নিকট সমস্ত ভাসিয়া গেল। ঐরূপ মানসিক দৃঢ়তা যাঁহাদের আছে তাঁহারাই ঐ পথ অবলম্বনের অধিকারী। ক্ষুদ্র মানবের কি তাহা সম্ভব!

আমরা সাধারণ মানব মনে করি, আমরাও ইচ্ছা করিলে পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণের ন্যায় যে কোন মুহূর্ত্তে ত্যাগী হইতে পারি অর্থাৎ জগতের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইতে পারি। শুধু তাহাই নহে—অনেকে আবার ঐরূপ ত্যাগের ভাণ করিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জগৎ সমক্ষে প্রচারে ব্যস্ত। কিন্তু একটুও ভাবে না যে,

ঐরূপ ত্যাগ কত কর্ম্ম এবং সাধন-সাপেক্ষ, এবং কঠোর কর্ম্মের মধ্য দিয়াই ত্যাগ বা নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ হইতে পারে। যিনি কখনও কোন কর্ম্ম করিতে পরাঙ্মুখ হন না, তিনি ইচ্ছা করিলে কর্ম্ম নাও করিতে পারেন। তাঁহাতেই এই ইচ্ছা শোভন হইতে পারে। যাহার কর্ম্ম করিবারই ক্ষমতা নাই সে আবার কর্ম্ম ত্যাগ করিবে কি করিয়া! এ নৈষ্কর্ম্ম্য তাহার আলস্যপ্রসূত—ত্যাগপ্রসূত নহে। সেইজন্য পূর্ব্বোক্ত ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে দেখা উচিত আমাদিগের সকল প্রকার কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা আছে কি না। যখন বুঝিব আমাদের সকল প্রকার কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা আছে এবং সকল প্রকার কর্ম্মও করিতেছি তখনই দেখিতে পাইব কর্ম্মত্যাগকরারূপ গুণ আমাদিগের ভিতর আপনা হইতেই সঞ্জাত হইয়াছে। তখন আর নৈষ্কর্ম্মত্ব লাভের জন্য সাধনা করিতে হইবে না, দেখিব উহা আমাদের স্বভাবই হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় পন্থা এই জগৎকে সত্যজ্ঞান করিয়া, জাগতিক সম্বন্ধ সকলকে সত্যজ্ঞান করিয়া অগ্রসর হওয়া। 'ইহার নাম ইতিমুখ পন্থা'। এই রাস্তায় আমাদের ভোগপ্রবৃত্তিগুলিকে জাগরিত করিয়া তাহাদের পূরণের জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে। এই প্রবৃত্তিমূলক পথে দেখা যায় মানুষ যেমন সুখভোগও করে তেমনি দুঃখভোগও করে। তুলনা করিয়া দেখিলে সুখ অপেক্ষা দুঃখের মাত্রাই অধিক বলিয়া প্রতীত হয়। মানুষ এই পথে দুঃখ কষ্টের ঘা খাইতে খাইতে জ্ঞানলাভ করে যে প্রবৃত্তির পথে সুখ নাই। সে দেখে, যে দুঃখ কষ্টের পারে যাইবার জন্য সে আজীবন চেষ্টা করিল কই সে ত উহা উত্তীর্ণ হইতে পারিল না! তখন সে প্রবৃত্তির পথ ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করে। যদিও এই পথে উক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করা অনেক সময় এবং আয়াস সাধ্য তথাপি সাধারণ মানবের পক্ষে ইহাই সহজগম্য। কারণ, মানবের বৃত্তিগুলি সাধারণতঃ বহির্মুখী—অর্থাৎ জাগতিক ভোগা-কাঙ্ক্ষী। একটী বেগবান অশ্বের তেজ মুহূর্ত্তমধ্যে দমন করা অপেক্ষা সে নিস্তেজ হইলে তাহাকে দমন করা কি সহজ নহে? তবে ঐ বেগ

যাঁহারা দমন করিতে পারেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু সকলের সে ক্ষমতা কোথায়।

ঐরূপভাবে যদি মানুষকে ঘা খাইয়া অভিজ্ঞতা লাভের পর নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে ত অনেক সময় নষ্ট করিতে হইবে এবং কত শক্তি বৃথাক্ষয় করিতে হইবে তাহা বলা অসম্ভব। কিন্তু কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিলে তাহাকে আর বৃথা সময় নষ্ট করিয়া ঐরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে না। কারণ, মানুষ জগতের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না হইয়া, ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া কি কৌশল অবলম্বন করিলে স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, কর্ম্মবন্ধন বিমুক্ত হইয়া স্বাধীন হইতে পারে, শক্তিসমূহের কিরূপ ব্যবহার করিলে অধিক ফল লাভ করিতে পারে, ইহাই কর্ম্মযোগ শিক্ষা দেয়। প্রবৃত্তির দাস মানব যাহাতে প্রবৃত্তির মধ্য দিয়াই মুক্তি লাভ করিতে পারে তজ্জন্য কর্ম্মযোগ উপদেশ দিতেছেন, 'কর্ম্ম করিয়া যাও কিন্তু আসক্ত হইও না।'

শুধু কর্ম্ম আমাদিগকে বদ্ধ করিতে পারে না। আমরা কর্ম্মের সহিত এবং জগতের সহিত যে আমি' 'আমার' সম্বন্ধ পাতাইয়া বসি, তাহাই আমাদের বন্ধনের কারণ। আমরা জগতে এই যে এত দুঃখ কষ্ট ভোগ করি, এত অভাব বোধ করি, তাহার কারণ, ঐ 'আমি' 'আমার' সম্বন্ধ। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায়, যে কার্য্যের সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ নাই তাহার সাফল্যে বা বিফলতায় আমি সুখে উৎফুল্ল বা দুঃখে ম্রিয়মাণ হই না। আর এই 'আমি', 'আমার' সম্বন্ধই আমাদিগকে কর্ম্মের ফলভোগী করিয়া কার্য্য-কারণ-রূপ নিয়মের বশীভূত করে। সেইজন্য কর্ম্মযোগ বলিতেছেন 'জগতের সমুদয় দ্রব্য ভোগ কর, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু তাহাদের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া বসিও না। সম্বন্ধ পাতাইলেই বন্ধন আসিয়া উপস্থিত হইবে।'

এই সম্বন্ধ ত্যাগের উপায় কি? একটী উপায়—জোর করিয়া

দৃঢ়তার সহিত কর্ম্মের ফলাফলের সহিত নিজেকে লিপ্ত হইতে না দেওয়া। ইহাতে অতিশয় মানসিক শক্তির প্রয়োজন। যাঁহারা ভগবানের অস্তিত্ব মানেন না, তাহাদের জন্য এই পন্থা অর্থাৎ তাহাদিগকে যে কোন উপায়ে হউক অনাসক্ত হইতে হইবে। দ্বিতীয় উপায়টী যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাঁহাদিগের জন্য। এই পথটী পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ। ভগবানেরই কর্ম্ম আমরা করিতেছি এবং তিনিই কর্ম্মফলভোক্তা ও দাতা, এইরূপ অপর একজনের অস্তিত্ব স্বীকার করায়, আসক্তি বুদ্ধি আপনা হইতেই কমিয়া যায়। অর্থাৎ ইহাতে মানুষকে কর্ম্ম করিতেই হইবে কিন্তু স্বামিত্ববুদ্ধি ত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের যন্ত্র স্বরূপ হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে ও সমস্ত কর্ম্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হইবে। এই পন্থা অপেক্ষাকৃত সহজ হইলেও আমাদিগকে অতি সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। কোন একটী কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া অহঙ্কারের বোঝা যেন ঘাড়ে করিয়া না বসি। স্বামিত্ববর্জ্জন বা আত্মসমর্পণের পর কোন কার্য্যের জন্য আনন্দিত বা দুঃখিত হইলে চলিবে না। এই আমিত্ব ত্যাগ শুধু বাচনিক না হইয়া যেন মন হইতেও দূরীভূত হয়। ক্রমে দেখিতে পাইবে কর্ম্ম আর আমাদিগকে বদ্ধ করিতে পারিতেছে না, আমাদের আর কোন অভাব নাই। তখন আমরা যাহা কিছু করি না কেন, এই কার্য্য কারণাত্মক জগৎ আমাদিগকে বদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না—আমরা মুক্তি লাভ করিব, স্বাধীন হইব।

ঈশ্বরচৈতন্য ও জীবচৈতন্য।

(স্বামী অমৃতানন্দ)

ঈশ্বর কল্পনা—ঈশ্বরচৈতন্য ও জীবচৈতন্য যে বস্তুতঃ এক ইহা সাধারণ ব্যক্তির কল্পনারও অতীত; কিন্তু তথাপি অপরোক্ষ-জ্ঞান বলে বলীয়ান বেদান্তের আচার্য্যগণ ঈশ্বরচৈতন্য ও জীবচৈতন্যের একত্বই ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা ঈশ্বর ও জীব যে বস্তুতঃ একই পদার্থ—কেবলমাত্র ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা কৃপাপরবশ হইয়া মনাবের ভ্রম দূর করিবার জন্য সমস্তই এক অনাদি অনন্ত নিত্যবস্তু ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত, এই সনাতন সত্য, ঐ উভয় চৈতন্যের বিশ্লেষণ দ্বার দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভেদে অজ্ঞান দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম সমষ্টি-অজ্ঞান উহা সর্ব্বজ্ঞত্বাদি উৎকৃষ্ট উপাধিবিশিষ্ট বলিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান ও ব্যষ্টি-অজ্ঞান অহঙ্কারাদি নিকৃষ্ট উপাধিবিশিষ্ট বলিয়া মলিন সত্ত্বপ্রধান। বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান সমষ্টি-অজ্ঞান উপহিত চৈতন্যই ঈশ্বরপদবাচ্য। এক অদ্বিতীয় নির্ব্বিকার ব্রহ্মের কেমন করিয়া ঈশ্বর, জীব ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থা সম্ভবপর হইল? কিরূপেই বা সেই নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের কখন সর্ব্বজ্ঞের ন্যায়, কখন অল্পজ্ঞের ন্যায় কার্য্যাদি করিবার যোগ্যতা লাভ হইল? সত্যই ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়, নির্ব্বিকার ও নিষ্ক্রিয় কিন্তু শুভ্র স্ফটিক যেরূপ লোহিত পুষ্পের সান্নিধ্যবশতঃ তৎকর্ত্তৃক উপহিত হইয়া নিজে শুভ্র হইয়াও রক্তবর্ণের ন্যায় প্রতিভাসিত হয় এবং জড় লৌহে যেমন চুম্বকের সান্নিধ্যবশতঃ চেতনত্বের ভাণ হয়, সেইরূপ নির্ব্বিকার অদ্বিতীয় ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের সমষ্টি ও ব্যষ্টি-অজ্ঞান দ্বারা উপহিত হইয়া ঈশ্বর ও জীব, সর্ব্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ ইত্যাদি অবস্থা সম্ভবপর।

সমষ্টি-অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্য সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের সাক্ষী বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ; সমস্ত জীবকে তাহাদের নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে ফলদান দ্বারা তাহাদিগকে চালাইতেছেন বলিয়া ঈশ্বর, সকল জীবের প্রেরক বলিয়া

নিয়ন্তা, সকল জীবের অন্তরে থাকিয়া বুদ্ধির নিয়ামক বলিয়া অন্তর্যামী; প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারা যায় না বলিয়া অব্যক্ত এবং চরাচর সৃষ্টির বিবর্ত্ত অধিষ্ঠান বলিয়া জগৎকারণ।

এখন দেখা যাউক বিবর্ত্ত ও পরিণামবাদ কাহাকে বলে। বিচার শাস্ত্রে দুইটি প্রধান বাদ (theory) আছে; একটি বিবর্ত্তবাদ ও অপরটি পরিণামবাদ। যখন কোন বস্তু স্বস্বরূপ বিকৃত না করিযাই আপনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তুর রূপ ধারণ করে তাহাকে বিবর্ত্তবাদ বলে।—যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। রজ্জু রজ্জুই আছে, ছিল ও পরেও থাকিবে; কিন্তু তথাপি আমার ভ্রমবশতঃ ইহাকে সর্পের ন্যায় প্রতীযমান হইল। এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে রজ্জুটি তাহার স্বস্বরূপ বিকৃত না করিয়াই সর্পভ্রম উৎপাদনের কারণ হইয়াছে; কারণ রজ্জুত কোনও দিন সর্প হইতে পারে না। যাহাকে অবলম্বন করিযা ভ্রম উৎপন্ন হয উহাকে অধিষ্ঠান বলে; অতএব রজ্জু সর্পের বিবর্ত্ত অধিষ্ঠান। ঈশ্বরও তাঁহার স্বস্বরূপ বিকারগ্রস্ত না করিয়া চরাচর সৃষ্টির বিবর্ত্ত অধিষ্ঠান। উপাদানবিশেষের বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত ও পূর্ব্বাবস্থার সহিত কিছু সৌসাদৃশ্য থাকে, ইহাকে পরিণামবাদ বলে; যেমন দুগ্ধ ও দধি। দুগ্ধ বিকৃত হইয়া দধি হয়। দুগ্ধ ও দধি একই বস্তুর একটি অবিকৃত ও অপরটি বিকৃত অবস্থা মাত্র, ইহাই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য, কিন্তু রজ্জু ও সর্পে বস্তুগতই ভেদ রহিয়াছে। বেদান্তের আচার্য্যগণ বিবর্ত্তবাদ অনুসারেই বলেন যে, এক মাত্র অপরিণামী ব্রহ্ম অধিষ্ঠানেই—রজ্জু অধিষ্ঠানে সর্পভ্রমের ন্যায় অজ্ঞানতাবশতঃ চরাচর বিশ্বপ্রপঞ্চের ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে।

সমষ্টি-অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্যকে ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, নিয়ন্তা ইত্যাদি কেন বলা হইল? এক মাত্র চৈতন্য ব্যতিরেকে জগৎ প্রপঞ্চের কারণ অজ্ঞান অর্থাৎ জগদাদি সমস্তই সমষ্টি অজ্ঞানের বা মায়ার অন্তর্গত। অতএব সমষ্টি-অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্য তদন্তর্গত সমস্ত যে জানিবেন, সকলকেই যে চালাইবেন ইহা আর আশ্চর্য্য কি? অচৈতন্য বস্তু কখনও জ্ঞাতা, নিয়ন্তা হইতে পারে

না। সুতরাং অজ্ঞান-উপহিত ঈশ্বরচৈতন্যই সর্ব্বজ্ঞ। শ্রুতিতেও আছে,—

"যঃ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন ঃ—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্ হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া

ঈশ্বরের কারণ-শরীর, আনন্দময় কোষ ও প্রলয় স্থান—নির্গুণ ব্রহ্ম যখনই অঘটনঘটনপটিয়সী মায়া কর্তৃক উপহিত হইলেন, তখনই তিনি সগুণ হইয়া পড়িলেন। এই সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর। অজ্ঞান-সমষ্টি ঈশ্বরের উপাধি হইয়া জগৎপ্রপঞ্চের কারণ হইয়াছে বলিয়া উহাকেই তাঁহার কারণ-শরীর বলা হইয়াছে। কারণ-শরীরে কেবলমাত্র মূল অজ্ঞান বা প্রকৃতি ও চৈতন্য বা পুরুষ থাকেন এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ তথায় থাকে না বলিয়া সেই কারণ-শরীর আনন্দময়। আনন্দময় কারণ-শরীর ঈশ্বরচৈতন্যকে কোষের ন্যায় আচ্ছাদন করিয়া থাকে বলিয়া উহাকে আনন্দময় কোষ বলে। শরীরের আচ্ছাদক যেমন চর্ম্ম, ঐরূপ ঈশ্বরচৈতন্যের আচ্ছাদক মায়া; সেই হেতু উহার নাম কোষ বলা হইয়াছে। প্রলয় কালে স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ অজ্ঞানে লীন হইয়া থাকে। ঈশ্বরে যখন স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ নাই তখন তাঁহার স্থান প্রলয় বুঝিতে হইবে।

যে চৈতন্য সমষ্টি-মায়া কর্তৃক উপহিত, যিনি মাত্র কারণ-শরীর-ধারী ও আনন্দময় কোষাচ্ছাদিত, প্রলয় যাঁহার স্থান, তিনিই ঈশ্বর।

জীব কল্পনা—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ব্যষ্টি-অজ্ঞান মলিন সত্ত্ব-প্রধান। এই মলিন সত্ত্বপ্রধান ব্যষ্টি-অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্যকে জীব বা প্রাজ্ঞ-চৈতন্য বলে।

জীবের কারণ-শরীর আনন্দময়কোষ ও সুষপ্তি স্থান। প্রলয়কালে মূল অজ্ঞান ঈশ্বরে বর্ত্তমান থাকিয়া পরে সৃষ্টির প্রাক্কালে হিরণ্য-গর্ভাদি প্রপঞ্চোৎপত্তির কারণ হইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাকে যেরূপ ঈশ্বরের কারণ-শরীর বলা হয়, সেইরূপ সুষুপ্তি কালে জীবগত অজ্ঞান মাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া উহাই অহঙ্কারাদি শরীর-সংস্কারের কারণ হয়

বলিয়া উহাকে জীবের কারণ-শরীর বলে এবং সে সময় আনন্দ অনুভব হয় বলিয়া এবং জীবাত্মাকে কোষের ন্যায় আচ্ছাদিত করিয়া রাখে বলিয়া, উহাই জীবচৈতন্যের আনন্দময় কোষ। সুষুপ্তিকালে স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের জ্ঞান জীবের থাকে না; সেই হেতু সুষুপ্তিই বা দৈনন্দিন প্রলয়ই জীবচৈতন্যের স্থান।

যখন আমরা জাগ্রৎ থাকি তখন স্থূল বাহ্য জগৎপ্রপঞ্চের সহিত আমাদের ব্যবহার সম্ভবপর এবং সেই হেতু উহাকে ব্যাবহারিক সত্য বলা হয়; কিন্তু যখন আমরা নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন দেখি তখন স্থূল জগৎপ্রপঞ্চের সহিত আমাদের ব্যবহার আর থাকে না। তখন কেবলমাত্র অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের ভোগ হইয়া থাকে; আবার যখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত হই তখন সূক্ষ্ম প্রপঞ্চেরও ভোগ হয় না; তখন আমরা মহা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া জড়ের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই জাগ্রৎ অবস্থায় অনুভূত ব্যাবহারিক সত্যরূপ স্থূল প্রপঞ্চ স্বপ্নাবস্থায় অনুভূত প্রাতিভাসিক সত্যরূপ সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের লয় হয় এবং গভীর নিদ্রায় স্থূল ও সূক্ষ্ম এই উভয় প্রপঞ্চেরই লয় হইয়া কেবলমাত্র এক অজ্ঞান থাকে। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের উপরম স্থানকেই সুষুপ্তি বলে। যেমন জলের ফেনার লয় তাহার কারণ তরঙ্গেতে এবং তরঙ্গের লয় মূল কারণ জলেতে হইয়া থাকে; সেইরূপ স্থূল প্রপঞ্চের লয় তাহার কারণ সূক্ষ্ম প্রপঞ্চে হয় এবং সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের লয় মূল কারণ অজ্ঞানে হইয়া থাকে। প্রলয় কালের স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের লয় মূল অজ্ঞানে হইয়া থাকে এবং সুষুপ্তিকালেও যখন স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের লয় হইয়া যায়, এবং সেই সুষুপ্তি অবস্থা যখন প্রতিদিনই আমাদের ভোগ করিতে হইতেছে, তখন উহাকে দৈনন্দিন প্রলয় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

দৈনন্দিন প্রলয়ে স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের লয় হইবার পরে যিনি বর্ত্তমান থাকেন, যিনি এই দৈনন্দিন প্রলয়ের সাক্ষীরূপে বিরাজমান, তিনিই নিত্যবস্তু, তাঁহাকেই শাস্ত্রে জীবচৈতন্য নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

প্রলয় ও সুষুপ্তিকালে অন্তঃকরণ-বৃত্তির অভাবে ঈশ্বর ও জীবের সে সময়ে আনন্দানুভব কি প্রকারে প্রমাণ হইবে? অন্তঃকরণবৃত্তির অভাবে উক্ত কালদ্বয় প্রচুর আনন্দময় হইলেও সে আনন্দের গ্রাহক যখন কেহই নাই তখন উহা যে আনন্দময় সে বিষয়ের প্রমাণ ত পাওয়া যাইতেছে না? আর কেনই বা সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে আনন্দ হইবে?

অন্তঃকরণ স্বচ্ছ হইলেও যেমন তাহার বৃত্তি অঙ্গীকার করা হয়, সেইরূপ চৈতন্য-প্রদীপ্ত-অজ্ঞান অতি সূক্ষ্মতম হইলেও তাহারও সূক্ষ্মবৃত্তি স্বীকার করা হয়। ঈশ্বর প্রলয় কালে মূল অজ্ঞান বৃত্তির দ্বারা আনন্দ অনুভব করেন, জীবও সুষুপ্তিকালে সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট অজ্ঞান বৃত্তির দ্বারা তারতম্যভাবে আনন্দ অনুভব করেন। আমরা সচরাচর ইহা দেখিতে পাই যে সুষুপ্তি হইতে উত্থিত ব্যক্তি জাগরিত হইয়া সে যে বেশ সুখে নিদ্রা গিয়াছিল ও সে সময় অজ্ঞান ছিল ইহা অনুভব করে; কারণ ঐরূপ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে, 'বেশ সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই'। অতএব সুষুপ্তোত্থিত ব্যক্তির অনুভব দ্বারা জানা যাইতেছে, সে সময় আনন্দ ও অজ্ঞান, এই উভয়েরই অস্তিত্ব থাকে। শ্রুতিতেও আছে—"আনন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞঃ"। উপরোক্ত অনুভব ও শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, প্রলয় ও সুষুপ্তিকালে ঈশ্বর ও জীবের অজ্ঞান বৃত্তির দ্বারা আনন্দানুভব অপ্রামাণ্য নহে; এবং প্রলয় ও সুষুপ্তিকালে স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের লয়ে সকল প্রকার বিক্ষেপের অভাব হয় বলিয়া ঈশ্বর ও জীব উক্ত কালদ্বয়ে আনন্দ অনুভব করেন।

বহুবৃক্ষের একত্র সমষ্টি করিয়া আমরা এক বন বলি। নদী, হ্রদ, কূপ ইত্যাদি বহু জলের সমষ্টি করিয়া আমরা এক জলাশয় বলিয়া থাকি; কিন্তু সেই এক বন অথবা এক জলাশয়কে ব্যষ্টিভাবে বলিতে হইলে আমরা বৃক্ষ, হ্রদ, তড়াগ, কূপ ইত্যাদি এইরূপ বলিয়া থাকি; সেইরূপ হিরণ্যগর্ভাদি উৎপত্তির কারণ সমষ্টি-অজ্ঞান-রূপে এক হইলেও অহঙ্কারাদি উৎপত্তির কারণ জীবগত অজ্ঞান

ব্যষ্টিভাবে অর্থাৎ পৃথক্‌ভাবে নানা এবং যখন মলিন সত্ত্বপ্রধান এই ব্যষ্টি-অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্যকে প্রাজ্ঞ বলা হইয়াছে তখন ব্যষ্টিভাবে উহা নানা, এইরূপ বলা হয় মাত্র।

বন বহুবৃক্ষের সমষ্টি বলিয়া সেই বনের ব্যষ্টি হইতে পারে, কিন্তু অজ্ঞান যখন এক তখন সেই এক অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্যের আবার সমষ্টি, ব্যষ্টি ইত্যাদি কেমন করিয়া সম্ভবপর হইবে?

অভেদ ও ভেদ দৃষ্টিই সমষ্টি ও ব্যষ্টির কারণ। ভেদ দৃষ্টিতে ব্যষ্টি, যেমন ঘট ও মৃত্তিকা; অভেদ দৃষ্টিতে এক, যেমন মৃৎপিণ্ড।

যেমন ব্যষ্টি বৃক্ষ সকল ও সমষ্টি বন বস্তুতঃ এক, যেমন ব্যষ্টি ঘট-মৃত্তিকা এবং সমষ্টি মৃৎপিণ্ড বস্তুতঃ একই পদার্থ; সেইরূপ জগৎ প্রপঞ্চোৎপত্তির কারণ ঈশ্বরগত মূল সমষ্টি অজ্ঞান এবং অহঙ্কারাদি উৎপত্তির কারণ জীবগত ব্যষ্টি-অজ্ঞান বস্তুতঃ এক।

সমষ্টি বনাবচ্ছিন্ন আকাশ, ব্যষ্টি বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশ যেমন বস্তুতঃ একই পদার্থ; তেমনি সমষ্টি-অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্য ঈশ্বর ও ব্যষ্টি অজ্ঞান-উপহিত-চৈতন্য জীব বস্তুতঃ একই পদার্থ। ঈশ্বর ও জীবে ভেদ যাহা আমরা বলিয়া থাকি, সে ভেদ চৈতন্যগত নহে, পরন্তু উহা উপাধির ভেদ বশতঃ ঐরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে মাত্র। সমষ্টি অজ্ঞান জগৎপ্রপঞ্চের কারণ বলিয়া এবং ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া তিনি কারণ-উপাধি অবচ্ছিন্ন এবং ব্যষ্টি অজ্ঞান জগৎপ্রপঞ্চরূপ কার্য্য হইয়াছে বলিয়া ও জীব সেই কার্য্যের সহিত জড়িত বলিয়া জীব-চৈতন্যকে কার্য্য উপাধি অবচ্ছিন্ন বলা হয়। এই কারণ ও কার্য্য-উপাধি ঈশ্বর-চৈতন্য ও জীবচৈতন্য হইতে পৃথক্ করিয়া দিলে এক মাত্র চৈতন্যই অবশিষ্ট থাকেন। অতএব ঈশ্বরচৈতন্য ও জীবচৈতন্য বস্তুতঃ অভেদ। বেদান্তের আচার্য্যগণও বলেন :—

"কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ।
কার্য্য কারণতাং হিত্বা পূর্ণবোধোঽবশিষ্যতে॥"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলিতেন —"বিচার করতে গেলে, যাকে 'আমি' 'আমি' কর্‌ছো দেখ্‌বে তিনি আত্মা বই আর কেউ নয়। বিচার

কর—তুমি শরীর, না হাড়, না মাংস, না আর কিছু। তখন দেখ্‌বে তুমি এ সব কিছুই নও। তোমার কোনও উপাধি নেই।" এই নিরুপাধিক চৈতন্যই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ, যাঁহার উপর এই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহত্রয়; জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়; সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিকারত্রয় এবং জীব, জগৎ, ঈশ্বর বস্তুত্রয় অধ্যারোপিত হইয়া সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে।

ভারতীয় শিক্ষা।

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

"শিবলিঙ্গ পূজার উৎপত্তি অথর্ব্ববেদ সংহিতায় যূপস্তম্ভের প্রসিদ্ধ স্তোত্র হইতে। উক্ত স্তোত্রে অনাদি অনন্ত স্তম্ভের অথবা স্কম্ভের বর্ণনা আছে; এবং উক্ত স্তম্ভই যে ব্রহ্ম, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যে প্রকার যজ্ঞের অগ্নি, শিখা, ধূম, ভস্ম, সোমলতা ও যজ্ঞ কাষ্ঠের বাহক বৃষ, মহাদেবের পিঙ্গ জটা, নীলকণ্ঠ, অঙ্গকান্তি, ও বাহনাদিতে পরিণত হইয়াছে, সেই প্রকার যূপস্কম্ভও শ্রীশঙ্করে লীন হইয়া মহিমান্বিত হইয়াছে।"—বিবেকানন্দ।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে দেখান হইয়াছে, ইজিপ্টের আইসিস এবং অসিরিস ধর্ম্মের উপর কিরূপ ভারতীয় হরগৌরী উপাসনার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। এই হরগৌরী উপাসনা যে ভারতেই প্রথম উদ্ভূত হয় তাহা জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ, ঋগ্বেদ হইতে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

ঋগ্বেদে দেখা যায়, অগ্নি দেবতাই ধীরে ধীরে রুদ্রে এবং শিখা শক্তিতে এবং বেদীই গৌরীপট্টে পরিণত হইয়াছে।

১ মণ্ডল, ২৭ সূক্তের ১০ ঋকে দেখা যায়—

জরাবোধ তদ্বিবিড্ঢি বিশেবিশে যজ্ঞিয়ায়
স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকং॥

"হে অগ্নি; তুমি স্তুতি দ্বারা জাগরিত হও; ভিন্ন ভিন্ন যজমানকে (অনুগ্রহ করিয়া) যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ যজ্ঞে প্রবেশ কর। তুমি রুদ্র, তোমাকে সুন্দর স্তোত্রে স্তুতি করিতেছি।" যাস্ক ঐ ঋকের বিষয় বলেন—"অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে।" সায়ন বলেন, "রুদ্রায় ক্রূরায় অগ্নয়ে।"

আবার ১ম, ৩৯ সূক্তের ৪র্থ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়—

ন হি বঃ শত্রুর্বিবিদে অধি দ্যবি ন ভূম্যাং রিশাদসঃ।
যুষ্মাকমস্তু তবিষী তনা যুজা রুদ্রাসো নূ চিদাধৃষে॥

"হে শত্রুহিংসক মরুৎগণ! দ্যুলোকে তোমাদিগের শত্রু নাই, পৃথিবীতেও নাই। হে রুদ্রপুত্রগণ! তোমরা একত্রিত হও। শত্রুদিগের ধর্ষানার্থ তোমাদিগের বল শীঘ্র বিস্তৃত হউক।" সায়ন 'রুদ্রাস' অর্থে "রুদ্রপুত্র মরুতঃ" করিয়াছেন। আবার দেখা যায়, রুদ্ ধাতুর অর্থ গর্জ্জন করা হয়। অতএব রুদ্র অর্থে শব্দায়মান ঝড়ের পিতা বজ্র বলিয়াই অনুমিত হয় (Vide Webers Indische Sutdien, translated in Muir's Sanskrit Text's, Vol. IV. See also Max Muller's Origin and Growth of Religion (1882), P. 216.)।

ইহা হইতে বেশ অনুমান করা যায় কিরূপে পৌরাণিক মহাদেবের বীজোদ্গম হইল।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া লই। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে লিখিয়াছেন, "বেদবিদ্যা-পারদর্শী সুবিখ্যাত শ্রীমান ম, মুলর বলেন, বৈদিক ঋষিগণ যখন যে দেবতার স্তুতি করেন, তখন তাঁহাকে পরাৎপর পরমেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া যান; উপাসক যখন এক দেবতার উপাসনা করেন, তখন অন্য কোন দেবতা তাঁহার স্মৃতিপথে উপস্থিত থাকেন না; ঋগ্বেদের বচনানুসারে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি

দেবগণ ভিন্ন ভিন্ন দেবতা নন, এক দেবতারই সংজ্ঞামাত্র; অর্থাৎ বেদাবলম্বী হিন্দুরা অন্যান্য জাতির ন্যায় বহুদেববাদী ছিলেন না। * * * সম্প্রতি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ভুবন বিখ্যাত পণ্ডিত-শিরোমণি শ্রীমান্ হুইট্‌নিও তাঁহার এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। বেদমাত্রাবলম্বী প্রাচীন হিন্দুরা যে এককালে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসনা করিতেন, ঋগ্বেদসংহিতায় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইন্দ্র ও অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণ, মিত্র ও বরুণ, দ্যৌ ও পৃথিবী, ঊষা ও রাত্রি প্রভৃতি দুই দুই দেবতার একত্র স্তুতি ঐ সংহিতার অনেক স্থানেই সন্নিবিষ্ট আছে। কেবল দুই দুই দেবতা নয়, নানা স্থানে আদিত্যগণ, মরুৎগণ প্রভৃতি বহু দেবতার একত্র সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ উল্লিখিত পূর্ব্বকালীন হিন্দুরা যে বহু দেবতার উপাসক ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।"

হুইট্‌নিওর মতে হিন্দুরা বহু দেবতার উপাসনা করিতেন বলিয়াই যে তাঁহারা বিধাতার অসীমত্ব জানিতেন না, এ কথা কি করিয়া স্বীকার করি। কারণ বেদের প্রায় সকল মণ্ডলেই সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব-নিয়ন্তার কল্পনার নিদর্শন পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন ১০ম মণ্ডলে প্রথম অদ্বৈত জ্ঞানোন্মেষের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অপর মণ্ডলসমূহেও ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। যথা—

> তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যংতি সূরয়ঃ।
> দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ ২০ ॥
> তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে।
> বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥২১॥১ ম॥২৪সূ॥

"আকাশে সর্ব্বতো বিচারী চক্ষু যেরূপ দৃষ্টি করে, বিদ্বানেরা বিষ্ণুর পরমপদ সেইরূপ সর্ব্বদা দৃষ্টি করেন।"

"স্তুতিবাদক ও সদা জাগরূক মেধাবী লোকেরা সেই বিষ্ণুর পরম পদ প্রদীপ্ত করেন।"

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমা সমাসতে ॥৩৯॥
১ম॥১৬৪সূ॥

"সকল দেবগণ পরম ব্যোমসদৃশ ঋকের অক্ষরে উপবেশন করিয়াছেন। এ কথা যে না জানে, ঋক্ দ্বারা সে কি করিবে? একথা যাহারা জানে, তাঁহারা সুখে অবস্থান করে।"

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইংদ্রো মায়াভিঃ পরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ ॥১৮॥
৬ম॥৪৭সূ॥

"সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধিভূত এই ইন্দ্র বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করেন এবং সেই সেই রূপ পরিগ্রহ করিয়া তিনি পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়েন। তিনি মায়া দ্বারা বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া যজমানগণের নিকট উপস্থিত হয়েন। কারণ তাঁহার রথে সহস্র অশ্ব যোজিত আছে।"

ইহা ছাড়া

"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" ॥১ম॥১৬৪সূ॥৪৬ঋ॥

"অহং রুদ্রেভির্বসুভিঃ" ॥১০ম॥১২৫সূ॥১ঋ॥

প্রভৃতি সকল জন বিদিত বহু মন্ত্র, ঋষিরা বহু দেবতার মধ্য দিয়া সেই এক পর দেবতারই উপাসনা করিতেন - প্রমাণিত করে। বহুদেবতার উপাসনা করিলেই যে সর্ব্ব শক্তিমান এক বিভুর জ্ঞান হারাইয়া ফেলিতে হয় তাহারও কোন অর্থ নাই। শঙ্করাচার্য্য, প্রভৃতি আচার্য্যগণ সকলেই এক পরব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা আবার সেই আত্মদেবতার বহুভাব ঘন মূর্ত্তি সকলও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যেমন ছিদ্রের মধ্য দিয়া বৃহৎ আকাশ দেখা যায় সেইরূপ বেদের ঋষিরা ইন্দ্রাদি দেবতার মধ্য দিয়া, এবং পুরাণের ঋষিরা গণেশাদি পঞ্চদেবতার মধ্য দিয়া সেই একই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন।

আর্য্য ঋষিরা যাহাই শ্রীমান্, বীর্য্যবান দেখিয়াছেন, তাহাতেই

পরমদেবতার অধিষ্ঠান চিন্তা করিয়া, তাহারই উপাসনা করিয়াছেন। সেই উপাসনারই একটি এই রুদ্র উপাসনা। ইহা হইতেই ক্রমে পৌরাণিক গল্পের অবতারণা হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক বৈষ্ণবেরা যেমন মহতাদি তত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গাদির উপর আরোপ করিয়া চতুর্ব্যূহরূপ এক নবভাবের উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন সেইরূপ বোধ হয় তৎকালীন ঋষিরা হরগৌরী অবতারের উপর বৈদিক তত্ব সকল আরোপিত করিয়া আর এক অপূর্ব্ব পৌরাণিক তত্বের উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন। পুরাণ বলিতেছেন, মহাদেবের পত্নীর নাম, উমা, হৈমবতী দুর্গা, অম্বিকা, দক্ষতনয়া গৌরী, কালী, করালী ইত্যাদি। কিন্তু মণ্ডুকোপনিষদেও আমরা অগ্নির সপ্ত জীহ্বার উল্লেখ দেখিতে পাই,—

কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বা ॥১ম॥২য়॥৪॥

"দুর্গাও অগ্নির একটি নাম মাত্র ছিল" (রমেশ দত্ত)। যখন রুদ্র, পুরাণে সর্ব্বসংহারক কাল হইয়া দাঁড়াইলেন তখন উপরোক্ত নাম গুলি তাঁহার পত্নী-পদবাচ্য হইয়া দাঁড়াইলেন। বাজসনেয়ী সংহিতায় অম্বিকা রুদ্রের ভগ্নি এরূপ দেখা যায়। কেনোপনিষদে উমা এবং হৈমবতীর উল্লেখ আছে, তিনি তথায় রুদ্রের পত্নী কি না বলা যায় না, কেবলমাত্র তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ ইন্দ্রের নিকট ব্যাখ্যা করিতেছেন। আবার ঋগ্বেদে দেখা যায়,—

গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী।
অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্ ॥

১ম।১৬৪ সূ ॥৪১ঋ ॥

"(মেঘ গর্জ্জনরূপ) অন্তরীক্ষচারিণী বাক্ বৃষ্টি জল সৃজনকরতঃ শব্দ করিতেছেন। তিনি কখন একপদী, কখন দ্বিপদী, কখন চতুষ্পদী, কখন অষ্টাপদী, কখনও নবপদী হন এবং কখন সহস্রাক্ষর

পরিমিত হইয়া অন্তরীক্ষের উপরিভাগে থাকিয়া শব্দ করেন।" মূলে যে "গৌরী" শব্দ আছে, সায়ন তাহার অর্থে বলেন-"মেঘগর্জ্জন, রূপ বাক্ বা শব্দ" অর্থাৎ "রুদ্র বা বজ্র নির্ঘোষ।" আবার দেখা যায়,—

ধিয়া চক্রে বরেণ্যো ভূতাণাং গর্ভমা দধে।
দক্ষস্য পিতরং তনা ॥
নি ত্বা দধে বরেণ্যং দক্ষস্যেলা সহস্কৃত।
অগ্নে সুদীতি মুশিজং ॥
৩য় ॥ ২৭ সূ ॥ ৯, ১০ ঋ ॥

"যে অগ্নি কর্ম্মদ্বারা বরণীয়, ভূতসমূহের গর্ভরূপে অবস্থিত, ও পিতাস্বরূপ, দক্ষের তনয়া সেই অগ্নিকে ধারণ করেন।"

"হে বল সম্পাদিত অগ্নি! তুমি উত্তম দীপ্তিযুক্ত, হব্যাভিলাষী ও বরণীয়। তোমাকে দক্ষের (কন্যা) ইলা ধারণ করিতেছে।"

দক্ষ তনয়া অর্থাৎ বেদীরূপা ভূমি। সায়ন ইলা অর্থে "ভূমি" করিয়াছেন। সেই ভূমি অগ্নিকে ধারণ করে অর্থাৎ বেদীতে রুদ্রাগ্নি স্থাপিত হয়। এই মন্ত্রটিই গৌরীপট্ট ও শিবলিঙ্গোৎপত্তির প্রথম নিদর্শন। এদিকে আবার বেদের স্থানে স্থানে রুদ্রের একটি নাম "ভব" পাওয়া যায় (রমেশ দত্ত)। আবার আমাদের শাস্ত্রকারেরা সকল বিষয়েরই কোনও না কোনও কারণ দেখাইতে ভাল বাসিতেন। অগ্নির রুদ্র নাম ধারণের একটি আখ্যায়িকা আছে। তৈত্তিরীয় হইতে সায়ন দেখাইয়াছেন "অসুরদিগের সহিত দেবগণের যুদ্ধের সময় অগ্নি দেবগণের নিহিত অর্থ লইয়াছিলেন, দেবগণ আসিয়া অগ্নির নিকট হইতে সেই অর্থ কাড়িয়া লইলেন। অগ্নি রোদন করিলেন, সেইজন্য তাঁহার নাম "রুদ্র" হইল। পুরাণেও এই গল্পের অনুরূপ গল্প দৃষ্ট হয়।

ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দিনে ক্ষয়দ্বীরায় প্রভরামহে মতীঃ।
যথা শম সদ্দ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্ন নাতুরং ॥
১ম। ১১৪ সূ। ১ ঋক।

"মহৎ কপর্দ্দী বীরনাশী রুদ্রকে আমরা মননীয় (স্তুতিসমূহ) অর্পণ করিতেছি, যেন দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণ সুস্থ থাকে, যেন আমাদের এই গ্রামে সকলে পুষ্ট ও রোগশূন্য হইয়া থাকে।"

রুদ্র শব্দের প্রাচীন অর্থ বজ্র এবং রুদ্র অগ্নিররূপবিশেষ ইহা আমরা দেখিয়াছি। সায়ন কপর্দ্দী অর্থে "জটিল" অথবা জটাধারী করিয়াছেন। এখন কৃষ্ণ ধূমপুঞ্জই অগ্নির জটা বলিয়া বোধ হয়। আবার দেখা যায়, বৃষ্ ধাতুর অর্থ বর্ষণ, তাহা হইতে বৃষ শব্দ হইয়াছে। মেঘই বারি বর্ষণ করে এবং মেঘই বজ্রের বাহক। সেইজন্য বৃষ রুদ্রের বাহন কল্পিত হইয়াছে। অপরে বলেন, অগ্নি কাষ্ঠের মধ্যে নিহিত, সেই যজ্ঞ কাষ্ঠ বৃষের পৃষ্ঠে আনয়ন করা হইত, সেই হেতু রুদ্রাগ্নির বাহক বৃষ। এবং যজ্ঞাবশেষ ভস্ম হইতে রুদ্রের বিভূত্যাঙ্গের কল্পনা করা হইয়াছে। স্কন্দপুরাণের আবন্ত্যখণ্ডান্তর্গত বৈশ্বানরোৎপত্তিবর্ণন নামক চতুর্থ অধ্যায়ে এ কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ভবাগ্নি ব্রহ্মাকে তাঁহার উপযুক্ত স্থানে নির্দ্দেশ করিতে বলেন। ব্রহ্মা সেই অগ্নিকে শিবাগ্নি বলিয়া চিনিতে পারেন নাই, সেইজন্য তিনি তাঁহাকে অন্যান্য অগ্নির ন্যায় সাধারণ স্থান নির্দ্দেশ করেন। তাহাতে রুদ্রাগ্নি অত্যন্ত জ্বালা-মাল বিস্তার করেন। ব্রহ্মা দেখিলেন তাঁহাতে আকার, ইকার, উকার প্রভৃতি অগ্নিও বর্ত্তমান। ব্রহ্মা ভীত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তখন কালাগ্নি রুদ্র তাঁহার স্বরূপ দেখাইলেন। ব্রহ্মা বুঝিতে পারিলেন যে এই অগ্নিই রুদ্র।

অপর দিকে দেখা যায়, জগতে দুইটি ধর্ম্ম চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে,—একটি পণ্ডিতদের ধর্ম্ম অপরটি সাধারণের। দর্শন-বিজ্ঞান-পরিমার্জ্জিত ধর্ম্ম সমাজের অতি অল্পলোকেই গ্রহণ করে। পরন্তু ষষ্ঠী, মাকাল, শীতলা, ইতু, দুর্ব্বা প্রভৃতি দেবতা; কবিকঙ্কন চণ্ডী ও দাশুরায়ের পাঁচালীই সাধারণ লোককে শাসন করিতেছে। সেই সকল দেবতাই তাহাদের ভাগ্যচক্রের বিধাতা এবং সেই সকল শাস্ত্রই তাহাদের বেদ বেদান্ত। পণ্ডিতেরা ঐ গ্রাম্য দেবতাগণকে বিশেষ স্থান না দিলেও এবং সাধারণে পণ্ডিতেদের দর্শন বিজ্ঞানাদি

না বুঝিলেও, পরস্পরের ধর্ম্ম পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে ছাড়ে না। বহু বেদান্তবাগীশ, বেদান্তচূড়ামণি "ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা" প্রতিপাদন করিয়া আসিয়াও নদীতটে অশ্বত্থমূলে সিন্দুর লেপিত ভৈরব দেবতার প্রস্তর মূর্ত্তিকে প্রণাম করিতে ছাড়েন না, বা পুত্রকন্যাদের মঙ্গল কামনা করিয়া মানিক পীরের সীন্নি মানিতে কুণ্ঠিত হন না। শাস্ত্রে না থাকিলেও তারকেশ্বরের মহিমা অনেক দেবতা অপেক্ষা বেশী। অপর দিকে পণ্ডিতের ধর্ম্মের জ্ঞান বিজ্ঞানও সাধারণের ধর্ম্মে, পল্লীভাষায় ধীরে ধীরে প্রবেশ করে। উহা হইতেই কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কবিকঙ্কনচণ্ডী প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া ধর্ম্ম রাজ্যে এক একটি নবধারার সৃজন করিয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার চল না থাকা বশতঃ সেগুলি পুনরায় দেবভাষায় লিখিত হইয়া মহাপুরাণ বা উ পুরাণ বলিয়া ঘোষিত হইতে পারিতেছে না। এই ব্যাপার শুধু এখন নয় বেদের সময়েও দেখা যায়। ঋগ্বেদাদি পাঠ করিয়া ইহা বিশেষ ভাবে অনুমিত হয় যে, ঋষিগণপ্রচলিত শুদ্ধসত্ব উপাসনা ছাড়া আরও অপরাপর বিসূচিকা, দূর্ব্বাদি নানা দেবদেবীর প্রভাব তৎকালীন আর্য্য ও অনার্য্য ভারতবাসীদের মধ্যে প্রবল মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। এমন কি, ঋগ্বেদেই আমাদের প্রতিপাদ্য দেবতা শিশ্নদেব বর্ত্তমান ছিলেন—তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদের ৭মণ্ডলের ২২সূক্তে দেখা যায়—

ন যাতব ইংদ্র জূজুবুর্ণো ন বংদনা শবিষ্ঠ বেদ্যাভিঃ।

স শর্দ্ধদর্য্যো বিষুণস্য জংতোর্মা শিশ্নদেবা অপি গুর্ঋতিং নঃ ॥৫॥

"হে ইন্দ্র! রাক্ষসগণ যেন আমাদিগকে হিংসা না করে। হে বলবত্তম ইন্দ্র! রাক্ষসগণ যেন প্রজাগণ হইতে আমাদিগকে না পৃথক্ করে। স্বামী ইন্দ্র যেন বিষম জন্তুর বধে উৎসাহান্বিত হন। শিশ্ন দেবগণ যেন আমাদিগের যজ্ঞ বিঘ্ন না করেন।" পুনশ্চ ১০ মণ্ডলের ৯৯ সূক্তে,—

স বাজং যাতাপদুষ্পদা সন্স্বর্ষাতা পরি ষদৎসনিষ্যন্।

অনর্বা যচ্ছতদুরস্য বেদো ঘ্নঞ্ছিশ্নদেবাঁ অভি চর্পসা ভূৎ॥ ৩॥

"তিনি সুচারু গতিতে গমনপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তিনি সর্ব্ববস্তুর দাতা, দিতে উদ্যত হইয়া যুদ্ধে অবস্থিত হয়েন। তিনি অবিচলিত ভাবে শতদ্বার বিশিষ্ট শত্রুপুরী হইতে ধন অপহরণ করেন এবং শিশ্নদেবগণকে নিজ তেজে পরাভব করেন"।

শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী সারদানন্দ তাঁহার 'শক্তি পূজা' নামক গ্রন্থে বলেন, "নিয়ত বর্দ্ধমান 'সুমের' জাতিরই এক ভাগ ক্রমে বাসের জন্য 'সুজলা সুফলা' দেশ বিশেষের অন্বেষণে নির্গত হইয়া স্ত্রীপুংচিহ্নের উপাসনাদি লইয়া ভারতে প্রবেশ করিল। অনেককাল সমৃদ্ধিশালী হইয়া ভারতে বাসের পর উহারই এক শাখা আবার মালাবার উপকূল হইতে নৌযানে মিসরে যাইযা নীলনদ তীরে অপর এক সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের সূচনা করিল।" কিন্তু সুমের জাতির ভারতে আসা সম্বন্ধে কোনও নিদর্শনই পাওয়া যায না। উপরন্তু তাহারাই যে মিসরে পূর্ব্ব দেশ হইত গিযাছিল এ কথা তাহারা নিজেরাই স্বীকার করে। আবার ঋগ্বেদেই যখন তাহাদের উপাসনার কথা দেখিতে পাওয়া যায় তখন তিনি অপর স্থলে যাহা বলিয়াছেন তাহাই স্থির বলিয়া বোধ হয়। "নারীর বিভূতি বা জায়াভাবের উপাসনা, পাশ্চাত্য বসু প্রাচীন কালে দ্রাবিড় জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন কারণ-প্রিয়, ভুজগভূষিত, উক্ষদেব (Bacchus) ও তচ্ছক্তি ঐশী (Isis) ইউরোপের নানাস্থানে নানাভাবে পূজা পাইতেন।" * * "প্রাচীন ইউরোপে ধর্ম্মালোকে বিস্তারের আব এক কেন্দ্র ছিল—মিসরে। ঐ মিসরও যে ভারতের ধর্ম্মালোকে দীপ্ত হইয়াছিল—এ বিষয়েরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। প্রাচীন মিসরি, মিসরের দক্ষিণ সমুদ্র দিয়া নৌকারোহণে ঐ দেশে প্রথম আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে—এ কথা মিসরিদের প্রাচীন গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। মিসরের দক্ষিণে ভারত ভিন্ন অন্যদেশ নাই। আবার দেখিতে পাওয়া যায় দাক্ষিণাত্যের মাদ্রাজাদি প্রদেশের দ্রাবিড়ির সহিত প্রাচীন মিসরের রং ঢং চেহারা,

আচার, ব্যবহার এবং পূজ্য দেবদেবীর বিশেষ সাদৃশ্য বর্ত্তমান—সেই শিবশক্তি পূজা, ষাঁড়ের সম্মান, বাবরি কাটা চুল, ধুতিপরা কাছাহীন, মিস্ কালো রং! কাজেই কেনা বলিবে—ঐ দ্রাবিড়িই মিসরে যাইয়া বহুপূর্ব্বে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল?”

পুনশ্চ মিসর যেমন পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তারের একটি কেন্দ্র, বাবিল (Babylon) সেইরূপ আর একটি কেন্দ্র। এখানেও যে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার হইয়াছিল তাহা তদ্দেশীয় সম্রাটদের বিকৃত সংস্কৃত নাম দেখিয়াই বেশ বোধগম্য হয়। যথা,—অস্থুর নতশির পাল (Assur-natsir Pal) ইনি বাবিল অস্থুরদের (Assyrian) প্রথম রাজা; ত্রিগনাথ পালেশ্বর (Tiglath Pileser) ইনি ভারতের কিয়দংশ জয় করেন। সম্মানেশ্বর (Shalmaneser); বলেশ্বর (Belshazzar); নীলগিরীশ্বর (Neriglissar); নবপালেশ্বর (Nabopolassar)—ইনি অস্থুর বেণীপালের (Assur bani-Pal) অধীনে বাবিলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং ইঁহার পুত্রই বিখ্যাত নবচন্দ্রেশ্বর (Nebuchadnezzer)। M. Lenormant অস্থুর রাজদের সমসাময়িক কতকগুলি ক্রিয়াকাণ্ডাত্মক স্তোত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই গুলির ঋগ্বেদের সহিত অনেক স্থলে মিল আছে। আবার বৌদ্ধ-জাতকে বর্ণিত সপ্তভূমিক প্রাসাদের সহিত কালদের (Chaldea) জিগারাট্সের অনেক ঐক্য বিদ্যমান। অত্রস্থ সুমের জাতির মধ্যে পুং স্ত্রী চিহ্নের উপাসনা ও অস্মদ্দেশীয় পুরাণে অস্থুরদের শিব উপাসনার কথা থাকায় এবং অস্থুর রাজগণের নামান্ত দেখিয়া তথায় যে পূর্ণ-মাত্রায় ভারতীয় শৈবধর্ম্মের প্রভাব বর্ত্তমান ছিল সে বিষয়ে প্রায় এক-প্রকার নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না কি?

এখন পূর্ব্বোল্লিখিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতেদের মতের সহিত শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী সারদানন্দের মত যদি পাঠক মিলাইয়া দেখেন তাহা হইলেই ভারতের সহিত মিসরের সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম হইবে এবং কেন প্রাচীন গ্রীক দর্শনের সহিত হিন্দু দর্শনের এত ঐক্য তাহাও বুঝিতে পারিবেন। পূর্ব্বোল্লিখিত কুটিলকেশগণই বোধ হয় মালাবার উপকূল

হইয়া সোমালিল্যাণ্ডে প্রবেশ করে। পরে দেবনহুষ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া বর্ত্তমান আবিসিনিয়ায় বসবাস করে এবং পরে ইহাদের পুনর্বিস্তারে সমগ্র মিসরদেশ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

বৈদিকী ও ভারতীয় অনার্য্যদের ধর্ম্ম মিলিত হইয়া তান্ত্রিকী পূজার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাও পূজ্যপাদ স্বামীর গ্রন্থ হইতে বেশ বুঝা যায়। "বৈদিক যুগের বিবাহ প্রথায়, কুমারী কন্যার মাতৃত্বশক্তি বিকাশের অধিকারিণী হইবার প্রথম পরিচয় প্রাপ্তিমাত্র 'গর্ভং ধেহি সিনি বালি', ইত্যাদি মন্ত্রে তাহার 'মাতৃমুখের' পূজাদির বিধান থাকায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঐ কাল হইতেই ভারত নারীতে মাতৃপূজা করিয়া আসিতেছে। মাতৃমুখ বা স্ত্রীচিহ্নের বেদোক্ত ঐ পূজা যে দ্রাবিড় জাতির মধ্যগত স্ত্রীচিহ্নের পূজার বা তন্ত্রোল্লিখিত মাতৃমুখের পূজার ন্যায় ছিল না ইহা বুঝিতে বেশ পারা যায়। উদ্দেশ্যের প্রভেদ দেখিয়াই ঐ কথা অনুমিত হয়। বৈদিকী পূজার উদ্দেশ্য কেবল মাত্র মাতৃত্বশক্তির সম্মান, প্রাচীন দ্রাবিড়ী অনুষ্ঠান সকলের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র জায়ার ভিতর দিয়া প্রকাশিতা নারী-শক্তিরই পূজা; এবং তান্ত্রিকী পূজার লক্ষ্য, মাতা এবং জায়া উভয় ভাবে প্রকাশিতা নারী-শক্তিরই মহিমা প্রচার।"

বৈদিক রুদ্রের সহিত আর্য্য মাতৃশক্তি ও অনার্য্য স্ত্রীশক্তির সম্মিলনে তন্ত্রের উৎপত্তি। যখনই শিবগৃহিণী অপূর্ব্বগুণ-রূপ-সম্পন্না উমার এবং অপরদিকে ঘোরা ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধানা মুণ্ডমালীনীর চিন্তা করা যায় তখনই ঐ মিলনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কেহ কেহ বলেন, তন্ত্র অত্যন্ত আধুনিক, উহা প্রায় খৃষ্টের ৮ম হইতে ১১দশ শতাব্দীর মধ্যে সৃষ্টি হয়। কিন্তু কতকগুলি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়ায় ঐ মত একেবারেই উল্টাইয়া গিয়াছে। জাপানের হরিউজি Horiuzi মঠে মধ্য ভারত হইতে আনিত একখানি তন্ত্র পাওয়া গিয়াছে। উহা চীনদেশীয় পুরোহিত কানশিন Kanshin ৭৫৩ খৃঃ লইয়া যান। ঐ তন্ত্র খানি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে উহা উহার মাতৃভূমিতে আরও দুই শতাব্দী পূর্ব্বে লিখিত হয়। পরে ইহাও অনুমিত হয় যে

বৌদ্ধ তন্ত্রের যুগারম্ভ যিশুখৃষ্টের সমসাময়িক। হিন্দু তন্ত্র যে তাহারও বহুপূর্ব্বে ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই কারণ বেদই এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ। এবং হিন্দু তন্ত্রের বিকৃত অবস্থাই এই বৌদ্ধ তন্ত্র। অবশ্য কোনও কোনও বিষয়ে বৌদ্ধ যুগে উহার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়।

উপনিষদেও তন্ত্রের বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য অতি প্রাচীন উপনিষদ্। উহার ১ম খণ্ডের, ৭ম অধ্যায়ে, ২য় মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় "ভূতবিদ্যাং।" শঙ্কর ইহার অর্থ করিয়াছেন ভূততন্ত্রং। অপরাপর পণ্ডিতে ইহার অর্থ করিয়াছেন "তন্ত্রশাস্ত্রং"। অথর্ব্ববেদীয় নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদে তন্ত্রের পূর্ণ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মন্ত্ররাজ নারসিংহ অনুষ্টুভ্ প্রসঙ্গে তান্ত্রিক মালামন্ত্রের স্পষ্ট আভাস সূচিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বৌদ্ধ-যুগ-পূর্ব্ব ও পর অনেক গ্রন্থে তন্ত্র শব্দটি পাওয়া যায়, যথা—

(১) সর্ব্বানুপায়ানর্থ সম্প্রধার্য্য সমুদ্ধরেৎ স্বস্য কুলস্য তন্ত্রং

(ভারত ১৩। ৪৮। ৬)।

(২) দর্শপৌর্ণমাসৌ তু পূর্ব্বং ব্যাখ্যাস্যামস্তন্ত্রস্য তত্রাম্নায়ত্বাৎ

(আশ্ব শ্রৌ ১। ১। ৩)।

(৩) তন্ত্র মঙ্গসংহতিঃ বিধ্যন্ত ইত্যর্থঃ স চাবস্থানাদি সংস্থাঙ্গপাস্তঃ প্রধানস্য তন্ত্রনাৎ তন্ত্রমিত্যুচ্যতে (কর্ক)।

কিন্তু এ সব সূত্র এবং উপনিষদের যুগের কথা। ইহারও পূর্ব্বে তন্ত্রের "শক্তি" ও "কারণ" যে ব্রাহ্মণের "সোম" ও "সহধর্ম্মিনীর" মধ্য দিয়া উঁকি মারে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এই সকল আলোচনা করিতে গিয়া পুরাণের দুটী গল্প মনে পড়ে। স্কন্দ পুরাণের কাশীখণ্ডে আছে সুদাস রাজা কাশীতে রাজ্যভার ব্রহ্মার নিকট এই স্বত্বে গ্রহণ করেন যে শিবকে ঐ স্থল ছাড়িয়া যাইতে হইবে। এদিকে মন্দর পর্ব্বত শিবকে ইচ্ছা করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মার অনুরোধে শিব মন্দর পর্ব্বতে গমন করেন। সুদাস নৃপতি অতি যজ্ঞপ্রিয় ছিলেন। যজ্ঞ বলে বলীয়ান হইয়া প্রজা পালন

করিতেন। শিবের আজ্ঞায় বিষ্ণু বৌদ্ধ মত প্রচার করিয়া তাঁহার বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের উচ্ছেদ করেন। তখন সুদাস হীনবীর্য্য হইয়া পড়ায় এবং শিবও পুনরায় কাশীধামে প্রবেশ করেন। এই গল্প ইহাই স্মরণ করাইয়া দেয় যে, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড এই আগম শাস্ত্রকে একেবারে ভারত বহির্গত করিয়া দেয়। পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচারের সহিত ইহার পুনরাগমন হইয়াছিল। ভাগবতে আর একটি গল্প আছে যে—নন্দী শিবনিন্দাকারীকে অভিসম্পাত করিলে ভৃগু এই বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, যে সকল ব্যক্তি মহাদেবের ব্রতধারণ করিবে তাহারা পাষণ্ডী বলিয়া খ্যাত হইবে। সেই শৌচাচারহীন ও মূঢ়বুদ্ধিদের সুরাই দেববৎ আদরণীয় হইবে। এই গল্পটি হিন্দু তন্ত্র হইতে বৌদ্ধতন্ত্রের উৎপত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

এখন এই সকল আলোচনা করিয়া বেশ বুঝা যায় যে ব্রাহ্মণের যুগে এই হিন্দু তন্ত্র হর-গৌরী বিষয়ক নানা উপাখ্যান সমন্বিত হইয়া দ্রাবিড়ীদের মধ্য দিয়া জল বা স্থল পথে নানা দেশে প্রচারিত হইয়া পড়ে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীকামাখ্যাধাম।

(শ্রীশস্ত্রপাণি শর্ম্মা।)

(উৎস)

রাত্রি গভীর-গভীর অতি সুগভীর। চরিদিকে এই পার্ব্বত্য প্রদেশে কোথাও উজ্জ্বল আলোক, কোথাও নিবিড় অন্ধকার, কোনও বস্তুর স্বাতন্ত্র্য নাই; সব এই আলোক আঁধারে যেন মিশিয়া গিয়াছে।

মানব জীবনের চিত্রই এই। কখন আলোক, কখন অন্ধকার, কখন আলোক-অন্ধকারের অপূর্ব্ব মেশামেশি।

এই মহাপুণ্য তীর্থ আদি-মাতা সতীর যোনি পীঠ। গুরুকৃপায় কাঙ্ক্ষসম্বন্ধহীন না হইলে এ মহাপীঠের প্রকৃত মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করা সাধ্যাতীত। মুখে বলা সোজা—"এই ব্রহ্মযোনি হইতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও ত্রিভুবনের উদ্ভব হইয়াছে"। কিন্তু কয়জন ইহার প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া, "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা" এই মহাবাক্য জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছেন! যোনি-মুদ্রাই মায়ের মাতৃত্বের প্রধান অভিব্যক্তি—যাহা হইতে জীবমাত্রই উৎপন্ন। অবতার হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত এই যোনি হইতে উদ্ভূত। বৃক্ষ হইতে যে ফল উৎপন্ন হয় তাহাও ঐ যোনির ভিতর দিয়া। কাঠ, পাথর, ধুলা পর্য্যন্ত একদিন ঐ যোনি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ যে গ্রহ, নক্ষত্র আকাশে জ্বলিতেছে শাস্ত্রীয় বচনে উহারাও যোনি সম্ভব।

এই সর্ব্ব-সম্ভাবী যোনি-মুদ্রা কি? লম্বা লম্বা কথায় 'আদ্যাশক্তি', 'প্রধানা প্রকৃতি' ইত্যাদি বলা যায়, কিন্তু সাদাকথায় "মা" নামে তাঁহাকে অভিহিত করিলে ক্ষতি কি? তিনি "মা," আর প্রসূত যা কিছু সবই তাঁহার সন্তান।

পশুতে মাতা-পুত্র, বা ভাই-ভগ্নী সম্বন্ধের মর্য্যাদা রক্ষা করে না। মানব জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে মর্য্যাদা বুঝে, বিশেষতঃ মায়ের মর্য্যাদা। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন না করিয়া কেহই কখন জগন্মাতার শুদ্ধ-সত্ত্ব ভাবের কিঞ্চিৎ মাত্রও অনুধাবন করিতে পারে না। মানুষের চরমোন্নতির ইহাই অলঙ্ঘনীয় ব্যবস্থা;—কেন? তা কি বুঝ্‌তে বাকি থাকে! আমরা যে স্ত্রীপুরুষ সকলে এক-মায়ের পেটের সন্তান!

কথাটা শুনিতে যত সোজা, তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করা ততটা সোজা নয়। কারণ, শোনা ও উপলব্ধি করা আকাশ পাতাল তফাৎ।

বড় বড় ভাবগুলি চিরকালই নিতান্ত সহজ ও সরল। বহু-কালাভ্যস্ত সংস্কার ও আত্মপ্রতারণা দ্বারা আমরাই সেগুলি

জটিল করিয়া তুলি। পুরুষ প্রকৃতির অবাধ মিলন ও অজস্র প্রজা সৃষ্টি ত ইতর জন্তু ও উদ্ভিদের ধর্ম্ম। ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারে সকলি হইতেছে,—তাঁহার অলঙ্ঘ্যনিয়মে মানুষের মধ্যেও ঐ ধর্ম্মপ্রভাবে প্রজা বর্দ্ধন হইতেছে, তাহা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু মানুষ জ্ঞান ও ভক্তি প্রভাবে মুক্তিকাম বা ঈশ্বর-কাম হইয়া পশু সুলভ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না, ইহাই কি ঈশ্বরের অভিপ্রেত? বিজ্ঞব্যক্তি হয়ত বলিবেন ঐ ধর্ম্ম পরিত্যাগে প্রজালোপের সম্ভাবনা। কিন্তু সে ভাবনা কার? সৃষ্টপ্রজার না সৃষ্টি কর্ত্তার? আর এক কথা বহুত্বই সৃষ্টির মূল কিন্তু যেখানে বহুত্ব সেখানেই দুঃখ ও অশান্তি। জ্ঞানী চান পূর্ণ ব্রহ্মকে সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া সমগ্র দ্বৈতপ্রপঞ্চ তাঁহাতে লীন করিতে। ইহাকেই ঋষিরা অপবর্গ বা মোক্ষ বলিয়াছেন। আর সকলেই যদি বিষ্ণুর সেই পরমপদ লাভ করিয়া সর্ব্বাত্মা, আত্মারাম হয়, তাহা হইলে দোষটা কি? কিন্তু চিরদিনই মহামায়ী এক হইয়াও বহুরূপে ক্রীড়া করিবেনই—সৃষ্টির ভাবনা আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না।

আর এক কথা—পুরুষ ও স্ত্রী, এই দ্বিবিধ সৃষ্টির কি প্রয়োজন? সকলেই যখন এক মায়ের সন্তান তবে পরস্পরে প্রবল আসক্তিযুক্ত এই মিথুন গঠনের কি উদ্দেশ্য? গলদ গোড়াতেই—'দ্বিবিধ ভাব,' 'আসক্তি' এ সব কথা কোথা হইতে আসিল। পাঁচ বৎসরের ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে কি ভাবে দেখে? 'জ্ঞান বৃক্ষের' ফল খাইয়া আদম ও হবা সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিয়াছিল। এখন উপায় এই কামনা-রূপ সর্পের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বিষ উগরিয়া ফেল। আমাদিগকে আবার পাঁচ বৎসরের ছেলের মত হইতে হইবে। মায়ের ছেলেকে মায়ের কোলে আশ্রয় লইতে হইবে। মা ত হাত বাড়াইয়া আছেন, ঝাঁপাইয়া তাঁহার কোলে পড়িতে পারিলেই হইল। ঐ কোল ভিন্ন নিরাপদ স্থান আর কি আছে? সেখান হইতে তুমি সম্রাট্ আর তাঁহাকে ছাড়িয়া এক পা গিয়াছ কি একেবারে খানায়।

জগজ্জননী প্রসব করিয়াই ক্ষান্ত নহেন জগৎ জুড়িয়া সন্তানের জন্য

কল্যাণ-কোল পাতিয়া রাখিযাছেন। কিন্তু আমরা এমন ব্যাদ্‌ড়া যে সোজাসুজি কল্যাণের পথে কিছুতেই যাইতে চাহি না। কাজে কাজেই থাবড়া খাইতে হয়।

সংস্কার কেন হইল, কোথা হইতে আসিল, এ সব কথা বিজ্ঞ-পণ্ডিতে বলিতে পারেন ও তর্কে বুঝাইতে পারেন। আমরা কিন্তু মোটামুটি দেখিতেছি কতকগুলা মহাপাজি সংস্কার জন্মাবধি আমাদের আসে পাশে বেড়িযা রহিযাছে। তাহার পর একটি একটি করিয়া ঐ সংস্কারগুলি খসাইয়া ফেলিবার পর মনটি শুদ্ধ হইলে তবে সিদ্ধকাম হইব, এ ভাবনাটা বড আশাপ্রদ বলে বোধ করি না, বরং হৃৎকম্প হয়। আবাব শুনি অনন্ত সৃষ্টি অনন্তকাল ধরে চলিয়াছে; তোমাব আমাব কথায় বা ইচ্ছায় একটি গাছের পাতাও পল, অনুপল না গুণে পড়বে না। সমুদ্রের ঢেউ চিরকাল ধরে উঠিতেছে পড়িতেছে। তা বলিযা আমিও ত নিশ্চেষ্ট হইতে পারিতেছি না! এই যে ভাবিতেছি, ইহাও ত তাঁহারি ইচ্ছায়। পর্ব্বত প্রমাণ সংস্কারই থাকুক আর অনন্ত কালই বহিযা যাক্ "মা" তাহা বুঝিয়া লইবেন—"মা" থাক্‌তে ছেলেব অত ভাবনার প্রয়োজন কিসের?

আচ্ছা তাঁহাকে "মা" বলিতেছি কেন? কি বলব? হয় প্রভু, না হয় পিতা, না হয় স্বামী, না হয় স্ত্রী, না হয় ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোন, বন্ধু, না হয় শত্রু একটা যাহোক্ কিছু ত বলিতে হইবে। যাহাই বলি না কেন মনে মনে, জানিতেছি তিনিই সব—আর তিনি ছাড়া যাহাকিছু তাহাও তিনি। মা বলাটা সবচেয়ে সোজা, কেননা মা হতেই উৎপত্তি। আর যাহাকে চিনি বা জানি সে মারই দ্বারায়! অত কথায় দরকার কি, আব কেও আপনার থাক্ বা না থাক্ মার গর্ভ হইতে যখন হইয়াছি তখন আমি ত তাঁহারই। মা ছেলের জন্য যতটা করে অপর কেহ কি ততটা করিতে পারে? অবশ্য স্ত্রী, স্বামীর জন্য জীবন্ত পুড়িয়া মরিতে পারে, কিন্তু স্বামী যে স্ত্রীর সর্ব্বস্ব! তার নিজের সুখ দুঃখ স্বামীর সঙ্গে জড়িত। মা কি ছেলেকে সেরূপ ভালবাসে; মার স্বার্থের সম্ভাবনাটা কোথায়।

এমন কি পশু পক্ষীতে পর্য্যন্ত মাতৃ-স্নেহেরই সবচেয়ে বেশী বিকাশ দেখা যায়। মায়িক সংসারেই যখন এতটা তখন ভগবান্‌কে জগজ্জননী বলে ডাক্‌তে ইচ্ছা হবে তা আর আশ্চর্য্য কি?

এই "মা" দুই ভাবে বিরাজ করছেন দেখতে পাই। বিদ্যামায়া—স্নেহ, দয়া, শান্তিরূপিণী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা; আর অবিদ্যামায়া—মূর্ত্তিমতী পিশাচিনী। এই দুইভাবেই যে তিনি এক উপাস্য ভগবান্ তা ভাবতেও মাথা ঘুরে যায়। কিন্তু আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই কালী মূর্ত্তিতে তিনি এই দুই ভাবের পূর্ণ সমন্বয়-রূপা হয়ে রয়েছেন। তাঁর আরো এক ভাব আছে, তিনি সত্ব, রজ, তম, এই ত্রিগুণময়ী, ত্রিলোকেশ্বরী। তা তাঁর যত ভাবই হোক, আমরা তাঁহার স্নেহময় কোলের চির অধিকারী। মায়ের ভালবাসা চিরকাল সমভাবেই সন্তানে প্রবাহিত। কোন্ মা কবে ভাব বিচার করে ছেলেকে ভালবাসে? ছেলেই বা কবে মায়ের ভাব বেছে মাকে ভালবাসতে পারে। ছেলের কাছে "মা" চিরকালই "মা"। যে ভাবেই আসুন, যে মূর্ত্তিতেই আসুন ছেলের কাছে তিনি "মা"। তিনি তাঁর নিজের খুসিতে নানারূপে, নানাভঙ্গীতে বিরাজ কর্‌চেন—এই পর্য্যন্ত।

"মা" বল্লে মোটামুটি কি বুঝি। আমরা বুঝি, নিজের গর্ভধারিণী মা—তিনি যদি সত্য হন্ ত সেই জগজ্জননী আরও কত সত্য! নিজের গর্ভধারিণী মা যদি শক্তি, স্নেহ ও মমতায় অসীম হন, ত জগজ্জননী আরও কত বেশী অসীম!

এমন "মা" থাক্‌তেও যে আমরা মা কে ভুলে থাকি, এটা কি কম ভেল্কির খেলা। মা আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার নানারূপের মধ্যে তোমাকে "মা" বলে চিন্‌তে পারি—পাঁচ বছরের ছেলের মত তোমার কোলে স্থান পাই।

টলষ্টয়ের আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা।

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম, এ)

টলষ্টয়ের অনুমোদিত আদর্শ-জীবন সম্বন্ধে গত চৈত্রের উদ্বোধনে আলোচনা করা হইয়াছিল। তিনি বলেন, জীবন হইতে সকল প্রকার বিলাস ও কৃত্রিমতা বর্জ্জন করা উচিত। পৃথিবীর সকল মানবের দুঃখ, নিজের দুঃখের ন্যায় অনুভব করিয়া তাহা নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করা উচিত। তাঁহার মতে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগতের জীবন আদর্শ-জীবন হইতে বহুদূরে সরিয়া যাইতেছে,—সকলেই অর্থ এবং কল্পিত সুখের সন্ধানে ব্যস্ত। এ সকল বিষয়ে বোধ হয় টলষ্টয়ের মত অধিকাংশ লোক অনুমোদন করিবেন। কিন্তু এই উপলক্ষে টলষ্টয় বলিয়াছেন, কখনও কোনও অবস্থায় কাহাকেও আঘাত বা বধ করা উচিত নয়, যুদ্ধ ও অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধান ঈশ্বরের নির্দেশ বিরুদ্ধ। এই বিষয়ে মত-ভেদ হওয়া সম্ভব। বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এই মত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা। এ বিষয়ে হিন্দু ধর্ম্ম এবং হিন্দুশাস্ত্রের কিরূপ অভিপ্রায় তাহা দেখা যাউক।

প্রথমেই দেখা যায়, কখনও যুদ্ধ করা উচিত নয়, অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া অন্যায়,—ইহা হিন্দুশাস্ত্রের প্রচারিত আদর্শ নহে। শ্রীরামচন্দ্রের জীবন হিন্দুর আদর্শ-জীবন। তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন—অন্যায়ের প্রতিবিধানার্থ বল প্রয়োগ করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ, শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধবিমুখ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রণোদিতে করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বোধগম্য হয় ধর্ম্মযুদ্ধ এবং অধর্ম্মযুদ্ধ এতদুভয়ের প্রভেদ হিন্দুধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন এবং ধর্ম্মযুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য, না করা পাপ। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রামাণিক স্মৃতি গ্রন্থে অপরাধীর দণ্ডবিধান বিহিত হইয়াছে।

অথচ অন্যায়কারীর অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহার প্রতি সৌজন্য প্রকাশের যে মহত্ত্ব তাহাও সম্যক্‌ভাবে দেখান হইয়াছে। রামায়ণে দেখি হনুমান অশোকবনে সীতার নিকট গিয়া সংবাদ দিলেন যে, রাক্ষসসৈন্য পরাস্ত হইয়াছে এবং রাবণ নিহত হইয়াছে। অশোক-বনের রাক্ষসীদিগকে দেখিয়া হনুমানের ক্রোধ হইল, তিনি বলিলেন,

ইমাস্তু খলু রাক্ষস্যো যদি ত্বমনুমন্যসে।
হন্তুমিচ্ছামি তাঃ সর্ব্বাঃ যাভি স্ত্বং তর্জ্জিতা পুরা॥
ক্লিশ্যন্তীং পতিদেবাং ত্বাং অশোকবনিকাং গতাং।

*　　*　　*　　*

ইহ দৃষ্টা ময়া দেবি রাক্ষস্যো বিকৃতাননাঃ॥
অসকৃৎ পরুষৈর্বাক্যৈর্বদন্ত্যো রাবণাজ্ঞয়া।

"হে দেবি, এই রাক্ষসীগণ রাবণের আজ্ঞায় আপনাকে ভর্ৎসনা করিয়াছে, আমি দেখিয়াছি। আপনি অনুমতি দিলে ইহাদিগকে বধ করিব ইহা আমার ইচ্ছা।" তখন দীনবৎসলা করুণাময়ী সীতা বলিলেন—

ভাগ্যবৈষম্যদোষেণ পুরস্তাদ্দুষ্কৃতেন চ।
ময়ৈতৎ প্রাপ্যতে সর্ব্বং স্বকৃতং হ্যুপভুজ্যতে॥

*　　*　　*　　*

পাপানাং বা শুভানাং বা বধার্হাণামথাপি বা।
কার্য্যং কারুণ্যমার্য্যেণ ন কশ্চিন্নাপরাধ্যতি॥

"আমার যে এত দুঃখ হইল তাহা আমার পূর্ব্বকৃত জন্মের ফল। তাহার জন্য এই রাক্ষসীদিগের দণ্ড দিয়া কি হইবে? যতদুর অন্যায়-কারী হউক না কেন সকলের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা উচিত।"

এখানে অন্যায়কারীর প্রতি সদ্ব্যবহার করা উচিত, এই নীতি প্রচারিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে সীতাদেবী একটি পুরাণোক্ত কাহিনীর উল্লেখও করিয়াছিলেন। সে কাহিনী এইরূপ,—

কোনও ব্যাধ ব্যাঘ্রানুদ্রুত হইয়া আত্মরক্ষার্থ এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিল। ঐ বৃক্ষে এক ভল্লুক ছিল। ব্যাঘ্র ভল্লুককে বলিল,

"এই ব্যাধ আমাদের সকল বন্য জন্তুর শত্রু। উহাকে বৃক্ষ হইতে ফেলিয়া দাও।" কিন্তু ভল্লুক রাজি হইল না, বলিল, তাহা হইলে ধর্ম্মহানি হইবে।" এই বলিয়া ভল্লুক নিদ্রা গেল। তখন ব্যাঘ্র ব্যাধকে বলিল, "ভল্লুক ঘুমাইয়াছে, উহাকে বৃক্ষ হইতে ফেলিয়া দাও।" ইহা শুনিয়া ব্যাধ ভল্লুককে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। ভল্লুক কিন্তু মাটিতে পড়িল না, অপর শাখা ধরিয়া ফেলিল। তখন ব্যাঘ্র ভল্লুককে পুনরায় বলিল, "ব্যাধ তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছে উহাকে ফেলিয়া দাও।" কিন্তু তাহাতেও ভল্লুক রাজি হইল না। সে বলিল—

ন পরঃ পাপমাদত্তে পরেষাং পাপকর্ম্মণাং
সময়ো রক্ষিতব্যোহি সন্তশ্চারিত্রভূষণাঃ ॥
সময়ঃ=অপকর্তৃষু প্রত্যপকারবর্জ্জনরূপঃ আচারঃ।

অতএব হিন্দুশাস্ত্রে অপকারীর দণ্ডবিধান এবং ক্ষমা প্রদর্শন উভয়ই আছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে কোন্ স্থলে দণ্ডবিধান করা উচিত, কোন্ স্থলে ক্ষমা করা উচিত। আমার বোধ হয় ইহার উত্তর এই ভাবে দিতে হইবে। যেখানে ক্ষমা করিলে অপরাধীর মনে অনুতাপ হইবে এবং তাহার স্বভাবের উন্নতি হওয়া সম্ভব সেখানে ক্ষমাই প্রশস্ত। কিন্তু যেখানে ক্ষমা করিলে অপরাধীর স্বভাবের কোনও পরিবর্ত্তন হইবে না, সে অন্যায় অত্যাচার করিয়া জগতের পীড়ন করিতে থাকিবে সেখানে অপরাধীর দণ্ডবিধান করাই সমুচিত। হনুমানের ভয়াবহ মূর্ত্তি দেখিয়া যে রাক্ষসীগণ প্রাণভয়ে শঙ্কিতা হইতেছিল, তাহারা যখন দেখিল, সীতাদেবী হনুমানকে নিবৃত্ত করিতেছেন, তখন তাহাদের হৃদয়ে ঘোর অনুতাপ হইবারই কথা, এবং ভবিষ্যতে কোনও অসহায় স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিতে তাহাদের পরাঙ্মুখ হওয়াই সম্ভব। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র যদি রাবণের অন্যায়ের প্রতিবিধান না করিতেন তাহা হইলে রাবণের মনের কোনও পরিবর্ত্তন হইত না। সে পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিয়া জগৎ পীড়ন করিতে থাকিত। তাই রাবণের অন্যায়ের দণ্ডবিধান করাই সমুচিত হইয়াছিল। অতএব অপরাধীর দণ্ডবিধান

করা উচিত কি না তাহা স্থির করিতে হইলে, অপরাধীর স্বভাবের কোনও পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব কি না তাহার বিচার করা প্রয়োজন এবং কিসে জগতের কল্যাণ হইবে তাহাও দেখিতে হইবে। আমাকে দুঃখ দিয়াছে বলিয়া উহাকে দণ্ড দিতে হইবে,—এই প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি দমন করা উচিত। আমি যে দুঃখ পাইয়াছি তাহার কারণ আমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম। আমি পূর্ব্বে পাপ না করিলে এ ব্যক্তি আমাকে দুঃখ দিতে পারিত না। পাপ যখন করিয়াছি তখন এ ব্যক্তি দুঃখ না দিলেও অন্যভাবে আমি দুঃখ পাইতাম—এ ব্যক্তি নিমিত্ত-মাত্র এইরূপ বিচার করা উচিত। তাহা হইলে মনে ক্রোধের উদয় হইবে না। শুধু দেখিতে হইবে কিসে জগতের কল্যাণ হয়, কিসে অনিষ্টকারী ব্যক্তিরও কল্যাণ হয়। এই রূপে বিবেচনা করিয়া, যেখানে দণ্ড দেওয়া প্রয়োজন হইবে, সেখানেও নিজের ক্রোধ, প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি প্রভৃতি দমন করিয়া নিষ্কাম ভাবে, আমি ভগবানের আদেশ প্রতিপালন করিতেছি এইরূপ মনে করিয়া দণ্ড দিতে হইবে। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের মত বলিয়া বোধ হয়। ভগবান্ গীতাতে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন,

মযি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥

যুদ্ধ করিবার সময় (এবং সকল কর্ম্ম করিবার সময়) কর্ম্মফলে অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য করিতে হইবে। অহঙ্কার-জ্ঞানও যথাসম্ভব বর্জ্জন করিতে হইবে।—"আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী" "তিনি আমাকে যেরূপ করাইতেছেন, আমি সেইরূপ করিতেছি" এইরূপ মনে করিতে হইবে।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥

*　　　*　　　*

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ বুঝিতেন, কোনও কর্ম্ম ন্যায় কি অন্যায় তাহা স্থির করিতে হইলে তাহার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধ সম্যক্‌রূপে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। মিথ্যা কথা বলা সাধারণতঃ অন্যায় হইলেও এমন অবস্থা হইতে পারে যখন মিথ্যা কথা বলা অন্যায় নহে। যেমন কোনও ব্যাধ এক মৃগের অনুসরণ করায় সেই মৃগ প্রাণভয়ে লুকাইল। ইহা যদি কেহ দেখিতে পায় এবং সেই ব্যাধ যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, "এই ধারে একটা মৃগ পলাইয়া আসিতেছিল, এইখানে কোথাও লুকাইয়াছে তুমি দেখিয়াছ কি?" তাহা হইলে মিথ্যা উত্তর দেওয়া অন্যায় হইবে না। কারণ অনেক সময় "আমি উত্তর দিব না" এরূপ বলাও চলে না, এরূপ বলিলে প্রশ্নকর্ত্তার মনে সন্দেহ হইবে, এবং মৃগ কোথায় লুকাইয়া আছে তাহা বাহির হইয়া পড়িতে পারে। মিথ্যা কথা বলা যেমন কোনও বিশেষ অবস্থায় দোষাবহ না হইতে পারে, সেইরূপ আঘাত করা বা হত্যা করাও বিশেষ বিশেষ অবস্থায় নির্দ্দোষ হইতে পারে। মনে কর এক দুর্ব্বৃত্ত কোনও অসহায় স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছে। তুমি হঠাৎ সেখানে আসিয়া পড়িলে। সে দুর্ব্বৃত্ত হয়ত তোমাপেক্ষা এত বেশী বলবান যে তাহাকে ধরিয়া রাখা তোমার সাধ্যাতীত। কিন্তু তোমার হাতে অস্ত্র আছে; তখন তাহা দ্বারা তুমি দুর্ব্বৃত্তকে আঘাত করিয়া অক্ষম করিতে পার। তাহা করিলে তোমার কি অন্যায় হইবে? তুমি অবশ্য প্রথমে তাহাকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিতে পার। কিন্তু সে যদি না শোনে তাহা হইলে আঘাত করা বা অবস্থা বিশেষে হত্যা করাও অন্যায় হইবে না।

কিন্তু যাঁহারা টলষ্টয়ের প্রচারিত আদর্শ গ্রহণ করেন তাঁহারা বলেন, এরূপ অবস্থাতেও আঘাত করা উচিত হইবে না, এবং আঘাত না করিয়াও কার্য্যসিদ্ধি হইবে। তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ—তুমি যদি অত্যাচারী ব্যক্তির সহিত ঘাত প্রতিঘাত কর তাহা হইলে তাহার

ক্রোধ বর্দ্ধিত হইবে এখন তাহার শরীরের বল যদি তোমার অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে সে তোমাকে পরাস্ত করিয়া তাহার অভীষ্ট অন্যায় কার্য্য করিতে অগ্রসর হইবে। কিন্তু তুমি যদি অত্যাচারীকে আঘাত না কর, যদি অত্যাচারী ব্যক্তি এবং যাহার উপর অত্যাচার হইবে উভয়ের মধ্যে গিয়া দাঁড়াও এবং নির্ব্বিরোধে ক্রুদ্ধ অত্যাচারী ব্যক্তির সকল আঘাত সহ্য কর তাহা হইলে ক্রোধ ক্রমশঃ নিঃশেষ হইয়া যাইবে, তাহার মনে কর্ত্তব্যবুদ্ধিও জাগিবে এবং সে অন্যায় হইতে বিরত হইবে। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, অনেকস্থলে এইরূপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে বটে, এবং সে স্থলে আততায়ীকে আঘাত না করাও যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু এমন অবস্থাও হইতে পারে, যেখানে বহুকাল কুকর্ম্ম করিয়া আততায়ীর স্বভাব অত্যন্ত নিকৃষ্ট হইয়াছে, ন্যায় এবং কর্ত্তব্যের ধারণা সহজে তাহার মনে উদয় হয় না, সেখানে তাহাকে আঘাত করা অন্যায় হইবে না। সব ক্ষেত্রেই যে আঘাত করা উচিত তাহা আমার বলিবার উদ্দেশ্য নহে। কোন স্থলে আঘাত করা উচিত কোনস্থলে উপদেশ দিয়া এবং প্রয়োজন হইলে নিজে আঘাত সহ্য করিয়া নিরস্ত করা উচিত, তাহা আততায়ীর চরিত্র দেখিয়া স্থির করিতে হইবে।

টলষ্টয় তাঁহার আদর্শ সমর্থন করিবার জন্য যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই যীশুর উক্তি সম্বন্ধে বিচার। সে সকল কথা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। আমাদের বিশ্বাস যীশু বাস্তবিকই 'কখনও বলপ্রয়োগ করিবে না' এই আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন এবং তদনুসারেই জীবন যাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু টলষ্টয় একটী যুক্তি দিয়াছেন তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। তিনি বলিয়াছেন, যে বল প্রয়োগ করে সে ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে। কাহাকে দণ্ড দিতে হইবে বা না হইবে তাহা ঈশ্বরের কাজ। তুমি যদি কোনও অন্যায়কারীকে দণ্ড দাও তাহা হইলে তুমি ঈশ্বরের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছ। ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে, আমার হাত দিয়া দণ্ড দেওয়া যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়,

তাহা তুমি কি করিয়া জানিলে। দণ্ড দেওয়া তাঁহার কার্য্য বটে কিন্তু তিনি ত আমাকে সেই কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারেন। এ অবস্থায় কিরূপ মনের ভাব হইতে পারে তাহা বঙ্কিমবাবু 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। রোহিণীকে দণ্ড দিবার উদ্দেশ্যে নিশাকর প্রসাদপুর গিয়াছে। নক্ষত্রচ্ছায়াপ্রদীপ্ত চিত্রার সোপানাবলীত উপর বসিয়া সে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছে ঃ—

"আমি কি নৃশংস! একজন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য এত কৌশল করিতেছি! অথবা নৃশংসতাই বা কি? দুষ্টের দমন অবশ্যই কর্ত্তব্য। যখন বন্ধুর কন্যার জীবনরক্ষার্থ এ কার্য্য বন্ধুর নিকট স্বীকার করিয়াছি, তখন অবশ্য করিব। কিন্তু আমার মন ইহাতে প্রসন্ন নয়! রোহিণী পাপীয়সী, পাপের দণ্ড দিব; পাপস্রোতের রোধ করিব; ইহাতে অপ্রসাদই বা কেন? বলিতে পারি না, বোধ হয়,সোজা পথে গেলে এত ভাবিতাম না। বাঁকা পথে গিয়াছি বলিয়াই এত সঙ্কোচ হইতেছে। আর পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার দিবার আমি কে? আমার পাপপুণ্যের যিনি দণ্ডপুরস্কার করিবেন, রোহিণীরও তিনি বিচারকর্ত্তা। বলিতে পারি না, হয়ত তিনিই এ কার্য্যে আমাকে নিয়োজিত করিয়াছেন। কি জানি, 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'।"

আর একটী কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। "কাহাকেও পীড়া দিব না" এই নীতির অনুসরণ করিলে সমস্ত জীব জগতে পর্য্যন্ত ইহার বিস্তার করা উচিত, কারণ তাহাদেরও সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে। নীতি অনুসারে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুকেও আঘাত করা অন্যায় হইবে। ব্যাধির চিকিৎসা করাও যুক্তি-সিদ্ধ হইবে না। কারণ শারীরিক ব্যাধি আরাম করিতে অনেক সময় লক্ষ লক্ষ জীবাণুর বিনাশ সাধন করিতে হয়।

মহাকবি গিরিশচন্দ্রকে বুঝিবার অন্তরায়।

(শ্রীবিনোদেশ্বর দাসগুপ্ত)

অনেকে গিরিশচন্দ্রকে মহাকবি বলিলেও সমগ্র শিক্ষিতবাঙ্গালী-সমাজ কিন্তু এখনও গিরিশচন্দ্রকে মহাকবিরূপে বরণ করিয়া লইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ইহার কারণ, গিরিশচন্দ্রের রচিত সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালী এখনও সম্যক্ ধরিতে পারে নাই। উহার কতকগুলি হেতুও আছে। তাহাই আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শিক্ষিত-সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই মোটের উপর পাশ্চাত্য ভাবাভিভূত; কেহ বেশী কেহ কম। একদল আছেন যাঁহারা পাশ্চাত্য জীবন-যাত্রার পদ্ধতি সম্যক আয়ত্ত করিয়া ভারতকে আধুনিক জাতি-সমবায়ের সমাজে উঠাইতে চান। ভারতের অতীত তাঁহাদের কাছে হয় তমসাবৃত, নয় ত আধুনিক সময়ের সম্যক্ অনুপযোগী বলিয়া একেবারে পরিহার্য্য। আর একদল আছেন যাঁহারা অতদূর যাইতে নারাজ; তাঁহারা ব্যাপার-বিশেষে ভারতীয় জীবনযাত্রার পদ্ধতি সংরক্ষণে ইচ্ছুক। কিন্তু যে সাধনা এই জীবনযাত্রার মূলে বিদ্যমান, তাহা ধরিতে না পারিয়া পাশ্চাত্যভাবের আলোকসম্পাতে ভারতের অতীত ও ভবিষ্যৎ ইতিহাসের চিত্র পরিস্ফুট করিতে চান। যাহার গুণে ভারত আজ পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যে অমর, সেই অধ্যাত্মবাদমূল সমাজগঠন যে ভারতের সনাতন বিশিষ্টতা তাহা তাঁহারা ধরিতে পারেন নাই বা মানিতে চান না। কাজেই ব্যক্তি-গত ও জাতিগত জীবনে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তা ও গৌরব কতখানি তাহা উভয় দলের কাহারও যথোচিত পরিমাণে উপলব্ধি করা হয় নাই, এবং এইজন্যই এই তত্ত্বানুশীলনে তাঁহারা বিমুখ। অনুশীলনের অভাবে আধ্যাত্মিক জীবনের রহস্য তাঁহাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য। অথচ আধ্যাত্মিক ভাবসম্বলিত নাটকেই গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে। শিক্ষিত-সমাজের যে এইরূপ অবস্থা ইহাই গিরিশচন্দ্রকে বুঝিবার পক্ষে প্রবল অন্তরায়।

নাটকে সন্নিবেশিত ঘটনাবলীর মধ্যে কার্য্যকারণসম্বন্ধ রক্ষা করা, এবং নাটকে অঙ্কিত চরিত্রসমূহের মানসিক ভাবগুলির উৎপত্তি, পুষ্টি, খেলা ও পরিণাম সুকৌশলে প্রদর্শন করা প্রভৃতি যে সব ব্যাপারে নাটককারের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, গিরিশচন্দ্রের সেই কৃতিত্ব তাঁহার ধর্ম্মমূলক নাটকসমূহেই অধিকতর পরিস্ফুট। কোন্ কোন্ অবস্থায় মানুষের প্রাণে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্মেষ হইতে পারে—কোন্ কোন্ অবস্থায় কিরূপে তাহা পরিস্ফুট হয়, পূর্ব্ব-সংস্কার আসিয়া কিরূপে নবোন্মেষিত ভাবকে সঙ্কুচিত বা প্রস্ফুটিত করে, আধ্যাত্মিকতার পথে প্রবর্ত্তক তখন কোন্ আশ্রয় ধরিয়া ইষ্টলাভে সমর্থ হয়—বিদ্যা, বুদ্ধি, ভক্তি, বিশ্বাস, জ্ঞান, বিচার, ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই ভাবের কোন অবস্থায় কতটুকু অনুকূল বা প্রতিকূল—মনোজগতের এই সব তত্ত্ব-প্রদর্শনে গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নাটকের ইতিহাসে, মানবমনের এই গভীর রহস্যের আলোচনা, এইরূপ নানাভাবে ও বিবিধ আলোকসম্পাতে আর কোনও কবি করিয়াছেন বলিয়া জানি না।

গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব মনস্তত্ত্বের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিভাগে নিযুক্ত হওয়ায় বাঙ্গালী তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্বের বিচার করিবার সুযোগ পাইল না। কারণ বর্ত্তমান শিক্ষা-দীক্ষার ফলে এই উক্তির অনুশীলনে ও ইহার ফলাফল আলোচনায় বাঙ্গালীর সহানুভূতি নাই। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদে এই অনাস্থাই গিরিশচন্দ্রকে বুঝিবার পক্ষে দুরতিক্রমণীয় অন্তরায়।

"কবিরা কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক।" মহাকবির একটি বিশেষত্ব এই যে তিনি সর্ব্বকালের শিক্ষক। এই শিক্ষা দ্বিবিধ। মনোবিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বগুলি কবি তাহার সৃষ্ট চরিত্রের সাহায্যে সহজবোধ্য করিয়া দেন। আবার প্রবৃত্তির খেলায় নায়ক-নায়িকাদের উত্থান, পতন ও বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান এবং উক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শুভাশুভ ফলসাধন প্রভৃতি অনুধাবন করিয়া সব দেশের সব সময়ের লোক কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া সমসাময়িক ব্যাপারে ও নিজের জীবনে সেই সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করিতে পারেন। এবম্বিধ

শিক্ষা সার্ব্বভৌম শিক্ষা। এ শিক্ষা জগতের সকল লোকজগতের মহাকবিগণের নিকট হইতেই পাইতে পারে। এই সার্ব্বভৌম শিক্ষা ছাড়াও মহাকবি অন্যবিধ শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। তাহার নাম জাতীয় শিক্ষা, জাতির জাতীয়ত্ব যেখানে সেখানে আঘাত করিয়া কবি সর্ব্বকালে জাতির আত্মবোধ জাগ্রত করিয়া থাকেন। সেক্ষপীয়রের নাটকাবলীতে একদিকে যেমন জগতের সকল লোকই একটা সার্ব্বজনীন শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে, তেমনি আবার ঐ নাটকাবলী ইংরাজ জাতির জাতীয়তা বোধ জাগ্রত করে। ইংরাজের উগ্র দেশাত্ম বোধ, স্বাধীনতা প্রিয়তা ও সংরক্ষণশীলতা এবং তাহার কর্ম্মকুশলতা ও প্রখর কাণ্ডজ্ঞান—এক কথায় সমগ্র ইংরাজজাতির প্রাণপ্রবাহই সেক্ষপীয়রের নাটকাবলীতে প্রতিফলিত। রামায়ণ ও মহাভারতে এমন সব আদর্শ চিত্রিত আছে যাহা সকল দেশের সকলযুগের ব্যক্তি মাত্রেরই অনুকরণীয়। আবার উহাতে ভারতের হৃদ্‌স্পন্দন ধ্বনিত বলিয়া, ভারতীয় জীবন-যন্ত্রের প্রধানসুরটি ঐ গ্রন্থদ্বয়ে বাজিতেছে সেইজন্য মহাকবি বাল্মীকি ও ব্যাস ভারতের সর্বকালেই জাতীয়তার শিক্ষক।

গিরিশচন্দ্রের যথোচিত প্রতিভার পরিচয় পাইতে হইলে বুঝিতে হইবে গিরিশচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর মধ্যে এই দ্বিবিধ শিক্ষা—সার্ব্বভৌম ও জাতীয়—কি পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা বুঝিতে গেলেই পূর্ব্বোক্ত অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হয়। গিরিশচন্দ্রের নাটকে যে সকল সার্ব্বজনীন শিক্ষা পাওয়া যায় তন্মধ্যে আধ্যাত্মিক শিক্ষাই প্রধান ও অনন্যসাধারণ। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত জগৎ আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারপূর্ব্বক আধ্যাত্মিকতা লাভের চেষ্টা না করিতেছে, ততদিন গিরিশচন্দ্রের কাব্য হইতে এই শিক্ষা লাভের অবসর কোথায়?

তাহার পর জাতীয়-শিক্ষা সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের সহিত আধুনিক বাঙ্গালীর যথেষ্ট মতানৈক্য বিদ্যমান। আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি কি তৎসম্বন্ধে যাহারা আলোচনা করেন তাহাদিগকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একদল বলেন, nationality

বলিতে যাহা বুঝায় ভারতে তাহা কখনও ছিল না। এখন তাহা গড়িয়া লইতে হইবে। যে পাশ্চাত্য দেশ হইতে ঐ জাতীয়তার ভাবটি আমদানী করা হইযাছে সেই দেশেরই অনুকরণে পাশ্চাত্য রাজনীতিকে ভিত্তি করিয়া আমরা আমাদের জাতীয়তা গড়িয়া তুলিব। অপরদল বলেন, জাতীয়তার অর্থ ব্যাপকভাবে ধরিলে বলা যায়, ভারতবর্ষে জাতীয়তা ছিল অর্থাৎ বিশেষ একটা উদ্দেশ্য লইয়া ভারতীয় জননেতাগণ ভারতবাসীর কর্ম্ম ও চিন্তা সুব্যবস্থিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন এবং কৃতকার্য্য হইযাছেন। এই যুগে যে নূতন ভারতীয় জাতি সংগঠনের কথা হইতেছে তাহার মূলেও সেই সনাতন উদ্দেশ্য ও প্রণালী থাকা উচিত। আধ্যাত্মিক সাধনাই ভারতের মুখ্য জাতীয় সাধনা—অন্যান্য ব্যাপার তাহাতে আনুষঙ্গিক ও পরিপোষক—এই কথা ভাল করিযা বুঝিয়া এই সনাতন জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

শিক্ষাপ্রাপ্ত ও মার্জ্জিতবুদ্ধি বাঙ্গালীদের অধিকাংশই প্রথমদল-ভুক্ত। অপরদলে লোকসংখ্যা কম বটে, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ কয়েকজন সূক্ষ্মদর্শী মনস্বী এই দলের অগ্রণী পুরুষ গিরিশচন্দ্র এই দলভুক্ত। তাই তিনি ধর্ম্মমূলক নাটকাদিকে জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় শিক্ষার উপায় মনে করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র বলেন—"ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু, ধর্ম্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে। * * * যেরূপ বীরচরিত্র যুদ্ধপ্রিয় বীরজাতির আদরের, সেইরূপ সহিষ্ণু, আত্মত্যাগী, লোক-ধর্ম্মসম্মানকারী নায়ক হিন্দুহৃদয়ে স্থান পাইবে। * * * এই দেশের হৃদয়গ্রাহী মৌলিকত্ব ধর্ম্মপ্রসূত হইবে। * * * এই জাতীয় অবস্থা নাটককারের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত।" (১) অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙ্গালীর সহিত গিরিশচন্দ্রের এই মতানৈক্য থাকায় গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা বুঝিতে বাঙ্গালীর বিলম্ব হইতেছে।

গিরিশচন্দ্রকে বুঝিবার পক্ষে আর এক অন্তরায় তাঁহার জীবনের

(১) ১৩১৭ সনের শ্রাবণ সংখ্যার নাট্যমন্দিরে প্রকাশিত "নাট্যকার" প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

বৈচিত্র্য। যে বৈচিত্র্য তাঁহার জীবনকে, কাহারও কাহারও মতে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে সে বৈচিত্র্যই কাহারও কাহারও নিকট গিরিশচন্দ্রকে বুঝিবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায়।

আধুনিক শিক্ষার একটা লক্ষণ এই যে, তাহা সকল লোককে একই যন্ত্রে ফেলিয়া এক ঘেয়ে করিয়া ফেলিতেছে। আদর্শের হিসাবে উদারতা ও সার্ব্বভৌমতার যতই বড়াই করুক না কেন আধুনিক শিক্ষা ঐক্য সাধন করিতে যাইয়া একাকারত্বের দাবী করিয়া বসে। লোক ধর্ম্মাচরণে এক পথাবলম্বী, ধর্ম্মমতে এক সম্প্রদায়ভুক্ত ও সামাজিক আচারব্যবহারে একাকার হউক; আহারে বিহারে শিক্ষায় দীক্ষায় ও সাধনায় মানুষ একাকার হইয়া একটি মাত্র বিশ্ব-মানব-সমাজে পরিণত হউক—ইহাই আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য। বৈচিত্র্যের মধ্যে মৌলিক একত্বের উপলব্ধিরূপ বৈদান্তিক সত্য আধুনিকতা এখনও একান্তভাবে ধরিতে পারে নাই। তাই আধুনিকতা-প্রিয় শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজের এক অঙ্গ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একঘেয়ে হইয়া উঠিতেছে। তাহারই ফলে তাহাদের অননুমোদিত আচার ব্যবহার কর্ম্মপ্রণালী বা সাধনার পক্ষপাতী লোকের উপর তাহাদের স্বভাবতঃই এমন এক বিরাগ আসিয়া উপস্থিত হয় যে তাহার ভিতর কি আছে না আছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি হয় না। বৈচিত্র্যময় গিরিশ-জীবনের এমন মনের স্তর আছে যেখানে তাহাদের সহানুভূতির কোমল-রেখাপাত হয় না। তাই তাহারা বিরাগভরে গিরিশচন্দ্র সম্পর্কিত যাহা কিছু তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনিচ্ছুক। কাজেই গিরিশচন্দ্রকে বুঝিবার অবসরও তাহাদের হয় না।

আবার আধুনিক শিক্ষার বিলাসিতা ও দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থা, এই দুইয়ের সংঘর্ষে শিক্ষিতসমাজের অপর এক অংশের বিচার বুদ্ধির প্রখরতা, মানসিক বল ও শ্রদ্ধা এতই কমিয়া আসিয়াছে যে যেখানেই জটিলতা ও বৈচিত্র্য দেখে সেখান হইতেই তাহারা পশ্চাৎপদ ফিরিয়া আসে। যে সবল বুদ্ধিবৃত্তি, যে তীক্ষ্ণ বিচারশীলতা, যে শ্রদ্ধার ভাব, কবির তত্ত্বানুশীলনে জটিল রহস্যোৎঘাটনে লোককে সমর্থ করে বাঙ্গালী সমাজের একাঙ্গে সে বুদ্ধিবৃত্তি, বিচারশীলতা ও শ্রদ্ধা পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। তাই গিরিশ-জীবনের জটিলতা ও বৈচিত্র্য বুঝিবার জন্ত প্রয়াস পাইতে তাহাদের উদ্যম হয় না। কাজেই অন্যান্য লোক গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে অন্যান্য কারণে যে উপেক্ষার ভাব অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে, তাহারা নির্ব্বিচারে সেই উপেক্ষাকেই অবলম্বন করে।

গিরিশচন্দ্রকে বুঝিবার আর একটি অন্তরায় আছে। সমাজের মতামত উপেক্ষা করিয়া তিনি যে সর্ব্বদাই "অনাবৃত ভাবে" সংসারে বিচরণ করিয়াছেন, তাহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমাজ (অন্ততঃ তাহার এক বিশিষ্ট অংশ) তাঁহাকে কতকটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখে। এই অবজ্ঞাই গিরিশচন্দ্রকে বুঝিবার পক্ষে অপর বাধা। গিরিশচন্দ্রের জীবনকথা যাঁহাদের নিকট পরিচিত তাঁহারা জানেন "সংসার ও গিরিশবাবুর মধ্যে অনেক কাল দ্বন্দ্বই চলিয়াছিল। সংসারে মনে একপ্রকার, মুখে অন্যপ্রকার ভাবরাশি লইয়া নিজ কাটাছাঁটা কেতাদুরস্ত রীতিপদ্ধতি সম্মুখে ধরিয়া, নিন্দাস্তুতিরূপ অস্ত্রধারণ করিয়া ঈর্ষাকষায়িত নয়নে প্রতিনিয়ত তাঁহাকে অন্য সাধারণের সহিত একপথে যা'তে আহ্বান ও ভয়প্রদর্শন করিতেছিল; মনও স্বীয়গতি প্রতিরোধে অসহিষ্ণু হইয়া, সকল ভয় প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া সংসারেরই চাতুরীতে তাহাকে অধিকতর চতুর হইতে হইয়াছে বলিয়া উহারই দোষ দেখাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে অন্য পথে চলিয়াছিলেন।" * এ অবস্থায় ইহা আশা করা যাইতে পারে না যে সমাজ তাঁহার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইবে। গিরিশচন্দ্র যে অবজ্ঞা সমাজকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন, স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় তাহাই ঘৃণার আকার ধারণ করিয়া সমাজের দিক হইতে গিরিশচন্দ্রের উপর অজস্রধারে বর্ষিত হইল। এদিকে তদীয় গুরুদেবের কৃপায় গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ মনীষা ও প্রতিভার বিকাসে তাঁহার বন্ধুবর্গ যতই চমৎকৃত ও উল্লসিত হইতে লাগিলেন সমাজস্থ শত্রুপক্ষের ঘৃণা ততই বাড়িতে লাগিল। বিদ্রোহী নগণ্য হইলে অবজ্ঞা ক্রমে উপেক্ষায় পরিণত হয়। কিন্তু যদি সে মনীষা-সম্পন্ন ও প্রতিভাশালী হয়, তাহাহইলে অবজ্ঞা ঘৃণায় ঘনীভূত হইয়া লোককে নির্য্যাতন-প্রয়াসী ও নিন্দাপরায়ণ করিয়া তোলে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। সমাজ যখন দেখিল যে বিদ্রোহী অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী, তখন সে ঘৃণা ও নিন্দার আবরণে তাহার প্রতিভা-রশ্মিকে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টাপর হইল। এই প্রতিক্রিয়ার কাজ এখনও চলিতেছে। তাঁহার অদ্ভুত জীবনের উপর শিক্ষিত সমাজের এক প্রধান অঙ্গের যথোচিত সহানুভূতি নাই—কাজেই তাহার কাব্যের গুণ বিচারে প্রবৃত্তি নাই। এই জন্যও সমাজ গিরিশচন্দ্রকে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

---

* ১৩১৮ সনের ফাল্গুন সংখ্যার উদ্বোধনে প্রকাশিত "গিরিশচন্দ্র ঘোষ" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

নিভৃত চিন্তা।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ)

শ্রীরামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,

"অদ্য কিম্বা শতাব্দান্তে বাজেয়াপ্ত হবে জান না।"

অর্থাৎ আজই হউক বা একশত বর্ষ পরেই হউক, আমাদের এই শরীর থাকিবে না। যদিও আজকাল আর একশত বর্ষ বাঁচিতে বড় একটা দেখা যায় না—ইহার মধ্যেই মানবের লীলাখেলা ফুরাইয়া যায়।

বাস্তবিক এই মৃত্যুর মত কঠোর সত্য জগতে আর কিছু দেখা যায় না। অথচ ইহাকে আমরা যতটা ভুলিয়া থাকি, আর কিছুই তত ভুলিয়া থাকি না। সেই জন্য প্রাচীনকালে রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়াছিলেন—

'অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরং॥'

প্রাণিগণ প্রত্যহই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে—অথচ যাহারা বাঁচিয়া রহিয়াছে, তাহারা মনে করিতেছে, আমরা চিরকাল বাঁচিব—ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কি আছে? একদিন আমাকে মরিতেই হইবে। মরিলে আমার কি অবস্থা হইবে? আমার কি একেবারে লোপ হইবে, না, আমি তখনও থাকিব? যদি থাকি, কি অবস্থায়ই বা থাকিব?

কঠোপনিষদে গল্প আছে, নচিকেতা নামে একটী ঋষিবালক স্বয়ং মৃত্যুর অধিপতি যমকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

বাস্তবিক আমাদের এই কর্ম্মে উন্মত্তবৎ ব্যস্ততার ভিতর অনেক সময় ভুলিয়া গেলেও একটু নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেই এই প্রশ্নই ঘুরিয়া ফিরিয়া আমাদের মনে উদয় হয় আমি মরিলে কি হইবে?

অনেকে প্রশ্নটীকে চাপা দিতে চেষ্টা করেন। যাহা জানিতে পারা যায় না, তাহা লইয়া অনর্থক মাথা ঘামাইয়া বর্ত্তমান কর্ত্তব্যে উদাসীন হইয়া কি হইবে? উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়া যাও।

কিন্তু কি করিব? ঘুরিয়া ফিরিয়া যে প্রশ্ন উঠে! আবার প্রশ্ন উঠে, কর্ত্তব্য কি? কি কর্ম্ম করিব?

যমরাজও নচিকেতার প্রশ্নটী চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, এই বিষয়ে পূর্ব্বকালে দেবতারাও সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন —এ বিষয় সহজে জানিবার উপায় নাই।

কিন্তু সহজে জানা যায় না বলিয়া ত আমরা উহাকে এত সহজে ছাড়িয়া দিতে পারি না। না জানিলে যে উপায় নাই। উহা না জানিলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিরূপে নিরূপিত হইবে? মৃত্যু হইলেই যদি সব শেষ হয়, তবে আমাদের কর্ত্তব্য কি দাঁড়ায়?

যদি কাহারও নিশ্চিত জ্ঞান হইত যে, মৃত্যু হইলে সব শেষ হয়, তবে সে যদি ইহ জীবনে খুব দুঃখে কষ্টে থাকে, তবে আত্ম-হত্যাই তাহার পক্ষে একমাত্র কর্ত্তব্য—কারণ, তাহাতেই সকল যন্ত্রণার অবসান। আর যদি সে নানারূপ সুখে পরিবেষ্টিত থাকে, তবে তাহার কর্ত্তব্য কি দাঁড়ায়?—চার্ব্বাকের মত

'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥'

এই ভাবিয়াই কি সে সুখে ডুবিয়া থাকিতে পারে? আমার ত বোধ হয় তাহা পারে না। মানুষ নাস্তিক্যভাব অবলম্বন করিয়া নিজেকে ভুলাইতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু মন ভুলে কই? নতুবা যখন যমরাজ নচিকেতাকে সমুদয় ভোগ্যবস্তু বররূপে দিতে চাহিলেন, নচিকেতার মনে কেন সেগুলি লাগিল না? ভোগ না হয় করিলাম, কিন্তু তাহাতে হইল কি?—ভোগ্যবস্তুসমূহ এই দেখিতেছি, এই

নাই—আবার ভোগকালেই ইন্দ্রিয়শক্তিগুলিও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়—তবে দুর্ব্বিজ্ঞেয় হইলেও আমার স্বরূপজ্ঞানই কি আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয় নয় ?

আমাদের সম্মুখে দুটী পথ রহিয়াছে—একটী আপাতমনোরম—ঐ পথে উপস্থিত যথেষ্ট সুখ কিন্তু উহাতে শান্তি নাই—নিরুদ্বিগ্নভাবে ঐ সুখ ভোগ করা চলে না—সর্ব্বদাই আশঙ্কা—কখন এ সুখ চলিয়া যাইবে। আবার ঐ সুখ-ভোগের দিকে দৃষ্টি করিতে গেলে জীবনের মহত্তম লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। মন ধ্যানস্থ হয় না—চিন্তা-শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়। ভোগসুখাসক্ত না হইয়া স্থিরভাবে চিন্তা করিতে করিতে তবে যদি এই জন্মমৃত্যু মহারহস্য একটু বোধ-গম্য হয়—তবে যদি অন্ধকারে একটু আলো পাওয়া যায়।

আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত জ্ঞানের আর উপায় কি ? তবে বিষয় কামনায় যখন এই আত্মপ্রত্যয় মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের মত থাকে, ততক্ষণ তাহা দ্বারা কিছুই বুঝা যায় না। কিন্তু যখনই একটু স্থিরমনে নিজ-স্বরূপ চিন্তা করা যায়, তখনই কি মনে হয় না, আমি দেহ নহি—দেহের সঙ্গে আমার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নহে এবং দেহের মৃত্যুর সঙ্গে আমারও বিনাশ হইবে, তাহাও নহে। আমার সহিত দেহের সম্বন্ধ একটা আকস্মিক ঘটনামাত্র। আমি পূর্ব্বেও ছিলাম, পরেও থাকিব—এই কার্য্যকারণ চক্রের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই—

'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ
নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো।
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥'

আমি জ্ঞানস্বরূপ, আমি অবিকার, আমি কর্ত্তাও নহি, সুতরাং কর্ম্মের সুখদুঃখ পাপপুণ্যাদির ফলভোক্তাও নহি। তবে কেন বোধ করিতেছি, আমি কর্ত্তা—তবে কেন বোধ হইতেছে—আমি বিকারী ? এই বোধ উপাধিযোগে হইতেছে। শুধু স্থূলদেহ নহে, মনও আমার

একটী উপাধি। সেই মনের সহিত মিশিয়া মনের চাঞ্চল্যের জন্য নিজেকে চঞ্চল এবং বিকারী ও মনের অহংভাবজন্য অভিমানে আপনাকে কর্ত্তা ভাবিতেছি। কিন্তু স্থির হইয়া ভাবিলে দেখি, আমি ত কর্ত্তা নহি। সুতরাং কর্ম্মের ফলভোগ মনের হউক, আমার সহিত ঐ ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সুখ দুঃখ, স্বর্গ নরকাদির কোন সংস্রব নাই। আমি আনন্দস্বরূপ, পূর্ণস্বরূপ, নিত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ।

তবে আর কেন মিছা কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বভ্রমে ভুলিয়া থাকি? নিত্য-ধ্যান আমার স্বরূপ—নিজ স্বরূপ বুঝিয়া আমাকে শান্ত হইতে হইবে। সমুদয় উপাধি এক এক করিয়া ছাড়িতে হইবে—নিরুপাধি, নিরাময়, নিশ্চিন্ত, শান্ত, পূর্ণস্বরূপ হইতে হইবে।

কিন্তু এত দিনের উপাধিসংসর্গে যে সং সাজা হইয়াছে, তাহাকে কি চট্ করিয়া ভুলা যায়? তাই বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া সংস্কার আসিয়া চাপিয়া ধরে। সেই সংস্কারকে ক্রমে ভুলিতে হইবে। যে সত্যকে আত্মপ্রত্যয়ে সত্য বলিয়া বুঝিলাম, তাহার সম্বন্ধে বার বার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। গুরুবাক্য শাস্ত্রবাক্য ত ঐ কথাই বলে—বার বার উহা শুন—মনে মনে বার বার ঐ এক কথারই আন্দোলন কর—তার পর উহার অহরহঃই ধ্যান করিতে থাক—তবেই উহার সাক্ষাৎকার হইবে, উহাকে দেখিতে পাইবে, উহার উপলব্ধি হইবে, উহার দর্শন হইবে।

বার বার ওঙ্কার মন্ত্র জপ করিয়া, উহার দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া মনকে শান্ত কর, আর সেই শান্তমনে আত্মদর্শন কর। ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবতঃ বহির্ম্মুখ, কেবল বাহিরের কাম্যবিষয়ে ছুটিতেছে। দৃষ্টি প্রত্যাহৃত কর—চক্ষুর্দ্বয়কে অন্তর্ম্মুখী কর, কর্ণে বহির্বিষয় শুনিও না। অমৃতত্ব লাভের যদি আশা কর, তবে ধ্যানস্থ হও, দেহ ইন্দ্রিয় মন মর্ত্ত্য—উহাদের দ্বারা মৃত্যুর পারের সেই অমৃতকে পাইবে না। উহাদিগকে বশ করিতে হইবে—তবেই সেই অমৃত, আনন্দস্বরূপ তোমার বিস্ময়দৃষ্টির সমক্ষে প্রকাশিত হইবেন। উঠ, জাগো, শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের নিকট যাইয়া বুঝিতে চেষ্টা কর—এই পথ ক্ষুরধারের ন্যায়

দুর্গম। কিন্তু নিরুৎসাহ হইও না। আমরা চেষ্টা করিলে এই সূক্ষ্ম-পথও পাইতে পারি, আবার ভোগের প্রশস্ত পথও আমাদের সম্মুখে খোলা আছে। এই আত্মতত্ত্ব—এই যোগ শ্রবণে সকলেরই অধিকার। বিষয়ে ভুলিয়া এই অধিকার ত্যাগ করিও না শ্রবণ কর—জানিও অনেকে ইহাকে শ্রবণ করিতেও পায় না। আবার শুনিয়া ধারণার চেষ্টা করিতে হইবে। যদি উহা দ্বারা জীবনের পরিবর্ত্তন সাধিত না হইল, তবে আর কি হইল—উহাকে বুঝিবার চেষ্টা, জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় উহার জ্ঞান হয় না। শব্দজনিত জ্ঞানে অনেক সময় ভাবের দিকে লক্ষ্য থাকে না—'ডুকৃঞ্ করণে' করিতে করিতেই সারা জীবন গেল, কবে আর ভাব আয়ত্ত হইবে? ভাবের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে, নিজেকে নিজে জাগরিত করিয়া ঐ আত্মতত্ত্বকে জানিবার জন্য ব্যাকুল হইতে হইবে। প্রাণ ব্যাকুল হইলেই এই আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়—ইন্দ্রিয় মন প্রাণাদি যাহারা আত্মতত্ত্বের দ্বার রোধ করিয়া রহিয়াছে, তাহারা শান্ত হইয়া নিবৃত্ত হয়, তখন তিনি নিজ মহিমায় প্রকাশিত হন।

এই মনের দ্বারাই আত্মতত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে—এই মনই শুদ্ধ ও একাগ্র হইলে আত্মতত্ত্বোপলব্ধির সহায়ক হয়।

শুদ্ধ ও একাগ্র মন সহায়ে নিত্যানিত্য বিচার করিতে হইবে। জগতে আমরা দেখিতেছি নানা বস্তু—বিভিন্ন বস্তু আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজন সাধন করিতেছে। যতক্ষণ এই প্রয়োজন বোধ বা কামনা, ততক্ষণ বহু বস্তুতে আমাদের মন আবদ্ধ থাকে। কিন্তু কামনা যত কমিয়া আসে, তত আর বস্তুতে প্রয়োজন থাকে না, ততই বস্তুর তত্ত্বজ্ঞানের দিকে মন ধাবিত হয়। তত্ত্বজ্ঞান কি না, স্বরূপ জ্ঞান। আমরা যে সকল বস্তু দেখি, সেগুলির উপাদান বিচার না করিয়া তাহাদের বিভিন্ন নামরূপের দিকেই আকৃষ্ট থাকি—আমরা জালা, খুরি, ভাঁড়, কলসী প্রভৃতি নামে ও ঐ ঐ প্রকার বিভিন্ন রূপে আকৃষ্ট, কিন্তু উহাদের সকলের উপাদানই যে এক মাটি,

সে দিকে আমাদের খেয়াল থাকে না। যিনি সদাসর্ব্বদা বিচার করেন, তাঁহার দৃষ্টি নামরূপ হইতে ক্রমশঃ সরিয়া গিয়া যাহার নাম, যাহার রূপ সেই দিকেই আকৃষ্ট হয়, কাজেই তাহার কর্ম্ম কমিতে থাকে।

'—নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥'

বাস্তবিক নানা বস্তু নাই—যে নানা দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুগ্রস্ত হয়।

অনিত্যে আসক্তিই মৃত্যু। কারণ, অনিত্য যাহা তাহা মৃত্যুর রাজ্যের। মৃত্যু অর্থ কি? মৃত্যু অর্থ বিকার—এই একরূপ দেখিতেছি—আবার আর একরূপ হইল। মাটির তালটার মৃত্যু হইল—উহা মরিয়া একটা হাঁড়ি হইল—আবার হাঁড়ি মরিয়া কতকগুলি চূর্ণ হইল। এইরূপ বিকার, এইরূপ অবস্থা-পরিবর্ত্তন ক্রমাগত চলিতেছে। সত্য বস্তু কি খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এই ব্যাপারকেই শাস্ত্রে ষড়্‌ভাব-বিকার নামে নির্দ্দেশ করে—জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে নশ্যতি। জন্মাইতেছে, খানিকক্ষণ থাকিতেছে, বাড়িতেছে, পরিবর্ত্তন হইতেছে, ক্ষয় হইতেছে, নষ্ট হইতেছে। মানুষ জন্মাইল, বাড়িল, ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া বৃদ্ধ হইল, মরিল। এইরূপ চলিতেছে। ইহার মধ্যে নিত্য কি? কে জন্মাইতেছে, কে বাড়িতেছে, কে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, কে নষ্ট হইতেছে? আমাদের জ্ঞান এই পরিণামীর মধ্যে অপরিণামীকে ধরিতে যায়—অপরিণামী একটা সত্তা আছে, ইহা বিশ্বাস না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না, কিন্তু উহাকে ধরিতেও পারে না। উহাকে ধরা যায় না। ইন্দ্রিয়, মন—ইহারাও পরিণামী—ইহাদের দ্বারা সেই অপরিণামীকে ধরা যাইবে কিরূপে? এইরূপ জগতের সঙ্গে আমাদের সদাসর্ব্বদা লুকোচুরি খেলা হইতেছে—আমরা আমাকেও জানিতে পারিতেছি না—জগৎকেও নহে।

দুইরূপে জানিবার চেষ্টা হইতে পারে—এক নিজেকে দেহ

বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহার মধ্যে আত্মা আছেন কি না জানিবার চেষ্টা করা, আর এক—নিজ অস্তিত্বের উপর নিজে দাঁড়াইয়া—এই অহং-প্রত্যয়গম্য আত্মাতে—আমাতে বিশ্বাসী হইয়া। আমি পিতামাতা হইতে হইয়াছি—আমি ব্রাহ্মণ বা শূদ্র, আমি বাঙ্গালী বা হিন্দুস্থানী এ এক রকমের জ্ঞান—আর আমি আমিই, আমি স্বয়ংসিদ্ধ—আমি আছি—এই জ্ঞানই আমার অস্তিত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ—শুধু বর্ত্তমান অস্তিত্বের নহে—ভূত ও ভাবী অস্তিত্বেরও প্রমাণ। দেহ কি কখন ভাবিতে পারে, আমি কোন কালে ছিলাম না বা থাকিব না? মন একটু স্থির হইলে—চিত্ত একটু নির্ম্মল হইলে এই জ্ঞানই ক্রমে নিশ্চিত জ্ঞানে পরিণত হয়। আমার নানারূপ উপাধি দেখিতেছি—মনোবৃত্তি, ইন্দ্রিয়বৃত্তি, দেহের বৃত্তি—ইত্যাদি নানাবিধ মিশ্রিত বৃত্তির সহিত আমি নিজেকে মিশাইয়া নানারূপ সুখদুঃখ বোধ করিতেছি। আমাকে এই সকল উপাধি হইতে মুক্ত করি - আমি আমি আমি এই যে ধারা আমার জ্ঞানে অবিরত উঠিতেছে, উহাকে বিষয় হইতে পৃথক্ করিয়া জানি। এই পৃথক্ করণের নামই বিবেক—ইহাই সাধনা—

মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ—

তৃণ হইতে তাহার ডাঁটাটী যেমন পৃথক্ করে—আমিও তদ্রূপ আমাকে দেহ ইন্দ্রিয় মন হইতে পৃথক্ করিবার চেষ্টা করি।

চেষ্টা, চেষ্টা—সাধনা, সাধনা। যত অধিক চেষ্টা হইবে, ততই অধিক সুখী হইব—আমি যে স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, আমি যে স্বয়ং সুখ-স্বরূপ, আমি যে নিত্যস্বরূপ, আমি যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আমাতে জন্ম মৃত্যু কোথায়? আমার আবার পিতামাতা কে? দিবারাত্র এই বিচার চলুক—দিবারাত্র এই শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন চলুক—কৈমন না সাক্ষাৎকার হয়।

ওঁ—ওঁ—এই প্রণবধ্বনি অহরহঃ করিতে থাক। মন স্থির হইয়া আসিবে—মন স্থির হইয়া আসিলেই তাহাতে একটী স্বসংবেদ্য অনুভূতি প্রতিভাত হইবে। উহা রহিয়াছেই—আমরা উহাকে

দেখিতেছি না বলিয়া যেন উহা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। এই ছাই গাদা সরাইয়া আত্মতত্ত্বরূপ রত্নের উদ্ধার সাধন কর।

যমনিয়মাদি সাধনসম্পন্ন হও—ব্রহ্মচর্য্যই পরম তপস্যা। তুমি শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপ—স্বয়ং আনন্দস্বরূপ। কেন নিজেকে দেহ উপাধির সহিত মিশাইয়া আপনাকে পুরুষ স্ত্রী আদি মনে করিয়া ভ্রান্ত হইতেছ? তুমি পুরুষ বা স্ত্রী নহ—অতএব তোমার আবার স্ত্রী বা স্বামী কিরূপে থাকিতে পারে? নিজের শুদ্ধস্বরূপের অহরহঃ চিন্তা কর—ব্রহ্মচর্য্য তোমার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

প্রত্যহ খানিকক্ষণ অন্ততঃ স্থিরভাবে বসিয়া নিজস্বরূপে সমাহিত হও—দেখিবে জীবনে কি গুরুতর পরিবর্ত্তন আসিবে। তোমার কাঁচা আমি গিয়া—পাকা আমি আসিবে।

ত্যাগ, ত্যাগ—ত্যাগের দ্বারাই ক্রমে উপাধিশূন্য হইবে। উপাধি জড়াইও না—অষ্টপাশে নিজেকে জড়াইও না—বন্ধন ছিন্ন কর। তুমি সিংহ—কেন তুমি নিজের রচিত জালে নিজেকে বাঁধিয়াছ?

নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী—জগজ্জালরূপ পিঞ্জর হইতে বাহিরে এস—পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া ফেল। আর ভাঙ্গিয়া ফেলিবার একমাত্র উপায়—নিজ বলে বিশ্বাসী হওয়া---জানা যে, পিঞ্জর হইতে আমার শক্তি বড়—কোন পিঞ্জর আমাকে আটকাইয়া রাখিতে পারে না। শত শত বন্ধন আসুক—শত শত পিঞ্জর আমাকে তাহার ভিতর পুরিতে চেষ্টা করুক-কেহই আমাকে বদ্ধ করিতে পারিবে না।

আকাশ কি কখনও ঘটে আবদ্ধ হয়? তবে আমি কেন দেহে বদ্ধ হইব? তবে কেন আমি জন্মমৃত্যু শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইব? তবে কেন আমি ধর্ম্মাধর্ম্মের মধ্যে পড়িয়া নিষ্পিষ্ট হইব? আমি নিত্যমুক্ত, নিত্যানন্দ স্বভাব—শত শত বিষয় মিলিয়া আমার আনন্দ এক কণা বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না।

এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য
ন কর্ম্মণা বর্দ্ধতে নো কনীয়ান্।

অতএব আমার চাহিবারও কিছু নাই।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তংম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
ত্বমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্য পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

মোট কথা, আমাদিগকে ইন্দ্রিয় মন সংযত করিতে হইবে, তবেই আমি যে কি বস্তু, তাহা আমি জানিতে পারিব। নতুবা যদি ইন্দ্রিয় মন ক্রমাগত বিষয়াভিমুখে ধাবিত হয়, তবে ক্রমাগত অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যের জন্য আত্মার মহিমা দর্শনে আমি বঞ্চিত হইব।

ভোগপ্রবৃত্তি ও সংযম বা বৈরাগ্য – এই দুইটী সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন —ভোগের দিকে যত অধিক আমরা ধাবিত হইব, ততই ত্যাগ-প্রবৃত্তি কমিয়া আসিবে, আবার ত্যাগের দিকে গেলে ভোগপ্রবৃত্তি কমিবে। এ উভয়ের সামঞ্জস্য হওয়া অসম্ভব। কতক বৈরাগ্য ও কতক ভোগ-প্রবৃত্তি লইয়া একরূপ সামঞ্জস্য হইতে পারে বটে, কিন্তু সে সামঞ্জস্য সাময়িক মাত্র—তাহাতে শান্তি হয় না, তাহাতে একটা স্থিতি হয় না, তাহাতে একটা শেষ হয় না। উহা কিছু দিনের জন্য একটা আপোষ মাত্র – কারণ, ভোগপ্রবৃত্তি আমাকে পূর্ণ ভোগের দিকে টানিতেছে, আবার ত্যাগপ্রবৃত্তি সম্পূর্ণ ত্যাগে আমায় প্রবৃত্তি দিতেছে। এই দুইটীর মধ্যে একটী প্রবল হইয়া অপরটিকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না করিতে পারিলে পথের শেষ হইবে না।

আমার মনে হয়, এই দুইটী প্রবৃত্তির মধ্যে ভোগপ্রবৃত্তিকে যদি অবাধে বাড়িতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে যে উক্ত ত্যাগপ্রবৃত্তিকে একেবারে নষ্ট করিতে পারিবে, তাহা কখনই হইতে পারে না, কিন্তু ত্যাগপ্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ বাড়িতে দিয়া ভোগপ্রবৃত্তির একেবারে উচ্ছেদসাধন করা যাইতে পারে।

আর একটী সন্দেহ আমাদের মনে উদয় হয় যে, আমদের উন্নতি কি অনন্তকাল ধরিয়া চলিবে, না, উহার কোথাও শেষ আছে? আপাততঃ মনে হয় যখন আমরা সান্ত অথচ আমাদের লক্ষ্য যখন

অনন্ত তখন উন্নতি অনন্তকাল ধরিয়াই চলিবে, কারণ, সান্ত কখনও অনন্তের নিকট পঁহুছিতে পারে না। অনন্তের দিকে চিরকাল অগ্রসর হইবে, অথচ চিরকাল সে সান্তই থাকিয়া যাইবে। মনে কর, আমি এই আত্মতত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে ক্ষণেকের জন্য সমাধি অবস্থা লাভ করিলাম—এখন এই সমাধি অবস্থা ত আবার ভঙ্গ হয়, সুতরাং এই সমাধি অবস্থা যাহাতে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, তাহার চেষ্টা হইতে লাগিল—এই সমাধি অবস্থার স্থিতি ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল, কিন্তু এমন কোন অবস্থা আমরা কল্পনা করিতে পারি না, যে অবস্থায় সমাধি কখনও ভঙ্গ হইতে পারে না, এইরূপ নিশ্চয় হইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উন্নতি অনন্তকাল ধরিয়াই চলিবে।

আমাদের শাস্ত্রে যে মুক্তির বিষয় পড়া যায়, তাহা কিন্তু এই ধারণার বিরোধী। মুক্তি যে একটা অবস্থা বিশেষ নয়, ইহা বুঝাইবার জন্য, বিশেষতঃ অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যাকারগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, মুক্তিই ত আত্মার স্বরূপ। অর্থাৎ কেহই প্রকৃতপক্ষে বদ্ধ নহে—অথচ বদ্ধ যতক্ষণ মনে করে, ততক্ষণই সে বদ্ধ—কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে বুঝিতে পারে, আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত, তখন সে যে ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই ত্রিকালেই মুক্ত, তাহা সে বুঝিতে পারে। কিন্তু ইহাতে আবার এক সন্দেহ হয় যে, যদিও আত্মা বাস্তবিকই মুক্তস্বভাবই হয়, অথচ বুঝা বা না বুঝার জন্য যদি এতটা তারতম্য হয়, তবে এক মুহূর্ত্তে যে আমি বুঝিলাম মুক্ত, কিছুক্ষণ পরে সে বোধ চলিয়া যাইবে না, আর আমাকে আমি বদ্ধ বলিয়া মনে করিব না, তাহারই বা স্থিরতা কি? ইহার উত্তরে কথিত হয়, যথার্থ একবার বোধ হইলে আর কখনও ভ্রান্তজ্ঞান আসিতে পারে না। সুতরাং দাঁড়াইতেছে এই যে, কখনও আর অজ্ঞান না আসিলেই বুঝা যাইবে যে, যথার্থ জ্ঞান হইয়াছিল।

মোট কথা, এই জায়গায় আর তর্কবুদ্ধি বিচারবুদ্ধি ঠিক চলে না, হয় শাস্ত্রে বিশ্বাস করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে হয়, নতুবা বুদ্ধির

অতীত বোধি বা intuition নামক অবস্থা বা বৃত্তিবিশেষ স্বীকার করিয়া তাহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়।

কিন্তু অনন্ত উন্নতিই স্বীকার কর, আর মুক্তিই স্বীকার কর, বর্ত্তমান অবস্থায় যে আমাদের সাধন করিবার কিছু আছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

এই সাধন কি? –

সদাসর্ব্বদা নিজ স্বরূপের চিন্তা করাই একমাত্র সাধন—নিজ স্বরূপ বা আত্মা শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি সমুদয় বিষয়ের পারে—ধ্রুব—স্থির—অবিকারী, সদা একরূপ। সুতরাং তাহার সাধন—মনের সহিত সমুদয় কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিরোধ—বুদ্ধির পর্য্যন্ত অচাঞ্চল্য—ইহার চেষ্টা করা। সাধন অর্থেই চেষ্টা—বার বার অভ্যাস। সদা সর্ব্বদা বিচার কর ও সেই স্থির অবস্থায় থাকিবার যত্নরূপ অভ্যাস কর। এক দিনে কিছু হইবে না—বার বার চেষ্টা করিতে হইবে—তবেই যদি শান্তি লাভ হয়, তবেই যদি সেই লক্ষ্যস্থলের কাছাকাছি যাওয়া যায়।

বড় কঠিন ব্যাপার! এক কথায় ত লিখিয়া দিলাম, কিন্তু কার্য্যে ইহার কতকটাও পরিণত করা কত শক্ত! কিন্তু কঠিন বলিয়া ত ছাড়িয়া দিলে চলিবে না, কারণ, ইহা আমাদের জীবন মরণের ব্যাপার। ইন্দ্রিয়গুলি কেবল বিষয়ের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, বলপূর্ব্বক সেগুলিকে অন্তর্ম্মুখী করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সদাই বহির্ম্মুখ ভাবকে কমাইয়া অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্যও অন্তর্ম্মুখ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। এ যেন নদীর যে দিকে স্রোত যাইতেছে, তাহার বিপরীত দিকে চলিবার চেষ্টা। কিন্তু এই চেষ্টা ছাড়া যে গত্যন্তর নাই। হাল ছাড়িয়া দিলে ত চলিবে না, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়েরা আমাদিগকে বিষয় সাগরে লইয়া গিযা একেবারে ডুবাইবে। আর এই সংযমের কঠোর চেষ্টার দরুণ প্রথমে খুব ক্লেশ হইবে বটে, কিন্তু পরিণামে উহাতে শান্তি তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন, মানুষের সুখ তিন প্রকার— সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক।

তামসিক সুখ নিদ্রা আলস্যাদি হইতে হয়—উহাতে আত্মার স্বরূপ একেবারে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে, রাজসিক সুখ বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ-জনিত। তামসিক ব্যক্তির ভোগবাসনা যে নাই, তাহা নহে কিন্তু সে ভোগের জন্য কোন চেষ্টা করিবে না, অথচ ভোগ্য বস্তুগুলি তাহার নিকট আসিবে, ইহাই সে চায়। যদি কিছু চেষ্টা করে, তবে সে ভোগ করিবার সিধা রাস্তা খোঁজে—সেই জন্য তামসিক লোকেই চোর, ডাকাত, জুয়াড়ে হয়। রাজসিক লোকে খুব চেষ্টা করে—ঐ রজঃ একটু সত্ত্বসংযুক্ত হইলে সে ধর্ম্মপথে, ন্যায়পথে থাকিয়া ভোগার্জ্জনের চেষ্টা করে, কিন্তু যত সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়, ততই সে বুঝিতে পারে—

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্
পরিণামে বিষমিব—

ভোগে আপাত সুখ হইলেও উহা পরিণামে বিষতুল্য। তাই সে ভোগ্যবস্তু হইতে সরিয়া গিয়া ভোগের ইচ্ছা পর্য্যন্ত যাহাতে হৃদয়ে না উদিত হয়, তজ্জন্য অভ্যাসযোগে প্রবৃত্ত হয়—অর্থাৎ মনটা বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মায় স্থাপন করিবার চেষ্টা করে। ইহাতে তাহার বিজাতীয় কষ্ট হয়। প্রিয় বিষয়গুলি হইতে দূরে থাকিতে হইবে—মনের মধ্যে বিষয়বাসনা উঠিতেছে, সেই বাসনা তাড়াইয়া আত্মবাসনা জাগাইতে হইবে—ইহা কি কম কষ্ট? কিন্তু এই কষ্ট প্রথমেই হয়—কিন্তু যতই অধিক অভ্যাস হয়, যতই মনটা বিষয় হইতে অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্য সরিয়া আত্মরূপ কমলের মধু পান করে, ততই তাহার একটা আনন্দ, একটা সুখ লাভ হইতে থাকে। এই অভ্যাস আবার খুব স্থূল হইতেও আরম্ভ করা যাইতে পারে। অপরের সেবা করার চেষ্টা, অপরের বাহ্য দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা ইহার একটা প্রকৃষ্ট উপায়। অপরের সুখ বিধান করিতে গেলেই নিজের স্বার্থ কিছু ছাড়িতেই হয়—ভাল জিনিষ কিছু পাইলে আমি একা তাহা ভোগ করিব না, আর পাঁচ জনকে তাহার ভাগী করিব—এইরূপ চেষ্টা হইলেও বিষয়ভোগের দিকে আসক্তি কতকটা কমিয়া আসিতে থাকে—তাহাতেও কষ্ট হয়, কিন্তু অভ্যাসবশে এই পরোপকারকার্য্যেও

সুখ বোধ হয়,—এই সুখ সাত্ত্বিক সুখের আভাস। সেই জন্যই বলে,
সৎকর্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইতে থাকে
চিত্ত শুদ্ধ হইলেই শেষে আত্মজ্ঞান লাভ হয়।

শিখগুরু।

(শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র)

কালের অপ্রতিহত গতি বিশ্বরাজ্যে যে কত পরিবর্ত্তন ও নূতনত্ব লইয়া আসে তাহা নির্ণয় করা মনুষ্য বুদ্ধির অতীত। মনুষ্য নিজ তর্ক ও বিচারশক্তি সহায়ে ঐ সকলের কার্য্যকারণ সঠিক নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটাইয়া ফেলে এমন কি, অনেক সময়ে উহা ধারণা করাও তাহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। জাতীয় ইতিহাসালোচনায় ইহার পরিচয় আমরা পদে পদে দেখিতে পাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী একই আদর্শানুসরণে জাতীয় জীবন হয়ত প্রভূতশক্তিসঞ্চয়ে সমর্থ হইয়া নিজ প্রাধান্য রক্ষা করিয়া যাইল কিন্তু সমভাবে চিরদিন কাটে না—কি যেন এক অলক্ষিত শক্তি উহা সম্পূর্ণ বিভিন্নপথে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিল। সেজন্য জাতীয় উত্থান-পতন বা উন্নতি অবনতির কারণগুলির বিশ্লেষণ ও বিচার করিলে উহাদের মূলে মঙ্গলময়ের ইচ্ছাই বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। নূতন পথে জাতীয় জীবনপ্রবাহ রোধকল্পে আজ পর্য্যন্ত ত মনুষ্যের সকল চেষ্টা ও উদ্যম ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইয়াছে। অদ্ভুত নিয়তি চিরদিনই আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিয়াছে ও করিবে—ভবিতব্য কেহই খণ্ডন করিতে সক্ষম নহে।

শিখজাতির ইতিহাস আলোচনাকালে আমরা ইহাই লক্ষ্য করি। নানকপ্রমুখ গুরুগণের নেতৃত্বে শিখদিগের জাতীয় জীবন এক বিশিষ্ট

আদর্শধারায় প্রবাহিত হইতেছিল; পরে অর্জ্জুনের সময়ে শিখজাতি উক্ত মূল ধারা হইতে কিয়ৎপরিমাণে বিশ্লষ্ট হইয়া পড়িলেও উত্তরকালে হরগোবিন্দ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া এক অভিনব পন্থার অনুসরণ করিল। যে ক্ষুদ্র জলরেখা পাঞ্জাব প্রদেশের একপ্রান্তে ক্ষীণ রজতমালার ন্যায় শোভা পাইতেছিল, উহা যে কালক্রমে আবর্ত্তময়ী মহাতরঙ্গিণীতে পরিণত হইয়া স্বীয় শক্তি ও গর্ব্বভরে মানবের সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সাগরাভিমুখে ধাবিত হইবে তাহা কে ভাবিয়াছিল? বিষয় নিস্পৃহ সংযতেন্দ্রিয় তপস্বী শিখগণ যে ভবিষ্যতে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে তরবারি ধারণ করিয়া এক মহাশক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইবে তাহাই বা কে কল্পনায় আনিতে পারিয়াছিল? সর্ব্বজীবে দয়া যাহাদিগের জীবনের প্রধান ব্রত, ভগবদ্দর্শন যাহাদিগের ধ্রুবলক্ষ্য, তপস্যা ও সংযম যাহাদিগের নিত্যকর্ম্ম তাহারা যে সৈনিক জীবন যাপন করিতে পারে, তাহা কেহই অনুমান করিতে সক্ষম হয় নাই।

হরগোবিন্দ।

গুরু অর্জ্জুনের অপঘাত মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইলে শিখগণ উহা শ্রবণ করিয়া শিহরিয়া উঠিল। গুরুকে তাহারা চিরদিন সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া আসিয়াছে। তাঁহার প্রত্যেক আদেশ প্রতিপালন করিতে, মনপ্রাণ দিয়া তাঁহার সকল প্রকার স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে তাহারা আপনাদিগকে অভ্যস্ত করিয়া আসিয়াছে। সেই গুরুকে তাহাদিগের সমক্ষেই মুসলমান দৌবারিক আসিয়া বন্দী করিয়া লইয়া গেল আর তাহারা কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল—তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইল না—ইহা ভাবিয়া তাহাদিগের তীব্র আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল এবং উহার জন্য আপনাদিগের মানবজন্মকে ধিক্কার দিতে লাগিল। প্রবল অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার উপযুক্ত ক্ষমতা যাহাদিগের নাই, যাহারা স্বীয় ধর্ম্ম বিনষ্ট হইতে দেখিয়াও কোনরূপ বাধাদানে সমর্থ হয় না তাহাদিগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এই সকল চিন্তায় বিক্ষুব্ধ শিখসমাজ

আত্মরক্ষা ও প্রতিশোধ লইবার জন্য বড়ই উদগ্র হইয়া উঠিল, এবং স্বভাবতঃই উহা সমগ্র শিখসমাজে এক ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত করিল। চন্দুশাহের ন্যায় সামান্য একজন যবন যদি আত্মবলে গুরুর প্রাণহত্যায় সমর্থ হয় তাহা হইলে তাহাদিগের উপায় কি? ইহা ছাড়া শিখগণ দেখিল, চন্দুশাহ মোগলের প্রিয়পাত্র, সে যদি মোগলের সহায় লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তাহারা সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। শিখদিগের প্রতি চন্দুশাহের প্রবল বিদ্বেষ যে সহজে নির্ব্বাপিত হইবার নহে ইহাও তাহারা উত্তমরূপেই বুঝিত; তাই আসন্ন বিপদ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য শিখগণ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল।

এদিকে পিতার অপমৃত্যুর বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তেজস্বী গুরু হরগোবিন্দ একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন, তাঁহার হৃদয়ে—মুসলমান-বিদ্বেষ জাগিয়া উঠিল। তিনিও উক্ত অন্যায়ের সমুচিত প্রতিশোধ লইবার জন্য মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এই সময়ে শিখগণ যখন তাঁহাকে আপনাদিগের মনোভিলাষ জ্ঞাপন করিল তখন তিনি উহার সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেন। পাঞ্জাববাসী তদীয় উত্তেজক আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া সকল দৌর্ব্বল্য ও নৈরাশ্য পরিহরণপূর্ব্বক নব উদ্যমে অভিনব প্রণালীতে গুরুসেবা করিবার জন্য উদ্যত হইল। শিখগণ নবাদর্শে এই গুরুসেবা কার্য্যে পরিণত করিতে যাইয়া উহা শেষে দেশ ও জাতিসেবায় পরিণত করিয়া ফেলে।

আমরা জাতীয় জীবনালোচনায় দেখিয়া থাকি, নূতন ও পুরাতনের সন্ধি ও সঙ্গম স্থলে একজন উন্নত মহৎব্যক্তির আবির্ভাব হয়—যিনি বিপদে অবিচলিত, পরাজয়ে অক্ষুণ্ণ ও নৈরাশ্যে আত্মনির্ভরশীল থাকিয়া আপন প্রতিভা ও চরিত্রবলে যেন দৈবশক্তি দ্বারা চালিত হইয়াই আশা ও ভরসার বাণী শুনাইয়া জাতীয় প্রাণ সঞ্জীবিত করিয়া তুলেন। সমগ্রজাতি এইরূপ যুগপ্রবর্ত্তক মহাজনদিগের আত্মবিশ্বাসের দ্বারা উদ্বোধিত হইয়া আবার সত্যসঙ্কল্প প্রভৃত মহৎগুণ সমূহ ফিরিয়া পায়। ইঁহাদিগের আচার-ব্যবহার, কথোপকথন এমন কি দৈনন্দিন জীবন-

যাপন-প্রণালীও ব্যষ্টিজীবনে অনুপ্রেরণা ও প্রবল উত্তেজনা লইয়া আসে। এইরূপে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা সাধনা ও সিদ্ধিকে এক করিয়া লইয়া জীবন উৎসর্গ করিতে কোনরূপ কুণ্ঠা বোধ করে না। তাই দেখিতে পাই, যে সম্প্রদায় বা জাতি পূর্ব্বে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অসহায় অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছিল, সহসা এইরূপ মহাজনদিগের সংস্পর্শে উন্নতির অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করে—যাহা কেহ কখনও আশা করে নাই, তাহাই অবশেষে সম্ভব হয়।

শিখগণ হরগোবিন্দের ন্যায় একজন নেতা লাভ করিয়া আপনাদিগের অভীষ্টসাধনে তৎপর হইল। হরগোবিন্দ পিতার জীবদ্দশাতেই মোগলদিগের সহিত কিয়ৎকাল যাপন করেন—ঐসময় হইতেই অস্ত্রশিক্ষার জন্য তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে; বাল্য হইতে শারীরিক ব্যায়াম করিতে তিনি অভ্যস্ত হন এবং মোগলদিগের নিকট হইতেই রণবিদ্যা শিক্ষালাভ করেন—ভবিষ্যতে ইহা তাঁহার অত্যন্ত প্রয়োজনে আসিল। তিনিই শিখসমাজে অস্ত্রশিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তনা করেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার হস্তে অনুক্ষণ দুইখানি তরবারি থাকিত—উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি স্পষ্টই বলিতেন—"একখানি পিতার অপমৃত্যুর প্রতিশোধের জন্য এবং অপরখানি মুসলমান-শাসনের উচ্ছেদসাধনের নিমিত্ত ধারণ করিয়াছি—ইহাই আমার জীবনের ব্রত।" তিনি শিখগণকে নিয়মিতভাবে ব্যায়াম ও অস্ত্রশিক্ষা দিতে লাগিলেন—কঠোর সৈনিক জীবনের জন্য তাহারা প্রস্তুত হইতে লাগিল। প্রত্যহ অভ্যাসের ফলে তাহারা অচিরে রণকুশল সৈনিকে পরিণত হইল। হরগোবিন্দ সর্ব্বদা সশস্ত্র অনুচরে পরিবেষ্টিত থাকিতেন। শত্রু যে কোন মুহূর্ত্তে আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে, সুতরাং প্রস্তুত থাকাই বিবেচকের কর্ম্ম।

তাঁহার সময়ে সম্রাট সাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা পাঞ্জাবের রাজ-প্রতিনিধিরূপে শাসনকার্য্য অতীব দক্ষতাসহকারে পরিচালন করিতে-ছিলেন। তাঁহার সহিত গুরুর বিশেষ পরিচয় ও হৃদ্যতা ছিল। যুবরাজ কখনও কোন ধর্ম্মাবলম্বীর উপর অত্যাচার করেন নাই,

তাহা ছাড়া, তিনি শিখদিগের প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধাবানও ছিলেন, সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিবাদের কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

একটী সামান্য ঘটনা লইয়া মোগলের সহিত গুরুর বিবাদ বাধিল। উহা স্বেচ্ছাসম্ভূত কিনা তাহা সঠিক বলা যায় না। কথিত আছে, হরগোবিন্দের একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য তাঁহার জন্য একটী সুন্দর ঘোটক ক্রয় করিয়া আনে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বাদশার অনুচরদিগের ঐ সৌষ্ঠবাঙ্গ প্রাণীটী দেখিয়া খুব লোভ হইল এবং কোনমতে লোভ সম্বরণ করিতে সক্ষম না হইয়া তাহারা ঘোড়াটী বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া লাহোরে চলিয়া গেল। উহাতে কোনপ্রকার গোলযোগ ঘটিল না। ঐ ঘটনার কিছুদিন পরে ঘোড়াটী খঞ্জ হইয়া যায়। রাজ অনুচরেরা অকর্ম্মণ্য প্রাণীর কোন প্রয়োজন নাই দেখিয়া কাজীর নিকট উহা দিয়া আসিল। গুরু ঘোড়াটীকে বড় স্নেহ ও যত্ন করিতেন— তিনি দশসহস্র মুদ্রাদানে প্রতিশ্রুত হইয়া কাজীর নিকট হইতে উহা উদ্ধার করিলেন। কাজীকে প্রতারিত করিবার জন্য তিনি মুদ্রা দান না করিয়াই ঘোটকটী লইয়া লাহোর পরিত্যাগপূর্ব্বক অমৃতসহরে পলায়ন করিলেন। এই ঘটনা সম্রাট সাজাহানের কর্ণে পৌঁছিল। তিনি গুরুর অপরাধের সমুচিত দণ্ডবিধান করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে শুনিলেন হরগোবিন্দের এক দুষ্ট অনুচর তাঁহার বড় সাধের শ্বেত শ্যেন পক্ষীটী গোপনে অপহরণ করিয়াছে। এইবার সম্রাটের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, তিনি সমগ্র শিখসমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আদেশ দিলেন ও সাত হাজার অশ্বসৈন্যসহ মুকলাস খাঁকে সেনাপতি করিয়া পাঠাইলেন। এদিকে মোগলসৈন্য আক্রমণে উদ্যত হইয়াছে জানিয়া গুরু তৎক্ষণাৎ সমগ্র পাঞ্জাববাসিগণকে সত্বর সমরযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ প্রচার করিলেন। তদীয় আহ্বানবাণী শ্রবণে অবিলম্বে পঞ্চসহস্র সুদক্ষ সৈন্য আসিয়া মিলিত হইল। পূর্ব্ব হইতেই শিখদিগকে তিনি অস্ত্রসঞ্চালনের সকল কৌশল যথারীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন, সুতরাং উহারা একপ্রকার প্রস্তুতই ছিল। শিখদিগের জাতীয় জীবনে উহা এক স্মরণীয় দিন। মোগলের

হস্ত হইতে স্বদেশ ও স্বজাতির মানসম্ভ্রম রক্ষাকল্পে ও জাতীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শিখসৈন্য গর্ব্বভরে সর্বপ্রথম সম্মুখ সমরে মোগল-শক্তির বিনাশসাধনের নিমিত্ত যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছে। গুরু হরগোবিন্দকে তাহারা দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধাভক্তি করিত—তাই চতুর্দ্দিক হইতে কোলাহল ও জয়ধ্বনি অবিরাম উত্থিত হইতে লাগিল। শিখ আজ রণোন্মত্ত—পারদর্শী ও সমরনীতিজ্ঞ সেনাপতি পাইয়া তাহাদের আনন্দের সীমা নাই। তাহারা জয়লাভে নিঃসংশয় হইল—তাই জাতীয় স্বাধীনতার মহাযজ্ঞে শিখগণ ক্ষুদ্র স্বার্থ ও আপনাপন জীবন বিসর্জ্জন দিল। তাহাদিগের অপূর্ব্ব একপ্রাণতা, আজ্ঞানুবর্ত্তিতা ও ধৈর্য্যের বিরুদ্ধে মোগলশক্তি অধিকক্ষণ আত্মরক্ষায় সমর্থ হইল না—বিধ্বস্ত হইয়া ফিরিয়া গেল। মোগলের রক্তস্রোতে রণভূমি ভাসিয়া গেল—অবশিষ্ট কয়েকজন সৈন্যসহ সেনাপতি প্রাণভয়ে রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া লাহোরে আশ্রয় লইলেন। প্রবল পরাক্রান্ত ও রণকৌশলী মোগলসেনানী শিখদিগের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে—এই বার্ত্তা সম্রাটের নিকট পৌঁছিলে তিনি একান্ত লজ্জিত হইলেন এবং সেনাপতিকে কাপুরুষ বলিয়া ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

হরগোবিন্দ শুধু যে একজন সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন তাহাই নহে তিনি একজন সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিজ্ঞও ছিলেন। মোগলের সহিত বহুকাল ব্যবহার করিয়া তিনি উহাদিগের আচারপদ্ধতি, স্বভাব ও চরিত্র সম্বন্ধে সবিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিপদকালে উহা তাঁহার একান্ত প্রয়োজনে আসিয়াছিল। তিনি বুঝিলেন, শত্রু একবারমাত্র পরাজিত হইয়া নিরাশ হইবার পাত্র নহে, মোগলের সহিত পুনর্ব্বিবাদ অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই উহার জন্য সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য।

বাস্তবিক সাজাহানও সেই সময়ে বিবাদের কারণানুসন্ধানে উৎসুক ছিলেন। সমগ্র ভারতের অধীশ্বর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ মোগল সামান্য একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া একান্ত হীনবলের ন্যায় রণে ভঙ্গ দিয়াছে, এ অপমান সাজাহানের সহ্য হইল না, যে কোন

উপায়ে শত্রু দমন করিতেই হইবে—ইহাই অনুক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন।

প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া হরগোবিন্দ আনন্দোল্লাসে অধীর হইলেন না; তিনি স্থির জানিতেন, তাঁহার জীবন নাশ না করিয়া মোগল কখনই ক্ষান্ত হইবে না—বুঝিলেন বিপদ আসন্ন। পাছে আবার যুদ্ধ করিতে হয় এই আশঙ্কা করিয়া তিনি অবিলম্বেই হিসর প্রদেশান্তর্গত কুদুরনামক স্থানের সন্নিকট বথিণ্ডারণ্যে আশ্রয় লইলেন। গুরুর আবাসস্থল বলিয়া উহা 'গুরু-কা-কোট' নামে অভিহিত হয়। এরূপ নিভৃত প্রদেশে বসবাস করিলেও তাঁহার মহিমায় মুগ্ধ হইয়া বহু ব্যক্তি তথায় তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল, তন্মধ্যে বুধনামক (নানকের শিষ্য নহে) একজন বিখ্যাত দস্যু ও লুণ্ঠনকারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ব্যক্তিই মোগলের সহিত পুনর্ব্বিবাদ ঘটায়। এই বুধ গোপনে লাহোরান্তর্গত রাজ অশ্বালয় হইতে দুইটী ঘোড়া অপহরণ করিয়া হরগোবিন্দকে উপহার দিল। উহার ফল এই হইল সাজাহান যুদ্ধযাত্রার সুবিধা পাইলেন—তাঁহার কোপ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল—এবং কালবিলম্ব না করিয়া তিনি প্রসিদ্ধ বীর কুন্মার বেগ ও লালবেগকে বিপুল মোগলসেনাসহ সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত করিয়া শিখের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।

হরগোবিন্দের গুপ্তস্থান কোথায় তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য সেনাপতিদ্বয় শতদ্রু নদী পার হইলেন। বিস্তৃত প্রান্তরে জলাভাবে মোগলবাহিনীর অনেক সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল। প্রথম আক্রমণে বিফল হইয়া ক্ষুধার জ্বালায় হিংস্র ব্যাঘ্র যেমন আপন শীকার খুঁজিতে বাহির হয় ও সমগ্র বনভূমি আলোড়িত করিতে থাকে, সেইরূপ প্রথম চেষ্টায় নিষ্ফল হইয়া মোগলসৈন্য পাঞ্জাবভূমির চতুর্দ্দিকে শত্রুর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তাহাদিগের অস্ত্রের ঝনৎকার ও ত্বরিত পাদক্ষেপে সেই বিজনপ্রদেশ মুখরিত হইয়া উঠিল।

হরগোবিন্দ ইতিপূর্ব্বেই আপন সৈনগণকে মোগল ধ্বংশের জন্য প্রান্তরে সন্নিবেশ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সহসা রণোন্মত্ত সেই বিপুল

শিখবাহিনীকে সম্মুখীন হইতে দেখিয়া মোগলেরা ত্রস্ত ও চমকিত হইল। শিখদিগের অতুল বিক্রম, রণচাতুর্য্য ও মানসিক দৃঢ়তার নিকট দ্বিতীয়বার দুর্দ্ধর্ষ মোগলবাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল-চেষ্টা করিয়াও মোগলসৈন্য বিপক্ষের অগ্রগমন রোধ করিতে সমর্থ হইল না—অবশেষে সেনাপতি কুন্মারবেগ ও লালবেগের দেহ শিখসৈন্যের অব্যর্থ অস্ত্রাঘাতে বাত্যাহত ছিন্নদ্রুমের ন্যায় ভূমিতে লুটাইতে লাগিলেন। এরূপ অবস্থায় মোগলসেনা আর উপায়ান্তর না দেখিয়া পলাইয়া প্রাণে বাঁচিল। শত্রুর নিকট হইতে সেনাপতি-দ্বয়ের মৃতদেহ রক্ষা করিতেও সমর্থ হইল না-নিরাশ ও ব্যর্থ হইয়া ফিরিল। রণস্থলে শিখদিগের বিজয়নিশান উড্ডীন হইল। শিখের বিজয়বার্ত্তা অচিরে সমগ্র ভারতভূমে প্রচারিত হইয়া গেল—হর-গোবিন্দের অসামান্য বীরত্ব, অসাধারণ তেজস্বিতা ও অদ্ভুত সাহসের পরিচয় পাইয়া সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলেন।

দুইবার মোগলশক্তি বিধ্বস্ত করিয়া হরগোবিন্দের প্রাণে নব আশার সঞ্চার হইল। মোগলসৈন্যকে তিনি যে এত সহজে পরাজিত করিতে সক্ষম হইবেন তাহা তিনি পূর্ব্বে আশা করেন নাই—ভাবিয়াছিলেন শত্রুর সম্মুখীন না হইয়া গোপনে অনিষ্টসাধনে তৎপর থাকিবেন, কিন্তু শিখসৈন্যের পরাক্রম ও বীর্য্যের সম্যক্ পরিচয় পাওয়ায়, তাঁহার আত্মবিশ্বাস আবার ফিরিয়া আসিল। মোগলশক্তি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করিবার জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। যুদ্ধের পর তিনি অনুচরবর্গ লইয়া শতদ্রু নদী পার হইলেন এবং কুরতারপুর নামক স্থানে পৌঁছিলেন। পুনর্ব্বার যুদ্ধযাত্রার জন্য তদনুরূপ শক্তিসঞ্চয়ে ব্যাপৃত হইয়া অবিলম্বে এক বৃহৎ বাহিনী গঠন করিলেন—উহাতে পদাতিক ও অশ্বারোহী উভয়ই রহিল। অতঃপর খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সরঞ্জামসহ শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইলেন।

যুদ্ধসম্ভাবনা শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হইল। হরগোবিন্দের

পাণ্ডে খাঁ নামক এক পাঠান অনুচর ছিল; প্রথমে গুরুর প্রতি তাহার অত্যধিক অনুরাগ ও ভক্তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কিয়ৎকাল অতীত হইলে গুরুর সহিত কোন কারণে তাহার বিবাদ ও মনোমালিন্য ঘটে, ঐ ব্যক্তি গুরুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। সদ্ভাবের পরিবর্ত্তে ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ তাহার হৃদয় অধিকার করিল এবং তখন হইতেই কি উপায়ে গুরুর অমঙ্গল ও অনিষ্টসাধন সম্ভবপর হয় তাহাই অনুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে এক প্রশস্ত উপায়ের সন্ধান মিলিল। পাণ্ডে খাঁ স্থির করিল, সম্রাট সাজাহান নিশ্চয়ই তাহাকে সাহায্য দান করিবেন, কারণ সে জানিত, বাদশা পূর্ব্ব হইতেই যুদ্ধ যাত্রার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। সেই জন্য আর অপেক্ষা না করিয়া পাণ্ডে খাঁ রাজধানী দিল্লীতে পৌঁছিয়া সাজাহানের নিকট তাহার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিল এবং মোগলের একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়াই যে ঐরূপ দুঃসাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা বিবেচনা করিয়াছিল, তাহা সম্রাটকে বুঝাইয়া দিল। সানন্দে সাজাহান তাঁহার সহিত প্রভূত মোগলসেনা প্রেরণ করিলেন এবং বিদায়কালে বলিলেন—"খোদা করুন, যেন আপনাকে আবার সমর-বিজয়ীরূপে রাজধানীতে অভি-নন্দন করিয়া লইতে পারি।"

এইরূপে মোগলসৈন্যের সহিত মহোল্লাসে পাঠানবীর পাঞ্জাব-প্রদেশে আসিয়া পৌঁছিল। ঐ সংবাদ হরগোবিন্দের নিকট প্রেরিত হইলে তিনি সমরক্ষেত্রে সৈন্যসমাবেশ করিলেন। তৃতীয়বার দুই শক্তি পরস্পরের উচ্ছেদসাধনের জন্য প্রবৃত্ত হইল। শিখসৈন্যদিগের সেই অপূর্ব্ব দৃঢ়তা, সেনাপতির প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি, তাহাদিগের সুশৃঙ্খল সমাবেশ ও শান্তসৌম্যমূর্ত্তি রণভূমির সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছিল। প্রথম আক্রমণ হইতেই মুসলমানসৈন্য সকল ক্ষমতা ও বীর্য্যপ্রয়োগে যত্নবান হইল—শিখ উহাতে কিছুমাত্র চঞ্চল না হইয়া পুনরাক্রমণে সবিশেষ শৌর্য্য প্রদর্শন করিল। উভয়পক্ষই প্রাণপণে বিপক্ষবিনাশে তৎপর—পরিশেষে কাহারা বিজয়ী হইবে তাহা বুঝা

গেল না। অবশেষে ভাগ্যলক্ষ্মী শিখের প্রতি প্রসন্না হইলেন এবং তাঁহারই অনুগ্রহে শিখ জয়ী হইল। মোগলসৈন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহারা শেষ রক্ষা করিতে সক্ষম হইল না। অবশেষে সেনাপতি পাণ্ডে খাঁ হরগোবিন্দ কর্তৃক নিহত হইলে উহারা প্রাণভয়ে পলাইয়া গেল।

তৃতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শিখসৈন্য অত্যন্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং কিয়ৎকাল বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন হইল। এতদ্ব্যতীত হরগোবিন্দ বুঝিলেন, শীঘ্রই পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মোগলবাহিনী তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইবে—সুতরাং এরূপক্ষেত্রে কোন নির্জ্জনপ্রদেশে চলিয়া গিয়া কিয়ৎকাল শান্তিময় জীবনযাপন করাই শ্রেয়ঃ। অতঃপর সৈন্যসহ দূরবর্ত্তী কোন এক পর্ব্বতক্রোড়ে বসবাস করিবার জন্য যাত্রা করিলেন; পথিমধ্যে বিতস্তা নদীর দক্ষিণোপকূলে রুহেলা নামক স্থানে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলেন—উহার নাম হিরাতপুর। জনহীন নির্জ্জন প্রদেশে শান্তিময় জীবনযাপন করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

যোদ্ধৃজীবনের কঠোরতা ও শ্রমশীলতা সহ্য করিয়া শিখদিগের জীবনীশক্তি ও প্রাণের স্ফূর্ত্তি অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল। সর্ব্বদা আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার মধ্যে বসবাস, কখনও নিরাহার, কখনও কখনও বা স্বল্পাহারে দিনযাপন, অসহনীয় শৈত্য বা উত্তাপে জীবন-ধারণ করা যে কিরূপ কষ্টদায়ক তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই অবগত আছেন। হরগোবিন্দ শিখসমাজে যে নব আদর্শের ভিত্তিস্থাপন করেন, তাহার সাফল্যেত্যায় তিনি সবিশেষ কার্য্যকুশলতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী গুরুগণ উক্ত আদর্শ শিখসমাজে দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, স্বসমাজের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তিনি যে উহার মধ্যে জাতীয়ত্ব-বোধ অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিতে এবং উহাকে উন্নতির পথে নিয়ন্ত্রিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ইহাই হরগোবিন্দের জীবনের আত্মপ্রসাদ স্বরূপ

হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে আরম্ভ করিল দেখিয়া তিনি পরবর্ত্তী গুরু নির্ব্বাচন করিলেন।

হরগোবিন্দের তিনটী বিবাহ হয়। তিনি পাঁচটী পুত্রলাভ করেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ গুরুদিত্তে, তৎপরে তেজবাহাদুর, সুরৎসিং, আনরৎ ও উত্তুলরাও। জ্যেষ্ঠ তদীয় জীবদ্দশাতেই প্রাণত্যাগ করেন। তৎপুত্র হররাওকে তিনি বড় স্নেহ করিতেন এবং উঁহাকেই গুরুপদে নির্ব্বাচিত করিয়া যান। উহাতে তেজবাহাদুরের জননী অতীব মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি জানিতেন জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হইলে দ্বিতীয় পুত্রেরই গুরুপদলাভের সম্ভাবনা বেশী। হরগোবিন্দ তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন -"তুমি অসন্তুষ্ট হইও না, তেজ এখনও শিশু। তোমার ভয় নাই, তেজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে গুরুপদ পাইবে। আমার নিজের অস্ত্রগুলি তোমাকে দিয়া যাইতেছি, তেজকে উপহার দিবে।"

যাহা হউক, ঐ ঘটনার পর আর বেশী দিন তিনি জীবন ধারণ করেন নাই। একত্রিংশ বৎসর গুরুপদে অবস্থিত থাকিয়া খৃষ্টাব্দের ১৬৩৯ বর্ষে তিনি হিরাতপুরেই দেহত্যাগ করেন।

হররাও।

হরগোবিন্দের মৃত্যুতে শিখসমাজ এক অমূল্য রত্ন হারাইল। যাহা যায় তাহা আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহার উত্তরাধিকারী গুরুপদের মর্য্যাদারক্ষণে একান্ত অযোগ্য হইলেন। সে কার্য্যদক্ষতা, সে আত্মসম্মান, তেজস্বিতা ও আত্মসংযম আর মিলিল না! প্রথমেই গৃহবিবাদ উপস্থিত হইল। সকলে ভাবিল, বুঝি শিখসমাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। দুর্ব্বলের হস্তে ক্ষমতা থাকিলে উহার সদ্ব্যবহার হয় না—তাই হররাও জ্যেষ্ঠতাত তেজবাহাদুরকে কোনরূপ সম্মান প্রদান করা দূরে থাক নানা উপায়ে অপমানিত করিতে লাগিলেন। এইরূপ ব্যবহারে সম্প্রদায়স্থ অনেকেই অসন্তুষ্ট হইয়াছিল এবং তাঁহাকে সাহায্যদানে বিরত হইল।

এই সময়ে মোগল রাজপরিবারেও বিষম বিবাদ চলিতেছিল।

আওরঙ্গজেব বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া সিংহাসন পাইবার জন্য উন্মত্তের ন্যায় কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। নির্ভীক দারা তখন পাঞ্জাবপ্রদেশে অবস্থান করিতেছিলেন—তিনি সেই সময়ে একান্ত অসহায়; তাই স্বীয় অনুচরবর্গকে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন। এই সময়ে কেবল শিখগুরু তৎকর্তৃক অনুরুদ্ধ না হইয়াই দারার সহিত যোগদান করিলেন—উহার ফল তাঁহাকে পরে ভোগ করিতে হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই যুদ্ধে দারা পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া মুলতানাভিমুখে পলায়ন করেন। আওরঙ্গজেবের দুর্দান্ত সৈন্যের বিরুদ্ধে একাকী শিখগুরু যুদ্ধ করিতে সাহসী হইলেন না, তাই তিনি অগত্যা হিরাতপুরেই ফিরিয়া আসিলেন।

কিছুকাল অতীত হইল; ভ্রাতৃহত্যায় কৃতকার্য্য হইয়া আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র অধিপতিরূপে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম হইতেই শত্রু-পীড়নে তাঁহার নজর পড়িল। তাঁহার অসহায় অবস্থায় গুরু দারাকে সাহায্যদান করিয়াছিলেন তাহা তিনি ভুলেন নাই—উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রাজাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই কালবিলম্ব না করিয়া তিনি গুরুকে রাজদূতের মুখে বলিয়া পাঠাইলেন—"যদি ক্ষমতা থাকে, রাজদ্রোহী হইয়া বীরত্বের পরিচয় দিবে—আমি তোমাকে রণে আহ্বান করিতেছি।"

অনুচরের নিকট হইতে ঐরূপ তেজস্বী ভাষা শ্রবণ করিয়া গুরুর প্রাণে ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তিনি স্বীয় অযোগ্যতা সম্পূর্ণরূপ জানিতেন—আরও বুঝিলেন, শিখসমাজ তাঁহার উপর একান্ত বিরূপ, সুতরাং যুদ্ধঘোষণা করা বড়ই বাতুলের কর্ম্ম। তাই অতীব বিনয় বচনে নতজানু হইয়া দূতকে বলিলেন—"সম্রাট আওরঙ্গজেবকে আমার শত শত কুর্নিশ জানাইতেছি। আমি একজন সামান্য অসহায় ফকির, তিনি যাহাতে দীর্ঘজীবন যাপন করিয়া প্রজাপালনে রত থাকিতে পারেন তজ্জন্য অনুক্ষণ ভগবানের নিকট

সকাতর প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহার সহিত কখনও কি আমার ন্যায় অকিঞ্চন ব্যক্তি যুদ্ধ করিতে সাহসী হয়? তাঁহাকে বলিবেন—আমি এখন একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যে অনুলিপ্ত থাকায় পুত্র রামরাওকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতেছি—আশা করি, তিনি উহার সহিত সদ্ব্যবহার করিবেন এবং স্বীয় গুণে আমার সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।" এতদ্ব্যতীত তিনি ঐ মর্ম্মে সম্রাটকে একখানি পত্রও লিখিয়া পাঠাইলেন।

দূতের সহিত রামরাও কয়েক দিনের মধ্যেই রাজধানীতে পৌঁছিল। আওরঙ্গজেব সকল সমাচার অবগত হইয়া এবং পত্র পাঠে বিশেষ আনন্দিত হইলেন। তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা সফল হওয়াতে তাঁহার আত্মপ্রসাদ হইল। পূর্ব্ব হইতেই উপদিষ্ট হইয়া রামরাও অতীব সৌজন্যের সহিত সম্রাটের সকল প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি বলিলেন—"আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম, হররাও বাস্তবিকই নির্দ্দোষ।" যুবককে তিনি অত্যন্ত আপ্যায়িত করিয়া রাজদরবারে কিয়ৎকাল যাপনের জন্য সমাদরে নিমন্ত্রণ করিলেন। রামরাও রাজসঙ্গে কাল কাটাইতে লাগিল।

এই সংবাদ গুরুর নিকট পৌঁছিলে তাঁহার সকল চিন্তা দূর হইল এবং তিনি শান্তিতে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ হইতে লাগিল; অবশেষে ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। পরবর্ত্তী গুরুদ্বয় কি ভাবে শিখজীবন নিয়ন্ত্রিত করেন এবং কতদূর কৃতকার্য্য হন, তাহা আমরা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

জগৎ ও ঈশ্বর।

(স্বামী অমৃতানন্দ)

যখন এই বৈচিত্র্যময় জগতের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিপতিত হয়, যখন আমরা দেখি কত উচ্চ উচ্চতর পর্ব্বতমালা তাহাদের হিম-মণ্ডিত গগনস্পর্শী শিখর উত্তোলন করিয়া শোভা পাইতেছে, যখন আমরা দেখি কত সুদীর্ঘ নদী আবার সেই সকল কঠিন প্রস্তরনির্ম্মিত গিরি ভেদ করিয়া শত যোজন পথ অতিক্রম করিয়া কত গ্রামের কত পল্লীর, কত নগরের কূল প্লাবিত করিতে করিতে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে আবার অনন্ত জলরাশি পরিপূর্ণ সেই বিস্তীর্ণ সমুদ্রের শুভ্র ফেনযুক্ত তরঙ্গরাজি যেন সহাস্যে বহুদূর হইতে সমাগত নদীগুলিকে সাদরে আহ্বান করিবার জন্য তীরের দিকে দৌড়াইয়া যাইতেছে, যখন আমরা দেখি কত বিভিন্ন প্রকারের বৃক্ষশ্রেণী তাহাদের অসংখ্য প্রকারের ফল ফুলাদির দ্বারা জগৎকে যেন অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে, যখন চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহনক্ষত্র পরিশোভিত অনন্ত নভোমণ্ডল আমরা নিরীক্ষণ করি, এবং অপরদিকে যখন মাতা পিতার স্নেহে, ভ্রাতা ভগ্নীর প্রেমে, স্ত্রীর ভালবাসায়, পুত্র কন্যার প্রতি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে, বন্ধুর বন্ধুত্বে মন বিহ্বল হইয়া যায় তখন যেন স্বতঃই মনে হয় উপনিষদ্ যে বলিতেছেন, "একমেবাদ্বিতীয়ং" "নেহ নানাস্তি" ইহা কি সম্ভবপর? হে পাঠক! এইরূপ সংশয় যে অবশ্যম্ভাবী ইহা বেদান্তের আচার্য্য-গণের অবিদিত ছিল না এবং সেই হেতু তাঁহারা এই জগৎকে বিশ্লেষণ করিয়া নানা যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে শ্রুতি-বাক্য মিথ্যা নহে। এক্ষণে তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

যাহা কিছু সৃষ্ট-পদার্থ তাহারই একটা নিমিত্ত ও একটা উপাদান কারণ আছে। যেমন ঘট—উহার নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার ও দণ্ডচক্র ইত্যাদি এবং উহার উপাদান কারণ

মৃত্তিকা। সেইরূপ আমাদের সম্মুখস্থিত জগৎও সৃষ্ট পদার্থ, সুতরাং উহারও নিমিত্ত ও উপাদান কারণ আছে কারণ ও কার্য্য যখন অভেদ তখন এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ কোন্ পদার্থ তাহা জানিতে পারিলেই আমরা জগতের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিব।

গত চৈত্রের 'অজ্ঞান বা মায়া' প্রবন্ধে মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তির কথা বলা হইয়াছে। একমাত্র সদ্‌বস্তু ব্রহ্মচৈতন্য মায়ার আবরণ-শক্তি দ্বারা আবৃত হইয়া পরে সেই মায়ার বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবেই জগৎরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। জল ও জলবুদ্বুদ বস্তুতঃ এক হইলেও যেমন নামে ও রূপে ভেদ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়, সেই-রূপ ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎ-প্রপঞ্চ ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ এক হইলেও নাম এবং রূপের আবরণে বহু বলিয়া বোধ হয়। নাম ও রূপ যেমন কল্পনামাত্র সেই প্রকার এই জগৎও কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নহে। যেমন রজ্জুজ্ঞানের অভাবে উহাতে সর্পভ্রম উৎপন্ন হয় সেইরূপ আত্মজ্ঞানের অভাবে নিজ আত্মাতে বিক্ষেপশক্তির প্রভাবে জগৎ ভ্রম হইয়া থাকে। আত্মাই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। কিন্তু দণ্ড যেরূপ ঘটের নিমিত্ত কারণ সেইরূপ নহে দণ্ড তাহার ঘটরূপ কার্য্যে ব্যাপিয়া থাকে না কিন্তু জগতের নিমিত্ত কারণ আত্মা তাঁহার জগৎরূপ কার্য্যে ব্যাপিয়া আছেন। শ্রুতিতেও আছে "তৎসৃষ্টাতদেবানু প্রাবিশৎ"। জড় লোহা চুম্বকের নিকটবর্ত্তী হইলে যেমন উহাতে চেষ্টার লক্ষণ প্রকাশ পায় সেইরূপ জড় অজ্ঞান বা মায়া চৈতন্য সান্নিধ্য-বশতঃই চেতনত্ব লাভ করে ও তাহার বিক্ষেপশক্তির দ্বারা জগদাদি ভ্রম উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়, সুতরাং জগৎ যখন অজ্ঞানেরই বিকার এবং অজ্ঞান যখন চৈতন্য সন্নিধানেই চেতনত্ব লাভ করে তখন চৈতন্যই অর্থাৎ ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত কারণ।

পূর্ব্বপক্ষ বলিতে পারেন, আত্মা জগতের নিমিত্ত কারণ হইলেও তিনি ইহার উপাদান কারণ হইতে পারেন না; কেন না, অচেতন জড়-প্রপঞ্চের উপাদান কারণ চৈতন্য ইহা কখনও সম্ভবপর নহে এবং যদিও হয় তাহা হইলে কার্য্য ও কারণের অভেদ-বশতঃ প্রপঞ্চজগতের

চৈতন্যস্বরূপই প্রমাণ হয় ও ইহার অনিত্যত্বও প্রমাণ হয় না অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চ নিত্য হইয়া পড়ে, অতএব উহা কি প্রকারে সম্ভবপর ?

সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের মায়া সাক্ষাৎ উপাদান হইলেও মায়াধীশ ঈশ্বরকে মায়া আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া ঈশ্বর যে জগতের উপাদান কারণ, ইহা অসম্ভব নহে। বিবর্ত্তবাদ অনুসারে ঈশ্বর-চৈতন্যের বিকার না হইয়াই অজ্ঞানতাবশতঃ জগৎপ্রপঞ্চরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। রজ্জু অধিষ্ঠানে ভ্রমদৃষ্ট সর্প যেরূপ মিথ্যা, চৈতন্য অধিষ্ঠানে অধ্যারোপিত জগৎও সেইরূপ মিথ্যা।

একই চৈতন্য কিরূপে এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইতে পারেন, তাহা একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যেমন মাকড়সা ও তাহার জাল। মাকড়সা তাহার জালের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই হইয়া থাকে। মাকড়সা কথাটিতে মাকড়সা দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকেই লক্ষ্য করা হইতেছে বুঝিতে হইবে, কারণ চৈতন্য অভাবে অর্থাৎ মৃত মাকড়সার দ্বার জালনির্ম্মাণ কার্য্য দেখা যায় না। মৃত মাকড়সা যখন জাল নির্ম্মাণ করিতে পারে না, তখন চৈতন্য যে ঐ জালরূপ কার্য্যের নিমিত্ত কারণ ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে এবং মাকড়সা তাহার দেহ হইতে লালা বাহির করিয়া জাল তৈয়ার করিলেও মৃত মাকড়সার দেহাংশ হইতে যখন জাল তৈয়ার হয় না, তখন মাকড়সার দেহটি সাক্ষাৎ উপাদান হইলেও চৈতন্যই প্রকৃত উপাদান; সেইরূপ ঈশ্বর-চৈতন্যই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান এই উভয় কারণই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "ঈশ্বর জগতের আধার ও আধেয় দুইই"। এবং যে উপাদানে কার্য্য হইয়াছে সেই উপাদানবিষয়ক জ্ঞান কর্ত্তার বা সেই কার্য্যের কারণের থাকা আবশ্যক, কারণ কর্ত্তৃত্বের উহা একটি লক্ষণ। কর্ত্তৃত্বের আরও দুইটি লক্ষণ আছে—চিকীর্ষা ও কৃতি। কার্য্য করিবার ইচ্ছাকে চিকীর্ষা বলে ও কার্য্যে প্রযত্নই কৃতি। এক্ষণে ঈশ্বরে অথবা অন্য কিছুতে যদ্যপি জগৎরূপ কার্য্যের উপাদান বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, চিকীর্ষা এবং কৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, উহাকেই এই

জগতের নিমিত্ত কারণ বলিয়া জানিতে হইবে। জড় কখনও এই জগতের নিমিত্ত কারণ হইতে পারে না, কারণ জড়ের কখনও চিকীর্ষাদি সম্ভবপর নহে। মায়া জড় সুতরাং মায়া এই জগতের নিমিত্ত কারণ নহে, কিন্তু ঈশ্বরের যে জগৎ উপাদান বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, চিকীর্ষা আছে ও কৃতি আছে সে সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ ঃ—

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্‌ব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে॥"

"যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, যাঁর জ্ঞানই তপস্যা তাঁহা হইতে এই ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ), নাম, রূপ ও অন্ন উৎপন্ন হয়।" ইহা ঈশ্বরের উপাদানবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রমাণ।

"সোহকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়।"

"তিনি ইচ্ছা করিলেন আমি বহু হইব, উৎপন্ন হইব।" ইহা ঈশ্বরের চিকীর্ষার লক্ষণ।

"তন্মনোঽকুরুত—"

"তিনি মনকে করিয়াছিলেন।" ইহা ঈশ্বরের কৃতি বা প্রযত্নের লক্ষণ। প্রদর্শিত শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বরে কর্তৃত্বের তিনটি লক্ষণই আছে, সুতরাং ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ। শ্রুতি আরও বলিতেছে যে, ঈশ্বর হইতেই এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে তাঁহাতেই স্থিত আছে ও প্রলয়কালে তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, রজ্জু-অধিষ্ঠানে সর্পভ্রমের ন্যায় ব্রহ্ম-অধিষ্ঠানে জগৎভ্রম হইয়া থাকে। এই জগদাকারে পরিণত মায়ার অধিষ্ঠান হওয়ার নামই উপাদানত্ব। ঈশ্বর যে জগতের উপাদান কারণ সে সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন ঃ—

"ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা"—"এই সমস্তই সেই আত্মা"
"সচ্চ ত্যচ্চ"—"তিনিই মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত হইয়াছিলেন"
"বহুস্যাং প্রজায়েয়"—"আমি বহু হইব, উৎপন্ন হইব।"

কার্য্য ঘট ও তাহার উপাদান মৃত্তিকা যেমন বস্তুতঃ এক, সেইরূপ ব্রহ্ম যদ্যপি জগতের উপাদান কারণ হন, তাহা হইলে ব্রহ্ম ও জগৎ, ঘট ও মৃত্তিকার ন্যায় বস্তুতঃ এক হওয়া উচিত, অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ সৎ, চিৎ ও আনন্দ জগতে দেখা যাইবে বা জাগতিক সকল বস্তুতেই ঐ তিন লক্ষণ থাকিবে। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা যাক্, ঐ তিন লক্ষণ জাগতিক বস্তুতে আছে কি না। সৎ, চিৎ ও আনন্দ অথবা অস্তি, ভাতি ও প্রিয় এই তিন লক্ষণই জগৎ ব্রহ্মে অধ্যস্ত বলিয়া জগতেও আছে। কারণ যে বস্তু যাহাতে অধ্যস্ত, তাহার লক্ষণাদি সেই অধ্যস্ত বস্তুতে থাকিতে দেখা যায়—যেমন রজ্জুর দীর্ঘ্যকাদিলক্ষণ অধ্যস্ত সর্পে দেখা যায়। লৌকিক দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, উপাদান কারণ কার্য্যে অনুস্যূত থাকে। এক্ষণে ব্রহ্মের অস্তি, ভাতি ও প্রিয় এই তিন লক্ষণ জগৎকার্য্যে অনুস্যূত ইহা জানিতে পারিলে ব্রহ্মের জগৎ উপাদানত্বে আর সংশয় থাকিবে না। অস্তি অর্থে আছে, এই জগৎ রহিযাছে, ইহা সকলেই অনুভব করিতেছে, ইহা যে ভাতি অর্থাৎ প্রকাশ পাইতেছে ইহাও সকলেই জ্ঞাত এবং ইহা প্রিয়ও বটে, কারণ জগতে প্রিয়বস্তুর দর্শনেই যখন আনন্দ হয় তখন অস্তি, ভাতি ও প্রিয় বা সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিন লক্ষণ ব্রহ্মে অধ্যস্ত জগতে রহিয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে, এ জগতে দুঃখও যথেষ্ট দেখিতে পাওযা যায় এবং যখন আনন্দময় বা প্রিয়ব্রহ্মে এই দুঃখ অধ্যস্ত তখন দুঃখ আমাদের প্রিয় হয় না কেন? দুঃখেতে তাঁর আনন্দাংশ অধ্যস্ত হইয়া দুঃখ আমাদের প্রিয় হয় না কেন? দুঃখ ত কাহারও প্রিয় বলিয়া শুনিতে পাই না? ঐরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না, কারণ একটা কোন কিছু আমরা অনুভব করার পর, কেন এইরূপ অনুভব হইতেছে ইত্যাদি হেতুর অনুসন্ধান করিয়া থাকি। এই জগৎ অথবা ঘট আমাদের প্রিয়, এইরূপ অনুভব হয় বলিয়াই তাহার হেতুর অনুসন্ধান করা হয়। হেতু আছে বলিয়া যে ঐ হেতু সকল স্থানেই আরোপিত হইবে এমন কোন নিয়ম নাই অর্থাৎ ব্রহ্মে "প্রিয়" এই লক্ষণটি আছে বলিয়াই যে

উহা দুঃখাদিতেও আরোপিত হইবে এমন কোন প্রয়োজন দেখি না। দুঃখ যদ্যপি প্রিয় বলিয়া কাহারও অনুভব হইত, তাহা হইলে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বলা যাইতে পারিত। যাহার অনুভবই হয় না তাহার আবার অধ্যাস কি? যদিও দুঃখে "প্রিয়" অংশের প্রতীতি হয় না কিন্তু অস্তি ও ভাতি এই দুইটি লক্ষণের প্রতীতি হয় এবং এই অস্তি ও ভাতি লক্ষণের আধিক্যবশতঃই সম্ভবতঃ "প্রিয়" অংশের অনুভব হয় না।

জগতের সকল পদার্থে ব্রহ্মসান্নিধ্যবশতঃ অস্তি, ভাতি ও প্রিয় ও অজ্ঞানপ্রসূত বলিয়া নাম এবং রূপ এই পাঁচটি অংশের উপলব্ধি হয়। পঞ্চদশীতে আছে ঃ—

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশ পঞ্চকম্।
আদ্যং ত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্॥"

অস্তি ভাতি ও প্রিয় এই তিনটি জগৎ হইতে বাদ দিলে অর্থাৎ ব্রহ্মের রূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দ জগৎ হইতে পৃথক্ করিলে নাম ও রূপ অবশিষ্ট থাকে। ঐ রূপ ও নামই তাহা হইলে জগৎ আর যাহা আছে তাহা ব্রহ্মের। সুতরাং নামে ও রূপেই ব্রহ্ম হইতে জগৎকে পৃথক বোধ করাইতেছে, বস্তুতঃ উহা ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নহে। যেমন সমুদ্রের ঢেউ সমুদ্রের জল ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে কিন্তু তথাপি একটা কল্পনাপ্রসূত নাম ও রূপের দ্বারাই উহাকে পৃথকভাবে দেখিয়া থাকি সেইরূপ অবিদ্যাপ্রসূত নাম ও রূপের সম্বন্ধবশতঃই জগতে বহুত্বের ব্যবহার হইয়া থাকে। নাম ও রূপ যখন কল্পনামাত্র তখন ব্রহ্মই একমাত্র আছেন। ঐ ব্রহ্ম অধিষ্ঠানেই মায়াকৃত জগদাদি অধ্যারোপিত হইতেছে। নাম ও রূপ ছাড়িয়া দিলে একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই থাকেন কিন্তু এমনি মায়ার প্রভাব যে সে অবস্তুকে বস্তু ও প্রকৃত বস্তুকে অবস্তুর ন্যায় দেখাইতেছে, এই জন্যই ব্রহ্মবিদেরা মায়াকে অঘটনঘটনপটিয়সী বলিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ সেবক উদ্ধব।

(শ্রীবিহারীলাল সরকার, বি, এল)

বৃহস্পতি-শিষ্য উদ্ধব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রী ছিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। ভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন, 'ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি র্ন শঙ্করঃ। নচ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥—উদ্ধব! তুমি যেমন আমার প্রিয় সেরূপ প্রিয় আর কেহ নহে। ব্রহ্মা পুত্র হইলেও, শঙ্কর মৎস্বরূপ হইলেও, সঙ্কর্ষণ ভ্রাতা হইলেও, শ্রী ভার্য্যা হইলেও তোমার মত প্রিয় নহে। এমন কি আমার নিজ মূর্ত্তিও তোমার মত প্রিয় নহে। ভগবান্ প্রভাস-যাত্রার পূর্ব্বে উদ্ধবকে বদরিকাশ্রমে যাইতে অনুজ্ঞা করেন। কিন্তু উদ্ধব প্রিয় প্রভুকে ত্যাগ করিয়া যাইতে না পারিয়া ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রভাস-যাত্রা করেন। সেখানে ভগবানের অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বক্ষণে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভগবানের অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে ভগবানের আনন্দঘনমূর্ত্তি দেখিয়া উদ্ধব কৃতার্থ হইলেন। এবং ভগবান সেই সময়ে তাঁহাকে আত্মার পরমা স্থিতি উপদেশ দেন। বিরহাতুর উদ্ধব ভগবানকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া বদরিকাশ্রমে যাত্রা করেন। উদ্ধবকে বদরিকাশ্রমে পাঠাইবার উদ্দেশ্য—ভগবদুপ-দিষ্ট জ্ঞানপ্রচার। ভগবান্ ভাবিয়াছিলেন, "অস্মাৎ লোকাৎ উপরতে ময়ি জ্ঞানং মদাশ্রয়ম্। অর্হতি উদ্ধব এবাদ্ধা সম্প্রতি আত্মবতাং বরঃ॥ ন উদ্ধবঃ অনু অপি মন্ন্যূনঃ যদ্‌গুণৈঃ ন আৰ্দ্দিতঃ প্রভুঃ। অতঃ মদ্বয়ুনম্ লোকং গ্রাহয়ন্ ইহ তিষ্ঠতু॥"—ইহলোক হইতে আমি চলিয়া যাইব, এক্ষণে আত্মজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ উদ্ধবই আমার জ্ঞানের অধিকারী। সম্প্রতি আর কাহাকেও উপযুক্ত দেখিতেছি না। বিশেষতঃ উদ্ধব আমা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন, কারণ বিষয় দ্বারা ইঁহার মন মোটেই ক্ষুব্ধ হয় না। অতএব লোকদের মদ্বিষয়ক জ্ঞান

শিক্ষা দিবার জন্য উদ্ধব এখানে থাকুন। ভগবৎকল্প মহাজ্ঞানী মহাপ্রেমী উদ্ধব লোক-শিক্ষার জন্য প্রত্যাদিষ্ট হইয়া বদরিকাশ্রমে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে বিদুরোদ্ধব সংবাদে উদ্ধবের ভগবৎপ্রেমের কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। বিদুর দুর্য্যোধনকর্তৃক গৃহ হইতে নিষ্কাসিত হইলে ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করেন। পর্য্যটন করিতে করিতে যমুনাতীরে হঠাৎ উদ্ধবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। পরম ভাগবত উদ্ধবের দর্শন পাইযা প্রেমে আলিঙ্গন করিয়া বিদুর যদুবংশীয়দের, পাণ্ডবগণের এবং বিশেষতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কুশল জিজ্ঞাসা করেন। ভগবানের নাম শুনিবামাত্র উদ্ধবের কিরূপ অবস্থা হয়, শুক বর্ণনা করিয়াছেন—

ইতি ভাগবতঃ পৃষ্টঃ ক্ষত্রা বার্ত্তাং প্রিয়াশ্রয়াম্। প্রতিবক্তুং ন চ উৎসেহে ঔৎকণ্ঠাৎ স্মারিতেশ্বরঃ॥ যঃ পঞ্চহায়ণঃ মাত্রা প্রাতরাশায় যাচিতঃ। তৎ ন ঐচ্ছৎ রচয়ন্ যস্য সপর্য্যাং বাললীলয়া॥ স কথং সেবয়া তস্য কালেন জরসম্ গতঃ। পৃষ্টঃ বার্ত্তাং প্রতিব্রূয়াৎ ভর্ত্তুঃ পাদৌ অনুস্মরন্॥ সমুহূর্ত্তং অভূৎ তূষ্ণীং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি সুধয়া ভৃশং। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন নিমগ্নঃ সাধু নির্বৃতঃ॥ পুলকোদ্ভিন্নসর্ব্বাঙ্গঃ মুঞ্চন্ মিলদ্দৃশা শুচঃ। পূর্ণার্থঃ লক্ষিতঃ তেন স্নেহপ্রসরসংপ্লুতঃ॥ শনকৈঃ ভগবৎ লোকাৎ নৃলোকং পুনরাগতঃ। বিমৃজ্য নেত্রে বিদুরং প্রীত্যা আহঃ উদ্ধব উৎস্ময়ন্॥—বিদুর প্রিয়জনের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র উদ্ধবের স্মৃতিপথে শ্রীকৃষ্ণ উদিত হইলেন। তিনি বিরহোৎকণ্ঠাবেশ হেতু—প্রতিবচন প্রদানে সমর্থ হইলেন না। উদ্ধব পঞ্চমবর্ষ বয়স কালে খেলায় কল্পিত শ্রীকৃষ্ণের জন্য উপহার রচনা করিয়া পরিচর্য্যা করিতেন। সে সময় মাতা প্রাতরাশ যাচ্ঞা করিলেও আহার করিতে ইচ্ছা করিতেন না—সেই উদ্ধব দীর্ঘকাল তাঁহার সেবা করিয়া কালবশতঃ বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিজ ভর্ত্তার কুশল জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার পাদস্মরণ করিতে করিতে কেমন করিয়া হঠাৎ প্রতিবচন দিবেন? তিনি মুহূর্ত্তকাল

নিস্পন্দ-তুষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন, যেন শ্রীকৃষ্ণপাদসুধায় উত্তমরূপে সুখী হইতে লাগিলেন এবং তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা যেন সেই সুধাতে অত্যন্ত নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে সর্ব্বাঙ্গে পুলক প্রকাশিত হইল। তার পর ঈষন্মীলিত নেত্র হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। ভগবৎস্নেহ-প্রবাহে উদ্ধবকে নিমগ্ন দেখিয়া বিদুর ভাবিলেন, এ ব্যক্তি কৃতার্থ হইয়াছে। তারপর উদ্ধব ভগবল্লোক হইতে মনুষ্যলোকে আস্তে আস্তে পুনরাগমন করিয়া অর্থাৎ দেহানুসন্ধান পুনর্প্রাপ্ত হইয়া নেত্রমার্জ্জন করিয়া ভগবচ্চাতুর্য্যস্মরণে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া প্রীতির সহিত বিদুরকে বলিলেন। ভগবানের নাম শুনিবামাত্র উদ্ধবের গভীর সমাধি হইল। তার পর পুলকে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল, তার পর অশ্রু বিগলিত হইল, তার পর দেহানুসন্ধান আসিলে, তিনি পুনর্ব্বচন প্রদানে সমর্থ হইলেন।

উদ্ধব বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ-দিবাকর অস্ত গিয়াছেন, কালসর্প আমাদের গৃহ গ্রাস করিয়াছে, আর কুশল কি বলিব? এই ভুবন অতিশয় ভাগ্যহীন। আর যদুগণ সর্ব্বাপেক্ষা হতভাগা! কারণ তাহারা এতকাল তাঁর সঙ্গে বাস করিয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। তারা যে নির্ব্বোধ ছিল, তাহা নহে, কিন্তু ভাগ্যদোষে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া বুঝিতে পারে নাই। তাহারা তাঁহাকে যদুশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এতকাল তাঁহার সেই মঙ্গল মূর্ত্তি দেখাইয়া মানুষের নয়ন হইতে বলপূর্ব্বক সেই মূর্ত্তি আকর্ষণ করিয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। সেই অত্যাশ্চর্য্য মূর্ত্তি সৌভাগ্য-সম্পত্তির পরাকাষ্ঠা ছিল। সময় সময় ভগবান্ নিজেই সেই মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। ভগবানের সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে ত্রিভুবনস্থ লোক দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। সেই মূর্ত্তিতে ব্রজাঙ্গনাগণের নয়ন সংলগ্ন হইলে তাঁহারা নয়ন ফিরাইতে পারিতেন না। তাঁহাদের দৃষ্টি স্থির হইয়া যাইত। ভগবান্ অজ হইয়াও যে বসুদেবগৃহে জন্মগ্রহণ করেন, অনন্তবীর্য্য হইয়াও অরি

ভয়ে ব্রজে যাইয়া গোপনে বাস করেন এবং কাল যবনাদির ভয়ে মথুরা হইতে পলায়ন করেন, এই সকল ভাবিয়া আমার অন্তরাত্মা ব্যথিত হয়। তিনি মথুরায় পিতামাতার পাদদ্বয় ধরিয়া বলিয়াছিলেন, 'হে তাত। হে অম্ব! কংসভয়ে ভীত হইয়া এতকাল আপনাদের শুশ্রূষা করিতে পারি নাই। আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।' তাঁহার পাদদ্বয়ের ধূলি একবার সেবা করিয়া কে তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারে? রাজসূয়যজ্ঞে শিশুপাল তাঁহার কত দ্বেষ করিয়াছিল, কিন্তু সেই শিশুপাল যোগিজনদুর্ল্লভ সিদ্ধি পাইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রে নরলোক বীরগণ অর্জ্জুনের রথে তাঁহার বদনারবিন্দ পান করিয়া তাঁহার গতি লাভ করিয়াছিলেন। লোকপালগণ করযোড়ে তাঁহার পাদপীঠের স্তব করিত, কিন্তু উগ্রসেনের নিকট তাঁহার কৈঙ্কর্য্য স্মরণ করিলে আমার হৃদয় ব্যথিত হয়। রাজা উগ্রসেন রাজাসনে উপবিষ্ট থাকিতেন, তিনি সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেন, 'মহারাজ! অবধারণ করিতে আজ্ঞা হউক!' তাঁহার আশ্চর্য্য দয়া। দুষ্টা পুতনা স্তনদ্বয়ে কালকূট লেপন করিয়া সেই স্তনপান করাইয়াছিল। কিন্তু সেও মাতা যশোদার গতি প্রাপ্ত হইল। আমি অসুরগণকে পরম ভাগবত মনে করি, কারণ তাহাদের চিত্ত ক্রোধাবেশমার্গ দ্বারা ভগবানে অভিনিবিষ্ট থাকে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার দর্শন লাভ করে। ইহা অপেক্ষা অধিক অনুগ্রহ আর কি বলিব?

"ভগবান্ কংসের কারাগারে অবরুদ্ধ বসুদেবের ঔরসে ও দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব কংসের ভয়ে তাঁহাকে নন্দের ব্রজে রাখিয়া আসেন। সেখানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের সহিত একাদশ বৎসর গূঢ়তেজা হইয়া বাস করেন। তিনি গোপবালকদের সহিত বৎস চারণ করিতে করিতে যূথসিংহ শিশুর ন্যায় যমুনাতীরস্থ উপবনে বিহার করিতেন। তাঁহার কৌমারচেষ্টা দেখিয়া ব্রজবাসীদের হৃদয়ে আনন্দ ধরিত না। তিনি বংশীধ্বনি করিয়া অনুচর গোপালদিগকে ক্রীড়া করাইতেন। সেই সময় রাজা কংস তাঁহার প্রাণ-সংহারাভি-

প্রায়ে কামরূপ নানা মায়াবীকে প্রেরণ করে। বালক ভগবান্ অবলীলাক্রমে তাহাদের প্রাণ সংহার করেন। যমুনার জল কালীয় বিষে বিষাক্ত হইলে তিনি কালীয়ের প্রাণবধ করিয়া গোপ-গোপীকে নির্ব্বিষ জল পান করান। গোপরাজ নন্দের বিত্তের সদ্ব্যয়ার্থ তাঁহাকে গো-যজ্ঞ করান। প্রবল বর্ষাপাতে ব্রজপুর কাতর হইলে তিনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে লীলাতপত্র করিয়া ব্রজপুরী রক্ষা করেন। তিনি শরৎকালীন জ্যোৎস্নাপ্লুত বনভূমিতে ব্রজাঙ্গনাদের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। এইরূপে একাদশ বর্ষ বৃন্দাবনে বাস করিয়া মথুরায় গমন করেন এবং তথায় রাজা কংসকে নিহত করিয়া পিতামাতার কারামোচন করেন। তিনি সান্দীপনি মুনির নিকট একবার মাত্র উপদেশে ষড়ঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি গুরুর মৃতপুত্রকে সঞ্জীবিত করিযা গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন। ভীষ্মক রাজার কন্যা রুক্মিণীর স্বয়ম্বরকালে সমাহূত অসংখ্য নৃপতিগণের সমক্ষে গান্ধর্ব্ব বিধানেতে রুক্মিণীকে হরণ করেন।

"কুরুক্ষেত্রে অসংখ্য নৃপতিকে মিলিত করিয়া পরস্পরদ্বারা তাহাদের সংহার করাইয়াছিলেন। যখন দুর্য্যোধন ভগ্নোরু হইয়া ভূমিশায়ী হন তখন তিনি তাহার দুর্দ্দশা দর্শনে আনন্দিত হন নাই বরং অবিসহ্য যাদবকুলের বিনাশ চিন্তা করিয়াছিলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া সাধুপথ প্রচলন করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। উত্তরার গর্ভ অশ্বত্থমার ব্রহ্মাস্ত্রে নিদগ্ধ হইবার উপক্রম হইলে তিনি তাহা রক্ষা করেন। রাজা যুধিষ্ঠিরকে তিন বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করান। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহারই মতে অবনীমণ্ডল রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ভগবান্ দ্বারকাপুরীতে স্নিগ্ধ সস্মিতদৃষ্টি, পীযূষতুল্য বচন ও শ্রীর নিকেতনস্বরূপ নিজ স্নেহদ্বারা পুরীস্থ সকলকে আমোদিত করিতেন। এইরূপে কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইলে তিনি মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিবার মানস করিলেন। ভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়া যদুকুমারগণ ক্রীড়া করিতে করিতে একদিন ঋষিদের কোপ উৎপাদন করিল।

ঋষিগণ ভগবানের অভিপ্রায় অবগত হইয়া অভিশাপ দিলেন। যাদবগণ প্রবাসতীর্থে গমন করিল। তথায় তীর্থোদক দ্বারা দেব ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বহুল দান করিল। ক্রিয়া সমাপ্তির পর তাহারা মদিরা পান করিয়া জ্ঞানভ্রষ্ট হইয়া পরস্পর কলহ করিয়া পরস্পরকে হত্যা করিল।

"ভগবান্ এই সমস্ত দর্শন করিয়া সরস্বতী জলে আচমনপূর্ব্বক একটী অশ্বত্থমূলে উপবেশন করিলেন। এই সমস্ত ঘটনার পূর্ব্বে দ্বারাবতীতে আমাকে বদরিকাযাত্রা করিতে আজ্ঞা করেন। আমি তাঁহার চরণ ত্যাগ করিতে অশক্ত হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করি। আমি প্রভাসে পঁহুছিয়া দেখিলাম তিনি অশ্বত্থবৃক্ষে পৃষ্ঠ দিয়া বাম উরুর উপর দক্ষিণ পাদপদ্ম রাখিয়া উপবিষ্ট আছেন। যদিচ সে সময় বিষয়সুখ পরিত্যক্ত হইযাছিল, কিন্তু দেখিলাম যেন তিনি আনন্দপূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন। সেই সময় সেখানে ভগবানের অনুরক্ত মৈত্রেয় মুনি পর্য্যটন করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হন। ভগবান্ আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'আমি জীবলোক ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে যাইতেছি। এসময় এই নির্জ্জন স্থানে একান্ত ভক্তিসম্পন্ন হইয়া যে আমাকে দর্শন করিলে, ইহাতে তোমার পরম মঙ্গল হইবে। আমি সৃষ্টির উপক্রম সময়ে ব্রহ্মাকে পরমজ্ঞান বলিয়াছিলাম।' ভগবানের কৃপাবলোকনরূপ অনুগ্রহভাজন হইয়া আমার শরীরে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল এবং আমি উপরুদ্ধকণ্ঠ হইলাম, অনেকক্ষণ পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে কহিলাম, 'ভগবন্! যে তোমার পাদপদ্ম সেবা করে তাহার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের কোনটাই দুর্ল্লভ নহে। কিন্তু আমি সে সকল আকাঙ্ক্ষা করি না। আমার মন কেবল তোমার চরণসেবার জন্য উৎসুক। হে প্রভো! তুমি নিস্পৃহ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া যে কর্ম্ম কর, অজ হইয়াও যে জন্ম লও, আর কালস্বরূপ হইয়াও যে অরি ভয়ে পলায়ন ও দুর্গাশ্রয় কর এবং আত্মারাম হইয়াও যে ভূরি ভূরি নারী-সমভিব্যাহারে গৃহস্থধর্ম্মাচরণ কর, ইহা দেখিয়া বিদ্বানরাও বুদ্ধিহারা হয়। প্রভো! তোমার বিজ্ঞা-

শক্তির অভাব নাই। আপনি সকল মন্ত্রণা করিতে পারিতে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, অজ্ঞের ন্যায় আমাকে আহ্বান করিয়া অবহিত হইয়া মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিতে, এই সব যখন আমার স্মরণ হয় তখন আমি অস্থির হইয়া পড়ি। হে ভগবন! ব্রহ্মাকে যে জ্ঞান বলিয়াছিলে উহা যদি আমাদের গ্রহণযোগ্য হয়, বলুন।' এই অভিপ্রায় নিবেদন করিলে কমললোচন ভগবান্ স্বীয় পরমা স্থিতি আমাকে উপদেশ করিলেন। এইরূপে তাঁহার নিকট পরমাত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হই। পরে তাঁহার চরণে প্রণামপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছি কিন্তু আমার অন্তরাত্মা বিরহে আতুর হইতেছে।" এইরূপে ভগবানের অমৃতকথা প্রসঙ্গে নিমেষে রাত্রি যাপন করিয়া বিদুরকে মৈত্রেয় মুনির নিকট যাইতে উপদেশ দিয়া উদ্ধব প্রস্থান করিলেন।

উদ্ধব মহাপ্রাণ ছিলেন। তিনি জীবের দুঃখে কাতর হইয়া বলিয়াছিলেন—

তাপত্রয়েণ অভিহতস্য ঘোরে সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনি ঈশ।
পশ্যামি ন অন্যৎ শরণং তব অঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাতপত্রাৎ অমৃতাভিবর্ষাৎ॥
দষ্টং জনং সম্পতিতং বিলে অস্মিন্ কালাহিনা ক্ষুদ্র সুখোরুতর্ষং।
সমুদ্ধরৈনং কৃপয়া অপবর্গৈঃ বচোভিঃ আসিঞ্চ মহানুভাব॥

ঘোর সংসারমার্গে ত্রিতাপে তাপিত সন্তপ্তজনের তোমার অমৃতবর্ষ পাদযুগলরূপ আতপত্র ভিন্ন অন্য শরণ দেখিতেছি না। এই সংসারকূপে মানুষ পতিত, কাল-অহি কর্ত্তৃক দষ্ট, সুখ ক্ষুদ্র কিন্তু মানুষ উরুতৃষ্ণায় তৃষিত। হে মহানুভব! কৃপা করিয়া ইহাদিগকে উদ্ধার কর এবং অপবর্গবোধক বাক্যামৃতদ্বারা অভিষিক্ত কর।

ভারতীয় শিক্ষা।

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

The Sannyasin, as you all know, is the ideal of the Hindu's life, and every one by our Shastras is compelled to give up. Every Hindu who has tasted the fruits of this world must give up in the latter part of his life, and he who does not is not a Hindu, and has no more right to call himself a Hindu. We know that this is the ideal—to give up after seeing and experiencing the vanity of things.—VIVEKANANDA.

প্রত্যেক জাতির চরিত্রের উপর তাহাদের শিক্ষাপ্রণালী নির্ভর করে। জাতীয় চরিত্র যদি প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিমূলক হয় শিক্ষাও ঠিক তদনুযায়ী হইবে। এই চরিত্র তাহার উপাদান সংগ্রহ করে তত্তদ্দেশীয় জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক অবস্থান হইতে। শীতপ্রধান, অনুর্ব্বর বা পার্ব্বত্য প্রদেশের লোক সাধারণতঃ কষ্টসহিষ্ণু এবং স্বার্থপর হয়। পারিপার্শ্বিক সংগ্রামে জয়ী হইয়া কোন প্রকারে নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে পারিলেই সে নিজেকে সুখী মনে করে। জীবনসংগ্রামে আমরণ পরিশ্রম করিয়া জগদান্তরালে বা হৃদয়-গুহায় কোন্ অনাদি, অনন্ত সত্য নিহিত আছে তাহা জানিবার তাহার সময় কোথায়? জরা, মরণ, ব্যাধি দুই একবার হয়ত কাহারও হৃদয়ে ক্ষণ-স্পন্দনের সঞ্চার করে কিন্তু সে বীণার সূক্ষ্ম তন্ত্রীর অনুরণন্ কাহারও কর্ণপটাহে আঘাত করে না, সে ক্ষীণ আর্ত্তনাদ ধীরে ধীরে আকাশেই লীন হইয়া যায়। তাহার সকল চেষ্টা, সকল শিক্ষা কেবল ভোগমুখী, তাহার সাহিত্য কামোদ্দীপক, তাহার বিজ্ঞান সর্ব্বসংহারী, তাহার দর্শন জড়প্রাণ। সে অপরকে কি শিক্ষা দিবে—তাহার শিক্ষা বলে

'আগে আমি, পরে তুমি—আমার ভোগের জন্য তোমার সৃষ্টি।' তাহার শিক্ষা জানে, সুশীল, সংযতেন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য সম্পাদন করিতে, সুশান্ত শান্তি-পরায়ণ হৃদয়ে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত করিতে।

কিন্তু ভারত তাঁহার সন্তানকে সে ভাবে পালন করেন নাই। করুণাময়ী চিরকালই নিজের সন্তানকে স্নেহের অঞ্চলে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন এবং পরদেশে যে বিদ্যা চাহিয়াছে তাহাকে বিদ্যা, যে আশ্রয় চাহিয়াছে তাহাকে আশ্রয়, যে ঐশ্বর্য্য চাহিয়াছে তাহাকে তাঁহার শেষ কপর্দকটী পর্য্যন্ত দান করিয়া, পরে বিন্দুবিন্দু নিজ শোণিত দানে তাহার পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। আর তাঁহার সন্তানের জন্য রাখিয়াছেন নিজ শুদ্ধ চেতন দেহ—সেই চির-শস্য-শ্যামল অঞ্চল, অভ্রভেদী তুষার-মণ্ডিত কিরীট, ভ্রূমধ্যে বালার্ক সিন্দুরফোঁটা, চন্দ্রকলা-প্রতিফলিত গঙ্গাযমুনার হার, পাদপ্রক্ষালনকারী সুনীল বারিধি, মানব দুঃখে উত্তপ্ত মরুহৃদয়, নক্ষত্রশোভিত নির্ম্মল ললাটাকাশে ঘন বলাহকের কুন্তলদাম এবং তদুপরি চপল বিদ্যুল্লেখা এবং নিবিড় তরুচ্ছায়ায় শান্ত শীতল ক্রোড়—আর শিখাইয়াছেন ভুবন মন-মোহিনী নিজ মাধবী প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশির উপাসনা করিতে—পরে তাহারও অন্তরবর্ত্তী অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপমব্যয়ম্ সেই 'সৌম্যা সৌম্যতরাশেষ সৌম্যেভ্যস্তুতি সুন্দরী'র রূপসাগরে ডুব দিয়া অবাক্ আত্মহারা, দিশেহারা হইয়া 'নুনের পুতলের' আমিত্বটুকু চিরতরে লীন করিতে। এ সাধনার মন্ত্র ত্যাগ, এ সাধনার অর্ঘ্য পবিত্রতা। যুগযুগান্তরব্যাপী কত অত্যাচার, অবিচারের মধ্য দিয়া ভারত-ভারতী এ সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন। জড়-বিজ্ঞান-দর্শনের মোহে পড়িয়া সে আজ পাষণ্ড সাজিতে পারে কিন্তু সে পোষাক তাহার ভাল লাগিবে না যখনই সে বিবেকদর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইবে তখনই সে সেই সাজ পোষাক থু থু করিয়া ফেলিয়া দিতে বাধ্য হইবে। কারণ, ত্যাগই তাহার প্রকৃতি, ত্যাগই তাহার ধর্ম্ম, নীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য। ভারতের ব্রহ্মচারী সকল প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ-ত্যাগী, গৃহস্থ বহুজন-হিতায় স্বোপার্জ্জিত সমগ্র বিত্তত্যাগী, বানপ্রস্থী সংসারত্যাগী, সন্ন্যাসী সর্ব্বত্যাগী।

ভারতে শ্রমজীবী পরসেবায় জীবনপাত করে, পরের সম্ভোগের জন্য বণিকের শিল্প বাণিজ্য, দুর্ব্বলের রক্ষার জন্য যোদ্ধার অস্ত্র ধারণ, আর সকল সুখসম্পদ-ত্যাগী ধর্ম্মরাজ্যের পুরোহিত ব্রাহ্মণ। ভারতের রাজা কখনও ছলে বলে কৌশলে পররাজ্য অপহরণ করেন নাই। ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য মাঝে মাঝে রাজসূয়, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিতেন বটে—কিন্তু "ছত্র ও চামর" ব্যতিরেকে প্রতিক্ষণেই তিনি তাহার সমগ্র বৈভব প্রজাকে দান করিতে প্রস্তুত। ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত বলিয়া এ দেশের রাজা রাম, যুধিষ্ঠির, অশোক; এদেশের ক্ষত্রিয় ভরত, ভীষ্ম, চণ্ড। ইদানীং যাহারা ত্যাগের অগ্নিদীক্ষা ভুলিয়া ইন্দ্রিয় ভোগের অনাধিক্য হেতু দুঃখিত, তাহাদিগকে অতীত ভারতের ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য বর্ত্তমান যুগপরিবর্ত্তক সন্ন্যাসী—উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছেন—

নানাদেশের সহিত তুলনা কর, দেখিবে সহিষ্ণু নিরীহ হিন্দুজাতির নিকট জগৎ কতদূর ঋণী। "নিরীহ হিন্দু" এই তিরস্কার বাক্যের মধ্যে কত সত্য নিহিত আছে। জগতের নানা দেশে নানা সত্য উদ্ভূত হইয়াছে, নানা শক্তিশালী জাতি তাহাদের প্রচার করিয়াছে কিন্তু ঐ প্রচার রণভেরীর নির্ঘোষে, গর্ব্বিত সেনাকুলের পদবিক্ষেপের সহিত হইয়াছিল। প্রতি প্রচারের পশ্চাতেই অসংখ্য লোকের হাহাকার, অনাথের ক্রন্দন ও বিধবার অশ্রুপাত অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু ভারত, যখন গ্রীসের অস্তিত্বই ছিল না, রোম যখন ভবিষ্যতের অন্ধকার-গর্ভে লুক্কায়িত, আধুনিক ইউরোপ যখন জার্ম্মনীর গভীর অরণ্যমধ্যে নীলবর্ণে দেহ অনুরঞ্জিত করিত, ইতিহাস যে যুগের খবর রাখে না, কিম্বদন্তীও যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস করে না, সে যুগেও ভাবের পর ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া সম্মুখে শান্তি ও পশ্চাতে আশীর্ব্বাণী লইয়া অগ্রসর হইয়াছে। জগতে কেবল ভারতই যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা দেশ জয় করে নাই। একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, গ্রীক-বাহিনীর বীরদর্প এখন কোথায়? রোমের শ্যেনাঙ্কিত বিজয় পতাকা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কোথায় গেল? কত জাতি উঠিয়াছে, পড়িয়াছে কিন্তু ভারত যেমন তেমনই রহিয়াছে কেন? কেন তাহারা

মদগর্ব্বে স্ফীত হইয়া প্রভুত্ব বিস্তারপূর্ব্বক স্বল্পকালমাত্র পরপীড়ক কলুষিত জাতীয় জীবন অতিবাহিত করিয়া জল বুদ্‌বুদের ন্যায় বিলীন হইয়াছে ?

কিন্তু সত্যই কি ভারত কখন পরদেশ ইচ্ছাপূর্ব্বক জয় করে নাই ? এ বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প কি কখনও তাহার ছিল না ?—অবশ্য ছিল, কিন্তু সে সমরনীতির বাহিনী ছিল রাজর্ষি ও সন্ন্যাসী, দুর্গ ছিল চরিত্র ও সত্ত্ব, পতাকা ছিল আত্মবলির রক্তদণ্ডের উপর ত্যাগের গৈরিক, তাঁহারা জয় করিয়াছিলেন খাল বিল, নদী নালা, পাহাড় পর্ব্বত নয়, চিন্তা রাজ্য, আধিপত্য করিয়াছিলেন নিগড়বদ্ধ দেহের উপর নয়—হৃদয়ের উপর।

সর্ব্ব প্রথম বিস্তৃতভাবে ভারতীয় শিক্ষার প্রচার আরম্ভ হয় মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের সময়। তৎকালীন শ্রীরামচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়া যে অপূর্ব্ব নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক তরঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা প্রায় পৃথিবীর সমগ্র অসভ্য জাতির উপর আধিপত্য করিয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই, রাক্ষসরাজ রাবণের বধের জন্য যখন বানর-রাজ সুগ্রীবের আদেশে সৈন্য সংগ্রহ হয় তখন নানা দেশীয় এবং নানা জাতীয় বানর ও ঋক্ষনামক অসভ্য জাতিরা কিষ্কিন্ধ্যাধিপতির পতকা তলে সমবেত হয়। তাহার মধ্যে কোনও কোনও জাতি লোহিত-বর্ণ, কোনও জাতি শ্বেত বর্ণ, কোনও জাতি বা শ্যামল, কেহ বা পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে, কেহ বা সমুদ্রতট হইতে আগমন করিয়াছিল। ইহারা যে মধ্যভারত, হিমালয়, ব্রহ্ম, শ্যাম এবং মালয় প্রভৃতি দেশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা তত্তদ্দেশীয় আকৃতি ও বর্ণ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। পরে সুগ্রীব সমবেত সৈন্যগণকে সীতা-দেবীর অন্বেষণের জন্য যে সকল স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাই তাহাদিগকে যবদ্বীপ (Java) এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপ সকলেও অনুসন্ধানের জন্য বলা হইয়াছিল। এবং অপর দিকে ইক্ষু সমুদ্রের ধারে (বোধ হয় পারস্যোপসাগর), অসুরদের রাজ্যের (Assyria) পর লোহিত সাগর (আরব সাগর বা শঙ্খ

সাগর) পার হইয়া গরুড়দেবের মন্দির যে দেশে আছে সেই সকল দেশেও (Egypt—"beaked headed winged statues"—ম্যাস-প্যারো লিখিত ইজিপ্ট এবং কালদের ইতিহাসের পক্ষীদেবতার—চিত্র দেখ) অনুসন্ধান করিবার জন্য বলা হয়। পরে সমুদ্রের পরপারে স্বর্ণ-খচিত জটারূপ পর্ব্বতের কথা আছে। ইহা মেক্সিকো (Mexico) বলিয়া বোধ হয়। মেক্সিকো সংস্কৃত 'মাক্ষিক' শব্দ হইতে আসিয়াছে। মাক্ষিক শব্দের অর্থ স্বর্ণ। জটারূপের সংস্কৃত অর্থ স্বর্ণ। পরে নাগরাজ অনন্তের আবাসে অনুসন্ধানের কথা আছে। যেখানে সুবর্ণ পর্ব্বত সৌমাংস দণ্ডায়মান। সূর্য্যদেব জম্বুদ্বীপ অতিক্রম করিয়া প্রভাতে এই পর্ব্বতচূড়া হইতে উদিত হন। ইহা হইতে অনুমিত হয়, উল্লিখিত স্বর্ণস্থান আমেরিকা। প্রাচীন আমেরিকায় সর্পের উপাসনা প্রচলিত ছিল। তদ্দেশীয় আদিমবাসীরা নাগ-চিহ্ন ধারণ করিত। হিন্দুরা যে কলম্বসের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই আমেরিকা সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন সে সম্বন্ধে অপর স্থানে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ডাক্তার জন ফ্রেজার (Dr. John Fraser L L D) বলেন যে, দাক্ষিণাত্যে আর্য্যদিগের প্রসারের সহিত কৃষ্ণকায় দ্রাবিড়ী অনার্য্যেরা একদিকে পোলেনেসিয়া (Polynesia – Australia, Eastern Peninsula, Indonesia and Ocenia, Melanesians) অপরদিকে লাক্ষ্যদ্বীপ, মালদ্বীপ হইতে মাদাগাস্কার পর্য্যন্ত বিতাড়িত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। তাহার প্রমাণে তিনি বলেন যে, মাদাগাস্কারে যে ভাষা প্রচলিত তাহা ও ১২০ অংশ দ্রাঘিমার নিকটবর্ত্তী মধ্য ও দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপনিবাসীদের সমোয়া (Samoa) ভাষা প্রায় একই। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সহিত সিংহলের অনার্য্যদের আকৃতি প্রকৃতির সৌসাদৃশ্য অতি নিকট (Polynesian Journal, Vol. IV, December 189,)। শ্রীযুক্ত মোক্ষমূলারও তাঁহার 'Science of Religion' নামক গ্রন্থে এ বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এখন আমাদের বক্তব্য এই যে,

অনার্য্যদের দেশান্তর প্রাপ্তি তরবারির দ্বারা হয় নাই। উহা সর্ব্বচরাচরপালক মহারাজ রামচন্দ্রের বিরাট সাম্রাজ্য গঠনের ফলেই হইয়াছিল। নানা অসভ্য দেশে তাঁহার অপূর্ব্ব জীবনীর সহিত ভারতীয় সভ্যতা প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি দক্ষিণ দেশের অনার্য্যদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কাহাকেও অনিচ্ছাসত্ত্বে বিতাড়িত করেন নাই। বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করিয়াছিলেন, সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য দিয়া সৌখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। সৈন্যদের প্রত্যাবর্ত্তনের সহিত নানাদেশে তাঁহার যশঃ-মহিমা প্রচারিত হইয়াছিল। তাহা নানা দেশীয় গ্রন্থের আবিষ্কারের সহিত প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। "শ্যাম দেশীয় ভাষায় বিরচিত বিশেষ বিশেষ পুস্তকের অন্তর্গত রাম ও লক্ষণ চরিত্র, রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ, রাম রাবণের যুদ্ধ বর্ণন, অনিরুদ্ধ উপাখ্যান, ভগবতী মাহাত্ম্য কথন, সুগ্রীব-সহোদর বালিরাজার বৃত্তান্ত এবং কাম ধেনু, নাগ কন্যা, যক্ষ, রাক্ষসাদি সংক্রান্ত নানা বিষয়ক প্রস্তাবে সংস্কৃত শাস্ত্রেরই সম্পূর্ণ কার্য্যকারিত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশের ভাষায়ও রামচরিত্রাদিবিষয়ক অনেক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত উভয় ভাষাতেই ঐ সমস্ত বিষয় সংক্রান্ত বহুতর কাব্য ও নাটক বিদ্যমান আছে। ঐ সমুদায়ই ভারতবর্ষীয়, অতএব মুখ্য বা গৌণরূপে সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত, তাহাতে সন্দেহ নাই" (Asiatic Researches London, Vol x., 1811, pp 234 and 248—251)। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি যে, বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী যুগে "ভারত-বর্ষীয় রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ধর্ম্মশাস্ত্র, সাহিত্যশাস্ত্র প্রভৃতি সমুদ্র অতিক্রমপূর্ব্বক যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপে নীত হইয়া ধর্ম্ম ও নীতি প্রকাশ করিয়াছে। কেবল যব ও বালি দ্বীপে নয়, ঐ অঞ্চলের অন্যান্য দ্বীপস্থ লোকেরও শিক্ষা ও সভ্যতা সাধন বিষয়ে যে হিন্দুদিগের বিশেষ-রূপ কার্য্যকারিত্ব ছিল, নানা বিষয়ে তাহার অনেকানেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি সুমাত্রা, লেম্বা, সেলিবিজ 'প্রভৃতি দ্বীপের বর্ণাবলী ও দেবনাগরাদি ভারতবর্ষীয় অক্ষরের ন্যায় কবর্গ,

চবর্গাদি বর্গ-বিভাগের নিয়মানুসারে বিভক্ত দেখা যায়" (The Journal of the Indian Archipelago vol II. No xii, pp. 770—774.)। পুনরায় আমেরিকাখণ্ডের অন্তঃপাতী পিরুবিয়া (Peru) দেশে প্রচলিত 'রামসীতোয়া' নামক মহোৎসব ও ঐ দেশীয় নৃপতিগণের সূর্য্যবংশ ও ইক্ষুকুল (Dynasty of Sugar-cane) হইতে উৎপত্তি প্রবাদ, ঐ খণ্ডের মধ্যস্থলবাসী কতকগুলি জাতির ভাষায় ঈশ্বরের নাম "সিবু" প্রভৃতি হইতে সম্রাট রামচন্দ্রের অতুলনীয় প্রভাবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় (A. R vol. I. p. 426)।

ভারতের জগৎশিক্ষার দ্বিতীয় অভিযান হয় শ্রীকৃষ্ণের সময়। তিনি একদিকে যেমন অর্জ্জুনের এবং উদ্ধবের প্রতি উপদেশের দ্বারা তৎকালীন মানবের আধ্যাত্মিককল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন, অপর দিকে দুরন্ত রাজাদিগেরও সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া জগতে শান্তিবিধান করিয়া যান। তাঁহার প্রভাব যে শুধু ভারতেই আবদ্ধ ছিল এমন নহে; মহাভারত, ভাগবত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইহাই অনুমিত হয় যে, তৎকালীন প্রায় সমগ্র প্রাচ্য খণ্ডই উহা অনুভব করিয়াছিল। খৃষ্টাব্দের ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীকদিগের নিকট যে এই ধর্ম্ম পরিচিত ছিল তাহা ভীলসার (Bhelsa) একটি বৈষ্ণব-ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রস্তর-অনুলিপিতে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। ঐ লিপিতে আমতালিকিতা (Amtalikita) বলিয়া একজন মহারাজের নাম আছে। এই আমতালিকিতা যে গ্রীকরাজ অ্যানটিয়ালকাইডাস (Atialkidas), সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কানিংহাম (Cunningham) তাঁহার রাজত্বকাল স্থির করিয়াছেন ১৭৫ খৃঃ পূঃ, কিন্তু উইলসন সাহেব স্থির করিয়াছেন ১৩৫ খৃঃ পূঃ (vide the Journal of the Royal Asiatic Society, of the year 1909, Part IV, Oct.)। অপর দিকে বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কালযবন গার্গ্যের সহিত সন্ধি করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কৌশলে নিধন করেন। এই কালযবন অসুর

যে কালদে (Chaldea) নিবাসী তাহাও নানা কারণে বেশ অনুমিত হয়।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচলন আমরা শ্রীকৃষ্ণ হইতেই লক্ষ্য করি। কিন্তু তাহারও বহু পূর্ব্বে এই বিষ্ণুর উপাসনা ভারতে প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের ১ম, ২৩ সূক্তের ১৭ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়,—

ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং।
সমূলহমস্য পাংসুরে ॥ ১৭ ॥

"বিষ্ণু এই (জগৎ) পরিক্রম করিয়াছিলেন, তিন প্রকার পদ-বিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার ধূলিযুক্ত (পদে) জগৎ আবৃত হইয়াছিল।" যাস্ক ইহার ব্যাখ্যা করিযাছেন,—

"যদিদং কিঞ্চ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুঃ। ত্রিধা নিধত্তে পদং। ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ। সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসি ইতি ঔর্ণবাভঃ।" নিরুক্ত ১২।১৯। দুর্গাচার্য্য নিরুক্তের এই অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"বিষ্ণুরাদিত্যঃ। কথমিতি যত আহ ত্রেধা নিদধেপদং নিধত্তে পদং নিধানং পদৈঃ। ক তৎ তাবৎ। পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ। পার্থিবোঽগ্নির্ভূত্বা পৃথিব্যাং যৎকিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি। অন্তরিক্ষে বৈদ্যুতাত্মনা। দিবি সূর্য্যাত্মনা যদুক্তং তমূ অক্রিন্বন ত্রেধা ভূবে কমিত। সমারোহণে উদয় গিরৌ উদ্যন্ পদমেকং নিধত্তে। বিষ্ণু পদ মধ্যন্দিনেঽন্তরিক্ষে। গয়শিরস্যস্তং গিরৌ ইতি ঔর্ণবাভ আচার্য্যো মন্যতে।"

ইহা হইতে এই বুঝা যায় যে বৈদিক হিন্দুগণ সূর্য্যকে বিষ্ণু বলিয়া উপাসনা করিতেন। সূর্য্যের উদয়গিরিতে আরোহণ, মধ্য আকাশে স্থিতি, এবং অস্তাচলে গমন, বিষ্ণুর এই তিন পদবিক্ষেপ।—ঔর্ণবাভ।

তাই শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় উপরোক্ত মন্ত্রের টিপ্পনিতে বলেন,—"এই সূর্য্যরূপ বিষ্ণুর জগতে পদবিক্ষেপরূপ উপমা হইতে ক্রমে নানা উপাখ্যান রচিত হইতে লাগিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, দেব ও অসুরদিগের মধ্যে এই জগৎবিভাগ কালে ইন্দ্র বলিলেন,

'বিষ্ণু যতটুকু তিন পদে বিক্রম করিতে পারেন ততটুকু দেবগণের, অবশিষ্ট অসুরদিগের।' অসুরগণ সম্মত হইল এবং বিষ্ণু তিন পদ বিক্রমে জগৎ, বেদ ও বাক্য ব্যাপ্ত করিলেন। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।—৬।১৫॥) শতপথ ব্রাহ্মণে অসুরগণ বলিতেছে, বামনরূপ বিষ্ণু শয়ন করিলে যতটুকু স্থান ব্যাপ্ত হয় ততটুকু দেবগণের; দেবগণ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সমস্ত জগৎ পাইলেন। (শতপথ-ব্রাহ্মণ। ১। ২। ৫॥) ঐ ব্রাহ্মণে (১৪। ১। ১) বিষ্ণুর সকল দেবের মধ্যে প্রাধান্য লাভের এবং তৎপর তাঁহার মস্তক ছিন্ন হওয়ার কথা আছে, এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৫। ১) ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে (৭। ৫) এই উপাখ্যান পাওয়া যায়। তাহার পর বিষ্ণুর বামন অবতার, বলিরাজার দমন ও হয়গ্রীবোপাখ্যান সম্বন্ধে পৌরাণিক উপাখ্যান আমরা সকলেই জানি। সূর্য্যের আকাশভ্রমণ সম্বন্ধে একটি বৈদিক উপমা হইতে কত উপাখ্যান সৃষ্ট হইয়াছে!*

"বিষ্ণু সূর্য্যের একটি নাম মাত্র, বেদের অনেক দেবগণের মধ্যে একজন দেবের একটি নাম মাত্র; তিনি পুরাণের জগৎপাতা পরমদেব হইলেন কিরূপে? ইহা মীমাংসা করা কঠিন নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বেদরচনার সময় সরলচিত্ত উপাসকগণ প্রকৃতির প্রত্যেক বিস্ময়কর দৃশ্য বা কার্য্যে একজন দেব অনুমান করিতেন। কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যখন জ্ঞানের উন্নতি হইল তখন হিন্দুগণ প্রকৃতির সকল কার্য্যে একজন নিয়ন্তা দেখিতে পাইলেন, একজন পালনকর্ত্তা বুঝিতে পারিলেন। সূর্য্য, আমাদিগকে পালন করেন, বায়ু আমাদিগকে পালন করেন, অগ্নি আমাদিগকে পালন করেন, কিন্তু এগুলি কার্য্য মাত্র, একজন কর্ত্তা এই কারণসমূহের দ্বারা, বায়ু অগ্নি ও সূর্য্য দ্বারা আমাদিগকে পালন করেন, সভ্য হিন্দুগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন। সে দেবের কি নাম দিবেন? বিষ্ণু জগৎ রক্ষা করেন,

* মৎস্য—শতপথ ব্রাহ্মণ ১। ৮। ১॥, বরাহ—তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭। ১। ৫॥; কূর্ম্ম—শতপথ ব্রাহ্মণ ৭। ৫। ১। ৫॥; হয়গ্রীব—শতপথ ১৪। ১। ১॥; বামন—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬। ১৫॥ শতপথ ১। ২। ৫॥

তিন পদবিক্ষেপে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া থাকেন, এরূপ বর্ণনা বেদে আছে; অতএব সভ্য হিন্দুগণ বেদ হইতে সূর্য্যের 'বিষ্ণু' নামটী গ্রহণ করিয়া জগতের পালনকর্ত্তাকে সেই নাম দিলেন।" কিন্তু এই বহুদেবতার উপাসনা সত্ত্বেও বৈদিক ঋষিরা যে তাহাদের মধ্যবর্ত্তী পরম দেবতাকে জানিতেন, তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। তৎকালীন ভারত ভারতী প্রকৃতির প্রতি বিস্ময়কর সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা মনীষী ছিলেন তাঁহারা আবার ঐ সকল দেবতার মধ্য দিয়া সেই এক সৎ দেবতার অনুসন্ধান পাইয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে ঐ বিজ্ঞান পৌরাণিক যুগে সাধারণ মানবের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে পরিণত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের যুগে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন ও হয়গ্রীব অবতারের প্রসঙ্গ থাকিলেও প্রকৃত অবতারতত্ত্বের প্রকাশ হইয়াছিল পৌরাণিক যুগে। এই যুগেই হর-গৌরী অবতারে বৈদিক অগ্নিরুদ্রাদি দেবতা শ্রীশঙ্করে লীন হইয়া শ্রীভগবানের সংহারমূর্ত্তির অপূর্ব্ব প্রকটন করিয়াছে। সেইরূপ আবার বৈদিক নানা আখ্যানসমন্বিত সূর্য্যদেবতা, রাম ও কৃষ্ণ অবতারে লীন হইয়া শ্রীভগবানের পালনীশক্তির অত্যদ্ভুত প্রকটন করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, এই যুগে সাংখ্য দর্শনের মহদাদি তত্ত্ব বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহরূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

আর একটি বিষয় আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে। ঋগ্বেদে আছে,—

ইংদ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদংত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥

"(এই আদিত্যকে) মেধাবিগণ, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া থাকেন। ইনি স্বর্গীয়, পক্ষবিশিষ্ট ও সুন্দর গমনশীল। ইনি এক হইলেও ইহাকে বহু বলিয়া বর্ণনা করে। ইহাকে অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা বলে।"

মূলে "সুপর্ণঃ গরুৎমান্" আছে। "সুপর্ণঃ সুপতনঃ গরুৎমান্ গবণবান্ পক্ষবান্ বা। এতন্নামকো যঃ পক্ষী অস্তি সোঽপি অয়মেব।"—

সায়ন। আদিত্যরূপ বিষ্ণুর গরুড়পক্ষী বাহন, এই যে পৌরাণিক কথা আছে, তাহা এইরূপ বৈদিক উপমা হইতে বোধ হয় উৎপন্ন হইয়াছে এবং পরে রামায়ণপরিচিত ইজিপ্ট ও আসিরিয়া দেশীয় গরুড় দেবতাও বোধ হয় এই দেশ হইতেই গিয়াছে। যে সকল বেদনিন্দুক, ভগবদ্বেষীরা শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এবং বিষ্ণু উপাসনার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান, তাহাদের শব্দজালবিস্তার সত্বেও আমরা উপরোক্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। ছান্দগ্যোপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ, অতি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে (যথা রথপালসূত্রসন্নে, ললিতবিস্তার) কেশবের কুন্তলের মাধুরীবর্ণন এবং শ্রীবুদ্ধের সমসাময়িক ভগবদ্ধর্ম্মের অস্তিত্ব দেখিয়া আর কোনও সংশয় আমাদের হৃদয় অন্ধকার করে না। শ্রীকৃষ্ণ ভারত-ভারতীর হৃদয়ের রাজা। তাহারা তাঁহাকে বহু মন্ত্রতন্ত্রে দর্শন করিয়াছে, বহু ছন্দে-বন্দে বর্ণনা করিয়াছে,—নাস্তিকের নাস্তিকতা কি তাঁহাকে ভুলাইয়া দিতে পারে? তাঁহার ধর্ম্ম আকাশের ন্যায় নির্ম্মল, সমুদ্রের ন্যায় গভীর, হিমানীর ন্যায় মহান, পৃথিবীর ন্যায় সর্ব্বংসহ; তাঁহার শাসন এখনও ভারতে অপ্রতিহত।

এইরূপে শ্রীভগবান তাঁহার অতিপ্রিয় অন্তরঙ্গ লীলাভূমি ভারতে আগমন করিয়া যুগে যুগে দুষ্টের দলন ও শিষ্টের পালনের দ্বারা জগতের অন্ধকার দূর করিয়া শান্তিরাজ্য স্থাপন করিয়া থাকেন। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে তৃতীয় মহাভিযানের শ্রেষ্ঠ নেতা শ্রীবুদ্ধদেবের শিক্ষা ও প্রচার লইয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

(ক্রমশঃ)

স্বপ্নতত্ত্ব।

(ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মস্তিষ্কের ক্রিয়া হইতেই মানসিক ভাব ও অনুভূতিসকল উৎপন্ন হয়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অধিকাংশেরই এইরূপ মত। পাশ্চাত্যের শারীর-বিজ্ঞানের (physiology) আলোচনায় দেখা যায়, আমাদের বহিরিন্দ্রিয়গণ বাহ্য জগতের পদার্থসকলের সঙ্ঘর্ষে উপস্থিত হইয়া আঘাতপ্রাপ্ত ও কম্পিত হইয়া উঠে; ঐ কম্পন স্নায়ুমণ্ডলী অবলম্বনে ক্রমে মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হয় এবং মস্তিষ্ক উহার বিরুদ্ধে প্রতিঘাত করিয়া থাকে, ঐরূপ ঘাতপ্রতিঘাতের ফলেই আমাদিগের অন্তরে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ প্রভৃতির এবং বাহ্য বস্তুসমূহের অনুভূতি আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব মস্তিষ্ক হইতে পৃথক্ পদার্থবিশেষ বলিয়া মনের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন কোথায়?

প্রাচ্য দর্শন কিন্তু পাশ্চাত্যের সহিত ঐ বিষয়ে একমত নহে। উহা বলে, মানবের নিত্য উপলব্ধ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাদিকালে সময় সময় এমন প্রত্যক্ষসকল দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদিগের আলোচনায় পাশ্চাত্য দর্শনের ঐ মত অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণেরও কেহ কেহ ঐ কথা স্বীকারপূর্ব্বক বলিয়াছেন, ঐরূপ অসাধারণ প্রত্যক্ষনিচয় বিরল হইলেও একেবারে অপ্রাপ্য নহে। সুপ্রসিদ্ধ ইতালীয় বৈজ্ঞানিক সিজার লম্ব্রসো (Caesare Lombroso) দুষ্কৃত-কারিদিগের বাহ্যান্তর গঠনপরিণতি (Criminal Anthropology) নামধেয় শারীর-বিজ্ঞানের নূতন এক অঙ্গ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার রচিত পুস্তকে বায়ুরোগগ্রস্তা (হিষ্টিরিয়া) এক বালিকার অত্যদ্ভুত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ঐ বিবরণী হইতে কতকগুলি

কথা এখানে উদ্ধৃত করিলে আমাদিগের আলোচ্য বিষয়ের সহায়তা হইতে পারে।

এই বালিকার বয়স তখন চতুর্দ্দশ বৎসর ছিল। তাহার পিতা এক জন অতি বুদ্ধিমান, কার্য্যক্ষম এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি বলিয়া সমগ্র ইতালীর মধ্যে পরিচিত ছিলেন। হিষ্টিরিয়া হইবার এক মাস পর হইতে ঐ বালিকা তরল খাদ্য ব্যতীত অন্য কিছু খাইতে পারিত না এবং অনেক সময়ে নিদ্রিত অবস্থায় (Somnambulism) উঠিয়া সকল প্রকার কর্ম্ম সাধনে নিযুক্ত হইত। গৃহকার্য্যে ও সঙ্গীতচর্চ্চায় ঐ সময়ে তাহার বিশেষ অনুরাগ দেখা যাইত এবং পিতা মাতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার ভাব সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উহার কিছু দিন পরে তাহার দুই চক্ষুর দৃষ্টি লোপ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এক অতি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। বালিকার চক্ষুর দৃষ্টি বিনষ্ট হইল বটে, কিন্তু ঐ বিষয়ের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপে তাহার নাসিকাগ্রে এবং বাম কর্ণপত্রের নিম্নভাগে (ear-lobe) দৃষ্টিশক্তির আবির্ভাব হইল। শরীরের ঐ দুই স্থান বিশেষতঃ নাসিকার অগ্রভাগ দিয়া সে সকল প্রকার লেখা পড়িতে লাগিল! সিজার লম্ব্রসো যৎকালে বালিকাকে পরীক্ষা করিতে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে ডাকঘর হইতে একখানি পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তখন বালিকার চক্ষুদ্বয় বেশ করিয়া তুলা দিয়া বন্ধ করিয়া ঐ চিঠি তাহাকে পড়িতে দিয়াছিলেন এবং সেও উহা তাঁহার সমক্ষে অনায়াসে পাঠ করিয়াছিল। বালিকার নাসিকাগ্রে ও বাম কর্ণে আবির্ভূত ঐ দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতার পরিমাণও লম্ব্রসো পরীক্ষাপূর্ব্বক স্বরচিত পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের চক্ষুর উপর আলোকরশ্মি প্রতিবিম্বিত করিয়া দিলে যেরূপ ক্লেশ উপস্থিত হয়, বালিকার নাকের এবং বাম কর্ণের যেখানে দৃষ্টিশক্তি নিহিত ছিল, সেই স্থানে সূর্য্যরশ্মি প্রতিবিম্বিত করিয়া দিলে সেইরূপ অসচ্ছন্দতার উদয় হইত। লম্ব্রসো ঐরূপে ঐ বিষয় পরীক্ষা করিবার কালে বালিকা বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিল,—'তুমি কি আমাকে অন্ধ করিতে চাও?'

দর্শনশক্তির ন্যায় এই বালিকার ঘ্রাণশক্তিও স্থানচ্যুত হইয়াছিল। নাসিকা ছাড়িয়া উহা চিবুকের নীচে আবির্ভূত হইয়াছিল। যে এমোনিয়ার তীব্র গন্ধ মানবসাধারণ কষ্টে সহ্য করে তাহা এই বালিকার নাসিকার নিকটে ধরিলে সে কিছুমাত্র গন্ধ পাইত না। কিন্তু কটু বা মৃদু গন্ধবিশিষ্ট কোন পদার্থ তাহার চিবুকের নিকটে আনিলে সে উহা অনায়াসে অনুভব করিত। কোনরূপ দুর্গন্ধ আসিলে হস্ত দ্বারা নিজ চিবুক চাপিয়া ধরিত এবং মস্তক দোলাইয়া বিরক্তি প্রকাশ করিত। ঐরূপে কোনরূপ সুগন্ধ আবার তাহার চিবুকের নিকটে ধরিলে সে চক্ষু মুদ্রিত ও মৃদুহাস্যপূর্ব্বক জোরে জোরে নিশ্বাস টানিয়া আনন্দের ভাব প্রকাশ করিত।

প্রধান জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বয় স্থানভ্রষ্ট হইবার কিছুকাল পরে এই বালিকাতে দূরদর্শনশক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাব পিতা মাতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে এই কালে যে সকল কথা বলিয়াছিল তাহা দুই বৎসর মধ্যে সফল হইয়াছিল এবং দেড় মাইল দূরস্থিত একটি নাট্যালয়ের কোন-খানে বসিয়া তাহার ভ্রাতা অভিনয় দেখিতেছে তাহাও এক দিবস নিজ ভবন হইতে দেখিতে পাইয়াছিল।

জড়বাদী বৈজ্ঞানিকগণ সিজার লম্‌্রসো কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ পূর্ব্বোক্ত ঘটনাবলীর কোনরূপ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারেন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ শারীরিক বিকৃতিপরিণতিই তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তে মন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জড় দেহের বিকৃতাবস্থায় মনের ঐরূপ অসাধারণ ক্রিয়া ও শক্তিপ্রকাশ সম্বন্ধে আরও অনেক দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐরূপ কতকগুলি ঘটনা আমরা কলিকাতার মেডিক্যাল ক্লাবের মাসিক পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছি।* লেখক ঐরূপ ঘটনাবলীর সহায়ে ইহাই প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান যে, জড় স্নায়ুমণ্ডলী অবলম্বনে মানসিক শক্তি সাধারণতঃ প্রকাশিত হইতে দেখা যাইলেও উহা স্নায়ুমণ্ডলী ব্যতিরেকেও আত্ম-

* Vide, Jounal Calcutta Medical Club Vol. V, Page 222.

প্রকাশ করিতে সময়ে সময়ে সক্ষম হইয়া থাকে। মনের ঐ অপূর্ব্ব শক্তিকেই আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে মানবের 'অজড়' ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত করিয়াছি। স্নায়ুমণ্ডলীর বিজ্ঞাননির্দ্দিষ্ট সুস্থাবস্থা ও নিত্যপরিদৃষ্ট সাধারণ শক্তি অনেকাংশে লুপ্ত হইবার পরে মনের অদৃষ্টপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশের যে সকল বিবরণ আমাদের নয়নগোচর হয়, তাহা হইতে আমাদিগের মধ্যে ঐ অজড় ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়।

কর্ম্মক্ষেত্রে ও আধ্যাত্মিক রাজ্যে যে সকল প্রতিভাশালী মনীষী পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন তাঁহাদিগের প্রত্যেকের জীবনে এমন কতকগুলি অসাধারণ প্রত্যক্ষ, অনুভূতি, দর্শন অথবা প্রত্যাদেশ উপস্থিত হইবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়—যাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত সংসারভূমির নহে। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান উহাতে তাঁহাদিগের মধ্যে আংশিক উন্মত্ততার পরিচয়ই এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছে।

সক্রেটিস (Socrates) নিজ জীবনের জটিল সন্ধিস্থলসমূহে কোন পথে চলিতে হইবে—কোন বিষয় করিতে এবং কোন বিষয় হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হইবে, তদ্বিষয়ক প্রত্যাদেশ লাভপূর্ব্বক উহা ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া গ্রহণ করিতেন। ইংরাজী বিশ্বকোষে (Encyclopaedia Britannica) সক্রেটিস সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ আছে, তাহাতে সক্রেটিসের ঐপ্রকার অসাধারণ অনুভূতির আলোচনাপূর্ব্বক নানা কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

হজরৎ মহম্মদ ঈশ্বরের নিকট হইতে যে সকল প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই কোরাণাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গভীর ধ্যানমগ্ন হইয়া সময়ে সময়ে তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা লুপ্ত হইত জানিয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক তাঁহার মৃগীরোগ ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার লডার ব্রাণ্টন (Lauder Brunton) ঐ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত অভিমত প্রকাশপূর্ব্বক বলিয়াছেন, ঈশ্বরের প্রত্যাদেশলাভরূপ হজরৎ মহম্মদ সম্বন্ধে যে কথা প্রসিদ্ধ আছে তাহা পূর্ব্বোক্ত মৃগীরোগের খেয়াল ব্যতীত আর কিছুই নহে;

পটাস্ ব্রোমাইড খাওয়াইয়া তাঁহার চিকিৎসা করা হইলে পৃথিবীর ইতিহাস নিশ্চয় ভিন্নাকার ধারণ করিত।

প্রাচীন যুগ হইতে একাল পর্য্যন্ত যে সকল মহাত্মা পৃথিবীকে ধর্ম্ম-ধনে ধনী করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা নিজ নিজ বিদ্যা-বুদ্ধিবলে আধ্যাত্মিক রাজ্যের নূতন সত্যসমূহ আবিষ্কারপূর্ব্বক লোকশিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, এরূপ কথা কখন বলেন নাই। তাঁহারা সতত প্রচার করিয়াছেন, দৈবশক্তিবলে তাঁহারা ইন্দ্রিয়াতীত ভূমিতে আরূঢ় হইয়া যে অলৌকিক সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, ত্রিবিধ দুঃখ বন্ধন হইতে মুক্ত ও অনন্ত শান্তি এবং আনন্দের অধিকারী করিবার জন্য তাহাই জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। উপনিষদাদি গ্রন্থে ঋষিগণ বিশ্ব জগতের কারণ সম্বন্ধে যে সকল চরমতত্ত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহা ঐরূপেই বলা হইয়াছিল। স্বীয় ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির দ্বারা তাঁহারা ঐ বিষয়ে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাহাই ঐ সকল গ্রন্থে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অথচ বিচারবুদ্ধিসহায়ে নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসকল আবিষ্কারপূর্ব্বক আমরা জ্ঞানের পথে যতই অগ্রসর হইতেছি ততই ঋষিদিগের প্রচারিত ঐ অমূল্য বাক্যসকলের সত্যতা সম্বন্ধে সমর্থন পাইতেছি। ইহা স্বল্প বিস্ময়ের কথা নহে। ঐরূপে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যে নিগূঢ় সম্বন্ধের কথা ঋষিগণ উপদেশ করিয়াছেন স্বপ্নতত্ত্বের যথাযথ আলোচনা আমাদিগকে তদ্বিষয়ে বুঝিবার পথেই অগ্রসর করিবে।

জড়বাদী পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক যে সকল অসামান্য অনুভূতিকে উন্মাদের লক্ষণ (hallucination বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কর্ম্ম-জগতেও তাহা কখন কখন অসাধ্য সাধন করিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপে পাশ্চাত্য ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জোয়ান্ অব আর্কের (Joan of Arc) কথা এখানে বলা যাইতে পারে। সেই প্রাচীন যুগে ফ্রান্সের স্বাধীনতাসূর্য্য ইংলণ্ডের প্রবল প্রতাপে অস্তমিতপ্রায় হইলে এক ষোড়শী কৃষক কন্যা রাজদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং শত্রুর কবল হইতে দেশ পুনরুদ্ধারপূর্ব্বক যুবরাজের রাজ্যাভি-

ষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া আপনাকে ঘোষণা করিয়াছিল। যথার্থই সে প্রত্যাদেশ পাইয়াছে কি না তদ্বিষয়ে পরীক্ষাও করা হইয়াছিল। তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার কালে যুবরাজের এক বন্ধু রাজবেশ এবং যুবরাজ স্বয়ং পরিচারকের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু জোয়ান তাহাতে প্রতারিতা না হইয়া যুবরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "হে রাজন, আপনার ছদ্মবেশ কি আমাকে প্রতারিত করিতে পারে? আমি যে মনশ্চক্ষে আপনার মূর্ত্তি দেখিয়াছি।"

পরে যাহা ঘটিয়াছিল, পাঠকের তাহা অবিদিত নাই। জগতের ইতিহাসে তাহা এক পরম বিস্ময়কর ঘটনা। ফ্রান্সের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার সেই দরিদ্রা, অশিক্ষিতা, নগণ্যা কৃষক-কন্যকা দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল!

ঐরূপে প্রতিভাশালী ঈশ্বর-সাধকদিগের ন্যায় বিশিষ্ট কর্ম্মিদিগের জীবন আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যাহাকে উন্মত্ততার লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, সেই প্রকার ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিসকলের মধ্য দিয়াই তাহাদিগের অসাধারণত্ব বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে এবং বিজ্ঞাননির্দ্দিষ্ট সুস্থ স্নায়ুমণ্ডলীযুক্ত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা তথাকথিত অসুস্থ স্নায়ুমণ্ডলীযুক্ত লোকদিগের মধ্যেই ঐ অসাধারণত্ব সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছে।* পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান যাহাকে স্নায়ুমণ্ডলীর সুস্থ ও সহজ অবস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে তাহা মানবের অন্তরনিহিত অসাধারণ শক্তিসকলের বিকাশের পথে অন্তরায় হয় বলিয়াই কি ঐরূপ হইয়া থাকে? নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (Napoleon Bonaparte) এবং জুলিয়াস সিজার পৃথিবীর ইতিহাসে দুইজন অতি শ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীর ছিলেন। বৈজ্ঞানিকদিগের মতে কিন্তু তাঁহারা উভয়েই এক প্রকার মৃগীরোগাক্রান্ত ছিলেন। নিজে (Nietzsche), সুইফ্‌ট (Swift),

* The Insanity of Genius—J. F. Nisbet.

স্কোমান (Schumann), ল্যাম্ব (Lamb) ইঁহারা সকলেই জীবৎকালে কখন কখন উন্মাদ হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।* কেপলার (Kepler), বেকন (Bacon), টার্নার (Turner) পাগলের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাগলের বংশে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম জগতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তির উদাহরণ আমাদের দেশেও বিরল নহে। দূরদৃষ্টিমূলক স্বপ্নসকলের ন্যায় উপরোক্ত ঘটনাগুলিও কি আমাদিগের অন্তরে অজড় ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব সূচনা করে না? দূরদর্শনশক্তি সম্ভবতঃ কেবলমাত্র মনুষ্যজাতির মধ্যেই নিবদ্ধ নহে। নিম্নশ্রেণীর জীবের মধ্যেও উহার অস্তিত্ব সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। মনস্তত্ত্বানুশীলন সভার পত্রিকায় (Journal of the Psychical Research Society) ঐ বিষয়ক অনেকগুলি ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে।†

নিম্নশ্রেণীর জীবের দূরানুভূতি থাকা স্বীকার করিলে আমরা এক্ষণে যাহা ভাল বুঝিতে পারি না জৈব জীবনের এমন কতকগুলি ঘটনার বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।‡ স্বপ্নাবস্থার ন্যায় হিপ্নোটাইজ্ড অবস্থায় স্নায়ুমণ্ডলী একপ্রকার সচরাচর অদৃষ্ট অবস্থা লাভ করে। ঐ অবস্থাগ্রস্ত ব্যক্তিবিশেষে দূরদৃষ্টিশক্তির বিকাশ হইয়াছিল আমার জানা আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য পুস্তকাদিতে এই অবস্থায় দূরদৃষ্টিশক্তি বিকাশের কথা বিরল পাওয়া যায়। প্রফেসর উইলিয়াম গ্রেগরী (Professor William Gregory) ঐ সম্বন্ধে এক স্থলে বলিয়াছেন—"ব্রেড (Braid) এই অবস্থাগ্রস্ত লোকদিগের মধ্যে দূরদৃষ্টির ঘটনা দেখেন নাই এবং নিজেও কখন উহা উৎপাদন করিতে পারেন নাই বলিয়া ঐ অবস্থায় দূরদৃষ্টি প্রকাশ হইতে পারে,

* Vide British Medical Journal, June, 1911

† Vide Journal of the Psychical Research Society, Vol. XI. pp. 278-290 and pp. 323-4; the same Vol. XII. pp. 21-3; the same Vol. IV. pp. 289.

‡ e.g. Chemio-tanis,

একথা একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন। আমি ব্রেডকে বিশেষরূপে মান্য করি, তথাপি না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটি গভীর গবেষণার পরিচায়ক নহে। আমি ঐ বিষয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করিবার বহুদিন পরে এইরূপ উচ্চ স্তরের ঘটনা দেখিতে পাইয়াছি। * আমাদিগের ধারণা দূরদৃষ্টিপরিচায়ক ঘটনা, স্বপ্নের ন্যায় হিপ্‌নোটাইজ্‌ড অবস্থাতেও ক্বচিৎ ঘটিয়া থাকে। সম্ভবতঃ উহা হিপ্‌নোটাইজ্‌কারীও ঐ অবস্থাপ্রাপ্ত—কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয় ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতির উপর নির্ভর করে। ঐ অবস্থায় (হিপ্‌নোটাইজ্‌ড্‌) আমি যে স্থলে দূরদৃষ্টি উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি, সেইখানে ঐ দুইজনই বিশেষ আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন ছিলেন।

ধর্ম্ম সাধনা করিবার কালে প্রাণায়াম করিবার প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গদর্শন পত্রিকায় তাঁহার 'নৌকা ডুবি' গ্রন্থ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করিবার কালে প্রাণায়ামের একটি সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত ব্যাখ্যার সারমর্ম্ম এইরূপ ছিল—বাক্য ও মনের দ্বারা জগদীশ্বরের উপাসনা করিবার কথা আমরা সকলে বিদিত আছি; ঐ সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাস নিয়মিত করিয়া তাহার দ্বারাও তাঁহার উপাসনা করিতে চেষ্টা করার নামই প্রাণায়াম। নৌকাডুবির গল্পটি কিন্তু যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তখন তাহাতে প্রাণায়াম সম্বন্ধে উক্ত ব্যাখ্যা বাদ দিয়া দেওয়া হয়। ঠাকুর মহাশয়কে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের অনুরোধে ঐরূপ করিতে হইয়াছে। আবার চিন্তাশীল কোন কোন ব্যক্তির ধারণা, প্রাণায়ামের দ্বারা সাধকগণ এক প্রকার হিপ্‌নোটাইজ্‌ড অবস্থায় স্বতঃ উপস্থিত হয়েন। বাহ্যেন্দ্রিয়ক্রিয়াসমূহ স্তব্ধ হইয়া ঐ অবস্থায় তাঁহাদিগের অন্তরনিহিত অসাধারণ শক্তিসকল জাগরিত হইয়া উঠিবার সুযোগ লাভ করে। সাধনপ্রণালীসকলের মধ্যে প্রাণায়ামের সমাদর ঐ জন্যই ভারতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

* Animal Magnetism by William Gregory, M.D., F.R.S.E.

হিপ্‌নোটিজ্‌ম্ (hypnotism) সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের গবেষণার দুই একটি কথা এস্থলে উল্লেখ করা ভাল। মোটামুটি ভাবে বলা যাইতে পারে যে আমাদের দেহে দুই প্রকার স্নায়ু আছে, প্রথমতঃ ক্রেনিয়াল নার্ভস্ (Cranial nerves) অথবা মস্তিষ্ক হইতে নির্গত স্নায়ু। এই শ্রেণীর ১১ জোড়া স্নায়ু আমাদের দেহের মধ্যে আছে। এইগুলি ব্যতীত মানবশরীরান্তর্গত অন্য সমস্ত স্নায়ুই স্পাইনাল নার্ভস্ অর্থাৎ কশারুক মজ্জা Spinal cord হইতে উৎপন্ন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দেখিয়াছেন যে, কৃত্রিম উপায়াবলম্বনে মস্তিষ্ক-নির্গত কোন এক জোড়া স্নায়ুর অন্তরে কিছুকালের জন্য মৃদু অথচ ধারাবাহিক উত্তেজনা আনয়ন করিতে পারিলে প্রায়শঃই হিপ্‌নোটাইজ্‌ড্ অবস্থা লাভ করা যায়। যেমন মনস্থির করিয়া যদি উজ্জ্বল আলোকের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখা যায়, কিম্বা শিবনেত্রে ভ্রূমধ্যে অক্ষিগোলকদ্বয় স্থিরভাবে ধারণ করিয়া রাখা হয়, কিম্বা মৃদুধ্বনির প্রতি মনস্থির করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে অনেকের হিপ্‌নোটাইজ্‌ড্ অবস্থা লাভ হয়। ১১ জোড়া ক্রেনিয়াল নার্ভসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান নিউমোগাষ্ট্রীক নার্ভস্ Pneumo-Gastric nerves, কশারুক মজ্জা Spinal cord এবং সিম্পাথেটিক নার্ভস্ Sympathetic nerves ব্যতীত আমাদের দেহে পূর্ব্বোক্ত স্নায়ু Pneumo-gastric nerves অপেক্ষা প্রধান স্নায়ু আর নাই। এই স্নায়ু, দেহের তিনটি সর্ব্বপ্রধান যন্ত্র—যথা, হৃদপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্ এবং পাকস্থলীর পরিচালন কার্য্যের মধ্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। ঐ স্নায়ুর মৃদু ও ধারাবাহিক উত্তেজনা করিয়া কিরূপে হিপ্‌নোটাইজ্‌ড্ অবস্থা আনা যায়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাহা এখনও স্থির করিতে পারেন নাই। কিন্তু এদেশে প্রাণায়ামের মধ্য দিয়া ঐ উপায় আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে এবং বোধ হয় ঐরূপ উত্তেজনায় দেহেরও মঙ্গল হয়। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, পারমার্থিক সাধনে অগ্রসর হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দেহমনে ঐ প্রকার কৃত্রিম অবস্থা আনয়ন করাটা কি ভাল ?

উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, ইহসংসারে কোন কার্য্য সুচারু-

রূপে সম্পন্ন করিতে হইলে আমাদিগকে কেবলমাত্র জাগ্রৎকালে উপলব্ধ জ্ঞানবুদ্ধির আশ্রয় লইতে হয় না ; কিন্তু স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় দেহমনরূপ যন্ত্রকে নিত্য কিছু কালের জন্য নিয়মিতভাবে রক্ষা করা প্রয়োজন হয়। উহা দ্বারা বুঝা যায়, জাগ্রৎকালে আমরা মন এবং চৈতন্যের যে অংশটুকুর সহিত পরিচিত আছি তাহাই আমাদিগের সমগ্র মন ও চৈতন্য নহে এবং উহাই যে আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাবস্থা তাহাও বলা যায় না। অতএব জাগ্রৎকালে সাধারণতঃ প্রকাশিত মানসিক শক্তি অপেক্ষা বিচিত্র ও অধিকতর শক্তি প্রকাশ করিতে হইলে নিদ্রা ও সুষুপ্তি অপেক্ষা গভীরতর কোন এক জাগ্রৎভিন্ন অবস্থায় দেহমনকে নিত্য কিছু কালের জন্য নিয়মিত ভাবে রক্ষা করার প্রযোজন হইবে। ঐ অবস্থাই আমাদিগের শাস্ত্রে সমাধি অবস্থা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে কিছুকালের জন্য বাহ্যসংজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়া থাকে এবং উহা বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহার কাহার স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ অবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তি যে সমগ্র মন ও চৈতন্য উপলব্ধি করেন তদ্বিষয়ে প্রমাণ, ঐ ব্যক্তির অনন্যসাধারণ জ্ঞান এবং সকল বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সমাধি অবস্থা আমাদের দেশ অপেক্ষা পাশ্চাত্য দেশে বিরল হইলেও কতকগুলি পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মধ্যে মনস্তত্ত্বভাবে ঐ অবস্থার বিশেষ অনুসন্ধান ও গবেষণা বর্ত্তমানকালে আরব্ধ হইয়াছে। এক জন সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ঐ অবস্থা সম্বন্ধীয় বক্তৃতা হইতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।*

ইনি বলেন, এই অবস্থার চারিটি লক্ষণ নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। যথা—

(১) অনুভূতিগম্যতা—সমাধি অবস্থায় চৈতন্য থাকিবার এইটিই প্রধান লক্ষণ বলা যাইতে পারে। যাঁহারা এই অবস্থা অনুভব

* The Gifford Lectures (1901-1902)—William James L. L. D. &c. delivered at the University of Edinburgh.

করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বলেন যে, এই অবস্থার বিষয় বুঝাইয়া বলা যায় না। যাহারা কখন এই অবস্থার উপলব্ধি করে নাই তাহা-দিগকে ইহার ভিতরকার ভাব কথায় বুঝান যায় না। অতএব ইতর সাধারণকে উহার বিষয় বুঝাইতে হইলে কেবলমাত্র নেতি নেতি প্রণালীর মধ্য দিয়া বুঝাইতে হয়।* কিন্তু অবস্থাটির স্বরূপ নেতি বা অভাব বস্তু নহে। এই অবস্থার ভিতর দিয়া যে 'ইতি' বা ভাববস্তু অনুভব করা যায়, আমাদের সাধারণ অবস্থার চৈতন্যের ভিতর দিয়া অনুভূত 'ইতির' সহিত তাহার তুলনাই হয় না—তাহার ভাব এত গভীর। ইহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা বুঝিতে হয় এবং এই হিসাবে ইহাকে বুদ্ধিগম্য বলিয়া হৃদয়গ্রাহী অবস্থা-বিশেষ বলা যাইতে পারে। কারণ নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ না করিলে হৃদয়গ্রাহ্য মনোভাবসকল কাহাকেও বুঝান যায় না। যে প্রেমের ভাব অনুভব করে নাই, সে প্রেমিকের অবস্থা বুঝিবে না, এবং তাহার ব্যবহার অর্থশূন্য ও চিত্তের দৌর্ব্বল্যপ্রসূত বলিয়া মনে করিবে। যাহার সুরজ্ঞান নাই, সে সঙ্গীত সুধারসের মহিমা বুঝিবে না।

(২) এই ভাবের মধ্যে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি—পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহাতে সমাধি হৃদয়গ্রাহ্য অবস্থাবিশেষ বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু যাঁহারা এই অবস্থা অনুভব করেন তাঁহাদিগের নিকট ইহা জ্ঞানের অবস্থা বলিয়াই অনুভূত হয়। ভাবমগ্নাবস্থার অন্তর্দৃষ্টিতে যে তত্ত্বসকল সহজবোধ্যও হয়, তাহা আমরা বিচারবুদ্ধির দ্বারা ধরিতেই পারি না। উহাতে তমঃ কাটিয়া যাইয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব নূতন আলোক প্রকাশিত হয়, নূতন তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়, যাহার অর্থ এবং প্রয়োজনীয়তা কথায় ব্যক্ত করা যায় না।† এই অবস্থার অনুভূতি জীবনে একবার

---

* বীরবাণী নামক পুস্তকে প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের সমাধি অবস্থা সম্বন্ধী গানের সহিত তুলনা করুন।

† রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কবিতার সহিত তুলনা করুন—রইল না আর আড়াল

মাত্র আসিলেও সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবন উহার প্রভাবে পরিবর্ত্তিত ও নিয়মিত হইয়া থাকে।

(৩) কর্ত্তৃত্বভাব শূন্যতা—সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তির অনুভূতি হয় যেন তাঁহার নিজ ইচ্ছাশক্তি এক বিরাট ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সতত বিধৃত এবং চালিত হইতেছে। প্রেতাত্মার আবেশে মিডিয়ামগণের স্বাধীন ইচ্ছার বিলোপ হইতে দেখিয়া এবং মানসিক অবস্থাবিশেষের আবির্ভাবে একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন সময়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য করিতে লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ হয়ত ভাবিয়া বসিবেন, সমাধি অবস্থা উহাদিগেরই অনুরূপ কোন প্রকার অবস্থাবিশেষ হইবে। কিন্তু ঐ সকলের সহিত সমাধি অবস্থার একটি বিশেষ বিভিন্নতা আছে। ঐ সকল অবস্থা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের উপর কোনই প্রভাব রাখিয়া যায় না। সমাধি-চৈতন্য হইতে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের কার্য্য হয়। উহা শুধু আসিয়াই চলিয়া যায় না, আমাদের অন্তরঙ্গ জীবনের উপর উহার ভাবের ছবি চিরকালের জন্য মুদ্রিত রাখিয়া যায়। অবশ্য ঐ মুদ্রণের গভীরতার পরিমাণ বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনে বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে।

(৪) ক্ষণস্থায়িত্ব—সমাধি অবস্থা অধিকক্ষণ রাখা যায় না। দুই একটি বিরল দৃষ্টান্ত ব্যতীত, দুই এক ঘণ্টা মাত্র মন ঐ অবস্থায় থাকিবার পরে পুনরায় সাধারণ চৈতন্যের অবস্থায় নামিয়া আসে; অবশ্য ইহার একাধিকবার পুনরাবৃত্তি হইতে পারে এবং ঐরূপ আবৃত্তি দ্বারা ইহার শক্তি এবং প্রভাব বাড়িয়া যায়।"

প্রাণে, বেরিয়ে এলেম জগত পানে, হৃদয় শতদলের সকল দলগুলি এই ফুটল রে, এই ফুটল রে।

* * * * *

আকাশ হতে প্রভাত আলো আমার পানে হাত বাড়ালো; ভাঙ্গা কারার দ্বারে আমার জয়ধ্বনি উঠল রে এই উঠলে রে॥ নিশার স্বপন ছুটল রে ঐ ছুটলরে টুটলরে আঁধার টুটলরে।

জেমস্ সাহেবের সমাধির কালনির্ণায়ক পূর্ব্বোক্ত কথার বিরুদ্ধে বলিতে পারা যায় যে, পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের জীবনী দ্বারা আমরা জানিতে পারিয়াছি, সমাধি অবস্থা কেবল মাত্র দুই এক ঘণ্টা নহে, একাধিক দিন পর্য্যন্তও থাকিতে পারে।

ভাবুকতার মূলে সমাধিচৈতন্যের আবেশ থাকে, এ বিষয় জেমস্ সাহেব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যসহায়ে অনেক অকবির বা নীরব কবির সমাধি-ভাবাবস্থা লাভের কথা জানিতে পারা যায়। সঙ্গীত, কবিতা, ধর্ম্মোপদেশ প্রভৃতি হইতেও ঐরূপ ভাবাবস্থা আসিবার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আবার কাহারও শব্দ বিশেষ জপ এবং উহার উপর মনঃস্থির করিলে সমাধির ভাব উপস্থিত হয়। শেষোক্ত বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপে ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবি টেনিসনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। নির্জ্জনে বসিয়া নিজ নাম জপ করিলে তাঁহার ঐ অবস্থার উদয় হইত। তিনি স্বয়ং ঐ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।*

---

* In a letter to Mr. B. P. Blood, Tennyson reports of himself as follows —

"I have never had any revelations through anæsthetics, but a kind of waking trance—this for lack of a better word—I have frequently had, quite up from boyhood, when I have been alone. This has come upon me through repeating my own name to myself silently, till all at once, as it were out of the intensity of the consciousness of individuality, individuality itself seemed to dissolve and fade away into boundless being, and this not a confused state, but the clearest, the surest of the surest, utterly beyond words—where death was an almost laughable impossibility—the loss of personality (if so it were) seeming no extinction, but the only true life. I am ashamed of my feeble description. Have I not said the state is utterly beyond words?"

আমাদের দেশে প্রচলিত 'শিবোহহং' বা 'সোহহং' মন্ত্রাদি জপের দ্বারা সাধকদিগের যেরূপ অবস্থা ও মনোভাবের উদয় হয়, কবি টেনিসনের নিজ নাম জপের দ্বারা সেইরূপ হইত বলিয়া অনুমিত হয়।*

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মা—শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত। প্রকাশক—শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা, ৫৫নং অপারচিৎপুর রোড। মূল্য আট আনা।

এই গীতি ৬৯টি প্রসাদী পদচ্ছায়ায় রচিত গানের সমষ্টি। রচয়িতা ঠাকুর মহাশয় ভূমিকায় এই গানগুলি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেই ইহার যথাযথ পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। "এই সকল গানের ভূমিকা কি লিখিব জানি না—মা লিখাইয়াছেন, লিখিয়াছি। আমি লেখক মাত্র। কেমন করিয়া কিসের জন্য এ সকল গান আমি লিখিলাম, তাহা আমি জানি না। মায়ের ছেলের আবদারপূর্ণ

Professor Tyndall in a letter, recalls Tennyson saying of this condition "By God Almighty ' there is no delusion in the matter ' It is no nebulous ecstasy, but a state of transcendent wonder, associated with absolute clearness of mind."

Memoirs of Alfred Tennyson, ii. 473

* শ্রীমুকুন্দ দাস মহাশয়ের রচিত একটি গান ঐরূপ ভাবের পরিচায়ক। যথা—

কেবা করে কার আরাধন
আপনি পাতিয়া কান শুন আপনারি গান,
আপনা আপনি আলাপন।
কারে ডাক বার বার কে দিবে তোমারে সাড়া,
আপনারে নাহি জান রয়েছ আপনাহারা,

কথা—এ সকল প্রকাশ করিবার যোগ্য কিনা তাহাও বলিতে পারি না। কেবল মায়ের নাম শুনাইয়া সুখ হয় বলিয়া এগুলি প্রকাশ করিলাম—যদি আমার অপর কোন ভাইকে এগুলির একটিও মায়ের সন্ধান বলিয়া দিতে পারে, তাহা হইলেই আমি পরম সুখী।"

এই নির্ম্মল পবিত্র মাতৃবিষয়ক সঙ্গীতগুলি শ্রবণ করিয়া যদি কাহারও চিত্ত নির্ম্মল হয়, পবিত্র হয়, জীবনে ব্যাকুলতার উদয় হয়—তাহা হইলে আমরাও সুখী হইব।

সতুর মা—গল্পপুস্তক। শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী প্রণীত। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। প্রকাশক—শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, ১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা। মূল্য ১।০

সতুর মা, বিশ্বেশ্বর দর্শনে, বন্ধু, অলক্ষণা, হ্যালির ধূমকেতু, মিলন, বীণার বিবাহ—'সতুর মা' এই সাতটি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি প্রথমে 'কুশদহ' এবং 'সুপ্রভাত' পত্রে প্রকাশিত হয়। এবং পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করিতে বঞ্চিত হয় নাই। লেখিকার গল্প লিখিবার শক্তি আছে, 'সতুর মা' এবং 'বীণার বিবাহ' এই দুটি গল্পে উহার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই পুস্তকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ—একটি মধুর পবিত্র সংযত ভাব। এইটিই বিশেষভাবে উপভোগ্য। পড়িলে লেখিকার প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়। আমরা আশা করি, 'সতুর মা' পাঠকসমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে।

পুস্তকের কাগজ, ছাপা, বাঁধাই চিত্তাকর্ষক।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান।

(স্বামী সারদানন্দ)

(৫)

শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাঁহার পুণ্যদর্শন ও কৃপালাভে সমাগত জনগণের সংখ্যাও তেমনি দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র মুস্তফি প্রমুখ অনেক গৃহস্থভক্তের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তসংঘে যিনি পরে স্বামী ত্রিগুণাতীত নামে সুপরিচিত হইয়াছিলেন—শ্রীযুত সারদাপ্রসন্ন মিত্র, মণীন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি অনেক যুবক ভক্তেরাও এখানে ঠাকুরের প্রথমদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দের ন্যায় অনেকে আবার ইতিপূর্ব্বে দুই একবার দক্ষিণেশ্বরে গতায়াত করিলেও এখানেই ঠাকুরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। নবাগত এই সকল ব্যক্তিদিগের প্রকৃতি ও সংস্কার লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর ইহাদিগের প্রত্যেককে ভক্তিপ্রধান অথবা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিপ্রধান সাধনমার্গ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন এবং সুযোগ পাইলেই নিভৃতে নানারূপ উপদেশ দিয়া ঐ পথে অগ্রসর করাইতেন। আমাদিগের জানা আছে, জনৈক যুবককে ঐরূপে ঠাকুর একদিন সাকার ও নিরাকার ধ্যানের উপ-